আল-মুকাদ্দিমা দ্বিতীয় খণ্ড

ইবনে খালদুন

অনুবাদ । গোলাম সামদানী কোরায়শী

আল-মুকাদ্দিমা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

দিব্যপ্রকাশ

www.amarboi.org

ইবনে খালদুন

আল-মুকাদ্দিমা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

গোলাম সামদানী কোরায়শী
অনূদিত

www.amarboi.org

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮১

দিব্যপ্রকাশ

আল্ মুকাদ্দিমা (২য় খণ্ড)
ইবনে খালদুন

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪
dibyaprakashbooks@gmail.com

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মইনুল আহসান সাবের

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com

মূল্য : ৫৫০ টাকা US $ 20

AL-MUQADDIMAH-VOL II : A Bengali Translation of Ibn Khaldun's 'Al-Muqaddima' from 'Kitabul Ibar' by Ghulam Samdani Quraishy. First Published June 1981. First Dibyaprakash edition : February 2007. Cover design : Mainul Ahsan Saber. Price Tk. 550

ISBN 984 483 260 8

www.amarboi.org

বিষয়-সূচি

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকা, তা অর্জন ও শিল্পগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলি ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ	: সম্পদ ও উপার্জনের তাৎপর্য, এর ব্যাখ্যা এবং উপার্জন বস্তুত মানসিক শ্রমের মূল্য মাত্র ১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: জীবিকা এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রকার ও প্রথা ১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	. চাকরি স্বাভাবিক জীবিকা নয় ·১৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: প্রোথিত ও সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সম্পদ লাভের চেষ্টা স্বাভাবিক জীবিকা নয় ১৮
পঞ্চম অধ্যায়	: পদমর্যাদা সম্পদের জন্য উপকারী ২৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	: সাধারণভাবে সৌভাগ্য ও সম্পদ বশংবদ ও চাটুকারীদের করতলগত হয় এবং এ প্রকার চরিত্র সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ ২৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনাকারী; যেমন কাজী, মুফতী, মুদর্রিস ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জেম এবং অনুরূপ অন্যান্যরা—সাধারণভাবে তাদের অবস্থা কখনই সচ্ছল হয় না ৩১
অষ্টম অধ্যায়	: কৃষিকাজ দুর্বল শ্রেণী ও সরলপ্রাণ বেদুইনদের জীবিকা ৩৩
নবম পরিচ্ছেদ	: বাণিজ্যের অর্থ এর প্রক্রিয়া ও প্রকার ৩৪
দশম পরিচ্ছেদ	: কোন্ শ্রেণীর লোক বাণিজ্যের দ্বারা উপকৃত হয় এবং কাদের তা পরিত্যাগ করা উচিত ৩৫
একাদশ পরিচ্ছেদ	. ব্যবসায়ীদের চরিত্র রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তদের চরিত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে ৩৭
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	: ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রী চালান দেওয়া ৩৮
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	: মজুদদারী ৪০
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	: পণ্যের সুলভ মূল্যে ব্যবসায়ীদেরকে মন্দা বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করে ৪২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	: ব্যবসায়ীদের চরিত্র নেতৃস্থানীয়দের চরিত্র অপেক্ষা হীন ও সম্ভ্রমের অতীত ৪৪
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	: শিল্পকর্মের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ৪৬
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	: নাগরিক সভ্যতার পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্যের দ্বারাই কেবল শিল্পকলার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে ৪৮
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	: নগর জীবনে শিল্পকলার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র নাগরিকতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলেই সম্ভব ৫০

www.amarboi.org

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : শিল্পকলার উন্নতি ও প্রাচুর্য মানুষের চাহিদার উপর নির্ভরশীল ৫২
বিংশ পরিচ্ছেদ : কোন নগরী যখন ধ্বংসের সম্মুখিন হয়, তখন এর শিল্পকলাও বিলীন হতে থাকে ৫৩
একবিংশ পরিচ্ছেদ : আরবরা সকল মানুষ অপেক্ষা শিল্পকলার সাথে অধিকতর অপরিচিত ৫৪
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বিশেষ একটি শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তার পক্ষে এর পরে অন্য একটিতে অভ্যস্ত হওয়া খুব কমই সম্ভব হয় ৫৬
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : মূল শিল্পকলাসমূহ সম্পর্কে আভাস দান ৫৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : কৃষিশিল্প ৫৮
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : স্থাপত্য শিল্প ৫৯
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : সূত্রধরের শিল্প ৬৩
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : বয়ন ও সীবন শিল্প ৬৬
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : ধাত্রী শিল্প ৬৮
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা শিল্প এবং এর প্রয়োজনীয়তা প্রান্তরীয় জীবন অপেক্ষা শহর-নগরে সর্বাধিক ৭২
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : লিপিকর্ম ও গ্রন্থাদি রচনাও মানবিক শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত ৭৭
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুস্তক শিল্প ৮৫
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সঙ্গীত শিল্প ৮৮
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শিল্পকলা, বিশেষ করে রচনা ও গণিত শিল্পীকে বিচক্ষণতার অধিকারী করে ৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উহাদের বিভিন্ন শাখা; শিক্ষা, এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও এর যাবতীয় কারণ; তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্টসমূহ ৯৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : মানব সভ্যতার জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়েই স্বাভাবিক বিষয় ৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ব্যবস্থাও শিল্পকর্মের অন্তর্গত ১০১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জনবসতিপূর্ণ ও নাগরিকতায় সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার ঘটে ১০৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বর্তমানকালে সভ্যতা লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার ১০৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কোরান সম্পর্কীয় এলমে তফসীর ও এলমে কেরাত ১১২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হাদিস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি ১১৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ : ফেকাহশাস্ত্র এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়ভাগ ১২৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ : দায়ভাগ শাস্ত্র ১৩৯
নবম পরিচ্ছেদ : ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতি এবং এতদ্‌সম্পর্কীয় বিতর্ক ও মতপার্থক্য ১৪২
দশম পরিচ্ছেদ : এলমে কালাম ১৫০
একাদশ পরিচ্ছেদ : পরিবর্তমান ক্রিয়াশীল জগৎ একমাত্র মননশীলতার দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ১৬৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি ও এর উদ্ভবের প্রক্রিয়া ১৬৬
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মানুষের জ্ঞান ও ফেরেশতাদের জ্ঞান ১৬৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : নবী (আঃ)-দের জ্ঞান ১৭০
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সত্তাগত দিক থেকে মানুষ অজ্ঞ; অর্জনের দ্বারাই সে জ্ঞানী হয় ১৭২

www.amarboi.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : কোরআন হাদিসের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের রহস্য উন্মোচন এবং এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তাদের বর্ণনা ১৭৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক শাস্ত্র বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ ১৮৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র ২০৩
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রাদি ও এর প্রকারভেদ ২০৮
বিংশ পরিচ্ছেদ : সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি। গণিতশাস্ত্র; হিসাবশাস্ত্র; বীজগণিত; ব্যবহারিক গণিত ও দায়ভাগ ২১৪
একবিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যামিতি বিষয়ক শাস্ত্রাদি ২২০
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষশাস্ত্র ২২৩
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : যুক্তিবিদ্যা ২২৬
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : পদার্থবিদ্যা ২৩৩
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : চিকিৎসাশাস্ত্র ২৩৪
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : কৃষিবিদ্যা ২৩৬
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মবিদ্যা ২৩৭
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : জাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি ২৪০
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বর্ণনাদি-রহস্যশাস্ত্র; ওজনের সম্পর্ক, এর অবস্থা ও এর বিপরীতধর্মী পরিমাণ এবং বিচিত্র প্রকৃতি ও চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা কিমিয়া শিল্পের মিশ্রণজনিত সংশ্লিষ্ট অবস্থানের প্রতি সম্পর্কযুক্ত বিশিষ্ট পর্যায়গত শক্তি আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা; আত্মিক চিকিৎসা; রাজন্যবর্গ ও তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মক্ষণ সম্পর্কীয় আলোকবিচ্ছুরণ; আত্মিক প্রভাব ও ঐশী আনুগত্য, প্রেম, আত্মসংযোগ, সাধনা, আনুগত্য, উপাসনা, সম্প্রীতি, আসক্তি, নাস্তির নাস্তি, একাগ্রতা, ধ্যান, বন্ধুত্ব, সখ্যতা প্রভৃতির স্থান স্বাভাবিক প্রভাব; শেষ পর্যায়গুলোর জন্য পরিচ্ছেদ; অন্তিম উপদেশ, উপসংহার, বিশ্বাস, ইসলাম-নিষিদ্ধতা ও যোগ্যতা; পৃথিবীর যায়েরজা থেকে প্রশ্নাদির উত্তর বের করার প্রক্রিয়া; বর্ণ পদ্ধতির দ্বারা (অন্তরের) গোপন রহস্য সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ; উপাদানের শক্তি বের করার বর্ণনা ২৫২
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রসায়নশাস্ত্র ২৮৪
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : দর্শনের অসারত্ব ও দর্শনশাস্ত্রানুসারীদের বিকৃতি ২৯৭
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষ শিল্পের অসারতা, এর উপলব্ধির দুর্বলতা এবং এ উদ্দেশ্যের বিকৃতি ৩০৫
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : কিমিয়াশাস্ত্রের ফলাফলের অস্বীকৃতি, এর অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা এবং এর চর্চার ফলে সংঘটমান বিকার-বিকৃতি ৩১২
চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রসম্পর্কীয় গ্রন্থাদির আধিক্য জ্ঞানার্জনের পথে বাধাস্বরূপ ৩২১
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : গ্রন্থরচনার জন্য নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্যাবলি এবং তদতিরিক্ত অপরিহার্য বিষয়সমূহ ৩২৩
ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকের আধিক্য শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে ৩২৮
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং এর কল্যাণকর পদ্ধতি ৩৩০
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সহায়ক শাস্ত্রাদিতে চিন্তার দীর্ঘ অবকাশ এবং এর সমস্যাদিতে প্রসারতা নেই ৩৩৫

www.amarboi.org

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : শৈশবকালীন শিক্ষা এবং মুসলিম অধ্যুষিত নগরসমূহে এর পদ্ধতিগত বিভিন্নতা ৩৩৭
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা তাদের জন্য ক্ষতিকর ৩৪১
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : জ্ঞানের অন্বেষণে দেশভ্রমণ ও জ্ঞানীদের দর্শনলাভ শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিধায়ক ৩৪৩
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : মানব সমাজে জ্ঞানীরাই রাজনীতি ও এর বিচিত্র মতাদর্শ থেকে অধিকতম দূরে অবস্থান করেন ৩৪৪
ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : ইসলামী শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব ৩৪৬
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : কোন অনারব যখন তার ভাষায় বিজ্ঞ হয়ে উঠে, তখন তার পক্ষে আরবি ভাষাভাষীদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ৩৫০
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : আরবি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদী—ব্যাকরণশাস্ত্র; অভিধানশাস্ত্র; অনুচ্ছেদ; অলংকারশাস্ত্র; সাহিত্যশাস্ত্র ৩৫৩
ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : ভাষা একটি শিল্পগত যোগ্যতা ৩৬৭
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : বর্তমান আরবি একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং মুজার ও হিমিয়ারের ভাষা থেকে এটা ভিন্ন ৩৬৯
অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : নাগরিক ও শাহরবাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং মুজারি ভাষা থেকে উহা ভিন্ন ৩৭৪
ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : মুজারি ভাষার শিক্ষাব্যবস্থা ৩৭৬
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : ভাষার এই যোগ্যতা ও আরবি ভাষাতত্ত্ব এক নয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষোক্তটির প্রয়োজন সামান্য ৩৭৭
একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : বাক্‌শৈলীবিদদের পরিভাষায় 'আস্বাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিরূপণ এবং সাধারণত আরবীয়ত্ব অর্জনকারী অনারবদের তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার হেতু বর্ণনা ৩৮০
দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাধারণভাবে শহরবাসীরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম এবং যারা আরবি ভাষা পরিমণ্ডল থেকে অধিকতর দূরে অবস্থিত, তাদের জন্য তা ততোধিক কষ্টকর ও কঠিন ৩৮৪
ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্য বিষয়দ্বয়ে বাণীর দ্বিধাবিভক্তি ৩৮৮
চতুর্পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়ে দক্ষতার সুযোগ খুব অল্পই ঘটে থাকে ৩৯১
পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : কাব্যশিল্প ও তার শিক্ষাপদ্ধতি ৩৯২
ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্যের কলাকৌশল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থের মধ্যে নয় ৪০৪
সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : অতিরিক্ত কণ্ঠস্থ শক্তির দ্বারা এই যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং কণ্ঠস্থ বিষয়ের উপর তার উৎকর্ষ নির্ভরশীল ৪০৫
অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : স্বাভাবিক ও অলংকৃত বাণীরূপ এবং অলংকরণের উৎকর্ষ অপকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা ৪০৯
ঊনষষ্টি পরিচ্ছেদ : পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা কাব্যচর্চার উর্ধ্বে অবস্থান করেন ৪১৬
ষষ্টি পরিচ্ছেদ : বর্তমানকালের নাগরিক ও বেদুইন আরবি কাব্য আন্দালুসের 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা; পূর্বাঞ্চলে 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা। ৪১৮
উপসংহার ৪৫৬

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকা, তার অর্জন ও শিল্পগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া
এবং তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলি

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সম্পদ ও উপার্জনের তাৎপর্য, তাদের ব্যাখ্যা এবং উপার্জন বস্তুত মানবিক শ্রমের মূল্য মাত্র]

জেনে রাখুন, মানুষ স্বভাবত-ই এমন সব বিষয়বস্তুর মুখাপেক্ষী, যা তাকে বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায়ে জীবনের বিকাশ থেকে পূর্ণতা এবং বার্ধক্যের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আহার ও শক্তি হিসেবে সাহায্য করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ অভাবশূন্য; কিন্তু তোমরা পরমুখাপেক্ষী।[১] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থের একাধিক বর্ণনায় ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীর সব কিছু বশীভূত করে দিয়েছেন।[২] তিনি সূর্য-চন্দ্রকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; সাগরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; নৌযানকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; জীবকুলকে তোমাদের বশীভূত করেছেন এবং এমন অনেক কিছু, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করা সম্ভব। এর ফলে মানুষের হাত পৃথিবী ও এর সব বস্তুর প্রতি প্রসারিত হয়েছে। কারণ তিনি তাকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করেছেন। এর কারণে মানুষের হাত সদা প্রসারমান এবং সকলেই এ প্রচেষ্টার অংশীদার। সুতরাং এক হাত যা লাভ করে, তার বিনিময়ে ছাড়া হস্তান্তর করতে চায় না। বস্তুত এভাবে মানুষ যখন তার প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শক্তি অর্জন করে তখন সে উপার্জন করতে চেষ্টা চালায়; যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে সে তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য ব্যয় করতে সমর্থ হয় এবং প্রয়োজনীয় বিনিময় সৃষ্টি করতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে খাদ্য অন্বেষণ কর।[৩]

কখনও সে জন্য তা বিনা চেষ্টাতেও লভ্য হয়ে ওঠে; যেমন কৃষিকর্মের যোগ্য বৃষ্টি এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। কিন্তু এগুলো সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে; এর সাথে প্রচেষ্টাকে যোগ করা প্রয়োজন, যেমন পরে এর বর্ণনা আসছে এভাবে মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা উপার্জিত সামগ্রী যদি তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণের পরিমাণ অনুযায়ী হয়, তা হলে তাকে বলা হয় জীবিকা এবং তা থেকে বেশি হলে একে বিলাসী পর্যায় ও পুঁজি বলে অভিহিত করা হয়। তারপর এরূপ লব্ধ বা অর্জিত সামগ্রী যদি সংশ্লিষ্ট

---

১. কোরান, ৪৭, ৩৮।

২. কোরান, ১৪, ৩২; তুল, ১৩, ২; ১৬, ১২; ২২, ৬৫; ২৯, ৬১; ৩১, ২০; ৩৫, ১৩; ৩৯, ৫; ৪৫, ১২।

৩. কোরান, ২৯, ১৭।

www.amarboi.org

ব্যক্তিকে পুনরায় উপকৃত করে এবং তার কল্যাণে ও প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য তা তাকে ফসল দেয়, তা হলে অনুরূপ সামগ্রীকে 'সম্পদ' বলা হয়। হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমার সম্পত্তির ঐ অংশই তোমার জন্য, যা তুমি খাদ্য হিসেবে হজম করেছ, পরিধেয় হিসেবে বিনষ্ট করেছ এবং দান হিসেবে ব্যবহার করেছ। সুতরাং ঐ সামগ্রী যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণে ও অভাব পূরণে পুনরায় উপকার না দেয়, তা হলে এর অধিকারীর দিকে লক্ষ্য রেখেই একে সম্পদ বলা যাবে না। তখন অধিকৃত সামগ্রী বান্দার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের ফসল বলে তাকে বলা হয় 'উপার্জন'। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি এর উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়। কেননা তা মৃতব্যক্তির দিকে লক্ষ করলে উপার্জন বলতে হয়; কোনক্রমেই তাকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ এ পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার কোনো উপকারেই আসে না। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের প্রতি লক্ষ করলে, যেহেতু তা তাদেরকে উপকৃত করে, সেজন্য তাকে সম্পদ বলা যায়। তাহলে সুন্নতের কাছে এটিই সম্পদের তাৎপর্য। অবশ্য মুতাজিলা সম্প্রদায় এটাকে সম্পদ বলার জন্য এরূপ শর্ত আরোপ করেছে যে, তা যেন ন্যায়ানুগ অধিকারে লব্ধ হয়। সুতরাং যা অনুরূপ ন্যায় অধিকারে লব্ধ নয়, তাকে সম্পদ বলা যায় না। এদিক থেকে বলপ্রয়োগে আহৃত ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জিত সব কিছুকে সম্পদ নামে অভিহিত করার অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ উৎপীড়ক, অত্যাচারী, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই সম্পদ প্রদান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তার দয়া ও সৎপথ অর্পণ করে থাকেন। মুতাজিলা সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করেছে, তা বিশদ করার স্থান এটা নয়।

অতঃপর জেনে রাখুন, উপার্জন একমাত্র অর্জনের প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তির ইচ্ছার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। সম্পদের ক্ষেত্রেও এক বা একাধিক পন্থায় এর জন্য প্রচেষ্টা ও শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে সম্পদ অনুসন্ধান কর। কেননা তা লাভের প্রচেষ্টা একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যে ও তাঁর নির্দেশ অনুসারেই সফল হতে পারে। বস্তুত সব কিছুই তাঁর কাছে থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং উপার্জন ও পুঁজি সঞ্চয়ন, যাই হোক না কেন, সব বিষয়েই মানবিক শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তা যদি শিল্পকর্ম হয়, তা হলে তা যে শ্রমেরই ফসল, সে সম্পর্কে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই; এমনকি তা যদি প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনি থেকে আহৃত হয়, তা হলেও, পাঠক, আপনি অবশ্য দেখতে পাবেন যে, এতেও মানবিক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় তা অর্জিত হয় না এবং উপকারেও আসে না।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বর্ণ ও রৌপ্য নামে দুটি খনিজ পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যা সব প্রকার সম্পত্তির মূল্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীবাসীর ধারণা এ দুটি সঞ্চয় ও আহরণযোগ্য সামগ্রী। যদিও তারা অনেক সময় অন্য অনেক কিছু আহরণ করে; কিন্তু সব কিছুই এ দুই পদার্থ লাভ করার জন্য। কারণ অন্য সবকিছুতেই বাজারমূল্যের ওঠানামা আছে; শুধু এ দুটিই এর বাইরে অবস্থান করে। সুতরাং এ দুটি উপার্জন, আহরণ ও সঞ্চয়ের মূল ভিত্তি। যখন এসব বিষয় স্থিরীকৃত হল, তখন এও জেনে রাখুন যে, পুঁজি হিসেবে যা কিছু মানুষের উপকারে আসে ও তার দ্বারা আহৃত হয়, তা যদি শিল্পকর্ম হয়, তা হলে তা হতে তার—আহৃত উপকারিতা তার শ্রমেরই

www.amarboi.org

মূল্য বিশেষ। কেননা এটিই তার আহরণের উদ্দেশ্য। যেহেতু সেখানে শ্রম ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং এ শ্রম সে তার আহরণের লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করে নি। কখনও শিল্পকর্মে এ শ্রমের সাথে অন্য কিছুও মিশ্রিত থাকে; যেমন সূত্রধর ও তাঁতীর কাজে কাঠ ও সুতো। কিন্তু শ্রমই সেখানে বেশি, এজন্য তার মূল্যও অত্যধিক। কিন্তু যদি তা শিল্পকর্ম ছাড়া অন্য কিছু হয়, তা হলে তার আহৃত উপকারিতার মূল্যের মধ্যে যে শ্রমের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে, তার মূল্যও ধরতে হবে। কারণ শ্রম না হলে তার আহরণ সম্ভব হতো না। কখনও তার অধিকাংশের মধ্যে শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট থাকে; সুতরাং তা ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক, মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমের একটি অংশ থাকেই। আবার কখনও শ্রমের ব্যাপার অস্পষ্ট হয়; যেমন মানুষের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণে দেখা যায়। অবশ্য শ্রম ও অন্যবিধ খরচ-পত্রের ন্যায্য অংশ শস্যের মূল্য নির্ধারণে লক্ষ্য করা হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যেসব অঞ্চলে চাষাবাদের বিষয়টি আয়াসসাধ্য বা তার অন্যবিধ খরচ-পত্র খুব বেশি কিছু নয়, সেখানে এটা প্রায় অস্পষ্ট থাকে। খুব অল্প সংখ্যক চাষী ছাড়া অন্যরা এটাকে গণ্যই করে না। যাহোক, উপরিউক্ত বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উপকারিতা ও উপার্জিত সামগ্রীর সব অথবা তার অধিকাংশই মানবিক শ্রমের মূল্য মাত্র এবং এটাতে সম্পদের অর্থও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা তাই, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। উপার্জন ও সম্পদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, এখানে তা-ও ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট হয়েছে।

জেনে রাখুন, যখন শ্রম বিলুপ্ত হয় অথবা জনবসতির অভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ও উপার্জনের দ্বার রুদ্ধ করে দেন। পাঠক, আপনি স্বল্প জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখুন; কেমনভাবে তাদের সম্পদ ও উপার্জন সামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা কোথাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ সেখানে মানবিক শ্রম হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব নগরীর জনসংখ্যা অত্যধিক, তাদের অধিবাসীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা বেশি সচ্ছলতা ও আরাম-আয়েসের অধিকারী; যেমন পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এ দিকে লক্ষ রেখেই দেশের সাধারণ মানুষ বলে থাকে, যে স্থানের জনবসতি হ্রাস পেয়েছে, সেখানকার সম্পদও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ নদী ও স্রোতস্বিনীর ধারাও বালুকা প্রান্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার স্রোতকে উদ্ধার করতে হলে খনন ও প্রবহনের ব্যবস্থা করা দরকার এবং নানাবিধ শ্রম ছাড়া তা সম্ভব নয়। এমনি বোধহয়, পোষ্য প্রাণীদের দুধের ধারা, যদি তাকে দোহনের দ্বারা প্রবাহমান রাখা না যায়, তা হলে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে তা শুকিয়ে যায়। স্রোতস্বিনী ও পয়স্বিনীর মধ্যে এ ব্যাপারে পার্থক্য নেই। পাঠক, জনবহুল নগরীতে এককালে যেসব প্রস্রবণ ছিল, তাদের দিকে লক্ষ করুন; কীভাবে তারা নগরীর পতনে পর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে; যেন কখনও তাদের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ দিবারাত্রির নির্ধারণ করে থাকেন।[৪]

৪. কোরআন, ৭৩, ২০

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[জীবিকা এবং তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রকার ও প্রথা]

জেনে নিন যে, জীবিকার অর্থ হল সম্পদ অর্জনের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা। এটা জীবন শব্দজাত[৫]। কারণ জীবন তথা মানুষের অস্তিত্ব এটি ছাড়া সম্ভব নয় বলে একেই জীবনের আধার স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতঃপর সম্পদ অর্জন ও উপার্জন সম্পর্কে বলতে গেলে এটি কখনও অপরের কাছ থেকে গ্রহণ এবং তার ওপর প্রতিপত্তির প্রভাবে সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য সুপরিচিত বিধি-নিয়ম বিদ্যমান এবং তাকে জরিমানা ও শুল্ক-করাদি বলা হয়। কখনও স্থলভাগে বা সমুদ্রে বন্যপ্রাণী নিধন ও শিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং তাকে শিকার বলা হয়। কখনও পালিত পশুর উপজাত, যা মানুষের উপকারে ও ব্যবহারে লাগে, তা দিয়ে অর্জিত হয়। যেমন—পালিত পশুর দুধ, রেশম কীটের রেশম ও মৌমাছির মধু। অথবা চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণ করে এগুলোর সংরক্ষণ ও ফল-ফসল অর্জনের দ্বারা করা হয় এবং এগুলোকে কৃষি বলা হয়ে থাকে।

কখনও মানবিক শ্রমের দ্বারা উপার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। কখনও এ শ্রম বিশেষ উপকরণের সাথে যুক্ত হয়; যেমন—লিখন, ছুতারের কাজ, সীবন, বয়ন, অশ্বারোহণ ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় এবং এগুলোর নাম শিল্পকর্ম। আবার কখনও এটি নির্দিষ্ট কোনো উপকরণের সাথে যুক্ত হয় না; এটি অবশিষ্ট সব পরিশ্রম ও তৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কখনও এ উপার্জন পণ্যদ্রব্য এবং বিনিময়ের জন্য তার প্রস্তুতির দ্বারা অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যকে চালান করা হয় অথবা নির্দিষ্ট স্থানে মজুদ করে বাজার মূল্যের ওঠানামা লক্ষ করা হয়। একেই বলা হয় বাণিজ্য।

এগুলোই জীবিকার প্রক্রিয়া ও তার প্রকার। সাহিত্যিক ও দার্শনিকের মধ্যে বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন, তার অর্থও এরূপ। যেমন হারিরী[৬] ও অন্যান্যদের বর্ণনা। তারা বলেছেন, জীবিকা বলতে রাজকীয় পদ, বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও শিল্পকর্ম বোঝায়। অবশ্য রাজকীয় পদ জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক কোনো প্রথা নয়; সুতরাং আমরা এর সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজকীয় শুল্ক-করাদির অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে এগুলো সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা করেছি। কিন্তু কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য স্বাভাবিক জীবিকা অর্জন

---

৫. মূলে আছে 'আরশ'।
৬. 'মকামাত' গ্রন্থ প্রণেতা কাসেম ইবনে আলী; ৪৪৯-৫১৬ (১০৫৫-১১২২ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

প্রক্রিয়া। এগুলোর মধ্যে কৃষিকাজ মূলত সর্বাগ্রগামী। কেননা তা অবিমিশ্র, স্বাভাবিক ও সহজাত। তার জন্য চিন্তা ও বিদ্যার প্রয়োজন নেই। এজন্য সৃষ্টির মধ্যে মানব পিতা হযরত আদমের প্রতি একে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনিই এর শিক্ষক ও অবলম্বনকারী। এ নির্দেশের দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, কৃষিকাজ জীবিকা প্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রগামী এবং স্বভাবের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিল্পকর্ম তার দ্বিতীয় পর্যায় এবং পরবর্তী। কেননা তা মিশ্র বিদ্যার সাথে জড়িত। এর জন্য প্রচুর চিন্তা ও সযত্ন অনুশীলনের প্রয়োজন। সম্ভবত এ কারণেই এটি একমাত্র সেই নগর জীবনে পাওয়া যায় যা যাযাবর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় ও পরবর্তী। এজন্যই একে সৃষ্টির দ্বিতীয় পিতা হযরত ইদরিসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তিনিই তাঁর পরবর্তী মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ শিল্পকর্মের উদ্ভাবন করেছিলেন।

বাণিজ্য যদিও উপার্জনের দিক থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অধিকারী, তবুও তার অধিকাংশ পথ ও প্রথা ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় গৃহীত কলাকৌশল মাত্র। যাতে এ দুটির উপজাত থেকে উপার্জনের উপকারিতা লাভ করা যায়। এ কারণে ধর্মীয় বিধান এতে চাতুর্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কারণ বাণিজ্যের মধ্যে জুয়ার অনুরূপ একটি অবস্থা বিদ্যমান। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, কোন কিছু না দিয়েই মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা। এজন্য একে বিধিসিদ্ধ বলে স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[চাকরি স্বাভাবিক জীবিকা নয়]

জেনে রাখুন যে, শাসকের জন্য তাঁর শাসনতান্ত্রিক ও রাজকীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সব বিভাগেই লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাঁর সেনাদল, রক্ষীবাহিনী ও মসীজীবীদের সহায়তা দরকার। প্রত্যেক বিভাগে তিনি এমন কিছু লোক প্রত্যাশা করেন, যারা তাঁর জ্ঞানে সেজন্য যথেষ্ট এবং তিনি সেই অনুপাতে তাদের বেতনাদির ব্যয়ভারও রাজকোষ থেকে বহন করে থাকেন। এসব চাকরির সবটুকুই শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত এবং তারই কল্যাণে তাদের জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা এসব চাকরির অধিকারীরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সর্বোচ্চ শাসকই তাদের সব শক্তির উৎস।

অবশ্য এর চেয়ে নিম্ন মর্যাদার চাকরিও বিদ্যমান। তার কারণ এই যে, অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই নিজ প্রয়োজনের কাজ করতে ঘৃণা করে অথবা তারা তা করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা তারা প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে তার সঙ্গতি হারিয়েছে। সুতরাং তারা উক্ত কাজের জন্য একজনকে নিয়োগ করে এবং তার সম্পদ থেকে এর পারিশ্রমিক বহন করে থাকে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক পৌরুষের জন্য এ অবস্থা প্রশংসনীয় নয়। কারণ যে-কোন ব্যক্তির অপরের উপর নির্ভর করা অক্ষমতার নামান্তর। এটি একদিকে যেমন তার দায়িত্ব ও ব্যয় বৃদ্ধি করে, তেমনি অন্যদিকে কাপুরুষতা ও অক্ষমতার মতো এমন দুটি দোষের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা পৌরুষের ধর্মে সর্বদাই পরিত্যাজ্য। অবশ্য অভ্যাসই মানুষকে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিবর্তে অস্বাভাবিককে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কেননা মানুষ তার পিতা-মাতার নয়, অভ্যাসের সন্তান।

তদুপরি যে কাজের যোগ্য ও যার উপর নির্ভর করা যায়, তেমন চাকরের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বস্তুত এমন কাজে নিয়োজিত চাকর চার প্রকার হতে পারে। হয় সে করিতকর্মা ও তার প্রতি অর্পিত দায়িত্বে বিশ্বস্ত হবে; নয়ত তার বিপরীত; অর্থাৎ সে করিতকর্মাও নয় এবং তার হাতে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথবা যে-কোন একটি ব্যাপারে বিপরীত হবে; যেমন করিতকর্মা কিন্তু বিশ্বস্ত নয় এবং বিশ্বস্ত কিন্তু করিতকর্মা নয়। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর চাকর, যে করিতকর্মা ও বিশ্বস্ত, তাকে কোন অবস্থাতেই কারও পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ সে তার কর্মকুশলতা ও বিশ্বস্ততার দরুন সাধারণ মানুষের সাহচর্যকে হেয় জ্ঞান করবে এবং তার সেবার জন্য

www.amarboi.org

বেশি মূল্য প্রত্যাশা করবে। কারণ সে এর চেয়ে বেশি দাবি করার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং যারা বিরাট জাঁকজমকের অধিকারী, তেমন আমীর-উমরাহ্গণ ছাড়া অন্য কেউ তাকে প্রতিপালিত করতে সক্ষম হবে না। জাঁকজমকের ব্যাপকতার মধ্যেই এরূপ চাকরের প্রয়োজন সর্বাধিক।

দ্বিতীয় পর্যায়ের চাকর, যার কর্মকুশলতা ও বিশ্বস্ততার কোনো গুণ নেই, তেমন কোনো লোককে কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা সে নিয়োগকর্তাকে দুদিক থেকেই একসঙ্গে কর্তন করবে। কর্মকুশলতার অভাবে তাঁর সব কাজ নষ্ট করবে এবং অন্যদিকে তাঁর সম্পদ অপহরণের দ্বারা তাঁকে নিঃস্ব করে তুলবে। যে-কোনো অবস্থাতেই সে মালিকের উপর গুরুভারস্বরূপ।

সুতরাং এ দু প্রকার চাকর নিয়োগের লোভ প্রত্যেককেই ত্যাগ করা উচিত। কাজেই তাদের জন্য শেষ দু প্রকার ছাড়া অন্য পথ নেই। এ দু প্রকার হলো বিশ্বস্ত কিন্তু অকরিতকর্মা এবং করিতকর্মা কিন্তু অবিশ্বস্ত। এ দু প্রকারের মধ্যেও যে-কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত আছে। আবার প্রতিটি মত পোষণের কারণও রয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে চাকর যদি করিতকর্মা হয়ে বিশ্বস্ত না-ও হয়, তবু তাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার। কারণ তাতে কাজের ক্ষতি হবে না এবং তার তছরুপের প্রবৃত্তিকে সতর্ক পাহারার মাধ্যমে আয়ত্তে রাখা যাবে। কিন্তু অকরিতকর্মা যদিও বিশ্বস্ত হয়, তবুও তার অকাজের দ্বারা লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি হবে। পাঠক, এটা জেনে নিন এবং চাকর গ্রহণের ক্ষেত্রে একে একটি কার্যকর নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করুন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[প্রোথিত ও সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সম্পদ লাভের চেষ্টা স্বাভাবিক জীবিকা নয়]

জেনে রাখুন, নগরবাসী বহু দুর্বল বুদ্ধির লোক মাটির নিচে থেকে ধনরত্ন বের করার জন্য লালায়িত হয় এবং তাকেই তাদের উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের ধারণা পূর্ববর্তী সব জাতির ধনরত্ন মাটির নিচে সঞ্চিত রয়েছে এবং ঐ সম্পদ এমন যাদু প্রক্রিয়ায় সীলমোহরকৃত যে, একমাত্র উক্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। কেননা কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার জন্য প্রয়োজনীয় ধোঁয়া, প্রার্থনা ও উৎসর্গাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আফ্রিকার নগরবাসীদের ধারণা, ইসলামের পূর্ববর্তী যেসব ফিরিঙ্গী জাতি সেখানে বাস করত, তারা তাদের ধনরত্ন মাটির নিচে পুঁতে রেখে গেছে। তারা তার নিদর্শন এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছে যে, তার রহস্য উদ্ধার করতে পারলেই কেবল ঐসব ধনরত্ন বের করা সম্ভব। পূর্বাঞ্চলের নগরবাসীরাও কিবতী, রোমান ও পারসিকদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং তারা এ প্রসঙ্গে এমন সব কাহিনী বর্ণনা করে, যা অবাস্তব কল্পকথার সমতুল্য। যেমন এমন একদল গুপ্তধন অন্বেষণকারী একটি সম্পদাগার খুঁড়লো, যারা কোন প্রকার যাদুবিদ্যা জানে না বা তার সংবাদও রাখে না; সুতরাং তারা দেখতে পেল উক্ত ধনাগার শূন্য অথবা কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ। অথবা তারা দেখতে পেল, যে স্থান অগাধ ধনরত্নে পূর্ণ রয়েছে; কিন্তু এর সামনে উন্মুক্ত তরবারী হাতে প্রহরী দণ্ডায়মান। অথবা এমনভাবে উক্ত স্থান কাঁপতে লাগল যে, বুঝি-বা তাদেরসহ ধসে যাবে। এমন আরও বহু অলীক কথাবার্তা।

আমরা মাগরিবের এমন অনেক বিদ্যার্থীকে দেখতে পাই, যারা স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন ও তার উপকরণ সংগ্রহে অক্ষম, তারা পার্শ্বদেশ ছিন্নভিন্ন এমন কিছু লেখা কাগজ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়। এসব কাগজে হয় অনারব ভাষায় কিছু লেখা থাকে অথবা তাদের ধারণা অনুসারে গুপ্তধনের মালিকদের নির্দেশিকা থেকে এতে এমন কিছু কথা অনূদিত হয়েছে, যা গুপ্তধনের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্থানের দিক্ নির্দেশ করে। এর দ্বারা এসব বিদ্যার্থী সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য পোষণ করে। তারা ধনীদেরকে অনুরূপ স্থান খনন ও গুপ্তধন সন্ধানে উৎসাহ যোগায়। এটি করতে গিয়ে তারা এরূপ ভান করে যে, উক্ত ধনী ব্যক্তিদেরকে তারা এজন্য জানাচ্ছে, যাতে তাঁরা এরূপ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির সময় শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি ও তাদের দেয়া শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা

www.amarboi.org

করতে পারেন। অনেক সময় তাদের কাছে বিরল ও অদ্ভুত ধরনের যাদুর উপকরণ থাকে, যা দিয়ে তারা তাদের অন্যান্য দাবির সত্যতা প্রমাণের ভান করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা যাদু ও তার প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এর ফলে বহু দুর্বল বুদ্ধির লোক আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং খনন কাজ পরিচালনার জন্য লোক সংগ্রহ করে। তারা রাতের আঁধারের আড়ালে অনুসন্ধান কাজ চলায়; যাতে রাজকীয় প্রহরী বা রাজপুরুষদের দৃষ্টি এর উপর না পড়ে। এর পর যখন কোনো কিছু পাওয়া যায় না, তখন ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব সেই যাদুমন্ত্রের অজ্ঞতার উপর ন্যাস্ত করা হয়, যা দিয়ে এ সম্পদটিকে সীলমোহর করা হয়েছে। এভাবে তারা এ প্রলোভনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য নিজেদেরকে প্রতারিত করে।

যতদূর সম্ভব এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত হওয়ার একমাত্র কারণ তাদের নির্বুদ্ধিতা। কারণ তারা জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক পন্থা বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও শিল্পকর্ম প্রভৃতির দ্বারা উপার্জন করতে অক্ষম। এজন্য তারা বিকৃত পন্থা ও অস্বাভাবিক ধারায় জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। এরূপ ও এমন অন্যান্য আচরণ, এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তারা উপার্জনে অক্ষম এবং তারা সম্পদ লাভ ও অর্জন করতে কোনো প্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই সফলকাম হতে চায়। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, তারা এমন কাজের দ্বারা অনর্থক নিজেদেরকে জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি দুঃখ, কষ্ট ও মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন করে। তদুপরি এরূপ প্রতারণার জন্য তাদের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান।

অনেক সময় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে উৎসাহের একটি অন্যতম কারণ হলো বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য এবং এর এমন সমস্ত অভ্যাস, যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কিছুতেই এখন আর উপার্জনের বিভিন্ন উপায় ও প্রক্রিয়া তার চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন স্বাভাবিক উপার্জন দিয়ে তার চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তখন তার সামনে এ একটি পথই খোলা থাকে, তা হলো, সে হঠাৎ কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই এমন বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে, যা দিয়ে সে তার বিশ্বাস পরিবৃত অভ্যাসগুলোকে তৃপ্তিদান করতে পারে। কাজেই সে এরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লালসাগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং এর জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ জন্যেই, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং ব্যাপক পরিধি ও বহুল বিলাসের অধিকারী নগরীগুলোর অধিকাংশ লোক এ বিষয় নিয়ে লালায়িত হয়ে ওঠে। যেমন মিশর ও অনুরূপ অন্যান্য নগরীর লোকজন। আমরা দেখতে পাই, এসব নগরীর অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে উৎসাহী এবং তা লাভ করতে সচেষ্ট। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অশ্বারোহীদেরকে অনুরূপ বিষয়াদির বিরল সংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং অনুরূপ উৎসাহের সঙ্গে তারা কিমিয়াশাস্ত্র শিক্ষা করতে অগ্রসর হয়। অনুরূপভাবে আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি যে, মিশরবাসীরা খুব আগ্রহের সাথে মাগরিবের বিদ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে; যাতে তাদের সাহায্যে কোনো প্রোথিত সম্পদ ও সঞ্চয়াগার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। তদুপরি তারা যাদুবিদ্যার সাহায্যে মাটিতে পানি শুষে নেয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ তাদের ধারণা

www.amarboi.org

এসব গুপ্তধনের অধিকাংশই নীলনদের প্রবাহ পথে লুক্কায়িত রয়েছে এবং সম্ভবত এ অঞ্চলের একটা বিরাট সঞ্চয় ও অপরিমিত ধনরত্ন এ নীলনদ তার স্রোতের দ্বারা ঢেকে রেখেছে। যেসব লোক এ সম্পর্কে লিখিত তথাকথিত অলীক বই রক্ষা করছে, তারা এ বলে তাদের মিথ্যাকে ঢাকা দেয় যে, কেবল নীলনদের এ প্রবাহের জন্য তারা এসব ধনের কাছে পৌঁছতে পারছে না। এভাবে তারা তাদের জীবিকার পথ প্রশস্ত করে এবং এসব অলীক কাহিনীর শ্রোতারাও যাদুবিদ্যার সাহায্যে নীলনদের পানি শুকিয়ে তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করার জন্য মেতে ওঠে। যাদুবিদ্যার প্রতি তাদের একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কারণ এ বিষয়টি বহু প্রাচীনকাল হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। যাদুবিদ্যা ও তার বহু নিদর্শন তাদের অঞ্চলের সমাধি ও অন্যান্য সৌধাদিতে অবশিষ্ট রয়েছে। ফেরাউনের যাদুর ব্যাপারগুলোও এ ব্যাপারে তাদের বিশিষ্টতার স্মরণ করায়।[৭] মাগরিবের লোকেরাও পূর্বাঞ্চলের দার্শনিকদের রচনা বলে একটি দীর্ঘ কবিতার কথা উল্লেখ করে, যার মধ্যে যাদু প্রক্রিয়ার সাহায্যে পানি শুষে নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক, আপনি উক্ত প্রক্রিয়া ঐ পদ্যটির মধ্যেই দেখতে পাবেন; যেমন পদ্যটি এই :

ওহে মাটিতে পানি শুষে নেওয়া রহস্যময় প্রক্রিয়ার অন্বেষণকারী।
এক বিচক্ষণ সত্যবাদীর বক্তব্য শ্রবণ কর।
তারা যে সব পুস্তক রচনা করেছে, তা ত্যাগ কর,
এগুলো অলীক কল্পনা ও অন্যান্য বাগাড়ম্বর পরিপূর্ণ।
আমার এ সত্য ও সদুপদেশপূর্ণ কথাগুলো শ্রবণ কর,
অবশ্য তুমি যদি এমন ব্যক্তি হও, যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না।
তুমি যদি কোন কূপের পানি শুষে নিতে মনস্থ কর,
যার সম্পর্কে সর্বপ্রকার জল্পনা-কল্পনা নিস্ফল হয়েছে।
তা হলে তোমার নিজের অনুরূপ একটি মূর্তি অঙ্কন কর, দণ্ডায়মান—
এর মস্তকটি একটি তরুণ সিংহের অনুরূপ—গোলাকার।
এর দুটি হাত একটি রজ্জু ধরে রাখবে, যার সাহায্যে
সে একটি বালতি কূপের অভ্যন্তর থেকে টেনে তুলছে।
তার বুকে একটি 'হে' বর্ণ লিখবে, যেমন তুমি দেখতে পাও—
'তালাক' শব্দের সংখ্যামান, বারংবার লেখা ত্যাগ কর।
তা 'ত্ব'য়ের উপর পদক্ষেপ করবে তাকে স্পর্শ না করে
একজন সাহসী, বুদ্ধিমান ও সতর্ক লোকের ন্যায় হাঁটবে।
এতদ্‌সমুদয়ের চতুর্দিকে একটি রেখা থাকবে,
তা গোলাকার না হয়ে চতুষ্কোণ হলে ভাল হয়।
তার উপর তুমি একটি পাখি জবেহ কর, রক্ত দিয়ে মাখাও,
জবেহের পরে তাকে সুগন্ধী ধোঁয়ায় আবৃত কর।
চন্দন, লোবান, ধুনা,
ও 'কুস্তা' মূল এবং তাকে রেশম দ্বারা আচ্ছাদিত কর।
বস্ত্রটি লাল অথবা হলুদ বর্ণের, নীল বর্ণের নয়—
এতে সবুজ ও ধূসর বর্ণ থাকবে না।

৭. তুল. কোরান, ৭, ১১০।

www.amarboi.org

তা বাঁধা হবে দুটি সুতায়—সাদা পশম
অথবা লাল, খাঁটি টকটকে লাল।
উদীয়মান রাশি হবে সিংহ, যেমন তারা বর্ণনা করেছে,
এবং মাসের আরম্ভটি হবে কৃষ্ণপক্ষ।
চন্দ্র বুধের কল্যাণাংশে সম্মিলিত থাকবে,
শনিবার—এ লগ্নই প্রচেষ্টার সময়।

অর্থাৎ ত্বয়ের অবস্থান তার পদদ্বয়ের নিচে হবে, যেন সে এর উপর দিয়ে হাঁটছে।[৮] আমার কাছে এ দীর্ঘ কবিতাটি প্রবঞ্চকদের মানুষকে বোকা বানানোর অপকৌশল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তারা এর মধ্যে বিচিত্র অবস্থা ও অদ্ভুত সব পরিভাষা ব্যবহার করেছে। তাদের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারের পর্যায় এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তারা গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনার জন্য প্রসিদ্ধ ঘর ও পরিচিত স্থানগুলোতে কিছুকাল বসবাস করে এবং সেখানে গর্ত করে তাদের ঐসব নিদর্শন ও বস্তু রেখে আসে, যা তারা তাদের এসব অলীক রচনাবলিতে উল্লেখ করে। তারপর তারা একশ্রেণীর নির্বোধ লোকদের কাছে এসব লেখা নিয়ে গিয়ে ঐসব গৃহ ও স্থান ভাড়া নিতে এবং সেখানে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা তাদেরকে বোঝায়—সেখানে এত বেশি ধনরত্ন আছে যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এর পর তারা তাদের কাছে ঐসব ধনরত্নের যাদুক্রিয়া ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাচার ও ধূম্রসুগন্ধী ক্রয় করতে সম্পদ দাবি করে এবং সেখানকার গর্তগুলোয় তারা নিজের হাতে যেসব নিদর্শন রেখেছিল, তা বের করার উদ্যোগ আয়োজনে লিপ্ত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐগুলো দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অথচ ইতোমধ্যে সে যে প্রতারণার জালে আটকে পড়ে সবকিছু গোলমাল করে ফেলেছে তা বুঝতেও সক্ষম হয় না। তারাও সুযোগ বুঝে তাদের সংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আরও জড়িয়ে পড়ে। এরূপ ভাষা ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের খনন কাজ, সুগন্ধী ব্যবহার, প্রাণী উৎসর্গ প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের ফলাফল যেন ঐ ব্যক্তি বুঝতে না পারে।

এ প্রসঙ্গে যথার্থ কথা বলতে গেলে এটা বলতে হয় যে, জ্ঞানে ও শ্রুতিতে কোথাও অনুরূপ গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনার কোনো ভিত্তি নেই। পাঠক, জেনে রাখুন, যদিও অনেক সময় এরূপ সঞ্চিত সম্পদ পাওয়া যায়, কিন্তু এটা একান্তই বিরল ও আকস্মিক। কেউ ইচ্ছা করে তা লাভ করতে পারে না। তা এমন কোনো বিষয় নয় যে, সব মানুষই তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ধনরত্ন মাটির নিচে পুঁতে ফেলে এবং তার সীলমোহরের জন্য যাদুবিদ্যার আশ্রয় নেয়। প্রাচীনকালেও এরূপ কোনো সাধারণ অভ্যাস ছিল না, আধুনিককালেও দেখা যায় না। যে সব গুপ্তধনের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌রা যার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন[৯], ঐগুলো মূর্খতার যুগের প্রোথিত সম্পদ। আবার তাও হঠাৎ কোনো সময় আকস্মিকভাবে পাওয়া যায়। এর প্রাপ্তি কখনই ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের ফল নয়।

৮. রোজেনথালে এ বাক্যটি পদ্যের মধ্যভাগে—লোকের ন্যায় হাঁটিবে-এর পরে উল্লেখিত হয়েছে।

৯. তুল, বোখারী (১ম খণ্ড)।

www.amarboi.org

তদুপরি যে ব্যক্তি তার ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে রাখে এবং তার উপর যাদুবিদ্যার দ্বারা সীলমোহর লাগিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় তাকে সম্পূর্ণ গোপন করার জন্যই এটা করে। সুতরাং তার পক্ষে গুপ্তধনলোভীদের জন্য এর নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে যাওয়া কী করে সম্ভব হতে পারে! সে এ ধনরত্ন গোপন করতে চেয়েছে, এটা যদি সত্য হয়; তা হলে কখনও সে সে জন্য বই লিখে সব শহরের লোকদেরকে তা খুঁজে বের করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাবে না। কারণ এতে তার গোপন করার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যায়। এ ছাড়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সব কাজেই একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং তা কল্যাণধর্মী হয়। সুতরাং মানুষের সম্পদ প্রোথিত করার উদ্দেশ্য হল, তা যাতে তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া সে যদি এটাকে সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন করতে চায় এবং অনাগত ভবিষ্যতে কোনো জাতি বা ব্যক্তি তা জানতে পারবে না, এটাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা সে নষ্ট ও ধ্বংস করার জন্যই করেছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এটা করতে পারে না।

অবশ্য তাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধনরত্ন কোথায়? তাদের সে অফুরন্ত ও অসংখ্য ধনরত্নের কথাও আমরা জানতে পেরেছি! এর উত্তরে, পাঠক, জেনে রাখুন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য ও অন্যান্য সামগ্রী খনিজ দ্রব্য এবং উপার্জিত সম্পদ। যেমন—লোহা, তামা, সীসা এবং অন্যান্য মৌলিক ও খনিজ পদার্থ। সভ্যতাই ওগুলোকে মানবিক শ্রমের দ্বারা বের করেছে এবং প্রয়োজন মতো একে বাড়িয়েছে কমিয়েছে। তার মধ্যে যা মানুষের হাতে পাওয়া যায়, তা হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সূত্রে সচল। অনেক সময় তা একদিক থেকে অন্যদিকে এবং এক সাম্রাজ্য থেকে অন্য সাম্রাজ্যে বিচিত্র উদ্দেশ্য ও সভ্যতার আকর্ষণে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় যদি সম্পদ হ্রাস পায়, তা হলে দেখা যাবে শ্লাভ ও ফিরিঙ্গী অঞ্চলে তা বেড়ে উঠেছে এবং মিশর ও সিরিয়ায় কমে গেলেও হিন্দ ও চীনে তার অভাব নেই। এটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপার্জিত সম্পদ বৈ অন্য কিছু নয়; সভ্যতা একে বাড়ায় ও কমায়। অন্যদিকে খনিজ পদার্থও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মোতি ও মণিমাণিক্য সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে সোনা, রুপা, তামা, লোহা, সীসা এবং টিনও ক্ষয়ের অধীন। এগুলোও স্বাভাবিক ধ্বংস ও বিনষ্টের ফলে খুব তাড়াতাড়ি ওগুলোর মূলসত্তা হারিয়ে ফেলে।

হ্যাঁ, মিশরে যে ধনপ্রাপ্তি ও গোপন সঞ্চয়ের ব্যাপার দেখা গেছে, এর কারণ এ যে, দেশটি হাজার হাজার বছর অথবা তারও বেশি সময় ধরে কিবতীদের শসনাধীনে ছিল। তারা মৃতদেহকে সোনা, রুপা, মণিমাণিক্য ও সামগ্রীসহ সমাধিস্থ করত। তাদের প্রাচীন সম্রাটদের সময়ে এটাই প্রথা ছিল। তারপর কিবতীদের পতন ঘটলে পারস্যবাসীরা উক্ত দেশের অধিকারী হয় এবং ধনরত্নের উদ্দেশ্যে তাদের সমাধিগুলোতে সুড়ঙ্গ কেটে তা বের করে আনে। তারা এসব কবর থেকে এত সম্পদ পেয়েছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেমন সম্রাটদের সমাধি পিরামিড ও অন্যান্য সমাধিসৌধ। পারস্যবাসীদের পরে গ্রিকরাও অনুরূপ কাজ করেছে। এ কারণে বর্তমানকালে তাদের সমাধিগুলোকে

www.amarboi.org

ধনরত্ন প্রাপ্তির স্থান বলে ধারণা করা হয় এবং অনেক সময় আকস্মিকভাবে সেখানে প্রোথিত সম্পদ পাওয়া যায়। এগুলো হয় মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ অথবা তাদের সম্মানে প্রদত্ত সোনা-রুপার বাসনপত্র ও সিন্দুক, যা পূর্ব থেকেই এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হত। সুতরাং কিবতীদের সমাধিস্থলগুলো হাজার হাজার বছর ধরে এ ধনরত্ন প্রাপ্তির ধারণার শিকার হয়ে এসেছে। এ কারণেই মিশরবাসীরা এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে অর্থপূর্ণ মনে করে এবং তা বের করার চেষ্টাও চালায়। এমনকি সাম্রাজ্যের শেষের দিকে তারা যখন অন্যান্য বিষয়ের ওপর কর আরোপ করে, তখন গুপ্তধন অন্বেষণকারীদের উপরও কর ধার্য করা হয়। এসব কর একশ্রেণীর নির্বোধ ও লোলুপ ব্যক্তিরা দিয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে এসব অর্থলোভী ব্যক্তি এ সমাধিস্থলগুলো উন্মুক্ত করার ও তাদের উদ্দিষ্ট সম্পদ বের করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপ ব্যর্থতা থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। যদি কারও মনে অনুরূপ দুর্মতি দেখা দেয় কিংবা কেউ যদি অনুরূপ কোনো চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে, তার উচিত স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনে তার আলস্য ও অক্ষমতা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স) এ ব্যাপারে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উচিত অনুরূপভাবে শয়তানের পথ ও তার কুমন্ত্রণা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। সে যেন তার প্রবৃত্তিকে এসব অবাস্তব ও মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা বিভ্রান্ত হতে না দেয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত সম্পদ দান করেন।[১০]

---

১০. কোরান, ২, ২১২; ৩, ৩৭; ২৪, ৩৮।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[পদমর্যাদা সম্পদের জন্য উপকারী]

এটা এই যে, আমরা পদমর্যাহীন অপেক্ষা সম্পদশালী ও পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেশি সচ্ছলতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হিসেবে দেখতে পাই। এর কারণ এই যে, পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সর্বদাই লোকে মান্য করে এবং তার পদমর্যাদার প্রতি তাদের আকর্ষণ ও এর সহায়তার প্রয়োজনে তারা পরিশ্রমের সাহায্যে তার.নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হয়। সুতরাং মানুষ তার যেকোন প্রকার প্রয়োজন—মৌলিক, অভাবজাত অথবা বিলাসী যা-ই হোক না কেন, তাদের পরিশ্রমের দ্বারা তা পূরণ করার চেষ্টা করে। এর ফলে উক্ত পরিশ্রমের ফসল পদমর্যার অধিকারী ব্যক্তির উপার্জন হিসেবে গণ্য হয়। যেসব বিষয়ে সাধারণভাবে মানুষ বিনিময় প্রত্যাশা করে, তার ক্ষেত্রে সেগুলোও বিনা মজুরিতে মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং এসব শ্রমের সব মূল্যই ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির জন্য জমা হয়ে ওঠে। এভাবে সে তার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ও তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মধ্যে একটা উদ্বৃত্তের অধিকারী হতে থাকে এবং ক্রমশ তার ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। যেহেতু পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জন্য অনুরূপ বিনামূল্যের শ্রমলাভ একটি সহজ ব্যাপার, সেজন্য অতি অল্প সময়ে সে ধনের অধিকারী এবং সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিনায়ক হয়ে পড়ে। এই অর্থ শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা ও জীবিকা অর্জনের একটি উপায় বলে গণ্য হতে পারে, যেমন আমরা আগে বলেছি।

অথচ অনুরূপ পদমর্যাদাহীন ব্যক্তি সর্বত্রই, যদিও সে সম্পদশালী হয়, তবুও সচ্ছলতা তার সম্পদ ও পরিশ্রমের অনুপাতেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীই এ পর্যায়ের। এজন্য পাঠক, দেখতে পাবেন পদমর্যাদার অধিকারীরা তাদের চেয়ে বেশি সচ্ছল। অন্য একটি উদাহরণও এর সাক্ষ্য দেয়। আমরা এমন অনেক ধর্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্মিক ও সাধুব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাদের পুণ্যাত্মা হওয়ার ধারণা প্রচারিত হতে না হতেই মানুষ তাঁদের কল্যাণ কামনাকে আল্লাহ্‌র কাজ বলে মনে করে। সুতরাং তারা তাঁদের সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে এবং নানাবিধ অভাব পূরণে এগিয়ে আসে। এর ফলে অতিসত্বর তাঁদের সচ্ছলতা দেখা দেয় এবং তাঁরাও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। অবশ্য এক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জনও করে থাকেন। এমন বহু ব্যক্তিকেই আমরা নগর, পল্লী ও প্রান্তরে ধনাঢ্যতা লাভ করতে দেখেছি। মানুষ তাঁদের জন্য ক্ষেতে-বাগানে কাজ করে দিচ্ছে; অথচ তাঁরা ঘরের মধ্যে বসে থাকেন; কখনও বের হয়ে দেখতেও যান না। এদিকে দিনে দিনে

www.amarboi.org

তাঁদের সম্পদ বাড়তে থাকে, উপার্জন অপরিমাণ হয়ে ওঠে এবং তাঁরা কোনো প্রকার প্রচেষ্টা ছাড়াই ধনী হয়ে দাঁড়ান। যারা এমন সচ্ছলতার রহস্য বোঝে না, তারা তাঁদের আসবাবপত্র, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। বস্তুত পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত সম্পদের অধিকারী করেন।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে সৌভাগ্য ও সম্পদ বসংবদ ও চাটুকারদের করতলগত হয় এবং এমন চরিত্র সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ]

আমাদের আগের আলোচনায় একথা প্রকাশ পেয়েছে যে, মানুষ যে উপার্জনের দ্বারা উপকৃত হয়, তা তাদের শ্রমের মূল্য মাত্র। যদি কাউকেও সামগ্রিকভাবে শ্রম থেকে বিরত রাখা হয়, তা হলে তার উপার্জনও শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে। বস্তুত তার শ্রম, এর মর্যাদা ও মানুষের কাছে এর চাহিদা অনুসারেই তার মূল্যমান নির্ধারিত হয় এবং সে অনুপাতেই তার উপার্জন বৃদ্ধি পায় অথবা ঘটে যায়। একটু আগেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, পদমর্যাদা মানুষের সম্পদ লাভের সহায়ক। কারণ ঐ পদের অধিকারীদের নৈকট্য লাভ করে বিপদ দূর অথবা সম্পদ লাভ করার জন্য মানুষ তাদের জন্য নিজেদের শ্রম ও ঐশ্বর্য ব্যয় করে থাকে। তারা ঐ মর্যাদার জন্য যে শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে, এর বিনিময়ে ঐ পদের সহায়তায় সৎ-অসৎ সর্বপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। সুতরাং তাদের এ শ্রম তাঁদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তার মূল্য তাঁদের জন্য সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য এনে দেয়। এর ফলে তাঁরা অতি অল্প সময়ে ধনাঢ্যতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ান।

অতঃপর পদমর্যাদার এ স্তরও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন এবং পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলেন রাজন্যবর্গ, যাদের উপর আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে এমন সাধারণ মানুষ, যারা কল্যাণ-অকল্যাণ কোনটারই শক্তি বহন করে না। এ দুটির মধ্যে আরও বহু বিচিত্র পর্যায় রয়েছে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্যলীলা, যা দিয়ে তিনি তাদের জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের কল্যাণ সুলভ করেন এবং তাদের অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। কারণ মানব জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য পরস্পরের কল্যাণধর্মী সহায়তা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কেননা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যদি কল্পনায় তার অস্তিত্ব ধরেও নেয়া যায়, তবুও তার স্থায়িত্ব কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তদুপরি এ সহায়তাও তাদের মধ্য থেকে স্বতোৎসারিত নয়; বরং অধিকাংশের পক্ষে মানব জাতির যথার্থ কল্যাণের উপলব্ধি না থাকায় এটি তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়। কেননা আল্লাহ্ মহান তাদেরকে ইচ্ছশক্তি দিয়েছেন এবং তাদের কার্যাবলি স্বভাবের তাড়নায় নয়, বরং চিন্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটা কখনও সহায়তা থেকে দূরে সরে যায় এবং তখনই তাকে এ বিষয়ে

www.amarboi.org

উৎসাহিত করতে হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে এমন একজন উৎসাহদাতার অস্তিত্ব প্রয়োজন, যিনি স্বজাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করবেন; যাতে তাদের দায়িত্বের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে পারে। এটাই মহান আল্লাহ্‌র সেই বাণীর অর্থ—'আমরা তাদের অনেককে অন্য অনেকের উপর পর্যায়ক্রমে উন্নীত করেছি; যাতে তারা একে অন্যকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করতে পারে। বস্তুত তোমার প্রতিপালকের দয়া তাদের সঞ্চয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।[১১]

আগে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, পদমর্যাদাই ঐ শক্তি, যা মানুষকে তাদের অধীনস্থ স্বজাতির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা দেয়। তাঁরা অনুমতি ও নিবৃত্তি, ধমকের প্রভাব ও আধিপত্যের ভাব দ্বারা অধীনস্থদেরকে অকল্যাণের প্রতিরোধ এবং কল্যাণের আগ্রহ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলেন। এ ব্যাপারে ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক কল্যাণের সবখানে ন্যায়কে তাঁরা অনুসরণ করে অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধন করে থাকেন। এর প্রথমটির দ্বারা একান্তভাবে ঐশী বিষয়গুলোতে মৌলিক সহায়তার উদ্দেশ্য থাকে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটিরই অন্তর্গত এমন একটি সহায়তার কামনা করা হয়, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সবখানেই অশুভ শক্তির আকারে বিদ্যমান। কেননা অনেক সময় বেশি কল্যাণের জন্য এর উপকরণের মধ্যেই সামান্য অকল্যাণের অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না; বরং তার অন্তর্গত সামান্য অকল্যাণ বহন করেই তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। সৃষ্টির উপর অবিচারের অর্থ সম্ভবত এটাই; ভালো করে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

অতঃপর মানব সভ্যতার নাগরিক অথবা আঞ্চলিক যেকোন পর্যায়ে মানুষের প্রতিটি শ্রেণী তার নিম্নতর শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে নিম্ন শ্রেণীটিও উচ্চ শেণীর পদমর্যাদার সহায়তা গ্রহণ করতে তৎপর হয়। সুতরাং এভাবে প্রতিটি শ্রেণী তার অধীনস্থ জনসমষ্টির কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো দ্বারা উপার্জনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বস্তুত পদমর্যাদার এ ধারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এটি পদমর্যাদার অধিকারীর পর্যায় ও শ্রেণী অনুসারেই ব্যাপক ও সংকীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং পদমর্যাদা যদি ব্যাপক হয়, তা হলে তার উপার্জনের মাত্রাও সে অনুপাতে ব্যাপক এবং যদি সংকীর্ণ ও স্বল্প হয়, তা হলে উপার্জনও সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু পদমর্যাদাহীন ব্যক্তি সম্পদের অধিকারী হলেও তার সচ্ছলতা নিজ শ্রম ও সম্পদের অনুপাতেই দেখা দেয়। সে তার ঐ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য গমনা-গমন করে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা চালায়, সে অনুযায়ী তার প্রাপ্তি। যেমন অধিকাংশ বণিক ও কৃষকের এটাই সাধারণ অবস্থা এবং শিল্পীদের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। কারণ তারা যখন পদমর্যাদাহীন হয়ে শুধুমাত্র তাদের শিল্পকর্মের উপর নির্ভর করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা দারিদ্র্য ও অনাহারের সম্মুখীন হয়। অতি সত্বর সম্পদ লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না; বরং তারা কেবল জীবনকে জীবিত রাখে এবং দারিদ্র্যকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে।

---

১১. জামাতুল, কোরান, ৪৩, ৩২; ৬, ১৬৫; ২৫, ২০।

www.amarboi.org

যখন এ বক্তব্য পরিষ্কার হল যে, পদমর্যাদা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সৌভাগ্য ও কল্যাণ কেবলমাত্র এর অধিকারী হওয়ার দ্বারাই ত্বরান্বিত হয়, তখন পাঠক এ কথাও আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এ পদমর্যাদা বিতরণ একটি অতি বৃহৎ ও মহৎ সৌভাগ্য বিতরণের সমতুল্য। যিনি এটি বিতরণ করেন, তিনি যথার্থই মহান সৌভাগ্য বিতরণকী এবং তিনি তা তাঁর অধীনস্থদের মধ্যেই বিতরণ করে থাকেন। সুতরাং এর বিতরণ একটি ক্ষমতার উৎস থেকে, একটি সম্মানের ভিত্তি হতে নিচে নেমে আসে। এজন্যই এ সৌভাগ্যের প্রত্যাশী-অভিলাষীরা বিনয় ও তোষামোদের প্রয়োজন অনুভব করে থাকে। যেমন তার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজাদের কাছে অনুরূপ চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। কারণ এটি ছাড়া তা লাভ করার অন্য কোন পথ নেই। এ জন্যই আমরা বলেছি যে, বিনয় ও চাটুকারিতার দ্বারাই কেবল সেই পদমর্যাদা লাভ করা যায়, যা সৌভাগ্য ও সম্পদের খনি এবং এ কারণেই অধিকাংশ সচ্ছল ও ধনাঢ্য ব্যক্তি এ অভ্যাসের দাস। সম্ভবত আমরা এ কারণেই এমন অনেক লোককে দেখতে পাই, যারা তাদের অহঙ্কার ও আত্মমর্যাদার দরুন অনুরূপ পদমর্যাদার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে যা পায়, তা দিয়েই কোনো প্রকারে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার মধ্যে জীবনধারণ করছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, এ অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা খুবই নিন্দনীয় চরিত্রগুণ। এটি একমাত্র সেই ব্যক্তির মধ্যেই জন্মাতে পারে, যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে এবং তাঁর ধারণা মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞান ও গুণের সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই ছুটে আসবে। যেমন জ্ঞানের সাগর পণ্ডিত ব্যক্তি, উন্নত রচনাশক্তির অধিকারী লেখক অথবা উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী কবি। তাঁরা সবাই নিজ বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং এ কারণেই মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী এ ধারণা তাদেরকে অহঙ্কারী করে তুলেছে। বংশমর্যাদা ও কৌলিন্যের অধিকারীরাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। কারণ তাদের পিতৃপুরুষের কেউ সম্রাট, বিখ্যাত জ্ঞানী অথবা প্রখ্যাত পুণ্যাত্মা ছিলেন। নগরে তাদের পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখে ও শুনে তারাও ধারণা করে যে, তা তাদেরও প্রাপ্য। কারণ তারা সেই সব গুণি ব্যক্তি আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী। অথচ তাদের মধ্যে উক্ত জ্ঞান-গুণের নিদর্শনমাত্রও নেই। কারণ জ্ঞান-গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না। অনুরূপভাবে কুশলী, দূরদর্শী ও বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনেক সময় নিজেদেরকে মনে মনে পরিপূর্ণতার প্রতিমূর্তি ভেবে মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হওয়ার ধারণা পোষণ করে।

পাঠক, এসব লোকের প্রত্যেককেই আপনি দেখতে পাবেন, তারা উন্নাসিকতায় নিমগ্ন এবং তাঁরা পদমর্যাদার সামনে নতি স্বীকারও করেন না ও তার অধিকারীদের চাটুকারিতায় যোগ দেন না। তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকেই তুচ্ছজ্ঞান করেন; কারণ তাদের ধারণা, তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাদের অনেকেই এমন কি স্বয়ং সম্রাটের সামনেও বিনয় প্রকাশে বিরত থাকেন এবং অনুরূপ কিছু করাকে হেয়তা, অপমান ও নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করেন। তাঁদের প্রতি মানুষ তাঁদের ধারণা অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করবে, এটাই তাঁরা কামনা করেন এবং এক্ষেত্রে কেউ ত্রুটি প্রকাশ করলে হিংসা পোষণ করতে আরম্ভ করেন। অনেক সময় অনুরূপ আচরণের জন্য

www.amarboi.org

তাঁরা নানাবিধ কথাবার্তা ও দুঃখও প্রকাশ করে থাকেন। এভাবে তারা বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা থেকে দূরে সরে থাকেন অথবা মানুষের অস্বীকৃতি থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেন না। এর ফলে মানুষ তাঁদেরকে খুব সুনজরে দেখেন না। কারণ আত্মম্ভরিতা প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিবিশেষ। এ কারণে তাদের কেউ কারও যোগ্যতা ও উন্নাসিকতা মেনে নিতে চান না; যদি না তা ত্রাস, প্রাধান্য ও ব্যাপকতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুত এ সবগুলোই পদমর্যাদার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির যদি পদমর্যাদা না থাকে, তা হলে তার অনস্তিত্বের জন্য সে নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে; পাঠক, যেমন আপনি ইতোমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা মানুষের প্রতি উন্নাসিকতার জন্য তাদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। তাদের সদাচারের কোন ন্যায্য অংশই তারা পায় না। এ কারণেই তাদের মধ্যকার সর্বোচ্চ গুণী ব্যক্তিরাও পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ মানুষ তাদেরকে ভালবাসে না এবং তাঁরাও তাঁদের অভ্যস্ত কর্তব্যগুলো সম্পাদন ত্যাগ করে ঘরেই অবস্থান করতে থাকে। এর ফলে তাদের জীবিকা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং অসচ্ছলতা, দারিদ্র্য অথবা তার চেয়ে কিছুটা উন্নততর অবস্থার অধিকারী হতে পারে মাত্র। কিন্তু কোন প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া কোন কালেই তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ থেকেই সম্ভবত মানুষের মধ্যে এ কথাটি বিখ্যাত হয়ে আছে যে, পূর্ণ জ্ঞানী কখনও পার্থিব সম্বন্ধেও ভাগ পায় না। কখনও এ ধারণার জন্য এভাবে যুক্তি দেয়া হয় যে, যেহেতু তাঁকে জ্ঞানের ভাগ পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে সেজন্য পার্থিব সম্পদের ভাগ সে অনুপাতে কেটে রাখা হয়েছে। এটাই সম্ভবত এ কথার অর্থ যে, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা লাভ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ই সব কিছুর নির্ধারক। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

এরূপ উন্নাসিকতার বহু উদাহরণ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেয়া যায়। সেখানেও তা নানা পর্যায়ে ঘটে থাকে। অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ পদমর্যাদার আসীন হয় এবং উচ্চশ্রেণীর বহুলোক কেবলমাত্র এ কারণে নিম্নে নেমে যায়। এর কারণ এই যে, সাম্রাজ্য যখন এর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তারের সীমায় পৌঁছে, তখন সাম্রাজ্যাধিকারীর গোত্রই রাজশক্তি ও রাজ্যশাসনের একক দায়িত্ব পালন করতে থাকে এবং অন্যরা এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। যদি তাদেরকে গ্রহণও করা হয়, তবু তারা রাজশক্তির অধিকারীদের পদমর্যাদার নিম্নে এবং শাসকের নির্দেশের অধীনে নিয়োজিত থাকে; যেন তারা সম্রাটের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র।

অতঃপর সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়ে এর রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে, তখন সম্রাটের কাছে যারাই তাদের আন্তরিক সেবা ও সদুপদেশ নিয়ে উপস্থিত হয়, তিনি তাদের সবাইকেই সমদৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে সমমর্যাদা দিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদিতে নিয়োগ করেন। এজন্য দেখা যায়, শুধু সম্রাটের স্বগোত্র নয়, বহু সাধারণ লোকও তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার গুণে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং তাদের সেবার দ্বারা তাঁর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে তারা ব্যাপকভাবে সম্রাট, তাঁর সভাসদ ও বংশাবলির বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁদের তোষামোদীর দ্বারা সাহায্য গ্রহণ

www.amarboi.org

করে থাকে। এর ফলে তাঁদের সাথে এসব লোকের সাহচর্য স্থায়ী হয়ে ওঠে এবং সম্রাট তাদেরকে নিজের লোক বলে গণ্য করেন। সুতরাং এ পদমর্যাদার মাধ্যমে তারা প্রচুর সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয় এবং সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য লোকের মধ্যে তারা বিধৃত হয়ে যায়।

অথচ এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের নবীন বংশধরেরা, সাম্রাজ্যের জন্য তাদের পিতৃপুরুষদের কষ্ট স্বীকার ও আন্তরিক অবদানের কথা স্মরণ করে গর্বে স্ফীত হতে থাকে এবং ঐসব কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে তারা গর্বিতভাবে সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। তাদের সব আচরণে ও কথাবার্তায় এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। ফলে সম্রাট তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন এবং তার পরিবর্তে এসব নব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কারণ তাদের প্রাচীন কোন কীর্তি উল্লেখ করার মত কিছু নেই এবং সে জন্য তাদের ইঙ্গিত করা বা অহঙ্কারী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। তাদের একমাত্র চরিত্র হল তাঁর বশ্যতা, চাটুকারিতা এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। সুতরাং তাদের পদমর্যাদা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং তাদের অবস্থা উন্নীত হয়। তাদের প্রতি সবর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সম্রাটের কাছে তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ফলে বিশিষ্টরাও তাদেরকে সমীহ করতে আরম্ভ করেন। আর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের বংশাবলি তাদের সেই উন্নাসিকতা এবং প্রাচীন কীর্তির গর্বে সমাহিত হয়ে থাকে। এ মানসিকতা তাদের জন্য সম্রাটের বিরক্তি উৎপাদন এবং নব-নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য তাঁকে প্ররোচনা দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই বহন করে আনে না। এভাবে সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থা বিরাজ করে। সাম্রাজ্যগুলোতে এ বিষয়টি একান্তই স্বাভাবিক এবং এ থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত ব্যক্তিদের পদমর্যাদার পথ সুগম হয়েছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সব বিষয়ে অবগত। তিনিই একমাত্র সহায়। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনাকারী; যেমন কাজী, মুফতী, মুদর্রিস, ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জেন[১১-ক] এবং অনুরূপ অন্যান্যরা; সাধারণভাবে তাদের অবস্থা কখনও সচ্ছল হয় না]

এর কারণ এই যে, উপার্জন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, শ্রমের মূল্য মাত্র এবং তা চাহিদার অনুপাতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সুতরাং কোন প্রকার শ্রম যদি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে তার মূল্য যেমন বাড়ে, তেমনি তার চাহিদাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব ধর্মীয় শিল্পকর্মের অধিকারীদের শ্রমে সাধারণ মানুষের কোন চাহিদা নেই। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধর্মের অনুরাগী বিশেষ ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে ফতোয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় কাজীর বিচারের প্রয়োজন হলেও এটি সাধারণভাবে অত্যাবশ্যকীয় নয়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কোন চাহিদা নেই বললেও চলে। এসব ধর্মীয় কর্মাদি সম্পর্কে একমাত্র সাম্রাজ্যের অধিপতিরাই চিন্তা করেন এবং তাঁরাই এগুলোর প্রতিষ্ঠা করেন। কেননা তাঁদের উপর ধর্মীয় কল্যাণবিধানের দায়িত্ব বর্তমান। সুতরাং এগুলোর নিয়োগের ও চাহিদার পরিমাণ অনুসারে সম্পদের একটা অংশ সে জন্য ব্যয় করে থাকেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর ফলে এসব ধর্মীয় কর্তব্যে রত ব্যক্তিরা কখনও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ও ব্যাপক প্রয়োজনীয় শিল্পকর্মের শ্রমিকদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারে না। যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে তাঁদের কর্তব্য কর্ম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার অধিকারী, তবু সে জন্য মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে চাহিদার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এজন্য তাঁদের ভাগে অতি অল্পই পড়ে।

তদুপরি তাঁদের কর্তব্যকর্মের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁরা সব শ্রেণীর মানুষ চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী এবং তাঁরা নিজেরাও নিজেদেরকে এরূপ ভেবে থাকেন। সুতরাং তাঁরা পদমর্যাদার অধিকারীদের বশ্যতা স্বীকার করে বেশি সম্পদ লাভের পথে আগান না। বরং বলা যায়, অনুরূপ কিছু করার তাদের অবসরই নেই। কারণ তাঁরা যে মহান কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন, সেজন্য চিন্তা ও সাধনাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। বরং এভাবেও বলা যায় যে, তাঁরা যে মহান কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন, এর মর্যাদাই তাঁদেরকেই পার্থিব ক্ষমতার অধিকারীদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখে।

১১-ক কাজী = বিচারক; মুফতি = ধর্মীয় বিধান দানকারী; মুদরিস = শিক্ষক; ইমাম = নামাজ পরিচালনাকারী এবং মুয়াজ্জেম = নামাজের আহ্বানকারী।

www.amarboi.org

কারণ তাঁদের পক্ষে এরূপ কাজ করা শোভা পায় না। এজন্যই সাধারণভাবে তাঁরা সম্পদের অধিকারী হতে পারেন না।

এ ব্যাপারে আমি অনেক গুণী ব্যক্তির সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছি; তারা এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। আমার হাতে সম্রাট আল-মামুনের প্রাসাদের হিসাব দপ্তরের কিছু ছিন্নপত্র বিদ্যমান, যাতে নানা বিষয়ে তৎকালীন আয়-ব্যয়ের বহু হিসাব রয়েছে। সেখানে কাজী, ইমাম, মুয়াজ্জেন প্রমুখ বৃত্তিধারীদের বেতনের যে হিসাব পাচ্ছি, তা আমার বক্তব্যের অনুকূলেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি পূর্বোক্ত সেই তার্কিক গুণীদেরকে তা দেখিয়েছি এবং পরিশেষে তাঁরাও স্বীকার করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টি জগতের রহস্যলীলা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিচক্ষণতার অপার মহিমা দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং নিবারণ করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

www.amarboi.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[কৃষিকাজ.দুর্বল শ্রেণী ও সরলপ্রাণ বেদুইনদের জীবিকা]

কেননা তা জীবিকার দিক থেকে স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রক্রিয়ার দিক থেকে অবিমিশ্র। এ কারণে, পাঠক, সাধারণত নগরবাসী কাউকেও এ বৃত্তি গ্রহণ করতে দেখবেন না। এবং সেখানকার ধনাঢ্য বিলাসীদের সম্পর্কে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এ জীবিকার অধিকারীরা হীনতার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আনসারদের ঘরের দ্বারে লাঙ্গলের ফলা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'যাদের ঘরের দ্বারে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানে হীনতাও এর সঙ্গে এসেছে।' বোখারি এই উক্তিকে অনুরূপ বিষয়ের আধিক্যের প্রতি আরোপ করেছেন এবং তিনি এরই ব্যাখ্যা করে তাঁর সংকলনে অধ্যায় যোজনা করেছেন,—'কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে পরিণাম অথবা নির্দেশিত সীমা অতিক্রম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।' এর কারণ সম্ভবত আল্লাহ্ ভাল জানেন, এই যে, এই জীবিকার জন্য কৃষকদেরকে যে কর দিতে হয়, তা দিয়ে তারা কোন না কোন ক্ষমতার বশীভূত হয়ে পড়ে। কেননা কর আদায়কারীমাত্রই হীনতা ও অক্ষমতার অধিকারী এবং এর দ্বারা তাকে কারও শাসন ও আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জাকাত আরোপিত কর-এ পরিণত হবে। এ দ্বারা তিনি অবিচারী রাজশক্তি, মানুষের জন্য কঠোরতা, আধিপত্য ও উৎপীড়ন এবং পুঁজি সংগ্রহে মহান আল্লাহ্‌র প্রাপ্যাদি ভুলে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য যে এ সব অধিকারকে আরোপিত করের ন্যায় মনে করবে, তার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত আল্লহ্ যা ইচ্ছা করতে পারেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সব কিছু অবগত এবং তিনিই একমাত্র শক্তিদাতা।

www.amarboi.org

নবম পরিচ্ছেদ

[বাণিজ্যের অর্থ, তার প্রক্রিয়া ও প্রকার]

পাঠক, জেনে রাখুন, বাণিজ্য হল স্বল্পমূল্যে সামগ্রী ক্রয় করে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করে উপার্জনের ব্যবস্থা করা। বিক্রেয় পণ্য যাই হোক না কেন; আটা, শস্য, পশু অথবা পরিধেয়, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজির এ বৃদ্ধিকে বলা হয় 'লাভ'। এ লাভ করার প্রক্রিয়া, হয় পণ্য মজুদ করে বাজার দরের সুলভ থেকে মহার্ঘ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যাতে বেশি লাভ হয় অথবা পণ্য ক্রয়ের স্থান থেকে এমন এক স্থানে চালান করা যেখানে বাজার তেজী; ফলে লাভও বেশি। এজন্যই অনেক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বাণিজ্যের অর্থজিজ্ঞাসুদেরকে বলেছেন, আমি তোমাকে এটি দুটি কথার দ্বারা শিখিয়ে দিচ্ছি—'সুলভ মূল্যে ক্রয় ও বেশি মূল্যে বিক্রয়।' এ উক্তি থেকেও ঐ কথাই প্রকাশ পাচ্ছে, বাণিজ্য অর্থে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই বেশি জ্ঞানী; তিনিই একমাত্র ভরসা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

www.amarboi.org

দশম পরিচ্ছেদ

[কোন শ্রেণীর লোক বণিজ্যের দ্বারা উপকৃত হয় এবং কাদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।[১২]]

ইতিপূর্বে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বাণিজ্য হল পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে তার চেয়ে বেশি মূলে বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করা। এটি করতে গিয়ে বাজার দরের ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা; অন্যত্র চালান দেয়া, যেখানে উক্ত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য অত্যধিক অথবা নির্ধারিত সময়ের পরে পরিশোধযোগ্য বেশি মূল্যে বিক্রয় করা। কিন্তু শেষোক্ত এ প্রক্রিয়ায় মূল পুঁজির তুলনায় লাভের পরিমাণ খুবই অল্প। অবশ্য পুঁজির পরিমাণ বেশি হলে এ অল্পও বেশি বলে মনে হবে। কেননা অধিকের অল্পও বেশি।

অতঃপর পুঁজি বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়ায় পণ্য সামগ্রী বিক্রেতাদের কবলে যায় এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য প্রদানের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা লাভের বিষয়টি অনিশ্চিত করে তোলে। কারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণের সংখ্যা খুব কম। এর ফলে ভেজাল, ওজনহ্রাস, পণ্যবিকৃতি ও মূল্য প্রদানে গড়িমসি দেখা দেয় এবং লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কেননা এ সময়ে পুঁজি আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এর বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় ক্রেতারা অস্বীকৃতি ও প্রতারণার মাধ্যমে মূল পুঁজিকেই নষ্ট করে দিতে চায়; যদি না এর জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা থাকে। দেশের শাসনব্যবস্থা এ ব্যাপারে খুব কমই সাহায্য করতে পারে। কারণ এর নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ্য বিষয়গুলোর উপরই বর্তায় মাত্র। এভাবে ব্যবসায়ী বেশ অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়।

এসব অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে তাকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এর ফলে কখনও কিছু লাভ দেখা দেয়, কখনও-বা কিছুই পায় না; আবার কখনও আসল পুঁজিই নষ্ট হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী যদি ঝগড়া করতে প্রস্তুত, হিসাব-নিকাশে দক্ষ, তাগাদা-তদবিরে কঠোর এবং শাসকের দ্বারস্থ হতে উদ্যোগী হয় তা হলে তার এই সাহস ও তদবিরের গুণে ক্রেতারা অনেকাংশে ন্যায্য আচরণ করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় ব্যবসায়ীকে কোন পদমর্যাদার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, যাতে ক্রেতারা তাকে সমীহ করে এবং শাসন কর্তৃপক্ষও তার খাতক ক্রেতাদের কাছে থেকে মূল্য আদায় করে দিতে তৎপর হয়। এর ফলে সে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছুটা ন্যায্য আচরণ

১২. এ পরিচ্ছেদে রোজেনথাল দ্বাদশ, ত্রয়োদশে দশম এবং একাদশে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

এবং ক্রেতাদের কাছে থেকে পুঁজি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। প্রথমটিতে তারা স্বেচ্ছায় এবং দ্বিতীয়টিতে তারা বাধ্যতামূলকভাবে এগিয়ে আসে।

কিন্তু কোন ব্যবসায়ী যদি স্বয়ং অনুরূপ সাহস ও তৎপরতা দেখাতে না পারে এবং তার কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদার সহায়তা না জোটে, তা হলে তার পক্ষে বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণ না করা উচিত। কারণ এ অবস্থায় ব্যবসায়ে নামার অর্থ তার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হওয়ার পথ করে দেয়া। ক্রেতারা তার পুঁজি খেয়ে ফেলবে এবং সে নিজে তাদের কাছে থেকে, বলতে গেলে, কোনো ন্যায্য আচরণই পাবে না। কারণ মানুষের অধিকাংশই, বিশেষ করে প্রজা ও ক্রেতাসাধারণ অন্যের অধীনস্থ সম্পদ কুক্ষিগত করে নিতে সর্বদা লালায়িত ও উদগ্রীব। যদি না শাসনতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির সংযম থাকত, তা হলে মানুষের সম্পদ লুটের মাল হয়ে দাঁড়াত। আল্লাহ্ যদি না মানুষের একাংশ দিয়ে অপরাংশকে প্রতিরোধ করতেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ নিখিল বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহশীল।[১৩]

১৩. কোরান।

www.amarboi.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের চরিত্র রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তদের চরিত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে।[১৪]]

কেননা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অধিকাংশ সময় ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত থাকে এবং সেজন্য তাদেরকে আবশ্যকীয়ভাবে চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এভাবে ক্রমশ ত্রুটির অধীন হলে তা তার চরিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকেই সে চতুর হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে সম্ভ্রমবোধের অভাব ঘটে, যা দ্বারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গ ভূষিত হয়ে থাকেন। তারপর যদি এ চাতুর্যের অনুসরণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ঝগড়া, ভেজাল, প্রতারণা এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্য গ্রহণ ও প্রদানে মিথ্যা শপথ ইত্যাদির ন্যায় নীচ প্রবৃত্তির দ্বারস্থ হয়, তা হলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণেই তাদের চরিত্র অসৎ হয়ে উঠবে। পাঠক, এজন্যই দেখতে পাবেন যে, রাজশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা এমন চরিত্র সৃষ্টির আশঙ্কাতেই এই জীবিকা গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকেন। অবশ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি বিদ্যমান, যারা তাদের সৎবৃত্তি ও সম্ভ্রান্ত যোগ্যতার দরুন এসব দোষ থেকে বেঁচে থাকতে সমর্থ হন; যদিও বাস্তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন[১৫] এবং তিনিই সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জনতার প্রতিপালক।

---

১৪. এ পরিচ্ছেদটি রোজেনথাল পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর পূর্ববর্তী সংস্করণ বলে মনে করেন এবং এর সাথে পাদটীকায় বর্ণনা করেছেন।

১৫. কোরান, ২, ১৪২।

www.amarboi.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রী চালান দেয়া]

ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী তার সেই পণ্যকে চালান দিয়ে থাকেন রাজা, প্রজা, ধনী ও দরিদ্রের কাছে যার ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। কেননা এ প্রক্রিয়াতেই তাঁর পণ্য বেশি কেটে থাকে। কিন্তু তা না করে তিনি যদি শুধু কিছু সংখ্যক লোকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন, তাহলে এটার বিক্রয়ের সম্ভাবনা একান্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা ঐ কিছু সংখ্যক ক্রেতা এ ব্যাপারে উদাসীন হলে এবং কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে তার বাজার মন্দা হয়ে দাঁড়ায় ও লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

অনুরূপভাবে চাহিদা অনুসারে পণ্য চালান দিতে গিয়ে তাকে সর্বদা মধ্যমমানের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। কেননা বেশি মূল্যের সামগ্রী একমাত্র ধনাঢ্য ও সম্রাটের সভাসদদের পক্ষেই ক্রয় করা সম্ভব এবং স্বভাবতই তাদের সংখ্যা কম। বস্তুত মানুষ সর্বদা মধ্যমমানের পণ্যকেই আদর্শ ক্রয়দ্রব্য বলে মনে করে। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীকে অবশ্যই তৎপর হতে হবে। কারণ এ বিবেচনার উপরই তার পণ্যের বাজারের তেজী ও মন্দা ভাব নির্ভর করছে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী যদি বহু দূরদর্শী অথবা বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে তার পণ্যকে অন্যত্র পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তা হলে এর দ্বারা ব্যবসায়ী বেশি উপকার, প্রচুর লাভ এবং বাজার মূল্যের ব্যাপক সুযোগ পেতে পারে। কেননা উক্ত অঞ্চলের অবস্থান বহু দূরে অথবা বিপদসঙ্কুল পথের পরপারে হওয়ায় সেখানে চাহিদা অনুসারে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ অল্প হবে। কারণ এমন অসুবিধার জন্যই এর সরবরাহকারীর সংখ্যা কম এবং এর অস্তিত্ব মূল্যবান। সুতরাং যে পণ্যের চাহিদা আছে অথচ এর পরিমাণ কম, এর মূল্য অবশ্যই বেড়ে যাবে। কিন্তু এর বিপরীতভাবে যদি স্থানটি নিকটবর্তী ও রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়, তা হলে সেখানে পণ্য সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে এর মূল্য সুলভ হয়ে উঠবে।

পাঠক, এ কারণেই আপনি দেখতে পান যে, যে-সব ব্যবসায়ী সুদান অঞ্চলে যেতে আগ্রহী, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সচ্ছল এবং প্রচুরতর ঐশ্বর্যের অধিকারী। কেননা সুদানের পথ অতিশয় দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। তৃষ্ণা ও ভীতির আশঙ্কায় পরিপূর্ণ কঠিন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সেখানে যেতে হয়। এ পথে নির্দিষ্ট পরিচিত কিছু সংখ্যক স্থান ছাড়া অন্যত্র পানীয় জল পাওয়া যায় না এবং এর সন্ধানও পথ-প্রদর্শক ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে এ পথের দূরত্ব ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে খুব অল্প লোকই সাহস

www.amarboi.org

করে থাকে। এর ফলেই সুদানের পণ্য আমাদের বাজারে খুব কম পাওয়া যায় এবং তার মূল্য বেশি। অনুরূপভাবে আমাদের এলাকার পণ্যও সেখানে বিরল। এ কারণে এসব অঞ্চলে পণ্য সরবরাহকারীরা সহজে তাদের পুঁজি বাড়িয়ে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে আমাদের এলাকা থেকে পণ্য নিয়ে যারা পূর্বাঞ্চলে যায়, তাদেরকেও কষ্টসাধ্য দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু যারা একই পরিমণ্ডলে ঘোরাফিরা করে এক শহর থেকে অন্য শহরে পণ্য চালান দেয়, তাদের খুব বেশি একটা উপকার হয় না। কারণ বেশি সরবরাহকারী, অতিরিক্ত পণ্য থাকার ফলে তাদের লাভের পরিমাণ খুব নগণ্য। আল্লাহ্, তিনিই তো সম্পদদাতা; প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।[১৬]

---

১৬. কোরান, ৫১, ৫৬।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[মজুদদারী]

নগরীর দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এটি সুপরিচিত যে, দুর্মূল্যের জন্য শস্যাদি মজুদ করে রাখা অশুভ কাজ। কারণ তার দ্বারা লব্ধ উপকার পরিণামে ক্ষতি ও সর্বনাশ ডেকে আনে। এর কারণ সম্ভবত, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এই যে, মানুষ স্বভাবতই খাদ্যের মুখাপেক্ষী এবং এ উদ্দেশ্যে তারা যে পরিমাণ অর্থেরই প্রয়োজন হোক না কেন, ব্যয় করতে বাধ্য। অথচ এ বাধ্য-বাধকতার জন্য তাদের অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের এ ক্ষোভ, যারা মানুষকে অনর্থক বেশি দিতে বাধ্য করে, তাদের অশুভ পরিণাম ডেকে আনতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সম্ভবত একেই ধর্মপ্রবর্তক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার স্বভাব হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে যদিও বিষয়টি অনর্থক নয়, তবু তার জন্য অন্তর বিক্ষুব্ধ হয় এবং মানুষ যেভাবে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ ছাড়াই অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হয়, তাতে ব্যাপারটিকে জবরদস্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের প্রতি মানুষ অনুরূপ মুখাপেক্ষী নয়। তা তার প্রবৃত্তির বিচিত্র চাহিদা পূরণ করতেই ক্রয় করে থাকে এবং এর জন্য তারা লোভের বশে ইচ্ছা করেই অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং তাদের অনুরূপ অর্থব্যয়ে অন্তরে কোন ক্ষোভ থাকে না। এ কারণেই যারা মজুদদারীর দ্বারা পরিচিত হয়ে ওঠে, মানুষের আন্তরিক ক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কারণ তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে এবং সেজন্য তাদের লাভ দূষিত হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

এ বক্তব্যের সাথে মিলে, এমন একটি রসাত্মক কাহিনী আমি মাগরিবের কোন এক জ্ঞানবৃদ্ধের মুখ থেকে শুনেছিলাম। আমাদের উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ্ আবেলি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি সুলতান আবু সায়িদের সময় ফেজনগরীর কাজী ধর্মশাস্ত্রবিদ আবুল হাসান মলিলীর কাছে একবার উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে তার বেতনের জন্য সঞ্চিত পণ্যের উপর ধার্যকৃত যে-কোন একটি খাতের কর গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। উস্তাদ আবেলি বলেন, উক্ত কাজী এটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, মদের উপর ধার্যকৃত কর। এটি শুনে উপস্থিত তাঁর সঙ্গীরা সবাই হেসে উঠলেন এবং বিস্মিত হলেন। পরে তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যেহেতু সঞ্চিত পণ্যদ্রব্যের উপর ধার্যকৃত সব করই নিষিদ্ধতার

www.amarboi.org

দিক থেকে সমতুল্য, কাজেই আমি তার মধ্য থেকে এমন একটি গ্রহণ করলাম, যা প্রদান করতে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় না। ভাবাবেগে আনন্দিত মূর্ছিত হওয়ার জন্যই মানুষ মদ ক্রয় করতে তাদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে। সুতরাং এর জন্য তাদের কোন প্রকার আক্ষেপ থাকে না এবং অন্তরের মধ্যে কোন বিক্ষোভও বহন করে না।

যথার্থই এ এক অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ অন্তরের গোপন বাসনাও জানেন।

www.amarboi.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[পণ্যের সুলভ মূল্য ব্যবসায়ীদেরকে মন্দা বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করে]

এটা এই যে, উপার্জন ও জীবিকানির্বাহ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, শিল্পকর্ম অথবা বাণিজ্যের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। বাণিজ্য বলতে সামগ্রী ক্রয় করে মজুদ করা এবং বাজার দরের উঠানামা লক্ষ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করা বোঝায়, এর ফলে উদ্বৃত্তকে বলা হয় লাভ এবং এর মাধ্যমেই অনুরূপ বৃত্তিধারীদের জন্য সর্বদা উপার্জন ও জীবিকা সংগ্রহ হয়ে থাকে। সুতরাং পণ্যসামগ্রী, তথা খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ অথবা যা দিয়ে পুঁজি সংগৃহীত হয়, সেগুলোর মূল্য সুলভ হয়ে উঠলে ব্যবসায়ী বাজারদরের উঠা-নামার সুযোগ পায় না এবং এ অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে থাকলে তার লাভ তথা পুঁজি বৃদ্ধির সমস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার মন্দা থাকার ফলে ব্যবসায়ীর শুধু কষ্টই সার হয়। সুতরাং সে এ ব্যাপারে যে কোন প্রকার চেষ্টা থেকে বিরত হয় এবং তার পুঁজি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

পাঠক, এক্ষেত্রে প্রথমে শস্যের কথাই বিবেচনা করুন। এর মূল্য স্থায়ীভাবে সুলভ হয়ে উঠলে, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বৃত্তিধারী অবস্থা কী নিদারুণভাবেই না বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে অতি নগণ্য লাভ কিংবা তার অস্তিত্বহীনতা শস্য উৎপাদনকারী চাষী থেকে আরম্ভ করে সব পর্যায়ের লোকের মধ্যেই নিরুৎসাহ ছড়িয়ে দেয়। কারণ তারা এতে তাদের পুঁজি বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখে না এবং যে সামান্য লাভ হয় তাতে খরচ না পুষিয়ে মূলধনের উপর চাপ পড়ে। এভাবে তারা ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে শস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা, যেমন—পেষণকারী, রুটি প্রস্তুতকারী তথা তার উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে খাদ্যরূপে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যারা এর সাথে যুক্ত আছে, তাদের সবার অবস্থাই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অনুরূপভাবে সৈন্যদলও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শাসক তাদের বেতন উৎপাদিত শস্যের দ্বারা পরিশোধ করে থাকেন। এর ফলে তাদের জন্য নির্ধারিত করের পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং তাদের পক্ষে সৈনিক বৃত্তি রক্ষা করে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; অথচ এ উদ্দেশ্যেই তারা শাসকের কাছ থেকে শস্য ও করের ভাগ লাভ করত। কিন্তু বেতনের দুরবস্থা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে ফেলে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে যখন মধু ও চিনির মূল্য স্থায়ীভাবে সুলভ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে ন্যূনতা দেখা দেয় এবং বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরা এগুলোর ব্যবহার ত্যগ করে। অনুরূপভাবে যাবতীয় পরিচ্ছেদের মূল্যের সুলভতা দুরবস্থার সৃষ্টি করে।

বস্তুত অতিরিক্ত সুলভ মূল্য যেমন বৃত্তিজীবীদের জীবননির্বাহে বাধার সৃষ্টি করে, তেমনি কোন বিশেষ পণ্যের অতিরিক্ত দুর্মূল্যও একই প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। অবশ্য অনেক সময় এ শেষোক্ত কারণটি অতিরিক্ত মূল্যের দ্বারা পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বটে; কিন্তু তেমন সুযোগ খুবই কম দেখা যায়। সাধারণভাবে মধ্যম মূল্যমান ও বাজারদরের সত্বর ওঠা-নামাই জীবন ও জীবিকার জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকে। এ সম্পর্কে মানবসভ্যতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলো থেকেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

যে খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীর প্রতি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সব মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অত্যধিক, কেবল সেগুলোতে সুলভ মূল্য প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। কেননা সমাজে এসব দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং এতে তাদের ব্যাপক সুবিধা হয়। বস্তুত এ ক্ষেত্রে ব্যবসার পণ্য অপেক্ষা এগুলোকে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই সম্পদদাতা, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং বিরাট সিংহাসনের একমাত্র প্রভু।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের চরিত্র নেতৃস্থানীয়দের চরিত্র অপেক্ষা হীন এবং সম্ভ্রমের অতীত]

ইতিপূর্বে আমরা অন্য একটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি যে, ব্যবসায়ীরা পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং তার মাধ্যমে লাভ ও উপকার প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদেরকে চাতুর্য, বিবাদ, বুদ্ধিমত্তা, মামলাবাজী ও প্রচুর নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এগুলো এ জীবিকার আনুষঙ্গিক ফলশ্রুতি। বস্তুত এ সব গুণ পবিত্রতা ও ভদ্রতার বিরোধী এবং এর ক্ষতিকারক। কেননা প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই মানুষের প্রবৃত্তিতে এর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং সৎকাজ সৎ-প্রভাব ও পবিত্রতা বহন করে এবং অসৎ কাজ ও শৈথিল্য এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। কাজেই এদের বারংবার ও পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ এদেরকে স্থায়ী ও দৃঢ় করে তোলে এবং অসৎ কার্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সচ্চরিত্রের বিনাশ ঘটাতে আরম্ভ করে। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ ফলশ্রুতি এটাই।

এ প্রভাব ব্যবসায়ীদের শ্রেণী ও পর্যায় অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যারা নিম্ন পর্যায়ের, যারা বিক্রেতাদের দুষ্কৃতি তথা ভেজাল, প্রতারণা, জোচ্চুরি এবং পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে মান ও মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা শপথের ন্যায় দুষ্কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাদের মধ্যে এসব দুশ্চরিত্রের অবস্থা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। তারা শৈথিল্যের মধ্যে জড়িত হয়ে সম্পূর্ণভাবে সম্ভ্রমবোধ ও এর সংরক্ষণ থেকে দূরে সরে যায়। যাহোক, যে-কোন অবস্থাতেই তাদের সম্ভ্রমবোধের মধ্যে চাতুর্য ও কলহের প্রবৃত্তি অনিবার্যভাবে প্রবেশ করে ক্রমশ এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়। তাদের মধ্যে অন্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা, যাদের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিচ্ছেদে বলেছি যে, তারা পদমর্যাদার দ্বারা একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যাতে তাদেরকে উপরোক্ত দুষ্কর্মাদির দ্বারস্থ হতে না হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থার সাফল্য খুবই নগণ্য ও বিরল হতে পারে যে, তাদের কাছে হঠাৎ কোন অভিনব উপায়ে অথবা নিজ বংশাবলির কারও কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হল, যা দিয়ে তারা সাম্রাজ্যাধিপতিদের নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে এবং এটা তাদের সমসাময়িক অন্য সবার মধ্যে তাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ফলে তারা উপরোক্ত দুষ্কর্মাদির সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিনিধি ও চাকর-গোমস্তাদের উপর নির্ভর করতে পারছে। শাসকরাও তাদের সাহচর্য ও উপঢৌকনাদির জন্য তাদের

www.amarboi.org

অধিকার রক্ষায় সুবিচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সুতরাং এসব বিষয় মিলেমিশে তাদেরকে সে সব অনিবার্য দুষ্কর্ম থেকে দূরে রেখেছে, যার কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে তাদের সম্ভ্রমবোধ কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য তবুও যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রতি সম্মতি অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন এবং এদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। তবে এরূপ সংস্পর্শের পরিধি সংকীর্ণ এবং এর প্রভাবও সেই অনুপাতে দুর্নিরীক্ষ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।[১৭]

১৭. কোরান, ৩৭, ৯৬।

www.amarboi.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকর্মের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন]

জেনে রাখুন, শিল্প এমন একটি অভ্যাস, যা গড়ে তুলতে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন। শ্রমের দিক থেকে এটা দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য। বস্তুত যা দৈহিক শ্রমের দ্বারা অনুভবযোগ্য তা সাহচর্যের দ্বারা অনুসৃত হলে বেশি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। কেননা দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে সাহচর্যই বেশি উপকারী। ফলত শিল্প একটি অভ্যাস, যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বারংবার অনুশীলনের দ্বারা স্থায়ী হয় এবং তার বাস্তবরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ অনুকরণ মূলের অনুপাতেই সমৃদ্ধ হয়। চোখে দেখা সবসময় শ্রুতি ও জ্ঞানের চেয়ে বেশি পূর্ণতা ও ব্যাপকতার অধিকারী। সুতরাং এর দ্বারা যে অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা শ্রুতির দ্বারা লব্ধ অভ্যাস অপেক্ষা পূর্ণতর ও স্থিরতর হয়ে থাকে। শিক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারেই শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে।

অতঃপর শিল্পকর্মের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিমিশ্র এবং কিছু সংখ্যক মিশ্র শিল্প বিদ্যমান। অবিমিশ্র শিল্পকর্ম মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বিশিষ্ট এবং মিশ্রগুলো সাধারণভাবে পরিপূর্ণতা বিধায়ক প্রয়োজনের সৃষ্টি। এর মধ্যে অবিমিশ্র শিল্পকর্মই এর অবিমিশ্রতার বৈশিষ্ট্যের জন্য সর্বপ্রথমে শিক্ষণীয়। কেননা এটা মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বিশিষ্ট হওয়ায় তার অনুসৃতির ধারা ব্যাপক। সম্ভবত এ কারণেই এটা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, তেমনি এর শিক্ষাও কতকাংশে অসম্পূর্ণ। কেননা মননশক্তি সর্বদাই তার বিভিন্ন প্রকার ও মিশ্ররূপকে সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ করতে তৎপর থাকে। আবার এ প্রকাশও অল্প অল্প আবিষ্কারের দ্বারা পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে এবং এভাবেই শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এর প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। এটা যুগ পরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে দেখা দেয়। কারণ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন কখনই হঠাৎ করে হয় না, বিশেষভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে। সুতরাং এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। পাঠক, এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন, ক্ষুদ্র শহরগুলোর শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ এবং সেখানে অবিমিশ্র শিল্পেরই প্রাধান্য। এর পর যখন তার নাগরিকত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিলাস-ব্যসনের অমোঘ আকর্ষণ শিল্পকর্মের প্রসারে সাহায্য করে, তখন শিল্প তার সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে রূপায়িত হতে থাকে।

শিল্পকে অন্যদিক থেকেও ভাগ করা যায়; তার মধ্যে কতকগুলো জীবিকানির্বাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে এটা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত কিংবা তার বাইরেও হতে

www.amarboi.org

পারে। অন্য কতকগুলো মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য মননশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পচর্চা ও শাসনব্যবস্থা। প্রথমটির উদাহরণ বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, লৌহশিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্ম। দ্বিতীয়টির উদাহরণ পুস্তক শিল্প অর্থাৎ অনুলিপি ও বাঁধাই দ্বারা পুস্তক প্রস্তুত করা, সঙ্গীত শিল্প, কবিত্ব, শিক্ষাদান এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পজ্ঞান। তৃতীয়টির উদাহরণ মৌলিক বৃত্তি এবং অন্যান্য শিল্পকৌশল।[১৮] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

১৮. এ অনুচ্ছেদটি রোজেনথালে নেই।

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক সভ্যতার পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্যের দ্বারাই কেবল শিল্পকলার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে]

এর কারণ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং নগর সংস্কৃতি বিকশিত না হয়, ততক্ষণ তাদের সব চিন্তা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত থাকে। তারা গম ও অন্যান্য শস্যাদি থেকে খাদ্য সংগ্রহে তৎপর হয়। তারপর যখন নগর সংস্কৃতি বিকশিত হয়, শ্রমের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং উৎপাদন মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন এ অতিরিক্ত উদ্বৃত্তকে জীবনের পূর্ণতা বিধানের প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়।

অতঃপর এ শিল্পকলা ও নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, এটা মানুষের সেই মননশক্তির ফসল, যা দ্বারা সে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে। অথচ খাদ্য গ্রহণের দিক থেকে সে সব প্রাণীর সাথে ক্ষুণ্নিবৃত্তির ক্ষেত্রে এক। এজন্যই তার এ পাশবিক চাহিদা পূরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা থেকে অগ্রবর্তী। কেননা মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার পর এদের সৃষ্টি। সুতরাং মৌলিক প্রয়োজনের নগরজীবনের ব্যাপকতা অনুসারেই তার কারুকার্য সম্পাদনের জন্য শিল্পকলার বিকাশ ঘটে এবং বিলাস-ব্যসন ও সচ্ছলতার দাবি অনুপাতেই তাতে নতুনত্বের চাহিদা দেখা দেয়। এ কারণেই প্রান্তরীয় জীবন অথবা ক্ষুদ্র নগরী অবিমিশ্র শিল্প ছাড়া অন্যগুলোর চাহিদা উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। বিশেষভাবে সে শিল্পই বিকশিত করে, যা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত, যেমন সূত্রধর, কর্মকার, দরজী, জোলা ও চর্মকারের কাজ। এগুলো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে—অনুশীলিত হলেও তাতে কোন প্রকার পরিপূর্ণতা ও নতুনত্ব দেখা যায় না। বরং সে পর্যায়েই থাকে, যা দ্বারা মৌলিক প্রয়োজন মেটে। কেননা এদের সবগুলোই সেখানে অন্য উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মাত্র; নিজেরা উদ্দেশ্য নয়।

যখন নগরজীবনে জোয়ার দেখা দেয় এবং পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভাবগুলোর চাহিদা জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন শিল্পকলা তার সামগ্রিক কারুকার্যসহ বিকশিত হতে থাকে। শিল্পকলা তার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে তা সহ আরও বহু শিল্পের জন্ম সম্ভব করে তোলে। বিলাস-ব্যসনের অভ্যাস ও তার আনুষঙ্গিক অবস্থাই চর্মকার, চর্মরঞ্জক, স্বর্ণকার ও অন্যান্য শিল্পকর্মীর আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু নগরজীবনের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে এতে পরিপূর্ণতার চাহিদা আরও ব্যাপক হয়ে দাঁড়ালে, এসব শিল্পও আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছে কারুকার্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। নগরে বহু লোক তখন এসব শিল্পকর্মকে

www.amarboi.org

তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ নগরের বিলাসী জীবনের চাহিদা অনুসারে এসব শিল্পে নিয়োজিত শ্রমের মূল্য বহুগুণে বেড়ে যায়। সে বিলাসের চাহিদা অনুসারেই তৈলকার, তাম্রকার, স্নানাগার-সহচর, পাচক, পিষ্ঠক প্রস্তুতকারক, হালুইকর, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক ও বিভিন্ন উপলক্ষে ঢোলবাদকের অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে পুস্তক-শিল্পী, যারা পুস্তকের অনুলিপি, বাঁধাই ও সংশোধনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। এ শিল্পটি নগরজীবনের মনন কার্যাদির ন্যায় বিষয়ের মধ্যে বিলাসী আত্মনিয়োগের পরিচয় বহন করে।

নগরজীবনের সংস্কৃতি চেতনার পরিধি সীমা অতিক্রম করলে শিল্পকর্মও সীমা ছাড়িয়ে যায়। যেমন, আমরা মিশরবাসীদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বোবা প্রাণী ও পোষ্য গাধাকে পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলে এবং তারা এমন সব অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখায়, যাতে মনে হয়, যেন এদের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা এদেরকে 'হুদীর তালে তালে নাচতে এবং শূন্যে প্রসারিত দড়ির পর দিয়ে হেঁটে যেতে শিখায়। এছাড়া ভারী পশু ও পাথর উত্তোলনের প্রক্রিয়া এবং আরও এমন অনেক শিল্পকলা মিশরবাসীরা জানে, যা আমাদের এ মাগরিবে দেখা যায় না। কারণ মাগরিবের সভ্যতা মিশর ও কায়রোর সভ্যতার সীমায় পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ এদের সভ্যতাকে মুসলমানদের দ্বারা চিরঞ্জীব করে রাখুন। আল্লাহ্ মহা বিচক্ষণ ও জ্ঞানময়।[১৯]

১৯. কোরান, ২, ৩২।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[নগর জীবনে শিল্পকলার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র নাগরিকতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলেই সম্ভব]

এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এটা এই যে, সর্বপ্রকার শিল্পকলাই মানব সমাজের অভ্যাস ও অনুশীলনের ফসল। অভ্যাসাদি দীর্ঘকালব্যাপী বারংবার অনুশীলনের ফলেই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এর বিশেষ স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পুরুষানুক্রমে অবর্তিত হতে থাকে। সুতরাং এর বিশেষ রূপ একবার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে পড়লে এর উচ্ছেদ দুঃসাধ্য হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, যেসব নগরী এক সময়ে ব্যাপক নগর সংস্কৃতির অধিকারী ছিল; পরবর্তীকালে এদের জনসমুদ্রে ভাঁটা পড়ে অবস্থা হ্রাস পেলেও সেখানে এসব শিল্পকলার এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান, যা অন্যত্র নবীন জনবহুল নগরগুলোতে নেই; যদিও এসব নগরী পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে। এটা অন্য কিছু নয়; বরং ঐসব প্রাচীন নগরীতে শিল্পকলা সুদীর্ঘকালব্যাপী বিচিত্র অবস্থা ও পর্যায়ক্রমিক অনুশীলনের মাধ্যমে এমন একটি স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পরবর্তীকালে অন্যদের উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানকালে আমরা আন্দালুসে অনুরূপ অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। সেখানে শিল্পকলার সমস্ত রীতিই প্রচলিত এবং নাগরিক অভ্যাসাদির জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয়, সেসব অবস্থাই সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন—স্থাপত্য, রন্ধন শিল্প, বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, প্রাসাদের শয্যাবিলাস, সুপরিকল্পিত ও সুন্দর গৃহ নির্মাণ খনিজ পদার্থ ও মৃত্তিকার বাসন তৈরি, অন্যান্য তৈজসপত্র প্রস্তুত, ভোজসভা ও বাসরসজ্জার ব্যবস্থা এবং বিলাস-ব্যসন ও এর অভ্যাসাদির উপযোগী অন্যান্য শিল্পকর্ম। পাঠক, আপনি আন্দালুসবাসীদেরকে এসব বিষয়ে তৎপর ও অভিজ্ঞ দেখতে পাবেন। আরও দেখবেন, এসব শিল্পকর্মই তাদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তারা এর এমন একটি পরিপূর্ণ অংশের অধিকারী, যা দ্বারা তারা অন্যান্য সব নগরীর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। যদিও বর্তমানে এর জনবসতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তাও এত বেশি যে, সমুদ্র তীরবর্তী অন্য কোন অঞ্চলের সাথে তার তুলনা করা যায় না। তবু এটা একমাত্র সেই অবস্থা, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাদের নগর সংস্কৃতি দীর্ঘস্থায়ী উমাইয়া সাম্রাজ্য, তার পূর্ববর্তী গথ সাম্রাজ্য এবং এর পরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য ও অনুরূপ অন্যান্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং নগর সংস্কৃতি সেখানে এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে, যার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া যায় না। অবশ্য ইরাক, সিরিয়া ও মিশর

www.amarboi.org

সম্পর্কেও অনুরূপ সংবাদ আমরা পেয়েছি। সেখানেও সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে সেখানে সর্বপ্রকার শিল্পকলা সুবিকশিত এবং এর সব কারুকার্য ও নতুনত্বসহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং বর্তমানকালেও এর স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে এবং সেখানকার জনবসতি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তার অস্তিত্ব লোপ পাবে না। কাপড়ের পাকা রঙের সাথেই এটা তুলনীয়।

তিউনিসেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। এটা সিনহাজা সাম্রাজ্য ও তার পরবর্তীকালে আল-মোহেদ সাম্রাজ্য থেকে যে নগর সংস্কৃতি লাভ করেছে এবং অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য মনের দিক থেকে এটা আন্দালুসের সমতুল্য নয়। তবুও এর মধ্যে মিশরীয় সংস্কৃতি থেকে আগত নানা রীতি-প্রকৃতি ব্যাপক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যকার স্বল্প দূরত্ব এবং প্রতি বছর ভ্রমণকারীদের যাতায়াতে এ মিশ্রণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। অনেক সময় মিশরীয়রা এখানে এসে দীর্ঘদিন বসবাসও করেছে। এভাবে তারা তাদের বিলাসের অভ্যাস এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পকর্মের মধ্যে যা শোভন বলে পরিচিত, তা এখানে সংক্রমিত করেছে। এ কারণে তিউনিসের অবস্থা অনেকাংশে মিশরের সাথে মিলে। এর কারণও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অন্যদিকে আন্দালুসের সাথেও এর মিল আছে। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব আন্দালুসের বহু লোক নির্বাসিত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর ফলে সেখানে আন্দালুসীয় রীতিনীতিও তার শিকড় গেড়ে বসেছে। যদিও বর্তমানে তিউনিসের জনবসতি নগর সংস্কৃতি লালনের অনুকূলে নয়, তবু এর যে স্বরূপ একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এটা তার আধার বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অতি অল্পই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমার কায়রোয়ান, মারাকেশ, কেল-আহাম্মদ প্রভৃতি নগরীতে সংস্কৃতির নিদর্শন দেখতে পাই; যদিও এসব নগরী আজ বিধ্বস্ত এবং বিলীয়মান বলে ধরা যায়। একমাত্র অভিজাত লোকের দৃষ্টিতে এসব নিদর্শন ধরা পড়তে পারে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, শিল্পকর্মের যে নিদর্শন সেখানে বিদ্যমান, তা এককালীন সজীবতার প্রমাণ বহন করছে। যেমন পুস্তকের লিপির লেখা মুছে গেলেও তার নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২০]

২০. কোরান, ১৫, ৮৬, ৩৬, ৮১।

www.amarboi.org

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকলার উন্নতি ও প্রাচুর্য মানুষের চাহিদার উপর নির্ভরশীল]

এর কারণও খুবই সুস্পষ্ট। তা এই যে, মানুষ বিনামূল্যে তার শ্রম নিয়োগে উৎসাহী হয় না। কেননা এ শ্রমের দ্বারাই তার উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। বস্তুত এ বিনিময় ছাড়া তার দীর্ঘজীবনের জন্য অন্য কোন কিছুই উপকারী বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ কারণে সে তার শ্রমকে এমন বিষয়ে নিয়োগ করে, নগরীতে যার মূল্য বিদ্যমান এবং তা দিয়ে তার উপকৃত হওয়া সম্ভব।

সুতরাং কোন শিল্পকর্মের যদি চাহিদা থাকে এবং তার জন্য ব্যয় করতে মানুষ আগ্রহী হয়, তখন এ শিল্পের অবস্থা সেই পণ্যসামগ্রীর সাথে তুলনীয়, যার বাজার তেজী ও সহজে বিক্রয়যোগ্য। এর ফলে নগরীর লোকেরা উক্ত শিল্পের শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়ে একে তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে যদি কোন শিল্পকর্মের চাহিদা এবং এর বাজারের তেজীভাব না থাকে, তা হলে তা শিক্ষা করতে কেউ আগ্রহী হয় না। ফলে তা পরিত্যাক্ত অবস্থায় অবহেলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যেই হযরত আলী থেকে বলা হয় যে, প্রতিটি লোকের মূল্য তার সৎকর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার শিল্পকর্মই তার মূল্য বহন করে; কেননা তার জন্য নিয়োজিত শ্রমের মূল্য দিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ করে।

এখানে অন্য একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়। এটা এই যে, শিল্পকর্ম ও তার উন্নতি সাম্রাজ্যের চাহিদার ফলে ত্বরান্বিত হয়। এরূপ শিল্পের বাজারে তেজীভাব ও চাহিদায় উৎসাহ থাকে। কিন্তু যে শিল্পকে সাম্রাজ্য শক্তি চায় না; বরং নগরীর অন্য লোকেরা ওটার ক্রেতা, ওটার তেমন কোন প্রসার হয় না। কারণ সাম্রাজ্য এক বিরাট বাজারতুল্য; এতে সব বস্তুই বিক্রয় হয় এবং এর চাহিদার কাছে অল্প-বেশির কোন পার্থক্য নেই। কাজেই যা সেই বিরাট বাজারে কাটে, তা-ই প্রচুর ও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। আর সাধারণ মানুষ যদি কোন শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করে, তা হলে ওটা ততটা প্রসার লাভ করে না এবং এর বাজারেও তেমন তেজীভাব দেখা যায় না। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈপ্সিত বস্তুত উপর ক্ষমতাবান।

www.amarboi.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন নগরী যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, তখন এর শিল্পকলাও বিলীন হতে থাকে]

এটা, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি যে, শিল্পকলা তখনই উন্নতি লাভ করে, যখন প্রয়োজন ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নগরীর অবস্থা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, এর জনবসতি ও অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে অবক্ষয় দেখা দেয়, তখন তার বিলাস-ব্যসন কমে গিয়ে পুনরায় মৌলিক প্রয়োজনের দ্বারা জীবন-যাপনের ধারা ফিরে আসে। কাজেই বিলাসের অনুসারী শিল্পকলাও হ্রাস পেতে থাকে। কারণ উক্ত শিল্পকলার কর্মীরা আর তা দিয়ে তাদের জীবিকার সংস্থান করতে সমর্থ হয় না। কাজেই তারা অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাদের পিছনে তার কোন উত্তরাধিকারী থাকে না। সুতরাং এসব শিল্পকলার সব রীতিনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেমন—বিলাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট চিত্রকর, স্বর্ণকার, লিপিকর, অনুলিপিকর এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্মী বিলীন হতে থাকে। এভাবে নগরজীবনের বিলীয়মানতার সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্পকর্ম ধ্বংস হতে হতে একসময় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞাতা, পবিত্র ও মহান।

www.amarboi.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরবরা সব মানুষের চেয়ে শিল্পকলার সাথে বেশি অপরিচিত]

এর কারণ এই যে, আরব বেদুইনরা যাযাবরী জীবনে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত এবং নাগরিক জীবন ও প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ইত্যাদির সাথে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। এ তুলনায় পূর্বাঞ্চলের অনারব এবং রোম সাগরের তীরবর্তী খ্রিস্টান জাতিগুলো নাগরিক জীবনে বেশি প্রতিষ্ঠিত। কারণ তারা এ নাগরিকতার মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং যাযাবরী জীবন ও এর অভ্যাসাদির সাথে তাদের পরিচয় নেই। এমন কি যে উট আরবদেরকে প্রান্তরের বন্যজীবন যাপন করতে এবং যাযাবর বৃত্তিতে নিমজ্জিত থাকতে আকর্ষণ করে, তা ঐসব জাতির মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। এর চারণ ভূমিও তাদের অঞ্চলে নেই এবং উটের প্রসবক্রিয়ার উপযোগী বালুকা প্রান্তরও সেখানে পাওয়া যায় না। এজন্য আমরা দেখতে পাই আরবদের জন্মভূমি এবং যেসব অঞ্চল তারা ইসলামের আবির্ভাবের পরে নিজেদের আয়ত্তে এনেছিল, সেখানে সামগ্রিকভাবে শিল্পকলায় অপ্রাচুর্য বিদ্যমান; এমন কি অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনুরূপ বিষয়াদি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও। পাঠক, এবার অনারব চীন, হিন্দ, তুর্কিস্থান এবং খ্রিস্টান জাতিগুলোর আবাসভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করুন; সেখানে কীভাবেই না শিল্পকলার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে এবং অন্যান্য জাতি তাদের কাছে থেকে ওটা গ্রহণ করছে!

মাগরিবের অনারব বারবারগণ এক্ষেত্রে আরবদের সমতুল্য। কারণ তারাও দীর্ঘকাল ধরে যাযাবরী জীবনধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাঠক, তাদের এ অঞ্চলে শহর-নগরের স্বল্পতাই আপনার জন্য এ বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ কারণে মাগরিবেও শিল্পকলার অপ্রাচুর্য এবং যা আছে, তাও অপ্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র পশমের বয়নশিল্প এবং চামড়ার জুতা তৈরি ও রঞ্জনশিল্পের যা কিছু অবশিষ্ট আছে। কারণ তারা নগর জীবন গ্রহণ করার পর এ দুটি শিল্প চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কেননা এ দুটির চাহিদা যেমন এখানে সাধারণ, তেমনি অন্যান্য শিল্পের মধ্যে এ দুটিই এ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। তদুপরি তারা যাযাবরী জীবন থেকেই এ দুটিতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে সুপ্রাচীন পারস্য, নাবতী, কিবতী, বনি-ইসরাইল, গ্রিক, রোমান প্রমুখ জাতিগুলোর রাজ্যকাল থেকেই সেখানে দীর্ঘকাল ধরে নগর সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে এবং ক্রমশ তা সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়ে গেছে। এর সঙ্গে বিচিত্র শিল্পকলারও বিকাশ ঘটেছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কাজেই এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

www.amarboi.org

ইয়ামেন, বাহ্রাইন, উম্মান, আল-জাজিরা প্রভৃতি অঞ্চল যদিও আরবদের অধিকারে ছিল, তবুও সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে এদেরই বহু জাতি কর্তৃক সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে। তারা শহর-নগর পত্তন করেছে এবং নগর সংস্কৃতি ও বিলাস-ব্যসনের চরম সীমায় পৌঁছেছে। এসব জাতির মধ্যে আদ, সামূদ, আমালেকা, হিমিয়ার এবং তাদের পরে তুব্বা ও'আযেয়া'রা দীর্ঘকাল ধরে রাজ্য পরিচালনা করেছে। তাদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে নগর সংস্কৃতি বিকশিত, এর স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্পকলার প্রাচুর্য অবারিত হতে পেরেছে। এ কারণেই সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ফলে ওটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং ওটা বারবার নবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে এসব অঞ্চল এখনও বুটিদার, ডুরিদার, সূক্ষ্ম জমিন ও রেশমী বস্ত্রাদির উৎপাদনস্থল বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সব কিছুর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম।

www.amarboi.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[যে ব্যক্তি বিশেষ একটি শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তার পক্ষে এর পরে অন্য একটিতে অভ্যস্ত হওয়া খুব কমই সম্ভব হয়]

এর উদাহরণ যেমন দর্জির কাজ। যখন কোন ব্যক্তি দর্জির কাজে অভ্যস্ত হয়ে দক্ষতা অর্জন করে এবং তা তার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে, তখন তার পক্ষে সুতোর বা রাজমিস্ত্রীর কাজে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি তেমন কিছু হয়, তা হলে বুঝতে হবে প্রথমটির কোন দৃঢ়তা তার মধ্যে অর্জিত হয়নি এবং এর রং তার মধ্যে পাকা হয়ে লাগেনি।

এর কারণ এই যে, অভ্যাসমাত্রই জীবাত্মার গুণ ও রং বিশেষ। ওদের একাধিক একসঙ্গে ভীড় জমাতে পারে না। যে-ব্যক্তি সদ্যোজাত প্রকৃতির অধিকারী তার পক্ষে যে-কোন অভ্যাস গ্রহণ এবং এর যোগ্যতা অর্জন অত্যন্ত সহজ হয়ে থাকে। সুতরাং যখন জীবাত্মা কোন একটি বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তখন সে নিষ্কলুষ প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায় এবং উক্ত অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত রঙের দরুন এর গ্রহণ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই অন্য একটি অভ্যাস গ্রহণের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এটা এতই স্পষ্ট যে, যে-কোন বাস্তব উদাহরণ পরীক্ষা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য পাঠক, আপনি এমন ব্যক্তি খুব কমই দেখতে পাবেন, যে একটি শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার পর অন্য একটিতেও সমানভাবে একই পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি যারা মননশীল জ্ঞানের চর্চা করেন, তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে যিনি কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে চরম সীমায় পৌঁছেছেন, তিনি অন্য বিষয়ে অনুরূপ দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন না। পরীক্ষা করলেই এর ত্রুটি বের হয়ে পড়ে। অবশ্য খুব অল্পক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এর সুস্পষ্ট কারণ, আমরা পূর্বে যে যোগ্যতার কথা বলেছি ওটাই। তা হল, জীবাত্মার অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানের আধার। তিনিই একমাত্র সহায় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

www.amarboi.org

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[মূল শিল্পকলাসমূহ সম্পর্কে আভাস দান]

জেনে রাখুন, মানব সমাজে শ্রমের পরম্পরাগত প্রাচুর্যের জন্য শিল্পকলার বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এ বৈচিত্র্যের পরিমাণ এত বেশি যে, বর্ণনার দ্বারা এর ইতি ও সংখ্যার দ্বারা এর শেষ করা সম্ভব নয়। অবশ্য যেগুলো মানব সভ্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অথবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, আমরা এখানে কেবলমাত্র সেগুলোর উল্লেখ করব। এছাড়া অন্যগুলো পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একান্ত প্রয়োজনীয়গুলোর মধ্যে; যেমন—কৃষিকর্ম, স্থাপত্য, দর্জির কাজ, কাঠশিল্প ও বয়নশিল্প এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্ভ্রান্ত শিল্পের মধ্যে; যেমন—ধাত্রীবিদ্যা, গ্রন্থ-রচনা, পুস্তকশিল্প, সঙ্গীতবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। ধাত্রীবিদ্যা সভ্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তার সাধারণ চাহিদা বিদ্যমান। কারণ এর দ্বারা নবজাতক জীবন লাভ করে এবং সম্ভবত তার জন্ম সম্পূর্ণ হয়। তদুপরি তার বিষয়বস্তু হল নবজাতক ও তাদের মাতৃকুল। চিকিৎসাশাস্ত্র হল মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও এর রোগ প্রতিরোধের বিদ্যা। এটা পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও এর আলোচ্য বিষয় মানুষের দেহ। গ্রন্থ রচনা ও এর অনুসারী পুস্তকশিল্প, এর দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সংরক্ষিত, এর ভুল-ভ্রান্তি অপসারিত এবং তার মনোভাব দূর-দূরান্তে প্রকাশিত হয়। এরই কল্যাণে মানুষের মনন ও জ্ঞানের ফসল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং মানুষের চিন্তাজগতের মর্যাদা উন্নত হয়ে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতবিদ্যা শব্দাবলির সুসমন্বয় সাধন করে এর অন্তর্গত সৌন্দর্যকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

শেষোক্ত এ তিন শিল্পই মহান সম্রাটদের সাহচর্যের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে গুণী ব্যক্তিরা তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিবেশ ও সৌখিন জলসায় উপস্থিত থেকে মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। এ কারণে এ তিনটি শিল্পের যে সম্ভ্রম বিদ্যমান তা অন্য কোথাও নেই। এছাড়া অন্যান্য সব শিল্পই সাধারণভাবে অনুসারী ও অনুগামী। অবশ্য অনেক সময় উদ্দেশ্য ও চাহিদার পরিবর্তনে সব শিল্পেরই মর্যাদার পরিবর্তন ঘটে থাকে। আল্লাহ্ই যথার্থতা সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।[২১]

---

২১. রোজেনথালে এখানে—আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।

www.amarboi.org

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[কৃষি শিল্প]

এ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য হল খাদ্য ও শস্য। এটা ভূমি চাষ, বীজ বপন, গাছের পরিচর্যাকরণ এবং জলসেচ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা এর বৃদ্ধিকে সীমায় পৌঁছানো। তারপর এর শীষগুলো কেটে এনে শস্য বের করে নেয়া। এছাড়া এর সাথে অন্যান্য শ্রম, উপকরণ ও চাহিদার যথাযথ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখা। এটা অন্য সব শিল্প অপেক্ষা অগ্রবর্তী। কারণ এটা সেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে, যা সাধারণভাবে মানুষের দৈহিক পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। কেননা তার অস্তিত্ব অন্য সব বিষয়কে বাদ দিতে পারে কিন্তু খাদ্য পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এ কারণে এ শিল্পটি প্রান্তরীয় জীবনের সাথে বিশিষ্ট। আমরা পূর্বেও বলেছি যে, প্রান্তরীয় জীবন নাগরিক জীবনের পূর্ববর্তী ও অগ্রবর্তী। এ কারণেই এ শিল্পটি প্রান্তরীয় জীবনের সাথে জড়িত। নগরবাসীরা এটা গ্রহণ করে না এবং এ সম্পর্কে কিছু জানেও না। কেননা তাদের সব অবস্থাই প্রান্তরীয় জীবনের পরবর্তী সৃষ্টি। সুতরাং নগরের শিল্পকলাও তার পরবর্তী ও অনুসারী। পবিত্র ও মাহন আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে বান্দাদেরকে স্থান দিয়ে থাকেন।

www.amarboi.org

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[স্থাপত্য শিল্প]

এ শিল্পকর্ম নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহের মধ্যে প্রথম এবং অগ্রবর্তী। এটা নিরাপত্তার জন্য গৃহ ও অট্টালিকা এবং নাগরিক জীবনে দৈহিক আশ্রয়ের জন্য সুরক্ষিত আবাস নির্মাণে শ্রম নিয়োগের জ্ঞান লাভ করা। এটা এই যে, মানুষ যেহেতু জন্মগতভাবে তার সব অবস্থার পরিণাম চিন্তা করতে অভ্যস্ত, সেজন্য অবশ্যই সে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় ভেবে দেখবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ছাদ ও চতুর্দিকে দেয়ালবিশিষ্ট গৃহাদি নির্মাণ করবে।

মানুষ তাদের এ সহজাত চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অধিকারী এবং বস্তুত এর মধ্যেই তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তার অনুরূপ চিন্তা করতে বাধ্য এবং মোটামুটিভাবে সেজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করে থাকে। যেমন—দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসীরা। কিন্তু যাযাবরী জীবনের অধিকারীরা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকে। কারণ তারা এই মানবিক শিল্পকর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং তারা প্রকৃতির দ্বারা প্রস্তুত গর্ত ও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

অতঃপর সমভাবাপন্ন অঞ্চলের যারা আশ্রয়ের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করতে অভ্যস্ত, তারা সংখ্যায় বেশি বলে একই সমতলে প্রচুর পরিমাণে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ফেলে। অথচ এসব সত্ত্বেও তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ও অজ্ঞাত থেকে যায়। সুতরাং তারা একে অপরের কাছে থেকে রাত্রিকালীন আক্রমণের আশঙ্কা করে। কাজেই তাদের এ সমাবেশকে চতুর্দিক হতে প্রাচীর বিন্যাসের দ্বারা সুরক্ষিত করার প্রয়োজন তারা তীব্রভাবে অনুভব করে। এভাবে এ প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চল একটি নগর বা পল্লীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেখানে তাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য শাসকের অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কখনও তারা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে এবং অধীনস্থ অন্যান্য সবাইকে রক্ষা করার জন্য রক্ষীপ্রাকার ও দুর্গ নির্মাণ করে থাকে। রাজন্যবর্গ এবং তত্তুল্য ক্ষমতার অধিকারী আমির ও গোত্রপ্রধানগণ অনুরূপ উদ্যোগ আয়োজন করে থাকেন।

নগরীর এ স্থাপত্যের মধ্যেও বিচিত্র অবস্থার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। প্রতিটি নগরীই তার পরিচিত শিল্পজ্ঞান এবং প্রচলিত ধারা অনুসারে নির্মাণকার্যে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে এদের নিজস্ব রুচি এবং সম্পদ ও দারিদ্র্য অনুসারে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যে-

www.amarboi.org

কোন এক নগরীর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। নগরবাসীদের মধ্যে অনেক বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে। এদের প্রাঙ্গণ প্রশস্ত এবং সেখানে বহু গৃহ, কুঠি ও বিপুলায়তন কক্ষ থাকে। কারণ গৃহস্বামীর সন্তান-সন্ততি, চাকর-নফর, পোষ্য ও অনুগামীদের সংখ্যা প্রচুর। তারা পাথর দ্বারা আস্তর লাগায়। তারা পাথর দ্বারা এসব অট্টালিকার দেয়াল নির্মাণ করে এবং তা গাঁথার জন্য চুন মিশ্রিত মসলা ব্যবহার করে। তারপর এতে রং ও প্রলেপের দ্বারা আস্তর লাগায়। তারা এর সর্বাংশে কারুকার্যমণ্ডিত ও মসৃণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাদের উদ্যোগ আয়োজনের দ্বারা এ মনোভাবই প্রকাশ করতে চায় যে, তারা আশ্রয়স্থলকে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাদের বাহনাদি বাঁধার জন্য আস্তাবলের প্রয়োজনও দেখা দেয়; যদি তারা সৈনাদলের কেউ হয় এবং তাদের প্রচুর সংখ্যক অনুগামী ও সহচর থাকে—যেমন আমীর এবং তাদের সমমর্যাদার রাজকীয় পুরুষ।

আবার অনেকে নিজে থাকার জন্য এবং সন্তান-সন্ততিকে আশ্রয় দেবার জন্য ক্ষুদ্র গৃহ ও কুটির নির্মাণ করে। এর অতিরিক্ত কিছু করার সঙ্গতি তার নেই এবং সেজন্যই সে একান্তভাবে মানুষের প্রকৃতিগত আশ্রয়লাভের ন্যূনতম ব্যবস্থা করে থাকে। এ দুটি স্তরের মাঝখানে আরও অগণিত স্তর বিদ্যমান।

রাজন্যবর্গ ও সাম্রাজ্যের অধিপতিরা বিরাট নগর পত্তন ও উন্নত অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়েও এ শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করেন এবং উক্ত শিল্পকর্মের চূড়ান্ত রূপ তুলে ধরার জন্য অট্টালিকাগুলো বৃহৎ আকৃতি ও গঠন সৌকর্যের ক্ষেত্রে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

স্থাপত্য শিল্প মানব সমাজের উপরোক্ত সমস্ত চাহিদাই পূরণ করে থাকে। সমভাবাপন্ন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে এ শিল্পের বেশি চর্চা হয়ে থাকে। কারণ অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে অনুরূপ স্থাপত্যের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। কেননা সেখানকার মানুষ বাঁশ ও মাটির তৈরি কুটির অথবা গর্ত ও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন কাটায়।

এসব শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ। আবার অনেকের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার কোন চিহ্ন নেই। অন্যদিকে এ স্থাপত্যের অন্তর্গত গঠনপ্রণালীরও ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে মসৃণ পাথর ও ইঁটের গাঁথুনির দ্বারা দেয়াল তোলা হয়। এগুলোর গাঁথুনির মসলা হিসেবে মাটি ও চুন ব্যবহার করে এমনভাবে এগুলোর জোড়গুলো মিলিয়ে দেয়া হয় যে, দেখতে সমস্ত দেয়ালটিই অখণ্ড বলে মনে হয়। এর মধ্যে শুধু মাটির কাজও আছে; তা দিয়ে দেয়াল তৈরি হয়। সে জন্য দুটি কাঠের ফলক ব্যবহার করা হয়। তাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থান ও প্রচলন অনুসারে নানাপ্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যম পরিমাণ দৈর্ঘ্যে চার হাত এবং প্রস্থে দুই হাত। এ দুটি ফলককে ভিত্তির ওপর স্থাপন করে তাদের মধ্যে নির্মাণকর্তার প্রয়োজন ও ভিত্তির প্রস্থ অনুসারে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। তারপর উক্ত দুটি ফলককে কাঠের টুকরার দ্বারা একত্রে বেঁধে দড়ির সাহায্যে টানা দিয়ে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং এ ফলক দুটির মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের দুই সীমায় দুটি ছোট কাঠের টুকরা দিয়ে

www.amarboi.org

বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর এ ফাঁকের মধ্যে চুনমিশ্রিত মৃত্তিকা ঢেলে দিয়ে তাকে ভাল করে মিশ্রিত করে বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দ্বারা বারবার উল্টা-পাল্টা করা হয়। এভাবে ওটা বসে গেলে পুনরায় দ্বিতীয়, তৃতীয়বার মাটি দিয়ে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ফলক দুটির মধ্যবর্তী ফাঁকটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় চুন ও মাটি মিশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণ অংশটিই অখণ্ড বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। তারপর পুনরায় পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ফলক দুটি তার উপর স্থাপন করে উলট-পালটের দ্বারা মাটি বসানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে এক সারির উপর অন্য সারি বসে সমস্ত দেয়ালটি এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা দেখতে একটি অখণ্ড বস্তু বলে ধারণা হয়। দেয়াল তৈরির এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'তাবিয়া'[১২] এবং যারা এ কাজ সম্পন্ন করে তাদেরকে বলা হয় 'তাওয়াব'।

স্থাপত্যের অন্য একটি শিল্পকর্ম হল দেয়ালের ওপর চুনের প্রলেপ দেয়া। এ উদ্দেশ্যে চুনকে পানিতে ভিজিয়ে খামির করা হয় এবং তার তেজস্ক্রিয়া দূর করে দেয়ালে লাগনোর উপযোগী ধাতস্থ্ করার জন্য এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ রেখে দেয়া হয়। তারপর নির্মাতার পছন্দ মত ওটা তৈরি হলে তাকে দেয়ালের উপরের দিক থেকে তার সাথে মিশিয়ে দেয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

স্থাপত্যের অন্য একটি শিল্প প্রক্রিয়া হল ছাদ প্রস্তুতকরণ। এর জন্য গৃহের দুটি দেয়ালের উপরে সুতোরের দ্বারা মসৃণকৃত অথবা শক্ত কাঠখণ্ড স্থাপন করা হয় এবং এদের ওপর আরও কাঠখণ্ড বিছিয়ে পেরেক দ্বারা আটকে দেয়া হয়। তারপর এগুলোর উপর মাটি ও চুন ঢালাই করে মুগুর দ্বারা পিটিয়ে মিশিয়ে সমান করে দেয়া হয় এবং তার উপর দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার ন্যায় চুনের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়।

স্থাপত্যের অন্য একটি দিক মসৃণকরণ ও অলঙ্করণ শিল্প। যেমন কলিচুন পানিতে গুলিয়ে খামিরের দ্বারা দেয়ালের ওপর নানাবিধ আকৃতি নির্মাণ করা। এভাবে কোন আকৃতি সংগঠিত হলে তার অন্তর্গত আর্দ্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় লোহার যন্ত্রাদি দ্বারা খোদাই করে এমনভাবে পালিশ করা, যাতে তার সৌন্দর্য ও সজীবতা ফুটে ওঠে। অনেক সময় দেয়ালের উপর মার্বেল পাথর, ইঁট, কাদামাটি, ঝিনুক অথবা খনিজ অঙ্গার লাগিয়ে সেগুলো দিয়ে সুসামঞ্জস্য কিংবা বৈচিত্র্যময় আকারা নির্মাণ করা হয়। শিল্পীদের দ্বারা নির্দিষ্ট গঠন ও অনুপাত অনুযায়ী এগুলো দেয়ালের উপর ফুটে ওঠে। যেন তা একটি সজীব বাগানের অংশবিশেষ। এছাড়াও পানি নির্গমনের জন্য প্রণালী ও চৌবাচ্চা নির্মাণের কলা-কৌশল রয়েছে। গৃহাদির মধ্যে মার্বেল পাথরের মজবুত করে একটি জলাধার প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যভাগে সংস্থাপিত মুখের দ্বারা চৌবাচ্চায় পানি এসে পড়ে এবং বাইরে থেকে নালার সাহায্যে এ পানি চৌবাচ্চায় সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই প্রকার আরও বহু নির্মাণকৌশল বিদ্যমান।

এসব শিল্পকর্মে শিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়ে থাকে এবং নগরীর জনবসতির প্রাচুর্য ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অনেক সময় শাসকগণও এসব শিল্পী, যারা নির্মাণকার্যে দক্ষতার অধিকারী, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করে থাকেন।

১২. মূল শব্দটি সম্ভবত স্পেনিশ তাপিয়া।

www.amarboi.org

এর বর্ণনা এই যে, মানুষ জনবসতিবহুল নগরীগুলোতে বাসস্থানের জন্য উপর নিচের শূন্য ও উন্মুক্ত স্থান, এমন কি গৃহাদির বহিরাঙ্গন ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় দেয়ালের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং গৃহের মালিকরা প্রতিবেশীদেরকে এরূপ তৎপরতায় বাধা দেয়। অবশ্য প্রতিবেশীদের এরূপ তৎপরতার আইনানুগ অধিকার থাকলে তা সম্ভব হয় না। তারা রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও পরিত্যাক্ত আবর্জনা নিষ্কাশন করার প্রয়োজনে নির্মিত নালা ইত্যাদি নিয়েও বিরোধের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় অনেকে অপরের দেয়াল, কার্নিশ অথবা নালার অংশবিশেষের উপর দাবি উত্থাপন করে। তাদের ঘন সন্নিবেশিত অবস্থানের জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। অনেক সময় অনেকে প্রতিবেশীর ভগ্নপ্রায় দেয়ালের পতন আশঙ্কা করে আপত্তি উত্থাপন করে এবং ওটা ভেঙ্গে ফেলে ক্ষতির আশঙ্কা দূর করার জন্য তাদেরকে শাসকের নির্দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অনেক সময় শরীকদের মধ্যে কোন বাসস্থান ভাগ করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা এমনভাবে করতে হয়, যাতে বাসস্থানের ক্ষতি অথবা তার উপযোগিতা নষ্ট না হয়ে যায়। এমন আরও বহু সমস্যা বিদ্যমান। একমাত্র নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন। তারা এসব ব্যাপারে জোর ও গিঁট, কাঠের বিভিন্ন অবস্থান, দেয়ালের হেলান দেয়া ও সোজা অবস্থা, গঠন ও উপযোগিতা অনুসারে গৃহাদির সুষম বণ্টন এবং আগম-নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রণালীবাহিত জলধারা গৃহ ও দেয়ালের ক্ষতিকারক হবার আশঙ্কা ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার ক্ষমতা রাখেন। অন্যের পক্ষে এরূপ বিবেচনা সম্ভব নয়। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তারা সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে এবং পুরুষানুক্রমে এসব বিষয়ে ক্ষমতা-অক্ষমতার বৈচিত্র্য বহন করে আসছেন।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এসব শিল্পকর্ম ও তার পরিপূর্ণতা নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধি এবং তার প্রাচুর্য চাহিদার প্রাচুর্য থেকে এসে থাকে। এজন্যই সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত থাকায় এসব শিল্পকর্মের জন্য অন্য অঞ্চলের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। যেমন সম্রাট ওলিদ ইব্‌নে আবদুল মালেকের সময় দেখা গেছে; যখন তিনি মদিনার মসজিদ বয়তুল মুকাদ্দস ও সিরিয়ায় নিজ নামাঙ্কিত মসজিদ বিনির্মাণের মনস্থ করলেন, তখন কনস্টান্টিনপোলের রোমান সম্রাটের কাছে দক্ষ নির্মাণশিল্পীর জন্য লোক পাঠাতে হল। রোমান সম্রাট তাঁর চাহিদা অনুযায়ী এমন সব কর্মী পাঠিয়েছিলেন, যাদের দ্বারা ওলিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

এসব শিল্পকর্মীদেরকে অনেক সময় জ্যামিতির অনেক কিছু জানতে হয়। যেমন—সমান করার জন্য ওলন দড়ি, পানি উপরের দিকে প্রবাহিত করার জন্য ব্যবস্থা এবং ইত্যাকার আরও বহুবিষয়। সুতরাং তাদেরকে এসব সমস্যা সম্পর্কে জানতে হয়। অনুরূপভাবে যন্ত্রের সাহায্যে ভার-উত্তোলন। কারণ পাথরের দ্বারা বিরাট আকারের কোন বস্তু তৈরি করে তা প্রাচীরের উপরে উঠাবার জন্য কর্মীদের শক্তিই যথেষ্ট নয়। এজন্য কৌশলের দ্বারা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়াতে হয়। এ উদ্দেশ্যে জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত নির্দিষ্ট ছিদ্রাদিতে রশি প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলে বস্তুর ভার বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রকে 'মিখাল' (কপিকল)

www.amarboi.org

বলা হয়। এর সাহায্যে অনায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে এবং এর কাজ একমাত্র মানুষের মধ্যে প্রচলিত জ্যামিতিক নিয়মাবলির মাধ্যমেই সফল হওয়া সম্ভব। অনুরূপ উপায়েই বর্তমানকালেও দণ্ডায়মান বিরাট বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ মানুষের ধারণা এই যে, এগুলো প্রাক-ইসলাম যুগের কীর্তি এবং যারা এগুলো নির্মাণ করেছিলেন, তাদের দেহের আকৃতি এগুলোর অনুপাতেই বিরাট ছিল। কিন্তু আদৌ তা নয়। তারা এ জ্যামিতিক প্রক্রিয়াতেই এসব সৌধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পাঠক, এটা বুঝে নিন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[২৩] পবিত্র তিনি।

২৩. কোরান, ৩, ৪৭।

www.amarboi.org

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[সূত্রধরের শিল্প]

এ শিল্পটি সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত এবং এর উপকরণ হল কাঠ। এর বর্ণনা এই যে, পবিত্র ও মহান আল্লাহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের জন্য এমন উপকারিতার সন্নিবেশ করেছেন, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। এদের মধ্যে বৃক্ষ অন্যতম; এর মধ্যে মানুষের জন্য এত উপকার বিদ্যমান, যা গুণে শেষ করা যায় না এবং প্রত্যেকেই এগুলোর সাথে পরিচিত। এসব উপকারের একটি হল এদের শুকিয়ে কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা। প্রথমেই মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে এই শুষ্ক কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের ভর দিয়ে চলবার লাঠি, পাচনবাড়ি এবং এদের ন্যায় অন্যান্য কাজে এর ব্যবহার হয়। কোন বস্তুর ভারের ফলে কাৎ হয়ে পড়া থেকে ঠেকনার সাহায্যে রক্ষা করার জন্যও এর প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়াও নগর ও প্রান্তরবাসীদের জন্য এতে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। প্রান্তরবাসীরা কাঠ দ্বারা তাদের তাঁবুর খুঁটি ও টানা, সোয়ারীর জন্য হাওদা এবং অস্ত্র হিসেবে বর্শা, ধনুক ও তীর প্রস্তুত করে থাকে। নগরবাসীরা তাদের গৃহের জন্য ছাদ, দরজার কপাট এবং বসার আসন এ কাঠ দ্বারা নির্মাণ করে। এসব কাজের প্রতিটিতেই কাঠ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট আকারে রূপ দেবার জন্য শিল্পের সহায়তা প্রয়োজন।

এসব কাজে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম, যা দিয়ে প্রতিটি উদ্দিষ্ট বস্তুর স্বরূপ বাস্তবায়িত হয়, তাকে সূত্রধরের কাজ বলে অভিহিত করা হয় এবং এর মর্যাদার তারতম্যও বিদ্যমান। এর জন্য উক্ত কাজের শিল্পীকে প্রথমেই কাঠ ফেঁড়ে ক্ষুদ্র খণ্ড ও তক্তায় রূপান্তরিত করতে হয় এবং পরে এসব টুকরা জোড়া দিয়ে উদ্দিষ্ট সামগ্রীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে হয়। সংশ্লিষ্ট শিল্পী এসব খণ্ডকেই তাদের শিল্প-কৌশলের বিন্যাস অনুসারে এমনভাবে সাজান, যাতে প্রতিটি সামগ্রী তার নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। যিনি এ কাজে নিয়োজিত হন, তাকে সূত্রধর বলা হয় এবং তিনি সভ্যতার একজন প্রয়োজনীয় শিল্পী।

অতঃপর যখন নগর সংস্কৃতির বিস্তৃতি দেখা দেয় এবং বিলাস-ব্যসনের বিকাশ হয়, তখন মানুষ এসব কাজ; তথা—ছাদ, দরজা, আসন ও অন্য সামগ্রীর প্রতিটির ক্ষেত্রে কারুকার্য সম্পাদনের চেষ্টা করে। এভাবে উক্ত শিল্পকর্মে কারুকার্য সম্পাদন ও সৌন্দর্যমণ্ডিতকরণের যে অদ্ভুত প্রচেষ্টা দেখা দেয়, তা সভ্যতার পরিপূর্ণতা বিধায়ক শিল্প-নৈপুণ্য মাত্র; কোনক্রমেই তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন দরজায় ও

www.amarboi.org

আসন ইত্যাদিতে খোদাইয়ের কাজ। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠখণ্ডকে মসৃণ ও অলঙ্কৃত করে তারপর এদেরকে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে পেরেকের সাহায্যে এমনভাবে মিলিয়ে দেয়া, যাতে দেখতে ওটা একটি অখণ্ড কাজ বলে মনে হয়। অনেক সময় এসব কাঠখণ্ডের দ্বারা বিচিত্র আকৃতির সৃষ্টি করে এমন শিল্প-কৌশলের দ্বারা বিন্যস্ত করা হয় যে, কাঠের কাজের মধ্যে এতে অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। এভাবে কাঠের দ্বারা প্রস্তুত সর্ব প্রকার সামগ্রীতে শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়া হয়।

অনুরূপভাবে সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত করতেও তক্তা ও পেরেকের সমন্বিত রূপ ফুটিয়ে তুলবার জন্য এ শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা জ্যামিতিক পরিমাপ অনুযায়ী মাছের দেহের আদলে এবং তার পাখনা ও বুকের সাহায্যে সন্তরণের দিকে লক্ষ রেখে এমন একটি আকৃতি গড়ে তোলা, যা পানি কেটে অগ্রসর হতে বেশি উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে। শুধু এতে মাছের মধ্যকার প্রাণের গতির পরিবর্তে বাতাসের দ্বারা গতি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় রণতরীগুলোতে দাঁড়ের সাহায্যেও গতি সঞ্চার করা হয়ে থাকে। এ শিল্পটি তার মূল ভিত্তিতেই এর সর্বপ্রকার কর্মের জন্য জ্যামিতিশাস্ত্রের একটি বিরাট অংশের ওপর নির্ভরশীল। কারণ যে-কোন সামগ্রীকে তার কল্পিত সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে রূপদানের জন্য নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে সাধারণ অথবা বিশেষ রূপটির যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন এবং এ নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে হলে জ্যামিতির সাহায্য অপরিহার্য।

এ কারণে দেখা যায় গ্রিক জ্যামিতিবিদরা প্রায় সকলেই উক্ত শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ ছিলেন। 'জ্যামিতির মূলনীতি' গ্রন্থ প্রণেতা ইউক্লিড একজন সূত্রধর ছিলেন[২৪] এবং তিনি এ পেশার দ্বারাই পরিচিত হতেন। অনুরূপভাবে 'সুচিঘন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধ্যায়' রচয়িতা অ্যাপলোনিয়াম, মিলানিয়াম প্রমুখ অন্যান্য অনেকেই এ শিল্পের সাথে পরিচিত ছিলেন।

অনেক সময় বলা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টিতে যিনি সর্বপ্রথম এ শিল্পজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর নাম হযরত নুহ (আ)। তিনি এ শিল্পের সাহায্যেই তাঁর মুক্তির জাহাজ তৈরি করেছিলেন, যা সেই মহাপ্লাবনে তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সংবাদ যদিও সম্ভব অর্থাৎ তিনি সূত্রধর ছিলেন; কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন বা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ কিছুর জন্য সময়ের দূরত্বের কারণেই কোন প্রকার প্রমাণ এসে পৌঁছায় না। এ সংবাদের অর্থ আল্লাহ্ই ভাল জানেন, সম্ভবত এই যে, সূত্রধরের এ শিল্পকর্ম অতিপ্রাচীন এবং হযরত নুহের পূর্বেকার এ সম্পর্কীয় কোন সংবাদ জানা যায় না। সুতরাং তাঁকেই এর প্রথম শিক্ষক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পাঠক, এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির মধ্যকার এ শিল্পকর্মাদির রহস্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট হোন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

২৪. যতদূর সম্ভব পরবর্তী অ্যাপলোনিয়ামের নামই এ প্রসঙ্গে অধিকতর পরিচিত।

www.amarboi.org

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[বয়ন ও সীবন শিল্প]

জেনে রাখুন, মনুষ্যত্বের দিক থেকে যারা সমভাবাপন্ন মানুষ, তাদের জন্য আশ্রয়ের চিন্তা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি পরিচ্ছদের চিন্তাও এবং এক্ষেত্রে বয়নকৃত সামগ্রীর সাহায্যে তারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সুতাকে এমনভাবে একত্র করতে হয়, যাতে তা দিয়ে একটি অখণ্ড কাপড় প্রস্তুত হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার নামই বোনা বা বয়ন।

প্রান্তরীয় জীবনের অধিকারীরা এ ব্যাপারে এক খণ্ডকেই যথেষ্ট মনে করে; কিন্তু তারাই যখন নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন তারা এ অখণ্ড কাপড়কে খণ্ড খণ্ড করে তাদের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মানানসই রূপে কেটে নেয়। তারপর এসব খণ্ডকে সুতার দ্বারা একত্র করে পরিধানের যোগ্য একটি পরিচ্ছদে রূপান্তরিত করে। এভাবে একত্র করার কাজে যে-বিদ্যাটির সাহায্য নেয়া হয়, তাকে বলে সীবন। এ শিল্প দুটি সভ্যতার জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ সব মানুষই আচ্ছাদনের জন্য এর মুখাপেক্ষী।

পশম, রেশম ও কার্পাসের লম্বা সুতার টানা এবং প্রস্থ সুতার পড়েন এমনভাবে পরস্পর গ্রথিত করা, যাতে এগুলোর সম্মিলনে একটি অখণ্ড জমিন গড়ে ওঠে। এটাই বয়নের উত্তম প্রক্রিয়া এবং এর সাহায্যেই নির্দিষ্ট আকৃতির বস্ত্রাদি তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে পশমের তৈরি চাদর এবং রেশম ও কার্পাসের তৈরি পরিচ্ছদের বস্ত্র ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয় শিল্পটি এসব বস্ত্রখণ্ডকে বিভিন্ন আকৃতি ও ধারা অনুসারে প্রথমে কাঁচি দিয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপযোগী করে কর্তন করা এবং তারপর উত্তমরূপে সুতার দ্বারা সেলাই, বন্ধনীর দ্বারা জোড়া দেয়া, পেঁচিয়ে আটকানো অথবা ফাঁক রেখে গাঁথার মাধ্যমে[২৫] শিল্পের প্রচলিত ধরন অনুসারে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা।

এ দ্বিতীয় শিল্পটি বিশেষভাবে নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা যাযাবরী জীবন এসব বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করে না। তারা কাপড় পরার জন্যই পরে। তাকে খণ্ড করে নির্দিষ্ট মাপে সেলাই করার মাধ্যমে শোভন পরিচ্ছদ তৈরির ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই; এটা একমাত্র নাগরিক জীবনের বিচিত্র বিষয়-বিলাসেরই সৃষ্টি। পাঠক, এদিক থেকে হজ্জব্রত পালনের সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্যটি

---

২৫. মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসরণ করে এ অর্থ দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এই চার প্রকার সীবন প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল।

www.amarboi.org

অনুধাবন করুন। কারণ ধর্মীয় বিধান অনুসারে হজ্জব্রত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল সাংসারিক সব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা। যেমন 'আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছি' এমন কি কোন ব্যক্তির পক্ষে তার বিলাসী অভ্যাস, তথা সুগন্ধী, নারী সংসর্গ, সেলাইকৃত পরিচ্ছদ, পাদুকা ইত্যাদির সাথে সংশ্রব রাখা সম্ভব নয় এবং শিকার ও অন্যান্য অভ্যাস, যা দিয়ে তার প্রবৃত্তি ও চরিত্র অনুরঞ্জিত হয়েছিল, তাও তাকে ত্যাগ করতে হবে; যেমন মৃত্যুর সময় সে সব কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে এমনভাবে আসবে, যেন সে হাশরের মাঠে উপস্থিত হচ্ছে, তার অন্তর বিনম্র এবং তার উদ্দেশ্য একমাত্র প্রভুর সন্তুষ্টি। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে, তা হলে এর প্রতিদানে সে সর্বপাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে, যেমন প্রথম দিন তার জননী তাকে নিষ্কলুষ জন্ম দিয়েছিল। তোমার পবিত্রতা হোক, তুমি বান্দাদের প্রতি কী অপরিসীম দয়া ও মমতার অধিকারী! তাদেরকে তোমার সকাশে পথপ্রদর্শন করতে তুমি কতই না ব্যাগ্র!

বস্তুত এ দুটি শিল্প সৃষ্টিজগতে অতিশয় প্রাচীন; কেননা সমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে দেহ আচ্ছাদনের এ স্বভাব মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের দরুন অসমভাবাপন্ন অঞ্চলে এই আচ্ছাদনের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ নেই। এজন্য প্রথম অঞ্চলের সুদানের অধিবাসীদের সম্পর্কে আমরা শুনতে পাই যে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উলঙ্গ। এ শিল্পের প্রাচীনত্বের জন্য একে হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়। কেননা তিনি নবীদের মধ্যে অতিশয় প্রাচীন। অনেক সময় এসব শিল্পকর্মের সাথে হারমিসের নাম যুক্ত হয়। কখনও বলা হয়, হারমিসই ইদরিস। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২৬]

২৬. কোরান, ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

www.amarboi.org

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[ধাত্রী শিল্প]

এটি মানব শিশুকে তার মাতৃজঠর থেকে বের করার প্রক্রিয়া সংবলিত শিল্প হিসেবে পরিচিত। এ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন এবং এর উপকরণ সংগ্রহ এর অন্তর্গত। তারপর, আমরা যেমন পরে বর্ণনা করছি, সে অনুযায়ী নবজাতকের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখাও এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ শিল্পটি সাধারণভাবে নারী সমাজের আয়ত্তাধীন। কেননা তারাই পরস্পরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বেশি যোগ্য। নারীদের মধ্যে যারা এ কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে 'কাবেলা' (গ্রহিতা) বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি প্রদান ও গ্রহণের মনোভাব থেকে গৃহীত হয়েছে। যেন প্রসবকারিণী তাকে নবজাতক প্রদান করে এবং সে তা গ্রহণ করে।

এর বর্ণনা এই যে, মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের সৃষ্টি ও এর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে চরম সীমায় পৌঁছে এবং আল্লাহ্ তার জন্য সেখানে অবস্থানের যে সময়সীমা,—সাধারণভাবে নয় মাস,—নির্ধারণ করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ আকর্ষণেই ওটা বাইরে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় বহির্পথ সংকীর্ণ হওয়ার ফলে ব্যাপারটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় চাপের ফলে যোনির পার্শ্বদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক সময় জরায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝিল্লীর আবরণ ফেটে যায়। এ সবই ব্যথার কারণ ঘটিয়ে এর আবির্ভাবকে তীব্র করে তোলে এবং এগুলোরই সম্মিলিত অর্থ প্রসববেদনা। এ পর্যায়ে ধাত্রী অনেকদিন থেকেই প্রসূতিকে সাহায্য করতে পারে; সে তার পৃষ্ঠদেশ, উভয় বস্তী ও জরায়ু সংলগ্ন নিম্নভাগ মালিশ করে দিতে পারে। এর ফলে জাতক বহিষ্কারে নিয়োজিত প্রসূতির শক্তি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যতদূর সম্ভব তার কষ্টের লাঘব হয়। ধাত্রী এক্ষেত্রে প্রসূতির কষ্টের ধারা অনুসরণ করেই তাকে সাহায্য করে।

অতঃপর জাতক ভূমিষ্ঠ হলে তার পাকস্থলীর সাথে যুক্ত নাভীর নাড়ীর দ্বারা মাতৃজরায়ুর অন্তর্গত ফুলের সাথে সে তখনও সংযুক্ত থাকে। বস্তুত এ নাড়ীর দ্বারাই সে জরায়ুতে অবস্থানকালে খাদ্য গ্রহণ করেছে এবং উক্ত ফুল একটি অতিরিক্ত অঙ্গ, যা জাতককে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। ধাত্রী এমনভাবে জাতকের এ নাড়ীচ্ছেদ করে, যাতে ওটা অতিরিক্ত অঙ্গের স্থানে না পৌঁছায় এবং জাতকের পাকস্থলী ও মাতৃজরায়ুর কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। তারপর সে উক্ত নাড়ীর কর্তিত স্থানটিকে সেঁকা দিয়ে অথবা অন্য যেভাবে সে ভাল মনে করে, এর সংক্রমিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে।

www.amarboi.org

অতঃপর এ জাতক, যার হাড় কোমল এবং সহজে বাঁকানো বা ফিরানো সম্ভব, সে একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে বাইরে আসার ফলে অনেক সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি ও তার গড়ন বিকৃত হয়ে যায়। কারণ এগুলো সদ্য সৃষ্ট এবং তখনও কোমল অবস্থায় বিদ্যমান। সুতরাং ধাত্রী নবজাতকের এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মৃদুচাপ ও অন্যবিধ ব্যবস্থা দ্বারা তার স্বাভাবিক গঠনের দিকে ফিরিয়ে আনে, যাতে নবজাতক তার নির্দিষ্ট গড়ন ও আকৃতিসহ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

অতঃপর ধাত্রী প্রসূতির দিকে দৃষ্টি দেয় এবং যথাস্থানে মালিশ ও কোমল চাপ প্রয়োগের দ্বারা তার জরায়ুস্থ ফুল বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। কারণ অনেক সময় ওটা বের হতে কিছুটা দেরি হয়। এর ফলে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, তার বের হওয়ার পূর্বেই জরায়ুর সংকোচন শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। যেহেতু ফুল একটি অতিরিক্ত অঙ্গ, সুতরাং ওটা সেখানে আটকে গেলে পচে উঠবে এবং তার দ্বারা জরায়ু বিষাক্ত হয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ধাত্রী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন কৌশলে ফুলের বিলম্বিত পতনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

এর পর সে নবজাতকের দেহকে তেল ও অন্যবিধ সংকোচক পদার্থের দ্বারা মর্দন করে, যাতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে ওঠে এবং জরায়ুতে অবস্থানকালীন তার গাত্রে লেগে থাকা তরল পদার্থ শুকিয়ে যায়। তারপর সে নবজাতকের চোয়াল ধরে কিঞ্চিৎ চাপ দেয়, যাতে তার তালু উঁচু হয়ে ওঠে; সে তার নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করে, যাতে তার মস্তিষ্কের পথ সুগম হয় এবং তার মুখে তরল পদার্থ দিয়ে তাকে গিলতে সাহায্য করে, যাতে তার পাকস্থলীর বাধা অপসারিত হয়ে তার পার্শ্বদ্বয়ের সম্মিলিত অবস্থার মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ধাত্রী প্রসববেদনার দরুন প্রসূতির যে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দিয়েছে, তার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করে এবং তার জরায়ু থেকে নবজাতকের বিচ্ছিন্নতার ফলে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে চেষ্টা করে। কারণ জাতক যদিও মাতৃজরায়ুর সাথে সংযুক্ত কোন অঙ্গ নয়, তবুও তাতে তার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্ধনের ফলে এর সংযুক্ত অংশেই পরিণত হয়েছিল। সুতরাং তার বিছিন্ন হবার বেদনা অঙ্গ-কর্তনের বেদনার ন্যায়ই তীব্র। এ বেদনার ওষুধ দেয়ার সঙ্গে ধাত্রী জাতকের বহিরাগমনের ফলে চাপে ও ছিন্ন হওয়ার দরুন যোনিদেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তারও চিকিৎসা করে। এসব দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে আমরা ধাত্রীদেরকেই বেশি যোগ্যতার সাথে ওষুধ প্রয়োগ করতে দেখতে পাই। এমনিভাবে নবজাতক তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রম না করা পর্যন্ত যে সব রোগ-শোকের অধীন হয়, তাতেও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা এ ধাত্রীরাই বেশি ফলপ্রসূ ব্যবস্থার অধিকারিণী হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়। এর একমাত্র কারণ দুগ্ধাবস্থা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নবজাতকের দেহজ শক্তি একটা সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এর পরেই সে যথার্থ মানবদেহের অধিকারী হয়। সুতরাং তখন তার দৈহিক বিষয়াদির জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন অত্যধিক দেখা দেয়। এজন্যই পাঠক, আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, উপরোক্ত শিল্প মানব সভ্যতা তথা মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের ব্যক্তিগত আবির্ভাব এর সাহায্য ছাড়া সাধারণত সম্পূর্ণ হয় না।

www.amarboi.org

কখনও কোন কোন ব্যক্তির জন্য এ শিল্পের সাহায্যের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। কখনও এটি আল্লাহ্র তরফ থেকে তাদের জন্য অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে দেখা দেয়; যেমন নবী, রসূলদের বেলায় ঘটে থাকে; আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দান করুন। আবার কখনও সহজাত প্রবৃত্তি ও নির্দেশের দ্বারা এটা সংঘটিত হয়। নবজাত সহজাত তাড়নায় জন্ম-প্রক্রিয়া পার হয়ে আসে এবং এ শিল্প-কৌশলের সাহায্য ছাড়াই তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের ঘটনা বহু ঘটেছে। এর মধ্যে নবী (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সহাস্য বদনে ত্বকচ্ছেদ অবস্থায় ভূমিতে দু হাত স্থাপন করে এবং দৃষ্টি আকাশে তুলে ধরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসাও তাঁর দোলনায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সহজাত প্রবৃত্তির কথাটিও অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাক্হীন প্রাণীরাও অদ্ভুতসব সহজাত তাড়নার অধিকারী; যেমন—মৌমাছি ও অন্যান্য প্রাণী। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির সেরা হবার পরে তার সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে; পাঠক, আপনার কী ধারণা হয়! বিশেষত সে আল্লাহ্র মহিমার দ্বারা বিশিষ্ট।

অতঃপর নবজাতক সকলের মধ্যে মাতৃস্তন্য পানের প্রতি আগ্রহী হবার যে সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়, ওটাই প্রমাণ করে যে, তাদের সকলের জন্যই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুত মহান আল্লাহ্র করুণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি হতে ফারাবী এবং আন্দালুসী দার্শনিকদের মতামতের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। তারা বিভিন্ন জাতির জাতিত্ব ও বস্তুর অস্তিত্ব বিনাশকে অসম্ভব বলে মনে করে। বিশেষ করে মানব জাতির অস্তিত্ব। তারা বলেন, যদি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব হত, তা হলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই থাকত না এবং এ ধাত্রীশিল্পের ওপর তার নির্ভরতা তাকে আরও বেশি করে অস্তিত্বহীনতার দিকে ঠেলে দিত। কারণ আমরা যদিও এ শিল্পের সাহায্য ছাড়া কোন জাতকের অস্তিত্ব ধরেও নিই এবং তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রমের কথা মেনেও নিই, তা হলেও দেখা যাবে তার স্থায়িত্ব আদৌ সম্ভব নয়। অথচ সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম মানব মণীষার ফসল, এর অনুসারী ও অনুগামী।

ইবনে সিনা এ মতের বিরোধী মত পোষণ করেন বলে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনা এবং সৃষ্টিজগতের বিনাশ স্বীকার করেন। তাঁর মতে আকশমণ্ডলের বিশেষ চাহিদা এবং প্রস্তুতির আশ্চর্য গঠন-প্রক্রিয়ায় বহু যুগ পরে পুনরায় সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসা সম্ভব। এর ফলে মাটিতে উপযোগী মিশ্রণের সৃষ্টি হবে এবং সেই অনুপাতে উত্তাপের আবির্ভাব ঘটিয়ে মানুষের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। তারপর তার প্রতিপালনের জন্য কোন প্রাণীর মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি করা হবে এবং সে মানব শিশুকে অপত্যস্নেহে তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রম করে অস্তিত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য সাহায্য করবে। তাঁর এ মত 'হাই ইবনে ইয়াকযান' নামক পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৭] কিন্তু এ যুক্তি-প্রমাণও ভিত্তিহীন। আমরা তাঁর সাথে জাতির অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একমত হতে পারি; তবু তা অনুরূপ যুক্তি-

২৭. অবশ্য 'হাই ইবনে ইয়াকযান' ইবনে সিনার নয়, বরং ইবনে তুফায়েলের রচনা।

www.amarboi.org

প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। কারণ তাঁর প্রমাণের ধারা এক অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণের সাথে যুক্ত। অথচ একজন ইচ্ছাময় কর্তার অস্তিত্বের ধারণা এ মতকে খণ্ডন করে এবং ইচ্ছাময় কর্তার ধারণা অনুসারে অনাদি মহিমা ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যমের কারণ নেই। সুতরাং এমন কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন কী!

তদুপরি তর্কের খাতিরে যদি একে মেনেও নেয়া যায়, তাহলে এ যুক্তি-প্রমাণের চরম পর্যায় হল এই ব্যক্তিপর্যায়ে সৃষ্ট মানবের অস্তিত্বকে মূকপ্রাণীর সহজাত প্রতিপালন প্রবৃত্তির ওপর ন্যাস্ত করা মাত্র। এরূপ করার প্রয়োজন কী? মূকপ্রাণীর মধ্যে যদি সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে জাতকের মধ্যে এর সৃষ্টি হতে বাধা কোথায়! যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কোন প্রাণীবিশেষের মধ্যে নিজের উপকার সাধনের জন্য প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি করা অপরের উপকার সাধনের প্রবৃত্তি অপেক্ষা বেশি সম্ভাবনাময়। সুতরা; পাঠক, উপরোক্ত দুটি মত-ই তাদের বিশেষ যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে নিজেদের অসারতা প্রতিপন্ন করছে, আমরা এ বক্তব্যই আপনার সামনে তুলে ধরেছি। মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানের আধার।

www.amarboi.org

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[চিকিৎসা এবং এর প্রয়োজনীয়তা প্রান্তরীয় জীবন অপেক্ষা শহর-নগরে সর্বাধিক]

এ শিল্পটি শহর নগরের জীবনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এর উপযোগিতার দিক এভাবেই সর্বত্র পরিচিত। বস্তুত এর ফলশ্রুতি হল স্বাস্থ্যবানদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা এবং রুগ্নদের রোগ ওষুধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত করা; যাতে সকলেই নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে।

জেনে রাখুন, সব রোগের মূল উৎস হল খাদ্যদ্রব্য। যেমন হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর এক বাণীতে বলেছেন। ওটা চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি পূর্ণ বিধান এবং সেই অনুপাতে উক্ত শিল্পের অধিকারীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। যদিও জ্ঞানীরা এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তা এই যে, তিনি বলেছেন, পাকস্থলী হল রোগের গৃহ; সংযম সব ওষুধের মূল এবং বেশি আহার সব রোগের উৎস। তাঁর বক্তব্য—পাকস্থলী সব রোগের গৃহ; এর কারণ সুস্পষ্ট। তাঁর বাণী, সংযম সব ওষুধের মূল; এক্ষেত্রে সংযম অর্থ ক্ষুধা অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণে সংযম হওয়া। এর অর্থ এই যে, ক্ষুধা এমন এক মহৌষধি যা সব ওষুধের মূল। তাঁর উক্তি, বেশি আহার সব রোগের উৎস; এর অর্থ খাদ্যের ওপর খাদ্য গ্রহণ এবং পাকস্থলী পূর্বের খাদ্য জীর্ণ করার পূর্বেই তার ওপর অন্য আহার্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়া।

এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকে আহার্যের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। সে তা গ্রহণ করে এবং এর মধ্যকার পরিপাকশক্তি একে পরিপাক করে দেহের অংশ হিসেবে রক্ত ও অস্থির উপযোগী তরল পদার্থে রূপান্তরিত করে দেয়। পুনরায় এর অন্তর্গত বৃদ্ধি শক্তি এ তরল পদার্থকে মাংস ও হাড়ে পরিণত করে। পরিপাক করার অর্থ দেহের তাপে পর্যায়ক্রমে খাদ্যদ্রব্যকে সিদ্ধ করে দেহের অংশে পরিণত করা। এর ব্যাখ্যা এই যে, খাদ্য যখন মুখে প্রবেশ করে এবং দাঁতগুলো তাকে চর্বণ করে, তখন মুখের তাপে তার মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে এর মিশ্রণের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয়। যেমন, পাঠক আপনি লক্ষ করতে পারেন যে, যে খাদ্য আপনি গ্রাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা যদি চিবিয়ে পুনরায় বাইরে আনেন, তা হলে এতে খাদ্য গ্রহণকালীন মিশ্রণ অপেক্ষা ভিন্নতর মিশ্রণ দেখা যাবে। তারপর পাকস্থলীতে উক্ত খাদ্য পৌঁছলে এর তাপ খাদ্যকে পরিপাক করে তরল পদার্থে পরিণত করে এবং ওটা বস্তুত পরিপাককৃত

www.amarboi.org

আহার্যের নির্যাস। এর পর এ নির্যাস যকৃতের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং পাকস্থলীতে অবশিষ্ট ভারী পদার্থকে নিম্নের দুটি বহির্পথের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর যকৃত এ তরল পদার্থকে স্বীয় তাপে জারিত করে বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত করে। এরূপ পরিপাকের সময় তরল পদার্থের ওপরে যে ফেনার মত বস্তু ভেসে বেড়ায় ওটাই হলুদ পিণ্ড এবং এর মধ্যে কিছু অংশ শুষ্ক হয়ে জমে যায়, ওটাই ঘন আকারে কফ হয়ে অবস্থান করে। এর পর যকৃত সমস্ত রক্তকে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে। সেখানে তা পুনরায় দৈহিক তাপে পরিপাক হয়। এ পরিপাকের সময় বিশুদ্ধ রক্ত থেকে এক প্রকার আর্দ্র-উষ্ণ বাষ্পের জন্ম হয়, যা জীবাত্মার শক্তি বর্ধন করে। এ বর্ধনশক্তি ক্রিয়াশীল হলে রক্ত মাংসে পরিণত হয় এবং তার ঘন অংশ অস্থি গঠন করে। তারপর দেহ এ পরিপাক ক্রিয়াতে যা অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাকে বিভিন্ন ধরনের পরিত্যাজ্য পদার্থে যেমন ঘাম, থুথু, তরল শ্লেষ্মা ও অশ্রুতে পরিণত করে। এটাই আহার্যের শক্তি থেকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে মাংসে পরিণত হবার রূপরেখা।

অতঃপর সব রোগের উৎস এবং অধিকাংশ রোগের স্বরূপ হল জ্বর। এর কারণ এই যে, দেহের উত্তাপ অনেক সময় উপরোক্ত প্রতিটি পর্যায় পরিপাক-ক্রিয়ার যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, এর কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং উক্ত খাদ্যবস্তু অজীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করে। এর কারণ সম্ভবত পাকস্থলীতে বেশি খাদ্যের উপস্থিতি, যা এর স্বাভাবিক তাপকে পরাস্ত করে। অথবা পাকস্থলীতে পূর্বের খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আরও খাদ্য গ্রহণ। এর ফলে হয় পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপ পূর্বের অজীর্ণ খাদ্যকে ত্যাগ করে নতুন খাদ্য পরিপাক করতে শুরু করে; নয়ত তাদের উভয়কেই একসঙ্গে পরিপাক করতে গিয়ে সে অক্ষম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পাকস্থলী এ অজীর্ণ খাদ্যরসকেই যকৃতে প্রেরণ করে; কিন্তু যকৃতের উত্তাপও তাকে পরিপাক করতে সমর্থ হয় না। অনেক সময় অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আগত অজীর্ণ রসের কতকাংশ পূর্ব থেকেই যকৃতে বিদ্যমান থাকে। কাজেই যকৃতের পক্ষে এর সবগুলোকে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ পরিস্থিতিতে দেহ সক্ষম হলে তার প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে শিরাবাহিত এ রক্তের অতিরিক্ত অংশকে ঘাম, অশ্রু ও থুথুর আকারে বের করে দেয়। অনেক সময় অক্ষমতার ফলে এর অধিকাংশই শিরা, যকৃত ও পাকস্থলীতে অবস্থান করে এবং কালক্রমে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি মিশ্রিত তরল পদার্থ পরিপাক ও জীর্ণ না হলে, এতে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। ফলে উক্ত অজীর্ণ খাদ্যও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে এবং তাকেই 'খিলত' বা বদরক্ত বলা হয়। বস্তুত প্রতিটি দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থই এক অদ্ভুত উত্তাপের জন্ম দেয়। মানুষের দেহে অনুরূপভাবে উৎপন্ন উত্তাপকেই জ্বর বলা হয়ে থাকে।

পাঠক, পরিত্যক্ত খাদ্রসামগ্রী পঁচে যাওয়া এবং বিষ্ঠার দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠার সাথে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। কীভাবে এগুলোতে উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে তার প্রস্তুতি অনুসারে অগ্রসর হয়ে যায়। দেহের মধ্যে জ্বরের ব্যাপারটিও অনুরূপভাবেই সংঘটিত হয় এবং ওটাই সব রোগের মূল ও উৎস, যেমন হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এসব জ্বরের ওষুধ হল নির্দিষ্ট কয়েক সপ্তাহ রোগীকে আহার গ্রহণে বিরত রাখা। তারপর তাকে নরম খাদ্য দেয়া যাতে তার আরোগ্য অবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে সুস্থ দেহকেও এসব রোগ ও অন্যবিধ সংক্রমণ হতে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং তার উৎসও উক্ত হাদীসটিতে রয়েছে।

কখনও অনুরূপ পচনক্রিয়া অঙ্গবিশেষে দেখা দেয় এবং এর ফলে উক্ত অঙ্গটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিংবা দেহের কোন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, হয় প্রধান অঙ্গগুলোতে, নয়ত অন্যত্র কোথাও। কখনও কোন অঙ্গ এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয় যে, উক্ত অঙ্গের চলনশক্তি রহিত হয়ে যায়। এগুলো থেকেই সব রোগের উৎপত্তি হয় এবং তার মূল উৎস সাধারণভাবে খাদ্যদ্রব্য। সব বিষয়েই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

এসব রোগ শহর-নগরের জনসমাজেই বেশি দেখা যায়। এর কারণ তাদের জীবনের সচ্ছলতা। তারা বেশি খাদ্য গ্রহণ করে, খাদ্যসামগ্রীর কোন বিশেষ একটি প্রকারেই তারা সন্তুষ্ট নয় এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে তারা বাছ-বিচারের প্রয়োজনবোধ করে না। তারা রন্ধন প্রক্রিয়ার দ্বারা বহু খাদ্যসামগ্রী, যেমন—বিচিত্র মসলা, শাক-সব্জি এবং শুষ্ক ও কাঁচা ফল-মূল একত্রে মিশ্রিত করে। তদুপরি তারা কোন এক প্রকার বা কতক প্রকারেও সন্তুষ্ট হতে চায় না। অনেক সময় আমরা এক প্রকার খাদ্যেই চল্লিশ প্রকার সব্জি ও মাংসের মিশ্রণ লক্ষ করেছি। এর ফলে খাদ্য সামগ্রীতে এক অদ্ভুত মিশ্রণের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এগুলো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য উপাদেয় বলেও প্রমাণিত হয় না।

এছাড়া শহর-নগরের আবহাওয়া অতিরিক্ত আবর্জনাজাত বিচিত্র দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্পের মিশ্রণে দূষিত হয়ে ওঠে। বস্তুত বায়ু আত্মশক্তিকে সতেজ করে এবং এ সতেজভাবের দরুন তার পরিপাকশক্তির উপযোগী স্বাভাবিক তাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তদুপরি শহরবাসীদের মধ্যে ব্যায়ামের অভ্যাস নেই বললেই চলে। কারণ তারা সাধারণভাবে শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকে; কোন প্রকার পরিশ্রমের কাজ তাদেরকে করতে হয় না এবং এর কোন প্রভাবও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত অনুরূপ অবস্থা নেই; সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক প্রতিটি বর্ণের বিচিত্র নিয়মকানুন বর্ণনা করে শিক্ষা দেন না; বরং সেখানে শব্দগুলোর আদল উপস্থিত করার মত লিপি-চাতুর্য শিক্ষা দেয়া হয়। যাতে শিক্ষার্থী শব্দাবলি শেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং তার আঙুল এর উপযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষা লাভের পর তাকে বলা হয় 'উত্তম' লিপিকর।

আরবিলিপি তুব্বা সাম্রাজ্যের সময় চরম বিকাশ লাভ করেছিল। এতে দৃঢ়তা সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়ে তৎকালীন নাগরিক জীবনের বিলাস-ব্যসনের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। একে হিমিয়ারি লিপি বলা হত। তারপর এটি আল-মুনজিরের বংশাবলির স্থাপিত রাজধানী হিরায় স্থানান্তরিত হয়। তারা তুব্বা রাজন্যবর্গের বংশ সম্পর্কের দাবিতে এ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইরাক ভূমিতে আরবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তারাই এ লিপির উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু এ দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকায় লিপির ব্যবহার তাদের কাছে তুব্বা-রাজাদের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। এ কারণে নাগরিকত্ব ও তার অনুসারী অন্যান্য শিল্পকর্মেও তারা পূর্বানুরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়নি। হিরা থেকে তায়েফবাসী ও কোরায়েশরা এ লিপির

www.amarboi.org

শিক্ষা গ্রহণ করে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে, যিনি হিরা থেকে এ লিপির শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার নাম সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া। বলা হয়, তার নাম হরব ইবনে উমাইয়া। তিনি ওটা আসলাম ইবনে সদরার কাছে থেকে শিখেছিলেন। এ মত সম্ভাব্য সত্যে বাস্তব এবং তাদের সেই মত অপেক্ষা নিকটবর্তী, যারা বলেন যে, তারা এটা ইরাকবাসী ইয়াদদের কাছে থেকে শিক্ষা করেছিলেন। ইয়াদীদের এক কবি বলেন—

তারাই সেই জাতি, যাদের অধীনে ইরাকের প্রাঙ্গণ বিদ্যমান, যখন
তারা একত্রে ভ্রমণ করে; কলম ও লিপিও তাদের আয়ত্তাধীন।

এ ধারণা একান্তই অসম্ভব। কারণ ইয়াদরা যদিও ইরাকের ভূমি অধিকার করেছিল, তবুও তারা সর্বদা যাযাবরী জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। অথচ লিপি-শিল্প নিশ্চিতভাবে নাগরিক জীবনের শিল্পকলা। কবির এ উক্তির একমাত্র অর্থ এটাই যে, তারা অন্যান্য আরব বেদুইনদের অপেক্ষা লিপি ও কলমের বেশি নিকটবর্তী ছিল। কারণ তারা শহর-নগর ও এর সন্নিহিত অঞ্চলগুলোর সাথে জড়িত ছিল। অন্যদিকে যে মতানুসারে বলা হয় যে, হেজাজবাসীরা এ শিল্পকে হিরা থেকে এবং হিরাবাসীরা তুব্বা রাজন্যবর্গের কাছে থেকে শিক্ষা করেছিল, তা সব মতের মধ্যে অধিকতম সাজুয্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

আমি ইবনে আব্বারের 'তাকমেরা' গ্রন্থে ইবনে ফর্‌রুখ আল কায়রোয়ানী আল কাসী আল আন্দালুসীর[২৯] প্রশংসায় দেখেছি। ইনি ইমাম মালেকের সহচর ছিলেন এবং তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে ফর্‌রুখ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম।[৩০] ইনি তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বললাম, হে কোরায়েশ বংশীয়রা! আমাকে এ আরবি লিপি সম্পর্কে সংবাদ দাও। তোমরা কি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এ লিপি ব্যবহার করতে? এর যা একত্র করে লেখার, তা একত্র করে লিখতে এবং যা পৃথক করে লেখার, তা পৃথক করে লিখতে? যেমন আলিফ, লাম, মিম, নুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, তোমরা কার কাছে থেকে ওটা গ্রহণ করেছিলে? তিনি বললেন, হরব ইবনে উমাইয়ার কাছে থেকে। বললাম, হরব কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে জদআনের কাছ থেকে। বললাম, আবদুল্লাহ্ ইবনে জদআন কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, আনবারবাসীদের কাছে থেকে। বললাম, আনবারবাসীরা কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, তাদের মধ্যে এক ইয়ামেনবাসী নবাগতের কাছে থেকে। বললাম, সেই নবাগত কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, খলজান ইবনে কাসেমের কাছে থেকে; যিনি হুদ নবীর ওহী লিখে রাখতেন এবং তিনি বলতেন,

তোমরা কি প্রতি বছর একটি করে প্রথার জন্য দান কর
এবং একটি মত, যা বিভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়?
সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল, যার জন্য গালি দেয়
জুরহুম; যাদেরকে তাদের গালি দিতে পারে এবং হিময়ার।

২৯. জীবনকাল, ১১৫-১৭৫ (৭৩৪-৭৯২ খ্রিঃ) হিঃ।
৩০. জীবনকাল, ৭৪/৭৫-১৫৬/১৬১ (৬৯৩/৯৫-৭৭২/৭৮ খ্রিঃ) হিঃ।

www.amarboi.org

ইবনে আব্বারের 'তাকামেলা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানেই শেষ। তার শেষের দিকে তিনি আরও বলেছেন। এ বক্তব্যগুলো আমার কাছে আবু বকর ইবনে আবু হুমায়রা, আবু বাহর ইবনেল আস,[৩১] আবুল ওলীদ ওয়াক্‌শী,[৩২] আবু উমর তিলমেনাকী,[৩৩] ইবনে আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মুফরেহের প্রভৃতি পরম্পরায় বর্ণিত গ্রন্থে এবং তাঁর হস্তাক্ষরে যথাক্রমে আবু সাইদ ইবনে ইউনুস,[৩৪] মুহম্মদ ইবনে মুসা হয় না। সুতরাং শহর-নগরে রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাবের অনুপাতেই তারা এ চিকিৎসাশিল্পের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রান্তরবাসীদের কথা বলতে গেলে, তাদের খাদ্য সাধারণভাবে স্বল্প। শস্যের অভাবে তাদের ওপর ক্ষুধারই প্রাধান্য বিরাজমান, এমন কি ওটাই তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। অনেক সময় এ অভ্যাসের স্থায়িত্ব দেখে মনে হয়, ওটা যেন তাদের সহজাত প্রকৃতি। এর পর মসলাপাতি তাদের কাছে অতি সামান্য অথবা নেই বললেই হয়। বিচিত্র মসলা ও ফল-মূল দিয়ে রন্ধনের প্রক্রিয়া নাগরিক জীবনের বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত; তারা অনুরূপ বিলাসের ধারে-কাছেও অবস্থান করে না। সুতরাং তারা তাদের খাদ্য সামগ্রীকে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করে এবং যা দিয়ে তার মধ্যে মিশ্রণের সৃষ্টি হতে পারে, তা থেকে দূরে থাকে। দেহের পক্ষে তাদের এ খাদ্য খুবই সহজপাচ্য হয়ে দেখা দেয়। তাদের পরিবেশের আবহাওয়াও দূষিত হয় না। তারা স্থায়ী বাসিন্দা হলেও অনধিক দূষিত পদার্থ ও দুর্গন্ধের জন্য এবং যাযাবরী বৃত্তিতে অভ্যস্ত হলে বিচিত্র বায়ুর স্পর্শে তারা মুক্ত পরিবেশে বাস করে।

ব্যায়াম বলতে যা বোঝায় তা চূড়ান্তভাবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের অশ্বারোহণ, শিকার করা, কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে অগ্রসর হওয়া বা নিজের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করার মধ্যে এর প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং এসব কাজে তাদের পরিপাকশক্তি সতেজ ও সুস্থ থাকে এবং এক খাদ্যের ওপরে অন্য খাদ্য গ্রহণের কোন সুযোগই তারা পায় না। কাজেই তাদের দৈহিক গড়ন বেশি সুস্থ এবং তারা রোগাক্রান্ত হওয়ার কবল থেকে দূরে থাকে। এজন্যই তারা চিকিৎসাশিল্পের খুব একটা প্রয়োজন অনুভব করে না। সম্ভবত এ কারণেই আমরা প্রান্তরীয় জীবনে কোন চিকিৎসককে দেখতে পাই না। তাদের প্রয়োজন নেই বলেই এরূপ হয়েছে। নয়তো তাদের প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই দেখা যেত। কারণ তাদের প্রয়োজন চিকিৎসকের জন্য জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হত এবং তিনি সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হতেন। এটাই আল্লাহর প্রথা যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং তোমরা তাঁর প্রথার মধ্যে কখনই কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে না।[২৮]

৩১. সুফিয়ান, ৪৪০-৫২০ (১০৪৯-১১২৬ খ্রিঃ) হিঃ।
৩২. হিশাম ইবনে আহমদ, মৃত্যু ৪৮৯ (১০৯৬ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৩. আহমদ ইবনে মহম্মদ, ৩৪০-৪২৯ (৯৫২-১০৬৮) হিঃ।
৩৪. বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস, ২৮১-৩৪৭ (৮৯৫-৯৫৮ খ্রিঃ) হিঃ।
২৮. কোরান, ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ৪৮, ২৩।

www.amarboi.org

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[লিপিকর্ম ও গ্রন্থাদি রচনাও মানবিক শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত]

এটা কতগুলো রেখা ও বর্ণপ্রতীক, যা মনোভাবের শ্রুত শব্দাবলিকে বুঝিয়ে থাকে। আভিধানিক ব্যঞ্জনায় এটা দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। কারণ রচনা এমন মহান শিল্পকর্ম, যা দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য পশুর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা মানুষের অন্তরস্থিত মানোভাবকে প্রকাশ করে এবং ওটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যাবলিকে দূরদূরান্তে প্রচারিত করে। এর ফলে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হয় এবং সাক্ষাৎ দর্শনের কষ্ট দূরীভূত হয়। এটা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাদির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বকথার সংবাদ দেয় এবং তাঁরা যা কিছু জ্ঞান ইতিহাসের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার সংবাদ এনে পৌঁছায়। এসব কারণ ও উপকারিতার জন্যই এটা একটি মহান শিল্পকর্ম।

এ শিল্পকর্মের সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। জনবসতি ও সভ্যতার ক্রমানুপাতে তাদের পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্রের ঔৎসুক্য ও চাহিদায় এটা বিকশিত হয়। এজন্যই নগরজীবনে লিপির সৌন্দর্য বেশি বিকশিত হয়ে থাকে; কেননা এটাও তার সামগ্রিক শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ শিল্পকর্মই নগরজীবনের স্বরূপ এবং ওটাই এর জনসমাজের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এ কারণেই আমরা অধিকাংশ প্রান্তরবাসীকে দেখতে পাই, তারা লিখতে ও পড়তে জানে না। তাদের মধ্যে যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের লিপি ও পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। যে সব নগরী জনসংখ্যায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্যে লিপি-পদ্ধতির অতিশয় সুন্দর ও চরম বিকাশ লক্ষ করে থাকি। এটি শিল্পকর্ম হিসেবে অনুসৃত হবার ফলেই তাদের কাছে সহজ হয়ে উঠেছে। যেমন বর্তমানকালে মিশরের কথা আমরা শুনতে পাই। সেখানে শিক্ষকগণ লিপি-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তাঁরা প্রতিটি বর্ণের আকৃতি সম্পর্কে নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তদুপরি তাঁরা তা লেখার ব্যাপারে হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করেন। এর ফলে তাঁদের কাছে শিক্ষার মর্যাদা বেড়েছে এবং শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ঔৎসুক্য দেখা গেছে। সুতরাং তাঁদের ব্যবস্থায় এর শক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে।

এর অনুরূপ শিল্পকর্ম ও তার প্রাচুর্য দেখা দেবার পশ্চাতে জনবসতির আধিক্য এবং শ্রমের ব্যাপক বিন্যাস বিদ্যমান। আন্দালুস ও মাগরিবে লিপি-শিল্পের ইবনে নুমান, ইয়াহিয়া ইবনে মুহম্মদ ইবনে হাশিশ ইবনে উমর ইবনে আইউ- আল মাগাফেরী

www.amarboi.org

তিউনিসী, বাহলুল ইবনে উবাইদা আল হামী, আবদুল্লাহ্ ইবনে ফররুখ থেকে বর্ণিত অবস্থায় উপস্থিত করেছেন। শেষ।

হিমিয়ারদের বিশিষ্ট একটি লিপি ছিল, একে 'মুসনাদ' বলা হত। এর বর্ণগুলো ছিল পৃথক পৃথক এবং তারা এটা তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকেই লিখতে দিত না। হিমিয়ারদের কাছ থেকেই মুজার আরবি লিপির শিক্ষা গ্রহণ করে; কিন্তু প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্যের জন্য তারা এতে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়নি। এ কারণেই তাদের লিপিতে শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকাশ দেখা যায় না। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা কোন দৃঢ় ভিত্তির সৃষ্টি করতে পারে নি এবং এতে স্থিরতা ও সৌন্দর্যের পরিচয়ও প্রস্ফুটিত হয়নি। কারণ প্রান্তরীয় জীবনবোধের সাথে শিল্পচর্চার অসঙ্গতি এবং তার প্রতি সাধারণ চাহিদার অভাব বিদ্যমান। এজন্যই আরবের লিপিচর্চা প্রান্তরীয় জীবনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বলতে গেলে তা বর্তমানকালে তাদের লিপিশিল্প বা তার নিকটবর্তী কোন এক পর্যায়ে ছিল। বরং যথার্থভাবে বলতে গেলে বর্তমানকালে তাদের লিপিশিল্প হিসেবে বেশি উৎকর্ষের দাবিদার। কারণ তারা অধিকতরভাবে নাগরিক জীবনের সন্নিহিত এবং বিভিন্ন নগর ও সাম্রাজ্যের সংশ্রবে এসেছে।

কিন্তু মুজারের প্রান্তরীয় জীবনধারা ইয়ামেনবাসী, ইরাকবাসী, সিরিয়াবাসী ও মিশরবাসীদের অপেক্ষা বেশি গভীর এবং নাগরিকত্ব হতে দূরতর পর্যায়ে অবস্থিত ছিল। এ কারণে ইসলামের প্রথম দিকে আরবিলিপি স্থায়িত্ব, স্থিরতা ও উৎকর্ষের কোন চরম পর্যায়েই উপনীত হতে পারেনি; এমন কি তা মধ্যম স্তরেও অবস্থান করেনি। এর একমাত্র কারণ আরব-বেদুইনদের প্রান্তরীয় জীবন ও বন্যতা এবং শিল্পকলা সম্পর্কে স্বাভাবিক উদাসীনতা।

পাঠক, এ কারণে সাহাবীদের দ্বারা লিপিকৃত কোরানে তাদের হস্তাক্ষর যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতি লক্ষ করুন। তা উৎকর্ষের দিক থেকে মোটেই সুবিন্যস্ত ছিল না। সুতরাং লিপিশিল্পের বিশেষজ্ঞরা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পোচিত বর্ণাদির রেখাবিন্যাসের অভাবের বিরোধিতা করেছেন। তারপর পূর্বসূরি তাবেয়ীগণ হযরত মুহম্মদ (স)-এর সহচরবৃন্দ যে হস্তাক্ষরে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন, তাকে পুণ্যের নিদর্শন হিসেবে অনুসরণ করেছেন। কারণ সাহাবীরা তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র গ্রন্থ সম্পর্কীয় ওহী ও বক্তব্যের প্রথম শ্রোতা ছিলেন। যেমন বর্তমানকালে অনেকেই কোন ধর্মগুরু বা বিজ্ঞ আলেমের হস্তাক্ষর পুণ্যার্থে অনুসরণ করে; ওটা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়াতে এক্ষেত্রে কোন ইতর-বিশেষ হয় না। কিন্তু এর সাথে কি সাহাবীদের হস্তাক্ষরের প্রতি অনুরূপ ব্যবহারের তুলনা করা যায়? অথচ কার্যত তাই হয়েছে এবং তা অনুসৃত হয়ে একটি লিপিধারার সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা যথাস্থানে এ ব্যাপারে যথার্থ লিপিবিন্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পাঠক, এখানে কখনই সেসব উদাসীন লোকের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, যারা বলে যে, সাহাবীরা লিপিশিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। লিপিশিল্পের মৌল রেখাবিন্যাসের সাথে তাঁদের হস্তাক্ষরের অসামঞ্জস্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়; তা ঠিক নয়; বরং তার প্রতিটি ব্যতিক্রমেই কার্যকারণ বিদ্যমান। এ কারণেই তারা

www.amarboi.org

বলে, যেমন 'লাআযবাহান্নাহু'৩৫ (আমি তাকে অবশ্য জবাই করে ফেলব) বাক্যের প্রথমে 'লা' শব্দে যে অতিরিক্ত 'আলেফ'টি সংযোজিত রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যে, ক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হয়নি। অনুরূপভাবে 'বে আয়দি' (তাঁর হাতে) বাক্যাংশের মধ্যে একটি অতিরিক্ত 'ইয়া' সংযোজনের উদ্দেশ্য হল ঐশী শক্তির পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত করা। এমন আরও উদাহরণ বিদ্যমান। বস্তুত এগুলো সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আপ্তবাক্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ ধারণাই তাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এর মাধ্যমে তারা সাহাবীদেরকে তাঁদের হস্তাক্ষরজনিত ত্রুটির অক্ষমতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এ সঙ্গে তারা হস্তাক্ষরের ত্রুটিহীনতাকেও একটি মহৎ গুণ বলে ধারণা করেছে। সুতরাং তারা সাহাবীদেরকে উক্ত ত্রুটি থেকে মুক্তি দিতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং তাঁদের প্রতি হস্তাক্ষরের উৎকর্ষের অধিকার আরোপ করেছে। তাঁদের হস্তাক্ষর যে যে স্থানে উৎকর্ষের বিরোধী হয়েছে, সে জন্য কার্যকারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন অথচ এটি আদৌ ঠিক নয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, হস্তাক্ষর তাঁদের জন্য কোন বিশেষ গুণ নয়। কারণ এটা নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গী সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের অন্তর্গত একটি শিল্পমাত্র; যেমন আপনি ইতিপূর্বে তার বিবরণ অবগত হয়েছেন। বস্তুত শিল্পকর্মে নৈপুণ্য সর্বদাই আপেক্ষিক। কোন সময়েই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন বিষয় নয়। এজন্যই এর ত্রুটি কোন প্রকারের ধর্ম ও চরিত্রের ত্রুটি বলে পরিগণিত হতে পারে না। বরং এই ত্রুটি জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং এ পর্যায়ে সভ্যতা ও তা দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশে এর ব্যবহার দ্বারা এর অবস্থা স্থিরীকৃত হবে।

হযরত মুহম্মদ (স) নিরক্ষর ছিলেন। এটা তাঁর জন্য একটি মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ তাঁর মর্যাদার স্বরূপ ভিন্ন। তিনি সভ্যতা ও জীবিকার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার শ্রমনির্ভর শিল্পকলা থেকে মুক্ত এবং তার উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু নিরক্ষরতা আমাদের জন্য কোন মহৎ গুণ নয়। কারণ তিনি যে ক্ষেত্রে সর্বত্যাগী হয়ে তাঁর প্রভুর নৈকট্যপ্রয়াসী, সেক্ষেত্রে আমরা এ সবাইকে আঁকড়ে ধরে জীবন-যাপনে তৎপর। সব শিল্পকলারই এ অবস্থা; এমন কি পরিভাষাসর্বস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁর জন্য এসব সাংসারিক উপকরণ থেকে মুক্তিই একটি মহৎ গুণ; কিন্তু আমাদের অবস্থা তদ্রূপ নয়।

অতঃপর যখন আরবদের মধ্যে রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটল তখন তারা বহু নগর অধিকার করল এবং বিভিন্ন দেশের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। তারা কুফা ও বসরায় এসে নাগরিক হয়ে বসল। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রচনাশক্তি ব্যবহারের উপলক্ষ আসল এবং লিপির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠল। তারা এর শিল্প-নৈপুণ্যকে অনুসন্ধান করে শিখে নিলে এবং তার ব্যবহারে পারদর্শী হতে লাগল। এর ফলে লিপিশিল্পে উৎকর্ষের ভাব দেখা দিল এবং তা স্থায়ী হয়ে উঠল। কুফা ও বসরায় চর্চা একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছলেও তা চরম পর্যায় নয়। তবুও কুফার লিপি বর্তমান যুগে একটি সুপরিচিত বর্ণবিন্যাস প্রণালী।

৩৫. এটি ও এর পরবর্তী বাক্যাংশটি যথাক্রমে কোরান, ২৭, ২১ এবং ১৫, ৪৭ হতে উদ্ধৃত।

www.amarboi.org

অতঃপর আরবরা দিকে দিকে ও দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তারা আফ্রিকিয়া ও আন্দালুস জয় করল। বনি আব্বাস বাগদাদের ভিত্তি স্থাপন করে তাতে লিপিশিল্পের চরম বিকাশ ঘটাল। কারণ তাতে জনবসতির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল এবং এসঙ্গে তা ইসলাম ও আরবি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাগদাদী লিপির ধারা অনেকাংশে কুফী লিপিকে অতিক্রম করে বেড়ে উঠল। অবশ্য উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও শোভন প্রকাশের ধারা অনুসরণ করেই এ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন শহর-নগরে এ বিরোধিতার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্থায়ী রূপ ধারণ করল। এ অবস্থায় বাগদাদে উক্ত লিপির ধরন উজির আলী ইবনে মুকলা[৩৬] দৃঢ় হস্তে ধারণ করলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করলেন 'ইবনে বাওয়াব' নামে পরিচিত বিখ্যাত লেখক আলী ইবনে হেলাল[৩৭]। তাঁরই ধারায় তৃতীয় শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে লিপিশিল্পে শিক্ষাদানের ব্যাপারে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছল। এস্থানে বাগদাদী লিপি গড়ন ও বিন্যাস রীতিতে কুফী লিপি থেকে অনেক দূরে সরে গেল; ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

এর পরও পার্থক্যের ধারা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যুগ পরম্পরায় গৃহীত বিভিন্ন বিন্যাস ও গঠনের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ওটা এসে ইয়াকুত[৩৮] ও আলওলী আলী আজমীর[৩৯] ন্যায় উত্তরসূরিদের কাছে শেষ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাঁদের অনুসৃত ধারাই একটা পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

অতঃপর এটা মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে কতকাংশে ইরাকি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং অনারবরা এ শিল্পকে মিশরেই পরিবর্ধিত করে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং মিশরি লিপির জন্য পার্থক্যের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আফ্রিকি লিপি তার প্রাচীন রেখাবিন্যাসের ধারা অব্যাহত রাখার ফলে বর্তমানে পূর্বাঞ্চলীয় গঠন-সৌকর্যের খুব নিকটবর্তী রয়ে গেছে। আন্দালুসের রাজশক্তি উমাইয়াদের দ্বারা পৃথক হয়ে গড়ে ওঠার ফলে তারা নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতি শিল্পকলা ও লিপিতে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানকালে সে পার্থক্যই আন্দালুসী রীতি হিসেবে সুপরিচিত হয়ে রয়েছে।

এভাবে বিভিন্ন দিকে ইসলামী সাম্রজ্যগুলোতে সভ্যতার বান ডেকেছিল এবং এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত ও তাদের বাজার তেজী ভাব ধারণ করেছিল। এর ফলে গ্রন্থ রচনার ধারা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি ও তাদের গ্রন্থনশিল্পে সৌষ্ঠবের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলোর দ্বারা প্রাসাদ ও রাজকীয় আগার এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যার তুলনা সম্ভব নয়। দিকে দিকে মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতাও এক্ষেত্রে দর্শনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

অতঃপর ইসলামী সম্রাজ্যের বিন্যাস শিথিল হয়ে এলে তার শক্তির হ্রাস প্রাপ্তির সাথে এ সব বিষয়ই সংকুচিত হয়ে পড়ল। বাগদাদের খেলাফতের পতনে সেখানকার

---

৩৬. মুহম্মদ ইবনে আলী; ২৭২-৩২৮ (৮৮৬-৯৪০ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৭. মৃত্যু ৪১৩ (১০২২ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৮. আল মুস্তাসিমী; মৃত্যু ৬৯৮ (১২৯৯ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৯. প্রকৃত নাম আবুল হাসান আলী ইবনে জেদ্দী।

www.amarboi.org

শিক্ষাগারগুলো উজাড় হয়ে উঠল এবং লিপি ও রচনার বিদ্যা; বরং বলতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ধারা মিশর ও কায়রোতে স্থানান্তরিত হল। বর্তমানকালেও সেখানে তাদের বাজার সরগরম দেখতে পাচ্ছি। লিপি সংক্রান্ত বিষয়ে যেখানে এমন শিক্ষক আছেন, যারা শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিটি বর্ণের রেখাবিন্যাস ও গঠনসহ হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের গড়নও তাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে তাদের গড়নসহ রেখাবিন্যাস শিখে নিতে খুব বেগ পেতে হয় না। তারা তাদের সৌন্দর্য, বিচিত্র ভঙ্গি ও লিখন পদ্ধতিসহ অতিসত্বর দক্ষতা অর্জন করে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত হয়। এভাবে সেখানে শিক্ষার একটি উত্তম ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

আন্দালুসবাসীরা আরবি সাম্রাজ্যের পতন এবং তার পরবর্তী বারবারদের আধিপত্য শিথিল হয়ে পড়ায় নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষভাবে তাদের ওপর খ্রিস্টান জাতিগুলোর আধিপত্য বিস্তৃত হলে তারা মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সমুদ্র তীরে চলে আসে। লামতুনা সাম্রাজ্যের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং তারাও বিভিন্ন সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে এই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর ফলে তাদের লিপি আফ্রিকিয়ার লিপির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কায়রোয়ান ও মাহদিয়া নগরের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিস্তৃতির সঙ্গে তাদের লিপিও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। সুতরাং তিউনিসকে কেন্দ্র করে এর সন্নিহিত সব আফ্রিকিয়ায় আন্দালুসী-লিপিই প্রাধান্য বিস্তার করল। কারণ পূর্ব-আন্দালুস হতে নির্বাসিত জনসমষ্টির অধিকাংশই এসব অঞ্চলে বসবাস করছিল। তাদের প্রাচুর্যই এ প্রভাবকে অনিবার্য করে তুলল। শুধু জারিদ অঞ্চলে একটি নিজস্ব রীতি বর্তমান ছিল। কারণ তারা আন্দালুসী লিপিকরদের সাথে মিলিত হয়নি এবং তাদের সাহচর্যের প্রভাব গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। কেননা তারা দলে দলে রাজধানী তিউনিসকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসত এবং সেখানেই বসবাস করত।

এভাবে আফ্রিকিয়াবাসীদের মধ্যে আন্দোলুসীলিপির একটি শোভন সংস্করণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পর আল মোহেদ সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া কতকাংশে খণ্ডিত হয়ে পড়লে এবং জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তিতে নগরসংস্কৃতি ও বিলাস-ব্যসনে ভাঁটা দেখা দিলে লিপির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় ও তার চর্চা কমে যায়। জনবসতির ওপর নির্ভরশীল এর শিক্ষা ব্যবস্থাও চাহিদার অভাবে ভেঙ্গে পড়ে। শুধু সেখানে আন্দালুসী লিপির একটি নিদর্শন বিদ্যমান, যা সাক্ষ্য দেয় যে, এক সময়ে সেখানে এর অপ্রতিহত প্রভাব বর্তমান ছিল। যেমন আমরা পূর্বে বলেছি নাগরিক জীবনে কোন শিল্পকর্ম স্থায়ী হয়ে উঠলে তার নিশ্চিহ্ন হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

এর পর দূরতম মাগরিবে বনি মারিন সাম্রাজ্য আন্দালুসী লিপির একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ, তারা এর নিকটবর্তী ছিল এবং আন্দালুসীরাও তাদের নিকটবর্তী ফেজে এসে বসবাস করছিল। তদুপরি বনি মারিন তাদেরকে তাদের সাম্রাজ্যের সর্বকাল ধরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এর পরে সাম্রাজ্য ও রাজধানীর বাইরে

www.amarboi.org

অন্যান্য অঞ্চলে লিপির ধারা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল; যেন কখনও এর অস্তিত্বই ছিল না। এর ফলে আফ্রিকিয়া ও দুই মাগরিবের অন্যান্য অঞ্চলের লিপিকর্ম উৎকর্ষ হারিয়ে ক্রমশ ক্রটিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ কারণে সেখানকার লিপিতে কোন পুস্তকের অনুলিপি প্রস্তুত করলে এর দ্বারা পাঠকের কষ্ট ও সময় নষ্ট ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। কারণ লিপির অবস্থা বিকৃতি, পরিবর্তন ও আকৃতিগত বিচ্যুতির মাধ্যমে এখন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বহু পরিশ্রমের পরই তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। নাগরিকত্বের হ্রাস ও সাম্রাজ্যের বিনাশের ফলে অন্যান্য শিল্পকর্মের ভাগ্যে যা ঘটে থকে, এখানেও তাই ঘটেছে। আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।[৪০]

উস্তাদ আবুল হাসান আলী ইবনে হেলাল, যিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ লিপিশাস্ত্রবিদ ইবনে বাওয়াব[৪১] নামে পরিচিত, 'বাসিত' ছন্দে 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে তাঁর একটি পদ্য বিদ্যমান; তাতে তিনি লিপিশিল্প সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি বর্তমান গ্রন্থের এ পরিচ্ছেদে একে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি; যাতে যারা উক্ত শিল্প সম্পর্কে অবগত হতে চান, তারা উপকৃত হতে পারেন। পদ্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ :

হে শিক্ষার্থী, তুমি যদি লিপিশিল্পে উৎকর্ষ সাধন করতে চাও;
তোমার যদি ইচ্ছা থাকে সুন্দর হস্তাক্ষর ও সুন্দর অঙ্কনের
যতি সত্যই লিখনশাস্ত্রে তোমার দৃঢ় ইচ্ছা আন্তরিক হয়,
তা হলে তোমার সহায়কের কাছে সহজ পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা কর।
কলম তৈরির জন্য সরল খাগড়া সংগ্রহ কর,
তা যেন শক্ত হয় এবং শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হয়।
অতঃপর তুমি তাতে নিব্ সংযুক্ত করতে চাইলে, সূক্ষ্ম কর
এমন ধারণা অনুসারে, যা সার্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
তার উভয় দিকে লক্ষ কর; তারপর তার নিব্
এমন একটি দিকে প্রস্তুত কর, যা সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ।
কলমের নিবের দিকটিকে একটি সুষম আকৃতি দাও,
যা লম্বাও না হয়, আবার খাটও না হয়।
তার মাঝখানে এমনভাবে ফাঁড়, যাতে তার কর্তনটি
উভয় দিক থেকে সমান আকৃতিতে বিরাজ করে।
অতঃপর তুমি যখন এসব কিছু যথাযথ পালন করলে
এবং বুঝতে পারলে যে, তোমার সব প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।
আমি এর সব রহস্য খুলে ধরব, এমন লোভ করো না;
বরং আমি তো তার গুপ্ত রহস্যের কিছুটা অবশিষ্টই রাখতে চাই।
কিন্তু আমি যা কিছু বলতে চাই, তার নির্গলিতার্থ হল,
তার আকৃতি চতুষ্কোণ ও গোলাকারের মধ্যবর্তী হবে।
তোমার দোয়াতকে ঝুল দিয়ে পূর্ণ করে শিকা মিশাও
এবং অম্লফলের নির্যাস দিয়ে খুব ভাল করে নাড়।

৪০. কোরান, ১৩, ৪১।
৪১. ৩৭ নং টীকা দ্রঃ।

www.amarboi.org

তার সাথে মিশাও রঙ্গীন উপাদান, যা মিশ্রিত করা
হয়েছে হরিতাল ও কর্পূরের সাথে।
অতঃপর তার মিশ্রণ ভাল করে প্রস্তুত হলে অনুসন্ধান কর
পরিষ্কার, উত্তম ও পরীক্ষিত কাগজ।
তাকে পরিমাণ অনুসারে কেটে নিবার পর তাতে চাপ দাও,
যাতে তার অন্তর্গত সব অমসৃণ ও বিরূপ অবস্থা দূরীভূত হয়।
অতঃপর তাতে ধৈর্যের সাথে রেখা অঙ্কন কর;
বস্তুত ধৈর্যশীলের ন্যায় অন্য কারও উদ্দেশ্য সফল হয় না
এর পর একটি কাঠের তক্তার ওপর নিয়ে একান্ত আগ্রহে
তোমার কাজ আরম্ভ কর, তাতে যেন অস্থিরতা না থাকে।
প্রথম অবস্থায় তোমার রেখার অপকর্ষের জন্য
লজ্জিত হইও না; কেননা প্রাথমিক অবস্থা এরূপই হয়।
প্রথমে কঠিন মনে হয়, পরে সহজ হয়ে আসে;
যে-কোন সহজ অভ্যাসের অধিকারী প্রথমে কাঠিন্যের সম্মুখীন হয়।
এভাবে তুমি যখন তোমার উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে,
তখন যথার্থই আনন্দ ও দক্ষতার দ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে।
আর তখন তোমার উপাস্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর সন্তুষ্টি
কামনা করিও; কেননা প্রভু কৃতজ্ঞের আশা পূর্ণ করেন।
তোমার হাতের প্রতি দৃষ্টি রাখ, তার আঙ্গুল যেন
কল্যাণকে রূপ দেয়, যা তুমি এ মায়াবী জগতে রেখে যাবে।
মানুষের সব কর্মফলের সাক্ষাৎ আগামীতে পাওয়া যাবে
দুর্ভাগ্যের লিপিতে অঙ্কিত এক উন্মুক্ত গ্রন্থ।

পাঠক, জেনে রাখুন, লিপি যেমন কথা ও বক্তব্যের প্রতীক, ঠিক তেমনি কথা ও বক্তব্যও আত্ম ও অন্তরে লুক্কায়িত ভাবের প্রতিধ্বনি। সুতরাং তাদের প্রত্যেকটিই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলতা হতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাঞ্জলতা শিক্ষা দিয়েছেন।[৪২] এটা সর্ব বিষয়ে প্রাঞ্জলতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং লিপিশিল্পের উৎকৃষ্ট অবস্থার অর্থ হল ওটা সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করবে। এতে প্রতিটি নির্দিষ্ট বর্ণের অবস্থান পৃথক এবং তার গড়ন ও রেখা সুস্পষ্ট সীমার দ্বারা অন্যটি হতে বিশিষ্ট হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে যদি লিপিকররা একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণকে পরস্পর সংযুক্ত করার কোন রীতি প্রচলিত করে থাকেন, তা হলে উক্ত প্রচলন অনুসারে তা লিপিবদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসারেই পৃথক বর্ণগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, কোন শব্দের প্রথমের দিকে 'আলেফ'; অনুরূপভাবে 'রে, 'যে', 'দাল', 'যাল' ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষের দিকে থাকলে এরূপ হবে না। এভাবে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হবে।

অতঃপর পরবর্তী লিপি-বিশারদ্‌রা কিছু সংখ্যক শব্দের পরস্পরের সংযুক্তি এবং কিছু সংখ্যক বর্ণের উহ্য রাখার ধারা প্রচলন করেন। এ রীতি-নীতি তাঁদের কাছে সুপরিচিত এবং যারা তাদের পরিভাষার সাথে পরিচিত, তারা ছাড়া অন্যদের কাছে এগুলো দুর্বোধ্য শব্দের সমষ্টিমাত্র। এসব লিপিকর মূলত শাসন ব্যবস্থার নথি-পত্র এবং

৪২. কোরান; ৫৫, ৩-৪।

www.amarboi.org

কাজীদের বিবরণী লেখক। এজন্যই তারা এককভাবে এসব পরিভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাদের লেখার বিষয় বেশি বলে এরূপ সংক্ষিপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। তবুও তাদের লিপির খ্যাতি আছে এবং তারা ছাড়া অনেকেই এরূপ পরিভাষার সাথে পরিচিত বলে এটা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তারা উক্ত পরিভাষাদির সাথে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছে যখন লিখেন, তখন স্বভাবতই সংক্ষিপ্তির পথ পরিত্যাগ করে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে লেখার চেষ্টা করেন। নয়তো ওটা তাদের কাছে অনারব লিপির ন্যায় দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। কারণ এ সংকেতিক লিপি এবং অনারব লিপি অপরিচয়ের দরুন উভয়ই সমান দুর্বোধ্য। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতার জন্য কোন প্রকার প্রয়োজনের অজুহাত সৃষ্টির অবকাশ নেই। অবশ্য শাসন-ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও সেনাদলের বিষয়াদির লেখকরা এ অজুহাত তুলতে পারেন। কারণ তাদের অনেক বিষয় মানুষের কাছে গোপন করতে হয়। বস্তুত শাসন-ব্যবস্থায় এমন অনেক বিধি-নিষেধ বিদ্যমান, যা গোপন রাখাই বিধেয়। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ সাংকেতিক লিপির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং এর ফলে বিষয়টি একটি প্রহেলিকায় পরিণত হয়।

এমন সংকেতের ক্ষেত্রে বর্ণ দ্বারা শব্দের কাজ চালানো হয়; সুগন্ধী, ফলমূল পাখি ও ফুলের নামও বর্ণের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় এবং অনেক সময় বর্ণাদির স্বাভাবিক রেখাবিন্যাসকে ভিন্নভাবে তুলে ধরে সংকেতের চাহিদা পূরণ করা হয়। এভাবে কারও কাছে গোপনে কিছু বলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময় লেখকরা এরূপ সংকেতে মনের ভাব প্রকাশ করে তা বুঝবার জন্য সংকেত নির্দেশ লিখে দেন। কারণ উক্ত সংকেত পূর্ব থেকে প্রচলিত না থাকলে এরূপ করার প্রয়োজন হয়। এর ফলে তারা এমন কতকগুলো নীতি প্রণয়ন করেন, যার সাহায্যে অনুমান করে উক্ত সংকেতের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। একে তারা 'রহস্যের চাবিকাঠি' বলে অভিহিত করেন। এসব বিষয় নিয়ে অনেকেই বিচিত্র সংকলনের অধিকারী হয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যথার্থ বিচক্ষণ ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।

www.amarboi.org

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[পুস্তক শিল্প]

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন ও সরকারি নথি-পত্র ইত্যাদির অনুলিপি, বাঁধাই এবং বর্ণনার ধারা ও শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা সংশোধনের প্রতি সব প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। এর কারণ হিসেবে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গী বিষয়াদির কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বর্তমানকালে সাম্রাজ্যের পতন ও জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে এগুলোর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

অথচ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইরাক ও আন্দালুসে এক সময়ে এসব বিষয়ের সাগর উথলিয়ে উঠেছিল। বস্তুত এ সবই জনবসতির ফসল ও সাম্রাজ্য শক্তির বিন্যাসের অনুষঙ্গী এবং এদুটির কাছে তার ব্যাপক চাহিদার অনুগামী। এর ফলেই সেকালে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। যুগে যুগে ও দিকে দিকে মানুষ এগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে গ্রন্থাদির অনুলিপি প্রস্তুত হয়ে বাঁধাই হত। এভাবে পুস্তক-প্রস্তুত শিল্পের আবির্ভাব ঘটে এবং শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অনুলিপি তৈরি, সংশোধন ও বাঁধাই করার কাজ সম্পন্ন করতেন। এছাড়া পুস্তক সম্পর্কীয় অন্যান্য যাবতীয় কাজ ও সংকলনের দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত হত। বিরাট জনবহুল নগরীতেই এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হত।

প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুস্তকাদির অনুলিপি এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় পুস্তিকা, দানপত্র ও ফরমান ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চামড়া থেকে তৈরি এক প্রকার উপকরণ ব্যবহার করা হত। এতে একদিকে যেমন প্রচুর সুবিধা ছিল, অন্যদিকে তেমনি তখন লেখার সামগ্রীর স্বল্পতা ছিল বলে কাজ চলে যেত। ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক এমন অবস্থার কথা আমরা পরে বর্ণনা করব। এর সাথে রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলপত্রও তখন এত ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। ফলে চামড়ার ওপর লেখা বিষয়াদিকে যেমন মর্যাদার চোখে দেখা হত, তেমনি তার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ দেখা দেয়নি।

এর পর গ্রন্থ রচনা ও নথিপত্র সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলপত্রাদিও বেড়ে উঠল। সুতরাং চামড়ার পক্ষে এ সব বিষয়ের সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এ সময়ে ফজল ইবনে ইয়াহিয়া কাগজ প্রস্তুত করার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং কাগজ প্রস্তুত হলে তাতে রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলাদি সংরক্ষিত হতে লাগল। সাধারণ লোকও তাদের রচনা কাজ এবং

www.amarboi.org

সরকারি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুলিপি প্রস্তুতকরণে তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। এর প্রস্তুতকরণ শিল্প চাহিদা অনুসারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

এর পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকারীরা এবং রাজশক্তির অধিকারীরা বিভিন্ন বিষয়ের সংকলনগুলোকে বর্ণনা সূত্রের দ্বারা উক্ত বিষয়াদির রচক ও কথকদের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও শুদ্ধকরণের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কেননা এরূপ সংরক্ষণ ও শুদ্ধীকরণের কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে প্রতিটি বক্তব্য তার বক্তার প্রতি যথার্থভাবে নির্দেশিত এবং প্রতিটি ধর্মীয় বিধান এর প্রবর্তক ও গবেষকের প্রতি যথার্থভাবে আরোপিত হল। সুতরাং যে সংকলনে অনুরূপভাবে সংকলয়িতা কোন সূত্র-প্রমাণ উপস্থিত করে তার প্রামাণ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হত না, তার কোন নির্দেশ বা বক্তব্য গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হত না। তখনকার দিনে দেশ-কাল-পাত্র জুড়ে এটাই ছিল জ্ঞানান্বেষী ও জ্ঞানের বাহকদের অবস্থা।

কিন্তু আধুনিক পুস্তক রচনা শিল্পে এ সূত্র-প্রমাণের বিষয়টি পরিত্যাক্ত হয়েছে। কারণ তৎকালে এর সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগিতা ছিল হাদীসের বিভিন্ন অবস্থা,[৪৩] যেমন—শুদ্ধ, শোভন, সংযুক্ত সূত্র, বিক্ষিপ্ত সূত্র, বিচ্ছিন্ন সূত্র, অপেক্ষিত সূত্র ইত্যাদি জেনে নিয়ে মিথ্যা হাদীস থেকে তাদেরকে পৃথক করা। এ বিষয়ে করণীয় সব কিছুই যথাযথ বিচার ও সরাসরি নির্ণয়ের মাধ্যমে হাদীসের মূল সংকলনগুলোতে করা হয়েছে এবং জাতির কাছে তা গৃহীত বলেও গণ্য হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে এ বিষয়ে বেশি কিছু করা অর্থহীন তৎপরতা বলে বিবেচিত হচ্ছে। একমাত্র আধুনিক হাদীস সংকলন এবং ধর্মীয় বিধানের নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার ছাড়া সূত্র-প্রমাণের অন্য কোন উপকার বর্তমানে নেই। অতীতে অবশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংকলন ও রচনাতেও এ সূত্র-প্রমাণের সাহায্যে রচয়িতার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হত এবং তাদের কাছ থেকেই যে এসব বিষয় যথাযথ বর্ণিত হয়েছে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হত। পূর্বাঞ্চলে ও আন্দালুসে এ বিষয়টি অতিশয় নিষ্ঠা ও সুস্পষ্টতার সাথে অনুসরণ করা হত। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালে এসব অঞ্চলে অনুলিপিকৃত বিভিন্ন গ্রন্থাদি একান্ত নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ। তাদের অনুসৃত সেসব নীতি বর্তমানকালের মানুষের দ্বারাও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, এসব প্রাচীন নীতি কতটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক একালেও তাঁদের সেই গ্রন্থাদির অনুলিপি প্রস্তুত করাচ্ছে এবং তাঁদের অনুসৃত নীতির সামনে জোড়হস্ত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করছে।

বর্তমানকালে মাগরিব অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের মধ্য থেকে গ্রন্থাদি রচনার ও অনুলিপি প্রস্তুতের এসব প্রথা লোপ পেয়েছে; তাদের মধ্যে সংরক্ষণ লিপিবদ্ধকরণ ও বর্ণনার সে ধারা আর নেই। কারণ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে আবার প্রান্তরীয় জীবন দেখা দিয়েছে। তারা এখন সেই প্রান্তরীয় লিপির সাহায্যে মূল গ্রন্থ ও সংকলনাদির অনুলিপি প্রস্তুত করে থাকে। মাগরিবের বিদ্যার্থীরা অস্পষ্টতা, বিচ্যুতি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ

৪৩. এর মূল পরিভাষা যথাক্রমে, সহিত, হাসান, মুসনাদ, মুরসাল, মাকত্, মওকুফ, মউযু ইত্যাদি। ষষ্ট অধ্যায়ের, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

www.amarboi.org

হস্তাক্ষর দ্বারা দুর্বোধ্য অনুলিপি প্রস্তুত করছে; যে-কোন পাঠকের পক্ষে এগুলোর পাঠোদ্ধার অতিশয় দুরূহ ব্যাপার এবং খুব কম ক্ষেত্রে এগুলো থেকে কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এ কারণে ধর্মীয় বিধানাদির ক্ষেত্রেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। কেননা এ ব্যাপারে অনুসৃত অনেক বিধানই বিশেষ মজহাবের ইমাম থেকে যথাযথ বর্ণিত হবার প্রমাণবিহীন এবং এগুলো একমাত্র ঐসব সংকলন থেকে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'-ভাবে গৃহীত হয়েছে। তদুপরি তাদের অনেক ধর্মীয় নেতা এগুলোর সাথে নিজের রচনাকর্ম মিশিয়ে একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ শিল্পে তাদের বিচক্ষণতার অভাব এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পূরণের উপযোগী শিল্পজ্ঞানও তাদের আয়ত্তাধীন নয়। আন্দালুসের এ শিল্পের অতি সামান্য চিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাব বিদ্যমান। তাও বিলীন হবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। আর মাগরিবে এ জ্ঞানচর্চার ধারা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাঁর বিষয়াদিতে সাফল্যের অধিকারী।[৪৪]

বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে, সূত্র-প্রমাণসহ বর্ণনার ধারা এখনও পূর্বাঞ্চলে প্রবাহমান রয়েছে। যারা সংকলনাদি শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য সেখানকার সাহায্য খুবই সহজলভ্য। কারণ সেখানে এখনও জ্ঞানচর্চা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পাদির বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান; যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। অবশ্য অনুলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে লিপির যে উৎকর্ষ সেখানে বিদ্যমান, তা অনারবদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে এবং তাদের দ্বারা ব্যবহৃত লিপিতেই। নয়তো মিশরেও অনুলিপির অবস্থা মাগরিবের ন্যায় বিকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে; বরং তার চেয়েও শোচনীয়। পবিত্র মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

৪৪. কোরান, ১২, ২১।

www.amarboi.org

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[সংগীত শিল্প]

এটা সমিল কবিতার ধ্বনিসমূহকে সুপরিচিত মাত্রাবিন্যাসের অনুপাতে সুরের মধ্যে বিধৃত করার শিল্পবিশেষ। এতে প্রতিটি ধ্বনি তার মাত্রা অনুসারে উচ্চারিত হয়ে একটি সুরের জন্ম দেয় এবং এসব সুর তাল অনুসারে গ্রথিত করে এমন একটি সুসমঞ্জস ঐক্যতানের সৃষ্টি করা হয়, যা শ্রবণেন্দ্রিয়কে মোহিত করে। এ ধ্বনি সমষ্টির পরস্পর সুসংবদ্ধ অবস্থানের মধ্যেই এ মুগ্ধকর আকর্ষণের সৃষ্টি হয়।

এর বর্ণনা এই যে, সংগীতশাস্ত্রে এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ধ্বনিসমূহ পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বস্তুত যে-কোন ধ্বনি অন্য ধ্বনির অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ ও এক-একাদশাংশ হিসাবে বিচিত্র সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করার পূর্বে প্রতিটি একক ধ্বনিকে মিশ্র করে তোলে। অবশ্য যে-কোন মিশ্রণই শ্রুতি সুখকর নয়; বরং শ্রুতিমধুর ধ্বনি মিশ্রণের কতগুলো বিশেষ স্বরূপ আছে, যা সংগীতশাস্ত্রবিদ্‌রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। যথাস্থানে তার বর্ণনা পরে আসবে।

কখনও সংগীতের এ সুর লহরীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বস্তুর শব্দাবলিকেও এর সাথে মিলিত করা হয়। এ উদ্দেশ্যে নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে আঘাত করে অথবা ফুৎকার দিয়ে এ শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে সংগীতের সুর আরও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে মাগরিবের এ প্রকার—কতিপয় যন্ত্র বিদ্যমান। তার মধ্যে বাঁশী, যাকে 'শাব্বাবা' বলে ডাকা হয়। এটি একটি ফাঁপা নল, যার পাশে কিছু সংখ্যক ছিদ্র থাকে এবং তাতে ফুঁ দিলে শব্দ উত্থিত হয়। উক্ত শব্দ এসব ছিদ্রপথে বের হবার কালে উভয় হাতের আঙুলকে অত্যন্ত সুপরিচিত নিয়মে তার ওপর চেপে ধরে তাকে মাত্রাযুক্ত করা হয়। এর ফলে শব্দাবলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং উক্ত সুসমঞ্জস শব্দ-তরঙ্গ সংগীতের সুরের সাথে মিলিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় তা এই সুসমঞ্জস্যতার জন্যই তাকে প্রিয় মনে করে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

এমন বাঁশী জাতীয় অন্য একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'যুলামী'। তার কাঠের দুই পাশ একত্র করে তৈরি নলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। অবশ্য তা ফাঁপা হলেও গোলাকার নয়; কারণ তা দুটি খোদাই করা খণ্ড একত্র করে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাতেও ছিদ্র আছে। তার সাথে সংযুক্ত একটি নলের মধ্য দিয়ে তাতে ফুঁ দিতে হয় এবং তার মধ্য দিয়ে ফুৎকার মূল অংশে প্রবেশ করে তা শব্দের সৃষ্টি করে। শাব্বাবার ন্যায় তাতে ছিদ্রমুখে আঙ্গুল চেপে ধরে শব্দকে মাত্রাযুক্ত করতে হয়।

www.amarboi.org

বর্তমানকালে এ বাঁশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হল 'বুক' (শিঙ্গা)। এটা তামার দ্বারা তৈরি, মধ্য ফাঁপা, বাহু সমান দীর্ঘ এবং এর ফাঁপা অংশটি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়ে হাতের তালুর পরিমাণ গোলাকৃতি হয়ে কলমের নিব্ লাগাবার স্থানের ন্যায় শেষ হয়েছে। তাতে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নলে ফুঁ দিলে সে ফুৎকার এর মধ্যে প্রবেশ করে ভারী ও উচ্চ শব্দ উত্থিত করে। তাতেও কতিপয় ছিদ্র রয়েছে এবং আঙুলি স্থাপন করে উক্ত শব্দকে পূর্বানুরূপ তালযুক্ত করা হয়। এর ফলে ধ্বনি-তরঙ্গ শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে।

এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তার সংযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিদ্যমান। এদের সবগুলোই মধ্য ফাঁপা। এদের আকৃতি হয় গোলকের ন্যায় গোলাকার; যেমন 'বরবাত' ও 'রবাব'; নয়ত চতুষ্কোণ; যেমন 'কানুন'। এদের উপরিভাগে তারগুলোকে এক মাথায় বেঁধে অন্য মাথায় কীলকের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়। কীলকগুলো যন্ত্রের গায়ে সংলগ্ন থাকে এবং প্রয়োজন মত তদেরকে মুচড়ে তারগুলো ঢিলা ও আঁটা করা যায়। তারপর এ তারগুলোতে অন্য কোন কাঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয় অথবা একটি ধনুকের ছিলায় তার বেঁধে একে মোম অথবা চর্বি দ্বারা মেজে তা দ্বারা উক্ত তারের ওপর ঘর্ষণ করা হয়। উক্ত তারগুলোর ওপর হাতের চাপ শিথিল করে কিংবা এক তার থেকে অন্য তারে স্থানান্তর করে উত্থিত শব্দাবলির মাত্রা ঠিক করা হয়। এমন বীণজাতীয় তারের সব বাদ্যযন্ত্রে বাম হাত এর অঙ্গুলীগুলো আঘাত ও ঘর্ষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারের পাশে উঠা-নামা করে। এর ফলে সুসমঞ্জস্য শ্রুতিমধুর ধ্বনি তরঙ্গ বের হয়ে আসে।

কখনও ধাতুনির্মিত পাত্রাদিতে কাঠখণ্ডের দ্বারা আঘাত করে এবং দুটি কাঠির দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করেও সুসমঞ্জস্য তাল-লয় সহকারে স্বরলহরীর সৃষ্টি করা হয়, যা শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে।

পাঠক, আমরা এখন আপনার সামনে সংগীতের শ্রুতিমাধুর্যের কারণ বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। এটা এই যে, মাধুর্য হল, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে, কোমলতার উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বিশেষ অবস্থার নাম। সুতরাং এ অবস্থা যদি উপলব্ধির সাথে সুসামঞ্জস্য ও কোমল প্রকৃতির হয়, তাহলেই তা মধুর হয়ে উঠে। অন্যদিকে ওটা যদি উপলব্ধির ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও কর্কশ হয়, তাহলে বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। এভাবে দেখতে গেলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যা নরম, তাই সাধারণভাবে স্বাদগ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের কাছে একটি সুষম অবস্থার সৃষ্টি করে। এমনিভাবে স্পর্শের ক্ষেত্রে যা কোমল এবং গন্ধদ্রব্যাদির ক্ষেত্রে তাই হৃদশক্তির বাষ্পীয় বিস্তারের সহায়ক, যা সুষম মিশ্রণের অধিকারী। কেননা ওটাই উপলব্ধিকারী এবং ইন্দ্রিয়গুলো তার কাছেই এ অবস্থাকে পৌঁছে দেয়। এ কারণেই সুগন্ধী গুল্ম, ফুল ও আতর আত্মশক্তির জন্য এমন অদ্ভুত গন্ধ ও কোমলতা বহন করে আনে। কারণ তাতে সেই বিশেষ উষ্ণতার প্রাধান্য যা হৃদশক্তির মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যমান।

দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এ কোমলতার অর্থ তাদের গড়ন, আকৃতি ও অবস্থার ক্ষেত্রে সুষমতার উপস্থিতি; কেননা ওটাই জীবাত্মার জন্য বেশি সুসামঞ্জস্য ও অতিরিক্ত সহজগ্রাহ্য। সুতরাং দ্রষ্টব্য বস্তুটি যদি তার মৌলিক উপাদান অনুসারে তার আকৃতি ও গঠনসৌকর্যে বিশিষ্ট হয় এবং এমনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, যাতে তার বিশিষ্ট উপাদানগত পরিপূর্ণতা ও সুষমতার যথার্থ সীমা বজায় থাকে, তা হলে ইন্দ্রিয়ের

www.amarboi.org

কাছে ওটাই সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব আকারে ধরা দেয়। এর ফলেই এ অবস্থাটি উপলব্ধিকারী আত্মশক্তির জন্য সুসামঞ্জস্য হয় এবং সে ওটা থেকে মাধুর্য সংগ্রহ করে।[৪৫] এজন্যই পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন, যে-সব প্রেমিক প্রেমের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তারা তাদের প্রেম ও আকর্ষণের গভীরতা বুঝানোর জন্য বলে যে, প্রিয়তমের আত্মার সাথে তাদের আত্মা মিশে গেছে। এর মধ্যে যে রহস্য আছে, তা কেবল আপনি ভুক্তভোগী হলেই বুঝতে পারবেন। এটা আর কিছুই নয়, উৎসের ঐক্য। কারণ আপনার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য যা কিছু আছে, তার প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন আপনার ও তাদের মধ্যে এ উৎসের ঐক্য বিদ্যমান। সৃষ্টির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আপনাদের উভয়ের বিদ্যমানতাই এর সাক্ষ্য বহন করছে।

এর এই তাৎপর্যের অন্য একটি দিক এই যে, প্রতিটি বস্তুই অন্য সব বস্তুর সাথে অংশীদারিত্বে এক; যেমন দার্শনিকগণ বলে থাকেন। সুতরাং এদিক থেকে আপনি যার মধ্যে পরিপূর্ণতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং জীবাত্মা তখন কল্পনার জগৎ ত্যাগ করে সেই বাস্তবে ফিরে আসতে উন্মুখ হয়, যা বস্তুত উৎস ও সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য হিসেবে বিরাজমান।

যেহেতু মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা সুসামঞ্জস্য এবং তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হল তার মানবিক দেহের আকৃতি ও গঠন সৌন্দর্য, সেজন্য সেই গঠন, শব্দাবলি ইত্যাদির মধ্যে সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবকে উপলব্ধি করাই তার সহজাত প্রবৃত্তির বেশি নিকটবর্তী। এ কারণেই প্রতিটি মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণেই দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়াদির মধ্যে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করে থাকে।

এ কারণে শ্রোতব্য বিষয়ের ধ্বনিসমষ্টির সুসামঞ্জস্যতাই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে; ওটা বিসদৃশতা নয়। কেননা ধ্বনিসমূহের জন্য অঘোষ, ঘোষ, কোমল, কর্কশ, কম্পিত, ঘৃষ্ট ইত্যাদি বহু অবস্থা বিদ্যমান। এতে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থই হল এমন একটি মিশ্রণের সৃষ্টি করা, যাতে শ্রুতিমাধুর্য উৎপন্ন হয়।

প্রথমত, ধ্বনি তার বিস্তার সীমা হঠাৎ অতিক্রম করবে না; বরং তা ক্রমান্বয়ে হবে এবং তার প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে আসবে। প্রতিটি ধ্বনির ক্ষেত্রেই এ অবস্থা প্রযোজ্য। ধ্বনির এ বিস্তারের মধ্যভাগে পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যও উভয় মেরুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। পাঠক, এক্ষেত্রে ভাষাবিদদের বিসদৃশ ধ্বনি সংযোগ এবং সমোচ্চারিত ধ্বনির সহাবস্থানের বিষয়টিকে মন্দ বলার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন। কারণ ওটাও এ পর্যায়ের।

দ্বিতীয়ত, ধ্বনি বিভিন্ন অংশে সুসামঞ্জস্যতা লাভ করবে; যেমন পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ধ্বনি তার অর্ধাংশে, এক-তৃতীয়াংশে, অথবা অনুরূপ অন্যান্য অংশে এমনভাবে স্থানান্তরিত হবে, যাতে সংগীতশাস্ত্রবিদদের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতরাং উক্ত শিল্পের বিশেষজ্ঞরা যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন, ধ্বনিগুলো যদি সেভাবে সুসামঞ্জস্য অবস্থাদির সৃষ্টি করে, তা হলে ওটা কোমল ও শ্রুতিমধুর হয়ে দাঁড়াবে।

---

৪৫. এর পরবর্তী বর্ণনার কতকাংশের সাথে এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য অতিশয় ক্ষীণ; মনে হয়, এটা প্রক্ষেপ (রোজেনথাল, ২য় খণ্ড, ৩৯৮ পৃ: দ্র:)।

www.amarboi.org

এরূপ সুসামঞ্জস্য অবস্থার মধ্যে অনেকগুলোই সরল; বহুলোক অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এরূপ ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টিতে পারঙ্গম। তারা এর জন্য কোন প্রকার শিক্ষা বা শিল্পানুশীলনের মুখাপেক্ষী হয় না। যেমন আমরা বহু লোককেই স্বভাবদত্তভাবে কাব্যের ছন্দ, নৃত্যের মাত্রা ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার অধিকারীরূপে দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ তাদের এ শক্তিকে 'গীতিময়তা' বলে অভিহিত করে। কুরআন পাঠকারীদের অনেককেই এ অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। তারা এমনভাবে কুরআন পাঠ করে, যাতে ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে সুরের সৃষ্টি হয়ে একটা সংগীতসুলভ আবেশের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের সুন্দর বাক্-বিন্যাস ও সুরসঙ্গতির দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করতে সক্ষম হয়।

এরূপ সুরসঙ্গতির ক্ষেত্রে যা মিশ্রণের দ্বারা জটিল হয়ে ওঠে, ওটা সব মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং সকলের স্বভাবদত্ত শক্তিও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; যদি সে সজ্ঞান হয়।

এটাই সেই সুরসৃষ্টির ব্যাপার, যার দায়িত্ব সংগীতশাস্ত্র বহন করছে; যেমন আমরা উক্ত শাস্ত্র আলোচনার সময় বর্ণনা করব।

ইমাম মালেক (রহঃ) সুর করে কুরআন পাঠের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং ইমাম শাফেয়ী এ সম্পর্কে মত দিয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সুরের অর্থ সংগীতশিল্পের অনুরূপ সুর নয়। কারণ কুরআন পাঠে তার ব্যবহারের নিষেধ সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কেননা সংগীতশিল্পের উদ্দেশ্য সব দিক থেকেই কুরআন পাঠের সাথে সামঞ্জস্যহীন। কুরআন পাঠ ও তার যথাযথ উচ্চারণ এমন কিছুসংখ্যক ধ্বনিমাত্রার অধীন, যা দিয়ে বর্ণমালা তার স্বরচিহ্নাদিসহ যথাবিহিতভাবে স্পষ্ট হতে পারে। যেমন দীর্ঘস্বর; তার দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতারও নির্ধারিত বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। একইভাবে সুর সৃষ্টির জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বরবিন্যাসের প্রয়োজন; তাছাড়া তার মধ্যে সঙ্গতি বিধানের দ্বারা পূর্ণতালাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, এ সঙ্গতিই সুরের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের একের ক্ষেত্রে অন্যের বিষয়টি প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করলে উভয়ের বিনষ্টি সাধন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বস্তুত কুরআন পাঠের বিষয়টি সংগীতের পূর্বেই সুনির্দিষ্ট বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, যাতে উক্ত গ্রন্থের সনাতন ধারায় কোন প্রকার ব্যতিক্রমের সৃষ্টি না হয়। সুতরাং সুর ও যাথাবিহিত কুরআন পাঠকে একত্র করার কোন অবকাশ নেই। ফলত, তাঁদের উপরোক্ত মতানৈক্যের একমাত্র লক্ষ্য হল সেই সরল সুর, যা গীতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্ট হয়ে থাকে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং পাঠক এক্ষেত্রে তার পঠিত শব্দাবলিকে এমনভাবে আবৃত্তি করবে, যেন তার ধ্বনি তরঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সংগীত ও আবৃত্তির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ হলে তা আর ইমাম মালেকের বক্তব্য অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে না। বস্তুত এ পার্থক্যের অভাবই তাঁদের বিতর্কের ভিত্তি। অবশ্য কুরআন পাঠ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত এটাই যে, তা এই যাবতীয় আবিলতা থেকে মুক্ত হবে; যেমন ইমাম মালেক মন্তব্য করেছেন। কেননা কোরানের বিষয়বস্তু হল মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিষয়াদির প্রতি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থান। এর সাথে সুস্বর শুনে মোহিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সাহাবীদের (রা) কুরআন পাঠও এ ধারাকেই অনুসরণ করেছে; যেমন তাঁদের ইতিহাসে তার বর্ণনা বিদ্যমান।

www.amarboi.org

এ ক্ষেত্রে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সেই বাণী, যাতে তিনি বলেছেন, আমাকে দাউদ বংশীয়দের সুস্বরের একটি অংশ প্রদান করা হয়েছে;[৪৬] তার অর্থ গীত ও সুর সৃষ্টি নয়। তার একমাত্র অর্থ হল সুন্দর স্বর, সুষ্ঠু পাঠ এবং প্রতি বর্গকে তার যথার্থ স্থান থেকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা।

ইতোপূর্বে যেহেতু আমরা সংগীতের তাৎপর্য বর্ণনা করেছি; সুতরাং পাঠক, জেনে রাখুন, ওটা একমাত্র সভ্যতারই অবদান। মানুষের এ সভ্যতা যখন মৌলিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে প্রয়োজনের সৃষ্ট অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় এবং পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভ্যাসাদির দিকে এগিয়ে যায়, তখনই তারা বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুসরণ করে ও এসব শিল্পের উদ্ভব ঘটায়। কারণ এরূপ শিল্পকর্মে তারাই নিয়োজিত হতে পারে, যারা তাদের প্রয়োজনীয় সব অভাব পূরণ করেছে এবং জীবিকা, সংসার ও অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। কাজেই সব অবস্থায় সর্ববিধ দায়িত্বমুক্ত ব্যক্তিরাই ভোগ-সম্ভোগের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য এসব শিল্পের দ্বারস্থ হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অনারব দেশগুলোর শহর-নগরে এসব শিল্পকলার এক তরঙ্গায়িত সমুদ্র বিরাজমান ছিল। তাদের সম্রাটগণ এসব বিষয় লালন করতেন এবং আগ্রহ সহকারে এদের মাধুর্য সম্ভোগে তৎপর থাকতেন। এমন কি পারস্য সম্রাটগণ এ সমস্ত বিষয়ের শিল্পী-কুশলীদেরকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং তারা সাম্রাজ্যে বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী ছিল। তারা জলসায় ও সমাবেশে উপস্থিত হয়ে সংগীত পরিবেশন করত। বর্তমানকালেও অনারব প্রতিটি অঞ্চলে ও রাজ্যপাটে শিল্পীদের অনুরূপ মর্যাদা বিদ্যমান।

কিন্তু আরবদের মধ্যে প্রথমে ছিল কাব্য-প্রীতি। তারা বক্তব্যকে সমান অংশে সঙ্গতি রক্ষা করে হসন্ত ও আকারাদি যুক্ত বর্ণমালার মাত্রা অনুসারে সুসংবদ্ধ করত। তারপর বক্তব্য বিষয়কে এসব অংশের মধ্যে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করত যে, তার প্রতিটি অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্যের বাহন হয়ে উঠত। এর ফলে অন্য অংশের সাহায্য ছাড়াই তার অর্থ সুস্পষ্ট হত। তারা একে বলত কাব্য পঙ্ক্তি। এক্ষেত্রে প্রথমে তারা বক্তব্যটিকে অংশে অংশে ভাগ করে একটি কোমলতার সৃষ্টি করত এবং এ অংশগুলোকে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে বিন্যস্ত করত। পরে যথার্থ উদ্দেশ্য ও সে অনুযায়ী বক্তব্যকে মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গতির সৃষ্টি করত। এভাবে তাদের উচ্চারিত বাণীসমষ্টির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিত, যা অন্যত্র সুলভ নয়। তার এরূপ মর্যাদার উৎস হল সেই সুসামঞ্জস্য বিন্যাস প্রণালী। এভাবে প্রস্তুত তাদের কাব্যসম্ভার তাদের ইতিহাস ও বিচক্ষণতার ভাণ্ডার এবং তাদের দুঃখ-বেদনার গাথা হয়ে উঠেছিল। এতে যেমন ছিল অর্থের যথার্থতা তেমনি ছিল আঙ্গিকের অভিনবত্ব। এটা নিয়েই তারা বহুকাল পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল।

অনুরূপভাবে বক্তব্যকে অংশে অংশে ভাগ করে হসন্ত ও স্বরান্ত বর্ণমালা একত্রীকরণের মাধ্যমে সঙ্গতি দেখা দিত, তা ঐকতান সাগরের একটি বিন্দু মাত্র; যেমন সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ওটা সকলের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু আরবরা এর বেশি অন্য কিছু বুঝত না। কেননা তারা তখন কোন প্রকার শাস্ত্র ও শিল্পের সাথে পরিচিত হয়নি। তাদের প্রান্তরীয় জীবনবোধেরই প্রাধান্য ছিল। তারপর উট চালকরা তাদের মধ্যে হুদীর

৪৬. বোখারী, ৩য় খণ্ড দ্র:।

www.amarboi.org

সুর নিয়ে এল এবং যুবকরা তাদের অবসরকালীন আনন্দের জন্য সুরালাপ করতে লাগল। এর ফলে ধ্বনি-তরঙ্গের আবৃত্তির মাধ্যমে সুরের সৃষ্টি হল। এ সুরকে কাব্যে প্রয়োগ করলে তারা তাকে সংগীত বলত এবং কোন প্রকার স্তুতি ও পাঠকার্যে প্রয়োগ করলে তাকে বলত 'তাগবির'। আবু ইসহাক যুজ্জাজ বলেছেন,[৪৭] ওটা 'গাবের' অর্থাৎ পরকালের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে স্মরণ করায় বলে তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আরবদের এ সংগীত প্রয়াসের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন সুরের মধ্যে একান্ত সরল সঙ্গতি দেখা দিত; যেমন ইবনে রশিক তাঁর 'উমদা' গ্রন্থের শেষ দিকে এবং অন্যরা অন্যত্র এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এরূপ সরল সুর-সঙ্গতিকে তারা 'সান্নাদ' বলে অভিহিত করত। তাদের এমন সুর-সঙ্গতির অধিকাংশই ছিল লঘু তালের, যা নৃত্যে এবং পদচারণায় ঢোলক ও বাঁশীর সাথে ব্যবহৃত হত। এতে একটা লঘু আনন্দ শিহরণের সৃষ্টি হত, যা গম্ভীরকেও অস্থির করে তুলত। তারা একে বলত 'হজাজ'। এটা এবং এর অনুরূপ অন্যান্যগুলোর সবাই সরল সুরগ্রাম, যা একান্তভাবে প্রাথমিক স্তরের। সুতরাং এগুলো কোন প্রকার শিক্ষা ছাড়াই মানব প্রকৃতির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব। বস্তুত, সর্বপ্রকার শিল্পকলার অবস্থাই এরূপ।

আরবদের সেই প্রান্তরীয় জীবন ও মূর্খতার যুগে এ অবস্থাই চলছিল। তারপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল এবং অনারবদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের কবলিত করে তাদের সব কিছুর ওপর সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। এসব সত্ত্বেও পাঠক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তারা কতখানি প্রান্তরীয় জীবনবোধ ও সাফল্যের অধিকারী ছিল। এর সাথে তাদের ধর্মীয় সততা ও নিষ্ঠা মিলে তাদেরকে অবসর বিনোদনের যাবতীয় ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যা ধর্ম ও জীবিকার সহায়ক ছিল না, তেমন সব কিছুকে তারা বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করেছিল। একমাত্র কুরআন পাঠে আবৃত্তির মাধুর্য এবং কাব্য পাঠে সুরের অনুরণন শিহরণকে তারা উপভোগ করত। কেননা এটাই ছিল তাদের অনুসৃত প্রথা ও অনুকরণীয় জ্ঞানাদর্শ।

অতঃপর যখন তাদের ওপর বিলাস-ব্যসনের প্রভাব এসে পড়ল এবং বিভিন্ন জাতির লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাদের মধ্যে সচ্ছলতার আবির্ভাব ঘটল, তখন তারা জীবনের ভোগ-সম্ভোগ আস্বাদনের চাকচিক্য ও অবসর বিনোদনের মাধুর্যের প্রতি আকর্ষিত হল। পারস্য ও রোমের সংগীতবিদরা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেজাজের অভিমুখে যাত্রা করল এবং পরিণামে আরবদের আশ্রিতপোষ্যে পরিণত হল। তার সারাঙ্গী, তানপুরা, বীণা ও বাঁশী সহযোগে গীত গাইতে আরম্ভ করল। আরবরা তাদের সুর শুনে তাদের কবিতাগুলোতেই সেই সুর আরোপ করল। মদিনায় 'নাশিত ফারেসী', 'তোয়েস', 'সায়েব' ও 'হায়ের'—আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের আশ্রিত, প্রমুখ গুণীরা অভিভূত হল। তারা আরবদের কবিতা শুনে তাতে সুর দিল এবং অদ্ভুত কৃতকার্যতা লাভ করল। তাদের নাম চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ল। তারপর তাদের কাছ থেকে 'মাবাদ' ও তার সমকালীন অন্যান্যরা এবং ইবনে সুরাইজ ও তত্তুল্য আরও অনেকে তাদের কাছে থেকে এ শিল্প গ্রহণ করল। এভাবে সংগীতশিল্প পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বনি-আব্বাসের

৪৭. আবু ইসহাক ইব্রাহীম সারী; মৃত্যু ৩১১ (৯২৩ খ্রিঃ) হিঃ (?)।

www.amarboi.org

রাজত্বকালে ইব্রাহীম ইবনে মাহদী, ইব্রাহীম মোশেলী ও তৎপুত্র ইসহাক এবং তৎপুত্র হাম্মাদের সাধনায় এসে পূর্ণতা লাভ করল। বস্তুত, তাদের সাম্রাজ্য বাগদাদে এ শিল্পটি এতদূর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে, তার বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কিত জলসাসমূহের কথা এ বর্তমানকাল পর্যন্ত আলোচিত হয়ে থাকে।

ঐ সময়ের লোকেরা সর্বদা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকত। তারা নৃত্যের জন্য পৃথক পোশাক, লাঠি এবং সুর-আরোপিত কবিতা ব্যবহার করত। এ বিষয়টিই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তাদের অবসর বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হত। এ নৃত্যের ক্ষেত্রে অন্য কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একটি পৃথক ধারা তৈরি করা হয়েছিল, তাকে বলা হত 'খুরজি'। এটা কাঠের তৈরি একটি ঘোড়ার আকৃতি, যাতে জিনপোশ ও মেয়েলী পোশাক থাকত। নৃত্যশিল্পীরা যেন তার ওপর আরোহণ করেছে, অনুরূপভাবে আক্রমণ, পশ্চাদপসারণ এবং তরবারি নিয়ে খেলা দেখাত। ভোজসভা, বিবাহ-বাসর, ঈদ উৎসব ও অন্যান্য অবসর বিনোদনের আনন্দমেলায় এমন আরও বহু বিচিত্র বিষয়ের আয়োজন করা হত।

বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য পল্লী-শহরে এ রকম শিল্পের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল এবং সেখান থেকে অন্যত্রও এদের প্রসার ঘটেছিল। মোশেলীদের এক যুবক আশ্রিত-পোষ্য ছিল; নাম ছিল 'যরইয়াব'।[৪৮] সে তাদের কাছে থেকে সংগীতশিল্পে দীক্ষা নিয়ে খুব দক্ষ হয়ে ওঠে। এর ফলে তার প্রতি হিংসাপরবশ হয়ে তারা তাকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। সে হকম ইবনে হিশাম ইবনে আবদুর রহমান আদ্দাখেল, আন্দালুসের তৎকালীন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়। উক্ত সম্রাট তাকে খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসেন, তাকে নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করেন এবং তার জন্য জায়গীর ও ভাষা নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি উক্ত গায়ককে তাঁর সাম্রাজ্যের সভাসদদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেন। এর ফলে আন্দালুসে সে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে যেতে সমর্থ হয়; যারা পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের কাল পর্যন্ত সেখানে সংগীতের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। আশবেলিয়া (শোভিলা)-য় উক্ত শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং সেখানে সভ্যতার সজীবতা ন- হওয়ার পর তার উত্তরাধিকার সমুদ্র তীরবর্তী আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে তা বিভিন্ন শহর নগরে বিস্তৃত হয়েছিল। সাম্রাজ্য শক্তির বিলুপ্তি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের পরও বর্তমানে সেখানে তার কিঞ্চিৎ চমক বিদ্যমান।

বস্তুত এ সংগীত শিল্প সভ্যতার প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্পের শেষে আবির্ভূত হয়। কেননা ওটা একান্তই পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভ্যাস এবং অবসর বিনোদনের আনন্দ সৃষ্টি ছাড়া সাধারণভাবে একে কোন পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সভ্যতার অবক্ষয় ও বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে এ শিল্পই সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই সব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।

---

৪৮. আলী ইবনে নফী, ইনি বস্তুত দ্বিতীয় আবদুর রহমানের দরবারে বরিত হন।

www.amarboi.org

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকলা, বিশেষ করে রচনা ও গণিতশিল্পীকে বিচক্ষণতার অধিকারী করে]

এ গ্রন্থে আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মানুষের মধ্যে বিবেচনাশক্তি বলে যে বিষয়টি আছে, তা প্রথমত তার মধ্যে একান্তই সম্ভাবনার আকারে বিরাজ করে। তাকে সেই সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের মধ্যে আনতে হলে প্রথমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির সাহায্য প্রয়োজন। তারপর ওটা থেকে উক্ত শক্তি মনন ও চিন্তনের মাধ্যমে উপলব্ধির পরিপূর্ণতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাথে একাত্মতা লাভ করে। তখন সে আত্মিক সত্তায় রূপান্তরিত হয় এবং তার অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এদিক থেকে লক্ষ করলে প্রতিটি জ্ঞান ও চিন্তা তার বুদ্ধির অনন্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে থাকে। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এর বিষয় ও অভ্যাস উভয়ই সর্বদা এমন একটি জ্ঞানগত বিচক্ষণতার সৃষ্টি করে, যা মূলত এর অভ্যাসেরই ফলশ্রুতি। এ দিক থেকে বলতে গেলে প্রতিটি অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি বাড়ায়। বিভিন্ন শিল্পকর্মের অভ্যাস বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনও বিচক্ষণতার জন্ম দেয়। কেননা এই শেষোক্তটি বিভিন্ন শিল্পকর্ম, যেমন, গৃহস্থালীর পরিচর্যা, সমকালীনদের সাথে জীবন-যাপন, তাদের সাহচর্য বিচিত্র ব্যবহারবিধির শিক্ষা এবং এটির পর ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠা ও তার যথাবিহিত আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির সমষ্টি হিসেবে দেখা দেয়। এ সবকিছু, করার জন্য এমন নীতি-নিয়ম শিক্ষার প্রয়োজন, যা বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব এবং এর ফলে এ সবগুলোই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়।

সমস্ত শিল্পের মধ্যে রচনাশক্তি এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার সাধন করে থাকে। কেননা এটির জন্য বিচিত্র বিষয় অধ্যয়ন এবং বিভিন্নভাবে মননের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য শিল্পে বিষয়টি তদ্রূপ নয়। এর বর্ণনা এই যে, রচনাশক্তি বস্তুত লিপির অন্তর্গত বর্ণমালার সাহায্যে বাক্যাবলিকে রূপায়িত করা এবং উক্ত বাক্যাবলির মূল উৎস হল মননের অন্তর্নিহিত ভাব-তরঙ্গ। এ ভাব-তরঙ্গ একের পর এক বিষয় অনুসরণ করে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে যায়। এর ফলে লেখক যতক্ষণ রচনাশক্তির প্রকাশে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ সে এ ভাব-তরঙ্গে নিমজ্জিত থাকে এবং এর দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ কারণেই সে প্রমাণের দ্বারা প্রামাণ্যকে অধিকার করার শক্তি অর্জন করে। এর নাম মনন শক্তি, যা দিয়ে মানুষ অজ্ঞাত বিষয়াদিকে জানার শক্তি অর্জন করেছে। এ শক্তিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে সে যে বিবেচনার পরিচয় দেয়, তাতেই তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে।

www.amarboi.org

এভাবে শিল্পের সাথে যুক্ত হবার ফলে তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আধিক্য দেখা দেয়। কেননা লেখক বিচিত্র বিষয়ে অবগাহন করে তার নির্যাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভ্যাস গড়ে তোলে। এজন্যই পারস্য সম্রাট তাঁর লেখকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা 'দেওয়ান' অর্থাৎ শয়তান অথবা উন্মাদ। কারণ তিনি তাদের এপ্রকার চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সম্রাটের এ উক্তিই লেখকদের সাথে সম্পর্কিত 'দেওয়ান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস।

এর সাথে হিসাব-নিকাশকারীদেরকেও যোগ করা যায়। কারণ হিসাব-নিকাশ শিল্পে সংখ্যার যোগ-বিয়োগজনিত এক ব্যাপক তৎপরতা বিদ্যমান। তাতেও নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টা রয়েছে। এর ফলে হিসাবকারী বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চিন্তনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এরূপ অভ্যাসের নামই বুদ্ধিমত্তা।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃজঠর থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, যে, তখন তোমরা কিছুই জান না। তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন। কতই না সামান্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ![৪৯]

---

৪৯. ভুল কোরান, ১৬, ৭৮; ৭, ১০; ২৩, ৭৮; ৩২, ৯; ৬৭, ২৩; কোরানের বিভিন্ন আয়াতের মিশ্রণে সৃষ্ট।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

[জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাদের বিভিন্ন শাখা; শিক্ষা তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার যাবতীয় কারণ; তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্টসমূহ।]

মানুষের সেই মননশক্তি সম্পর্কে ভূমিকা, যা দিয়ে তাকে সমগ্র প্রাণিজগতের মধ্যে বিশিষ্ট করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকে জীবিকা অর্জনের পথ প্রদর্শন করানো হয়েছে এবং তার স্বজাতির সাহায্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই সে স্বীয় উপাস্যের বিষয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী হয়েছে এবং রসূলগণ তাঁর কাছে থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে উৎসুক হয়েছে। এর ফলেই সে সমগ্র প্রাণিজগতকে তার বশ্যতা স্বীকার করাতে এবং তার শক্তির অধীন করতে সমর্থ হয়েছে। বস্তুত এভাবে আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দান করেছেন।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

[মানব সভ্যতায় জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই স্বাভাবিক বিষয়[১]]

এর বর্ণনা এই যে, মানুষ তার প্রাণিসুলভ অনুভূতি, গতি, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির দিক থেকে অন্যান্য প্রাণীর সাথে একই পর্যায়ের। একমাত্র মননশক্তিই তাকে প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট করেছে। এর দ্বারাই সে তার জীবিকা অর্জন করতে, তন্নিমিত্ত স্বজাতীয়দের সহযোগিতা করতে এবং উক্ত সহযোগিতার প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই কল্যাণে যে আল্লাহর কাছে থেকে নবী-রসূলের আনীত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করতে এবং এর অনুষ্ঠান ও অনুসরণ করে পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করতে সচেষ্ট হয়।

---

১. এ পরিচ্ছেদের অনুবাদ রোজেনথাল পাদটীকায় তুলে দিয়েছেন। তাঁর মতে এটা গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ কারণে রোজেনথাল এস্থলে যে পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করেছেন, তা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে নেই। সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে প্রদান করছি।

'মানুষের মননশক্তি'

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ মননশক্তির দ্বারা মানুষকে সকল প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট করেছেন এবং একে তিনি মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের আরম্ভ ও সমগ্র সৃষ্টির ওপর তার আধিপত্য বিস্তারের শেষ পরিণতি হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

এ বিষয়টির বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রাণী মাত্রেই অনুভূতিশীল। তার অস্তিত্বের বাইরে অন্য সকল বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে সে নিজ অনুভূতির মাধ্যমে চেতনা লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত বাহ্য-ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনা—যেমন শ্রুতি, দৃষ্টি, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা সচেতন হতে পারে। কিন্তু মানুষ এর অতিরিক্ত, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এমন বিষয় সম্পর্কেও চিন্তার মাধ্যমে অবহিত হতে পারে। এ শক্তি তার মস্তিষ্কের গহ্বরে নিহিত রয়েছে। এরই সাহায্যে যে তার অনুভূত দৃশ্যাবলিকে মননশক্তির দ্বারস্থ করে এবং তথা হতে নির্যাস গ্রহণের মাধ্যমে অন্য দৃশ্যের উদ্ভব ঘটায়। এ মননশক্তি, অনুভূত বিষয়াদির বাইরের দৃশ্যাবলিকে আয়ত্ত করার জন্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কোরানে একেই 'আকাইদা' বা হৃদয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয়ের অধিকারী করেছেন। 'আকইদা' বহুবচন; এর একবচন ফুয়াদ। এস্থলে এর অর্থ মননশক্তি।

এ মনন শক্তির কতকগুলো স্তর বিদ্যমান। প্রথম স্তর হল বাহ্য জগৎ সম্পর্কে এমন এটি বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধি লাভ করা, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এ ধরনের মনন মূলত ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। একেই 'বিষয়বুদ্ধি' বলা হয়। এর সাহায্যেই মানুষ তার জীবনধারণোপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ এবং এর বিপরীত বিষয়াদিকে বর্জন করে।

www.amarboi.org

মানুষ সর্বদাই এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে থাকে। নিমেষমাত্রও এর ব্যতিক্রম হয় না; বরং চোখের পলকে তার এ চিন্তা জাগ্রত হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে উদ্ভাবিত হয় বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিচিত্র শিল্পকর্ম।

অতঃপর এ মননশক্তি এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; বরং প্রাণী মাত্রের স্বভাব অনুযায়ী যা লাভ করা দরকার, তার জন্য এমন সব অনুভব ও উপলব্ধির মুখাপেক্ষী হতে হয়, যা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে থাকে না। এ করণে মননশক্তির নির্দেশ অনুসারে মানুষ এমন ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়, যাঁরা এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে শিক্ষা, অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা অথবা উপলব্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। অথবা তাঁরা তাদের পূর্ববর্ত্তী নবীদের প্রচারিত শিক্ষা থেকে তা প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ নবীরা তাঁদের সমসাময়িক মানুষকে এসব বিষয়ে অবহিত করেন এবং পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা যুগ পরম্পরায় আগ্রহের সাথে গৃহীত হতে থাকে।

অতঃপর তার মনন ও চিন্তা যে-কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করে পৃথক পৃথকভাবে আবর্তিত হয় এবং এর মৌল উপাদানের মধ্যে আগত বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অবস্থা নিরীক্ষণে রত হয়। এভাবে তার অনুশীলনের ফলে তার সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উপনীত হলে উক্ত বিষয়টি তার সামগ্রিকতায় মৌল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাদিসহ একটি বিশেষ শাস্ত্রে পরিণত হয়। উত্তর পুরুষরা এ বিশেষ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী হয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়ে থাকে এবং এরই অনিবার্য তাড়নায় শিক্ষার ধারা গড়ে ওঠে। এ কারণেই পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত। আল্লাহ্‌ই সব বিষয়ে অবগত।

মননের দ্বিতীয় স্তর হল এমন আদর্শ ও আচার-আচরণের কথা চিন্তা করা, যা দ্বারা মানুষ স্ব-সমাজ অন্যের সাথে বসবাস করতে এবং সমাজকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এ স্তরটি মূলত গুণগ্রাহিতার দ্বারা অভিজ্ঞতা পরম্পরায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং পরিণামে এগুলো একটি কল্যাণধর্মী চেতনার সৃষ্টি করে। একেই বলা হয় 'বিবেক বুদ্ধি'।

মননের তৃতীয় স্তরটি হল ইন্দ্রিয় তৎপরতার মাধ্যম ছাড়া জ্ঞান অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোন বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রচেষ্টা। একে 'কল্পনাবুদ্ধি' বলা হয়। এটা উপলব্ধি ও গুণগ্রাহিতা উভয়ের দ্বারা গড়ে ওঠে। এরা বিশেষ ধারায় এবং বিশেষ অবস্থায় সম্মিলিত হয়ে অনুরূপ ভিন্ন একটি উপলব্ধি ও গুণগ্রাহিতার জন্ম দেয়। অতঃপর এগুলো পুনরায় আরও কিছু শক্তির সাথে মিশ্রিত হয় এবং আরও কিছু জ্ঞানের জন্ম দেয়। পরিণামে এর অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সাযুয্য পার্থক্য, কারণ ও উপলক্ষসহ উপলব্ধিতে প্রকট হয়। এরূপ বিষয়াদির মননের দ্বারা মানুষ তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা বিধান করে এবং সে শুদ্ধচিন্তা ও আত্মিক উপলব্ধির শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়। এটা মানুষের অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিল্পকর্মের অন্তর্গত[২]]

এর বিবরণ এই যে, কোন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন, তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একমাত্র তার প্রাথমিক অবস্থাদি ও তার নিয়মাবলি আয়ত্তকরণ এবং তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার মূলনীতি থেকে যোগ্য সমাধানসুলভ বৈচিত্র্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিদ্যার্থী এ অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত শাস্ত্রে তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না।

বস্তুত শাস্ত্র সম্পর্কিত এ যোগ্যতা শুধু এর উপলব্ধি ও অনুধাবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, কোন বিশেষ শাস্ত্রের কোন বিশেষ সমস্যার উপলব্ধি অনুধাবনের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনকারী এবং বিশিষ্ট জ্ঞানী ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে সমধর্মিতা বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে যোগ্যতা বলতে বুঝায়, তা একমাত্র বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। অন্যেরা ওটা উপলব্ধি করতে পারে বটে; কিন্তু যোগ্যতার অধিকার তাদের নেই। এর ফলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যোগ্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্যার উপলব্ধি ও অনুধাবনই যথেষ্ট নয়।

সমস্ত যোগ্যতাই আধিভৌতিক। ওটা দৈহিক হোক অথবা মানসিক হোক— চিন্তনীয় হোক বা অন্য কিছু হোক; যেমন গণিত। বস্তুত সব আধিভৌতিক বিষয়ই উপলব্ধিগ্রাহ্য; সুতরাং তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্য প্রতিটি শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এমন বিখ্যাত শিক্ষকদের প্রয়োজন হত, যারা দেশে ও কালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বজনমান্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। তদুপরি শিক্ষাব্যবস্থা যে, একটি শিল্পকর্ম, তা এর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষার বিভিন্নতা থেকেও বুঝতে পারা যায়। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিটিতেই বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীরা এর শিক্ষাদানের জন্য বিশিষ্ট পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত সব প্রকার শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বুঝা যায় যে, উক্ত পরিভাষা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের মৌলিক উপাদানের অন্তর্গত নয়। কারণ তেমন কিছু হলে ওটা সকলের কাছেই এক হত। পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন যে, ধর্মীয় দর্শনশাস্ত্র (এলমে কালাম) শিক্ষাদানে ব্যবহৃত

---

২. এ পরিচ্ছেদটি রোজেনথালে সপ্তম পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে।

www.amarboi.org

পরিভাষার ক্ষেত্রে কীভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশেষজ্ঞরা মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় মূল নীতিশাস্ত্র (অসুলে ফেকাহ্) ও আরবি ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিটি শাস্ত্র, যাই অধ্যয়ন করার জন্য ব্রতী হওয়া যাক না কেন, আপনি এর শিক্ষাদান সম্পর্কীয় পরিভাষায় মতানৈক্য দেখতে পাবেন। সুতরাং এর দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, এগুলো শিক্ষাব্যবস্থারই শিল্প-সংক্রান্ত ফসল এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের উপাদান মূলত এক।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটা জেনে রাখুন যে, বর্তমানকালের মাগরিবের অধিবাসীদের মধ্যে এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এর কারণ অত্র অঞ্চলের জনবসতির হ্রাস, সাম্রাজ্যের দুরাবস্থা এবং এদের ফলে শিল্পকর্মের শোচনীয়তা ও বিলুপ্তি; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর উদাহরণ কায়রোয়ান ও কার্ডোভা এক সময়ে যথাক্রমে মাগরিব ও আন্দালুসের দুটি বিশিষ্ট নগরী ছিল। তাদের জনবসতিতে প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের শাস্ত্রালোচনা ও শিল্পচর্চার ব্যাপক চাহিদার ফলে সমৃদ্ধির সাগর উথলে উঠেছিল। তাদের সমৃদ্ধির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও নাগরিক জীবনের প্রয়াসের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার দৃঢ়তা এসেছিল। কিন্তু তাদের দুরবস্থা দেখা দেয়ার ফলে এ পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। আল মোহেদ সাম্রাজ্যে মারাকেশে এ বিষয়ে কিছুটা চর্চা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে আল মোহেদদের প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য থাকায় নাগরিকত্বের তেমন প্রসার প্রথমদিকে দেখা যায় নি। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের স্বল্পস্থায়িত্বের জন্য বিকাশমান নাগরিক জীবনও এর ধারা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মাদির বিকাশও খুব অল্পই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

মারাকেশের সাম্রাজ্যশক্তি বিলুপ্ত হবার পর[৩] আফ্রিকিয়া থেকে কাজী আবুল কাসেম ইবনে যয়তুন[৪] সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বাঞ্চলে গমন করেন। তিনি ইমাম ইবনে আল খতিবের[৫] শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় শাস্ত্রেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর প্রচুর জ্ঞান ও উত্তম শিক্ষাদান প্রণালীর সঞ্চয় নিয়ে তিনি তিউনিসে ফিরে আসেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে শোয়ায়েব দাকালী[৬] পূর্বাঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। ইতিপূর্বে ইনিও মাগরিব থেকে সেখানে গিয়েছিলেন এবং মিশরীয় শিক্ষাদীক্ষায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এখন তিনিও ফিরে এসে তিউনিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালীও উপকারী বলে বিবেচিত হল। তিউনিসবাসীরা তাঁদের উভয়ের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করল এবং এ শিক্ষার ধারা তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে আবর্তিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত

৩. এস্থলে ইবনে খলদুন ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে মারিনীদের দ্বারা আল মোহেদ সাম্রাজ্য বিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
৪. আবুল কাসেম ইবনে আবু বকর; ৬২১-৬৯১ (১২২৪-১২২৯ খ্রিঃ) হিঃ। ইনি ৬৪৮ ও ৬৫৬ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করেন।
৫. ইনি ইমাম ফখরউদ্দিন রাজী। ২২৮ পৃঃ ৫০ নং টীঃ দ্রঃ।
৬. মুহম্মদ ইবনে শোয়ায়েব আল হাশকুরী; মৃত্যু ৬৬৪ (১২২৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

তা কাজী মুহম্মদ উবনে আবদুস সালাম[৭] যিনি ইবনে হাজেবের[৮] বিখ্যাত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী, তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে শেষ হল। তিউনিস থেকে তিলমিসানে এ শিক্ষার ধারা ইবনে ইমাম[৯] ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা নীত হয়েছিল। ইনি ইবনে আবদুস সালামের সাথে একই শিক্ষকের অধীনে একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানকালে তিউনিসে ইবনে আবদুস সালামের শিষ্য এবং তিলমিসানে ইবনে ইমামের শিষ্যরা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, ভয় হয়, হয়ত তাঁদের শিক্ষার ধারা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে 'যাওয়াহ্' থেকে আবু আলী নাসেরউদ্দিন আহ মাশাদ[১০] পূর্বাঞ্চলে গমন করে আবু আমর ইবনে হাজেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করে তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি শিহাবউদ্দিন আল কেরাফীর[১১] সাথে একই সময়ে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় শাস্ত্রধারায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর তিনি প্রচুর জ্ঞান ও উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতিসহ মাগরিবে ফিরে আসেন। তিনি 'বেজা' (বগি)তে বসবাস অবলম্বন করে সেখানে বিদ্যার্থীদের মধ্যে শিক্ষার ধারা প্রচলিত করেন। অনেক সময় তাঁর এক শিষ্য ইমরান আল মাশাদ[১২] তিলমিসানে গমন করতেন এবং সেখানে বসবাস করে উক্ত শিক্ষা পদ্ধতির ধারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য বর্তমানকালে বগি ও তিলমিসানে তাঁদের শিষ্যের সংখ্যা খুবই কম; বরং নেই বললেই চলে।

কার্ডোভা ও কায়রোয়ানের পতনের পর থেকে ফেজ ও মাগরিবের অন্যান্য অঞ্চলে সুশিক্ষার ধারা অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয়নি। এর ফলে সেখানকার অধিবাসীদের শাস্ত্রানুশীলনের অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এসব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের সহজতম পন্থা হল কথোপকথন ও বিতর্কের মাধ্যমে ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা লাভ করা। সম্ভবত এ পদ্ধতিতেই একজন বিদ্যার্থী সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি ও এর যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ। পাঠক, আপনি এতদঞ্চলের বিদ্যার্থীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা জীবনের অধিকাংশ সময় জ্ঞানের সভায় কাটিয়েও কেমন নিশ্চুপ, কোন কথা বলা ও কারও প্রতি কিছু আরোপ করার কোন ক্ষমতাও তাদের নেই। শুধুমাত্র কণ্ঠস্থ করার দিকেই তাদের দৃষ্টি পড়ে আছে এবং তাও প্রয়োজনের ... । সুতরাং দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেও তারা জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা...র ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় যোগ্যতার অধিকারী হয় না। এর ফলে, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন, যারা তাদের বিদ্যা অর্জন সম্পূর্ণ করেছে বলে মনে হবে, তারাও

৭. আন হাওয়ারী; ৬৩৬-৭০৬ (১২৭৭-১৩৪৮ খ্রি:) হি:। ইবনে খলদুনের শিক্ষকদের অন্যতম।

৮. বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণ প্রণেতা আবু আমর উসমান ইবনে হাজেব; মৃত্যু ৬৪৬ (১২৪৯ খ্রি:) হি:।

৯. এ নামে তাঁ দুই ভাই ছিলেন; আবু যায়েদ আবদুর রহমান; মৃত্যু ৭৪৩ (১৩৪৪ খ্রি:) হি: এবং আবু মুসা ইসা; ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্লেগ মহামারীতে মৃত্যু হয়।

১০. মনসুর ইবনে আহমদ; ৬৩২-৭৩১ (১২৩৫-১৩৩০ খ্রি:) হি:। মাশাখালী (।)।

১১. আহমদ ইবনে ইদরিস; মৃত্যু ৬৪৮ (১২৮৮ খ্রি:) হি:।

১২. ইমরান ইবনে মুসা; ৬৭০-৭৪৫ (১২৭২-১৩৪৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কোন দায়িত্ব পালন, বির্তক অনুষ্ঠান ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে! তাদের এমন ক্রটির একমাত্র করণ তারা যথার্থ শিক্ষা ও এর প্রয়োজনীয় ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। অথচ এতদ্সত্ত্বেও তাদের কণ্ঠস্থ করার শক্তি অন্য সকলের চেয়ে বেশি এবং এ ব্যাপারেই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কারণ তাদের ধারণা শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে এ মুখস্থ করাকেই বুঝায়। যদিও প্রকৃত অবস্থা মোটেও তা নয়।

এর আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে এই বিষয়ের মধ্যে যে, মাগরিবে বিদ্যার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের নির্দিষ্ট সময় হল ষোল বছর; অথচ তিউনিসে এ সময় মাত্র পাঁচ বছর। সম্ভবত এটাই জানা মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের সর্বাপেক্ষা কম সময়। এর মধ্যেই বিদ্যার্থী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে সাফল্য লাভ করে অথবা ব্যর্থ হয়। কিন্তু মাগরিবে বর্তমানকালে এটা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় নির্ধারণের একমাত্র কারণ সেখানকার শিক্ষাব্যস্থার ক্রটি। এর ফলে সেখানকার বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জন এমন একটি কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এতে অন্য কোন রহস্য নেই।

আন্দালুসবাসীদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের সেই ধারা আর অবশিষ্ট নেই। শত শত বছর ধরে মুসলমান জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে তাদের মধ্য থেকে শাস্ত্রানুশীলনের আগ্রহ লোপ পেয়েছে। একমাত্র আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য ছাড়া অন্য সব বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। তারা বহু কষ্টে একেই টিকিয়ে রেখেছে এবং উক্ত বিষয় দুটির শিক্ষার ধারা সংরক্ষণ করার ফলে তা এখনও মোটামুটি অক্ষত আছে। ধর্মীয় শাস্ত্র এখন তাদের মধ্যে মূল থেকে বিচ্যুত একটি নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তামূলক শাস্ত্রাদির ক্ষেত্রে মূল ও তার নিদর্শন কোনটিই অবশিষ্ট নেই। এর কারণ জনবসতি হ্রাসের ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষার ধারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশ স্থানই শত্রুদের কবলে চলে গেছে। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরবর্তী সামান্য অঞ্চলে এখনও তাদের আধিপত্য আছে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা জীবিকার জন্যই বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশের ওপর ক্ষমতাবান।[১৩]

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ধারা রুদ্ধ হয়নি; বরং সেখানে শাস্ত্রের বাজার তেজী এবং তার সাগর ফুলে ফেঁপে রয়েছে। কারণ সেখানে শিক্ষার ধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে সুযোগ পেয়েছে এবং জনবসতির প্রাচুর্য একে সহায়তা করেছে। যদিও এর শিক্ষার কেন্দ্র বিরাট বিরাট নগরীগুলো, যেমন—বাগদাদ, বসরা, কুফা প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তবুও আল্লাহ, তাদের অপেক্ষাও বিরাট নগরাদির দ্বারা উক্ত চর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন। ফলে উপরোক্ত নগরসমূহ থেকে শিক্ষা ইরাক আজম, খুরাসান মাওরায়ান্নাহার প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় নগর এবং কায়রো ও তার সন্নিহিত অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ কারণে উপরোক্ত নগরসমূহে জনবসতির ধারাবাহিকতা ও সমৃদ্ধির কখনও অভাব হয়নি এবং সেদিক থেকে শিক্ষার ধারাও সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পূর্বাঞ্চলবাসীরা মোটামুটিভাবে শিক্ষাদান শিল্পে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ;

১৩. কোরান; ১২, ২১।

www.amarboi.org

বরং বলা যায়, অন্যান্য সব শিল্পকর্মেই তারা দক্ষ। এজন্যই মাগরিব থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বাঞ্চলে গমনকারী অধিকাংশ বিদ্যার্থীর ধারণা এই যে, পূর্বাঞ্চলীয়রা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মোটামুটিভাবে পশ্চিমাঞ্চলীয়দের অপেক্ষা বেশি পরিপূর্ণতার অধিকারী। তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারেই বেশি সচেতন ও বিচক্ষণ। তাদের বিবেচনা শক্তি সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ীই মাগরিববাসীদের অপেক্ষা পরিপূর্ণতর। এমন ধারণা অনুসারে এসব বিদ্যার্থীরা আমাদের ও তাদের মনুষ্যত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই তারা পূর্বাঞ্চলীয়দের জ্ঞান ও শিল্পকর্মের ব্যুৎপত্তি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনি অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

বস্তুত পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এ পরিমাণ কোন পার্থক্য নেই, যাকে মানুষের সত্তাগত পার্থক্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছায় প্রথম ও সপ্তমের ন্যায় অসমভাবাপন্ন অঞ্চলদ্বয় সম্পর্কে অনুরূপ পার্থক্যের কথা বলা যায়। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উপাদানগত মিশ্রণ সেখানে অসমভাবাপন্ন হওয়ায় জীবাত্মাও তার অনুসারী হয়ে গড়ে ওঠে। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যে বিষয়টি মর্যাদাগত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে, তা হল নাগরিক জীবনের ফলশ্রুতি হিসেবে বেশি বুদ্ধিমত্তার প্রভাব; যেমন শিল্পকর্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এস্থানে তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব।

ওটা এই যে, নাগরিকগণ তাদের জীবনের সর্বাবস্থায় জীবিকা, বাসস্থান, স্থাপত্য এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ কাজে কতিপয় নিয়ম মেনে চলে। তাদের পরিশ্রম, তাদের অভ্যাস ও তাদের আচার-আচরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার তৎপরতায় এটি দেখা যায়। তারা কোন কাজ আরম্ভ করার কালে এ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে তাকে সম্পন্ন করে। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, এ নীতিগুলো যেন সীমারেখা, যা অতিক্রম করা যায় না। অথচ এমন অবস্থা সত্ত্বেও এসব বিষয় এমন কতিপয় শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে ওঠে যে, তা পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক শিল্পানুষ্ঠান জীবাত্মার ওপর এমন একটি প্রভাব বিস্তার করে, যা তাকে একটি নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এর ফলে সে অন্য একটি শিল্পকর্ম গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে এবং তার বুদ্ধিমত্তা দ্রুততার সাথে বিচিত্র বিষয়ের পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হয়।

মিশরীয়দের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষার যে পর্যায়ের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তা একান্তভাবে দুরাধিগম্য। যেমন তারা পোষা গাধা, অন্য চতুষ্পদ মূক প্রাণী ও পাখিকে এমন সব কথা এবং কাজ শিক্ষা দেয় যা তাদের বিরলত্বের জন্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাগরিববাসীরা ওটা শিক্ষা দেয়াতো দূরের কথা তার রহস্য অনুধাবন করতেই অপারগ হয়।

বস্তুত শিক্ষায়, শিল্পকর্মে ও জাতীয় অভ্যাসমূলক অবস্থাদিতে লব্ধ উত্তম নৈপুণ্য মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটায় এবং তার মননশক্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে। যোগ্যতার ব্যাপ্তিই এর উৎস। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মানুষের জীবাত্মা উপলব্ধির সাহায্যেই বিকশিত হয় এবং এরই ফলে সে যোগ্যতায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

www.amarboi.org

ক্রমাগত শিক্ষার প্রভাব তার মধ্যে যে নৈপুণ্যের জন্ম দেয়, তারই কল্যাণে তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য পরিমাণে বেড়ে গেছে। একেই সাধারণ মানুষ মানবিক সত্তার পার্থক্য বলে ধারণা করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

পাঠক, নগরবাসীদের সাথে প্রান্তরবাসীদের তুলনা করলেই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। আপনি নগরবাসীকে কেমন বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও বিচক্ষণতায় পটু দেখতে পান; এ তুলনায় প্রান্তরবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে, তার মানবিক সত্তাই বুঝি পৃথক এবং বুদ্ধির দিক থেকে তার সম্ভাবনাও বুঝি অন্তর্হিত। কিন্তু মূলত তা নয়। এরূপ পার্থক্যের একমাত্র কারণ নগরবাসী তার নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভ্যাস ও অবস্থা থেকে শিল্প ও সদাচারের নৈপুণ্য অর্জন করেছে, যা প্রান্তরবাসীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং কোন নগরবাসী যখন শিল্পনৈপুণ্য, যোগ্যতা ও শিক্ষায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে; তখন তাকে দেখে প্রত্যেক অযোগ্য ব্যক্তিরই মনে হতে থাকে যে, ওটা একমাত্র তার বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই সম্ভব হয়েছে এবং প্রান্তরবাসীদের জীবাত্মা তাদের সহজাত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ফলেই অনুরূপ নৈপুণ্য থেকে বঞ্চিত। অথচ প্রকৃত অবস্থা আদৌ তা নয়। বরং আমরা প্রান্তরবাসীদের মধ্যেও এমন লোকের সাক্ষাৎ পাই, যারা সহজাত বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির এক পরিপূর্ণ উচ্চস্তরে অবস্থান করে। বস্তুত নগরবাসীদের মধ্যে যা প্রকাশ পায়, তা শিল্পনৈপুণ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাকচিক্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ দুটি বিষয়ের প্রভাবে জীবাত্মা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

পূর্বাঞ্চলবাসীদের অবস্থা এটাই; কারণ তাও শিক্ষা ও শিল্পে মর্যাদার দিক থেকে উন্নত এবং প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দৃঢ়। তাদের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রান্তরীয় জীবনের বেশি নিকটবর্তী। এর কারণও আমরা এ পরিচ্ছেদের পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু উদাসীন প্রকৃতির সাধারণ দৃষ্টির লোকেরা এ বিষয়টিকে মনুষ্যসত্তার পার্থক্য বলে ধারণা করে এবং এর দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে বিশেষিত করে। বস্তুত এটা আদৌ সত্য নয়। পাঠক, বিষয়টি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করুন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে এটা যা ইচ্ছা বাড়িয়ে থাকেন। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপাস্য।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[জনবসতিপূর্ণ ও নাগরিকতায় সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার ঘটে]

এর কারণ, শিক্ষাদান প্রণালী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, সামগ্রিক শিল্পকর্মের অন্তর্গত এবং ইতিপূর্বে আমরা এটাই বলেছি যে, এসব শিল্পকর্মের বিকাশ একমাত্র নগর পরিবেশেই দেখা যায়। এসব পরিবেশের জনবসতির অল্পাধিক্য এবং এর নাগরিকতা ও বিলাস-ব্যসনের তারতম্যানুসারে শিল্পকর্মের মধ্যেও প্রাচুর্য ও স্বল্পতা দেখা দিয়ে থাকে। কেননা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারটিই মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং মানুষের শ্রম যখন মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হয়, তখনই একে উক্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিষয়সমূহে নিয়োগ করা হয় এবং ওটাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম। এর ফলে যে ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী অথচ পল্লীতে অথবা অসংস্কৃতিপরায়ণ কোন নগর পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পক্ষে সেখানে এ শিল্পসুলভ শিক্ষাব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রান্তরীয় জীবনে শিল্প-সংস্কৃতির একান্ত অভাব, যেমন পূর্বে বলেছি। সুতরাং তাতে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপুল জনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর পরিবেশের দিকে অগ্রসর হয়ে আসতে হবে। বস্তুত এভাবেই প্রান্তরীয় জীবনের শিল্পাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

পাঠক, আমাদের এ বক্তব্যকে ইসলামের প্রথমদিকে জনবসতিপূর্ণ বাগদাদ, কার্ডোভা, কায়রোয়ান, বসরা, কুফা প্রভৃতি নগরীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করুন। এসব নগরীর নাগরিক জীবনে সমৃদ্ধি আসার পর কীভাবে তাদের মধ্যে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর উথলে উঠেছিল। তারা শিক্ষাব্যবস্থা ও তার পরিভাষা নির্মাণে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিল এবং বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিচয় দিয়েছিল; এর ফলে তারা একদিকে যেমন পূর্বসূরিদের আয়োজনকে অতিক্রম করেছিল, অন্যদিকে তেমনই উত্তরসূরিদের জন্যও অননুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর যখন তাদের জনবসতি হ্রাস পেল ও অধিবাসীর সংখ্যা সংকুচিত হয়ে এল, তখন তাদের সেই প্রসারতাও তার সব বিষয়সহ সংকীর্ণ হয়ে উঠল। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গেল, তার শিক্ষার ধারা গেল এবং ইসলামী নগরগুলো থেকে সব কিছুই স্থানান্তরিত হল।

বর্তমানকালে আমরা দেখছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থা যা কিছু আছে তা মিশরের কায়রো নগরীতে বিদ্যমান। এর কারণ তার জনবসতি সাগর সদৃশ এবং

www.amarboi.org

হাজার বছর ধরে তার নাগরিক সমৃদ্ধি স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। এর ফলে সেখানে বিচিত্র শিল্পের বিকাশ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বিশেষভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সমৃদ্ধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে।

বিগত দুইশ বছর ধরে সম্রাট সালাহউদ্দিন ইবনে আইউবের সময় থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উক্ত অঞ্চলে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে তুর্কি আমলেও শিক্ষাব্যবস্থার এ ভিত্তি আরও সুরক্ষিত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। এর কারণ তুর্কি আমীররা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে অনেক সময় সম্রাটের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করত। বিশেষ করে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে এ উত্তরাধিকার হারাবার আশঙ্কা বদ্ধমূল ছিল। কারণ তারা সম্রাটের ক্রীতদাস ও আশ্রিত পোষ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এরূপ ক্ষেত্রে সম্রাটদের পক্ষ থেকে শাস্তি ও উৎপীড়নের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সুতরাং এসব আমীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মস্থল ও অনাথাশ্রম প্রচুর পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের পরিচালনার জন্য বিপুল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এগুলোর পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে অথবা তা থেকে অন্য উপায়ে কিছু লাভ করে যাতে তাদের বংশাবলি সচ্ছলতার সাথে জীবন-যাপন করতে পারে, তার জন্য তাতে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাও তারা করে রেখেছিল। অবশ্য এটা ছাড়াও সাধারণভাবে তাদের মধ্যে সৎকাজ ও কল্যাণধর্মীতার আকর্ষণ ছিল এবং তাদের কীর্তি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পারলৌকিক পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল। সুতরাং এসব কারণে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং তার আয় ও ফসল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের ব্যয়ভার বহনের কোন অসুবিধা ছিল না। ফলে ইরাক ও মাগরিব অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক সেখানে জ্ঞানার্জনের জন্য যাত্রা করত। এভাবে ধীরে ধীরে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটেছিল এবং তার ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[১৪]

১৪. কোরান; ৩, ৪৭।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বর্তমানকালে সভ্যতা লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার]

জেনে রাখুন, যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ উৎসাহী হয় এবং নগর পরিবেশে তাদের শিক্ষাগ্রহণ ও দানের ব্যবস্থা করে, তা দুই প্রকার। যাকে স্বাভাবিক বলা যায় এবং মানুষের চিন্তাধারাই তার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। অন্য প্রকারটি বর্ণনামূলক, যা প্রবর্তনের কাছে থেকে গ্রহণ করতে হয়।

প্রথম প্রকারটি মূলত দার্শনিক শাস্ত্রজ্ঞান, যা মানুষ তার মননশক্তির দ্বারা অবহিত হতে পারে। সে তার মানবিক উপলব্ধির দ্বারাই তার আলোচ্য বিষয়, সমস্যাদি, প্রমাণের বিশ্লেষণ ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। এমন কি এর মাধ্যমেই যে এর শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে তার সমগ্র তৎপরতা তার চিন্তাশীলতার ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়টি প্রবর্তিত ও বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টি। এর সব অংশই ধর্মীয় প্রবর্তকের কাছ থেকে প্রামাণ্য বর্ণনার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়; বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ এতে নেই। অবশ্য একমাত্র মূলনীতি থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উদ্ভাবন ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন হয়। কারণ বিস্তারিত ও পরবর্তীকালে আগত সমস্যাবলি কোন মূলনীতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিত্বে আসে না। ফলে উক্ত সমস্যাবলিকে এক প্রকার অনুমান সূত্রে মূলের সাথে মিলিয়ে সমাধান করতে হয়। অবশ্য এরূপ অনুমান সর্বক্ষেত্রেই মূলনীতিতে বিধৃত ও বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সুতরাং পরিণামে এ অনুমান প্রক্রিয়াও মূলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে বর্ণনাধারারই অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

এমন সব বর্ণিত শাস্ত্রই কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত ধর্মীয় বিধানের অন্তর্গত। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষ আমাদের জন্য যা কিছু প্রবর্তন করেছেন, তাই এসব শাস্ত্রের ভিত্তি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু শাস্ত্র রয়েছে, যা উপরোক্ত শাস্ত্রালোচনায় সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারপর এ সবগুলো শাস্ত্রই আরবি ভাষাসংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞানের অনুসারী হয়; কারণ এই আরবি জাতীয় ভাষা এবং তাতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এসব বর্ণিত শাস্ত্রের বহু শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। কারণ এসব সম্পর্কে আদিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য মহান আল্লাহর অপরিহার্য নির্দেশ সংবলিত বিধি-নিষেধ জেনে নিতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ কুরআ·· হাদীসের সরাসরি

www.amarboi.org

নির্দেশ, সর্বসম্মতি অথবা মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ কারণে তাকে সর্বপ্রথম কোরানের মর্মার্থ ও শব্দাবলির আর্থিক পরিমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। একেই বলা হয় 'এলমে তফসীর' বা ব্যাখ্যাশাস্ত্র। তারপর কোরানের বাণী, যা হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন, তা কিভাবে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে সে সূত্র বিচার এবং কুরআন পাঠে বিভিন্ন পাঠসৃষ্টিতে মতানৈক্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একেই বলা হয় 'এলমে কেরাত' বা কুরআন পাঠশাস্ত্র। এ ছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী যা হাদীসরূপে পরিচিত, তা কিভাবে শ্রুতি পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে এবং তার বর্ণনাসূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করার প্রয়োজন হয়। কারণ এ সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, সততা-অসততার মাধ্যমেই বর্ণিত বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং তার নির্দেশ আবশ্য পালনীয় বলে স্থিরকৃত হয়ে থাকে। এমন বিচার-বিশ্লেষণ, সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারকে বলা হয় 'এলমে হাদীস' বা হাদীসশাস্ত্র।

অতঃপর এসব উৎস থেকে সব সমস্যার উপযোগী মূলনীতি বের করে আনা প্রয়োজন এবং সে জন্য একটি নৈতিক মানদণ্ড স্থাপনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। যে আলোচনা ও অনুসন্ধান এ বিষয়ে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় 'অসুলে ফেকাহ' বা মূল নীতিশাস্ত্র। এর পর মূলনীতির সাহায্যে মানুষের পালনীয় যে সব ফলাফল লাভ হয়; বিধি-নিষেধ দেখা দেয়, তারই নাম 'ফেকাহ' বা ধর্মীয় শাস্ত্র।

অন্যদিকে এসব অবশ্য পালনীয় বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত; আবার অনেকগুলো হৃদয়ের সাথে। এ শেষেরটিকেই বলা হয় 'ঈমান' বা বিশ্বাস; যা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য দুটি পর্যায়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এসব বিশ্বাস্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলি, পুনরুত্থান, স্বর্গীয় সুখ ও নরকীয় শাস্তি, ভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা এবং এ সবাইকে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে বলা হয় 'এলমে কালাম' বা ধর্মীয় দর্শন।

অতঃপর কুরআন ও হাদীসের বিষয়াদি পর্যালোচনা করার পূর্বে ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কেননা উক্ত পর্যালোচনা ভাষাজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এটি কয়েক প্রকার; তার মধ্যে অভিধান, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র ও সাহিত্য। আমরা যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এসব বর্ণিত শাস্ত্রাদির সব অংশই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও সাধারণভাবে সব ধর্মেই এমন শাস্ত্রাদির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যদি থাকে, তা হলে ওটা দূরতম জ্ঞাতি হিসেবে এর সাথে এ বিষয়ের মধ্যে অংশীদার হবে যে, এসবই মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে ধর্মীয় বিধানরূপে তার প্রবর্তকের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে দেখতে গেলে এই ইসলামী শাস্ত্রাদি অন্য সব কিছু থেকে পৃথক; কেননা এটা অন্য সব ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে। এজন্যই ইসলাম-পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় আলোচনা পরিত্যাক্ত। তাতে দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় বিধান কুরআন ছাড়া অন্য ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করতে নিষেধ করেছে। হযরত মুহম্মদ (স) বলেছেন, তোমার গ্রন্থধারীদেরকে সত্যও বল না, মিথ্যাও বল না। বলো, আমরা বিশ্বাস করি, যা

www.amarboi.org

আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের উপাস্য এক।[১৫] নবী (স) উমর (রা)-এর হাতে তৌরাতের একটি পৃষ্ঠা দেখে রাগ করেছেন এবং তার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে এ ধর্মকে উজ্জ্বল সুস্পষ্টভাবে আনয়ন করিনি? আল্লাহ্‌র কসম, আজ মুসা জীবিত থাকলে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া অন্যকিছু করতে পারতেন না।

অতঃপর এসব বর্ণিত শাস্ত্রের প্রসার এ উম্মতের মধ্যে যেভাবে হয়েছে, তার বেশি ধারণা করা যায় না। এতে অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেছে, যার অতিরিক্ত কিছু আছে বলে মনে হয় না। এর পরিভাষাসমূহ সংস্কৃত হয়েছে, এর শাখা-প্রশাখাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের গন্তব্যে উপনীত হয়েছে। এর প্রতিটি শাখায় এমন ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা আদর্শ হিসেবে অনুসরণীয় এবং এমন সব গঠন-পদ্ধতি স্থিরকৃত হয়েছে, যা দিয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব। এসব বিষয় থেকে অনেকগুলোর সাথে পূর্বাঞ্চল ও অনেকগুলোর সাথে পশ্চিমাঞ্চল বিশিষ্ট হয়েছে। এসব বিখ্যাত শাস্ত্রাদি সম্পর্কে আমরা অচিরেই শাস্ত্রাদির পর্যায়ক্রমিক আলোচনা উল্লেখ করব।

বর্তমানকালে মাগরিবে শাস্ত্রাদির বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। কারণ তার জনবসতি হ্রাস পেয়েছে, এবং তার শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। জানি না, আল্লাহ্ পূর্বাঞ্চলকে কী করবেন! তবে সাধারণ ধারণা এই যে, সেখানে শাস্ত্র ও শিক্ষা-পদ্ধতির ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হবে। সেখানে নাগরিকত্বের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসী শিল্পসম্ভারেরও প্রাচুর্য থাকবে। কারণ বিপুল ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যপুষ্ট বিদ্যার্থীরা এসব ধারাকে সজীব রাখবে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তিনি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে অতিশয় পারঙ্গম এবং তাঁর হাতেই সাহায্য ও সহায়তা।

১৫. কোরান; ২৯, ৪৬।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[কুরআন সম্পর্কীয় এলমে তফসীর ও এলমে কেরাত]

কুরআন আল্লাহ্‌র নবীর ওপর অবতীর্ণ বাণীর সমষ্টি এবং গ্রন্থাকারে দুই মলাটের মধ্যবর্তী লিপিবদ্ধ অবস্থার নাম। এটি সুসংবদ্ধসূত্রে সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচারিত। অবশ্য সাহাবীরা এটি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করার সময় এর কতিপয় শব্দ, বর্ণের অবস্থান ও তাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে মতভেদ পোষণ করেছেন। এগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে সাতটি মত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এ সাতটি মতও সুসংবদ্ধসূত্রে তাদের উচ্চারণসহ প্রচারিত হয়েছে এবং যারা এসব মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের সাথে সম্বন্ধযুক্তভাবে এগুলোকে এক বিরাট দল বর্ণনা করেছেন। এর ফলে এ সাতটি পাঠ এলমে কেরাতের ভিত্তি হিসেবে স্থিরীকৃতি হয়েছে। অনেক সময় এর বাইরেও কিছু সংখ্যক পাঠভেদ এসে উক্ত সাতটি পাঠের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু কেরাতশাস্ত্রবিদদের কাছে এ অতিরিক্তগুলোর বর্ণনাসূত্র তেমন প্রামাণ্য কিছু নয়।

কোরানের এ সাতটি পাঠ কেরাতশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে সুপরিচিত। অনেকেই এ সাতটি পাঠের সুসংবদ্ধ বর্ণনা সূত্রের বিরোধিতা করেছেন। কারণ তা তাদের কাছে উচ্চারণের বৈচিত্র্য মাত্র; যার সুসমন্বিত কোন রূপ নেই। অবশ্য তা তাদের কাছে কোরানের সুসংবদ্ধ বর্ণনা সূত্রের জন্য কোন প্রকার ত্রুটি নয়। অন্য অনেকে এ মতকে অস্বীকার করে সাতটি পাঠের বিষয়টি সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে উচ্চারণের বিষয়টি ছাড়া অন্যান্যগুলো, যেমন দীর্ঘস্বর ও হ্রস্ব স্বর ইত্যাদির ব্যাপারে ধারাবাহিক বর্ণনার কথা বলেছেন। কারণ কারও পক্ষে এ উচ্চারণ ভেদ শ্রবণ করা সম্ভব নয়। এটাই শুদ্ধ মত।

কেরাতশাস্ত্রবিদরা এভাবে এসব পাঠের ধারা ও সেগুলোর বর্ণনা অব্যাহত রেখেছিলেন। এর পর শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ ও একত্রীকরণের যুগ দেখা দিল এবং যথাযথ ধারা অনুসারে গ্রন্থাদি রচনা করা হল। এর ফলে বিষয়টি একটি পৃথক শাস্ত্র ও বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হল। মানুষ একে পূর্বাঞ্চল ও আন্দালুসে পুরুষানুক্রমে বর্ণনা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব আন্দালুসে আমেরীনদের আশ্রিতপোষ্যদের অন্যতম মুজাহিদের[১৬] শাসনকাল এসে উপস্থিত হল। ইনি কোরানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কেরাত সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। কারণ তাঁর

---

১৬. মৃত্যু ৪৩৬ (১০৪৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

পৃষ্ঠপোষক আল মনসুর ইবনে আবু আমের তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং যথারীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে তৎকালীন কেরাত বিশারদদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। এর ফলে মুজাহিদ এই ব্যাপারে ব্যাপক দক্ষতার অধিকারী হন। এর পর মুজাহিদ দানিয়াও পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোর শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর কল্যাণে সেখানে এলমে কেরাতের আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে। তিনি স্বয়ং এ শাস্ত্রে একজন ইমাম বলে পরিগণিত ছিলেন। তদুপরি কেরাত সম্পর্কীয় এ বিশিষ্টতা ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পণ্ডিত্য ছিল। এর ফলে তাঁর সময়ে আবু আমর দানীর[১৭] আবির্ভাব ঘটে এবং ইনি শাস্ত্রকে চরম সীমায় উন্নীত করেন। শেষ পর্যন্ত এলমে কেরাত সম্পর্কীয় জ্ঞানের জন্য তাঁকেই আদর্শরূপে গণ্য করা হত এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র-প্রমাণ বর্ণনা ক্ষেত্রে তাঁকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। তাঁর এ সম্পর্কীয় রচনাকর্মও একাধিক। ফলত মানুষ অন্য সবাইকে ত্যাগ করে এ শাস্ত্রে দানীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং অন্য সব রচনা বাদ দিয়ে তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল্ তাইসীর'কে পাঠ্য হিসেবে বরণ করে নেয়।

অতঃপর এর সন্নিহিত বিভিন্ন যুগ ও পুরুষানুক্রম অতিক্রম করে সাতিবার অধিবাসী আবুল কাসেম ইবনে ফীর্রুর[১৮] আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি পূর্বোক্ত আবু আমরের রচনাবলির সংস্কার করে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। তিনি এ উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ পদ্য রচনা করে তাতে কেরাতশাস্ত্রবিদদের নাম আরবি বর্ণমালার ধারা অনুসারে বিবৃত করেন এবং তা যাতে সংক্ষিপ্ত ও সারল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, সে জন্য প্রচেষ্টা চালান। এর ফলে পদ্যটি সহজে কণ্ঠস্থ করার উপযোগী হয়ে উঠে। তিনি এতে কেরাতশাস্ত্রকে এক ক্ষুদ্র আধারে সন্নিবেশিত করার প্রয়াসে সাফল্য লাভ করেন। এ কারণেই মানুষ একে মুখস্থ করতে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি শিক্ষার্থীদের জন্য এটি পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত করতে তৎপর হয়। এর ফলে তদবধি এ পদ্যটি মাগরিব ও আন্দালুসের শহরগুলোতে পাঠ্য হিসেবে বিদ্যমান।

অনেক সময় এ কেরাতশাস্ত্রের সাথে আরবি লিপিশাস্ত্রকেও যোগ করা হয়। এতে কুরআনে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার গড়ন ও তাদের রেখা-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। কারণ সেখানে এমন অনেক বর্ণ ও তার রেখা-বিন্যাস বিদ্যমান, যা সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম। যেমন 'বেআয়দি' বাক্যাংশে একটি অতিরিক্ত 'ইয়া' এবং 'লা আজবাহান্নাহু' ও 'লা আউযাউ' বাক্য দুটিতে অতিরিক্ত 'আলেফ' রয়েছে।[১৯] অনুরূপভাবে 'জাযাউজ্জালেমিন'[২০] বাক্যাংশে একটি 'ওয়াউ' ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক স্থানে 'আলেফ' বর্ণটি উহ্য, আবার অনেক স্থানে তা প্রকাশ্য। 'তে' বর্ণটি অনেক স্থানে লম্বা করে লেখা হয়েছে; অথচ তা যথানিয়মে উপরে দুটি ফোঁটাসহ 'হে'র আকারে লেখা উচিত। এমন অন্যান্য বিষয়। আমরা লিপিসম্পর্কীয় আলোচনার সময় কোরানের এ লিপি-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি।

---

১৭. উসমান ইবনে সায়িদ; ৩৭২-৪৪৪ (৯৮৩-১০৫৩ খ্রি:) হি:।
১৮. ৫৪৮-৯০ (১১৪৪-৯৪ খ্রি:) হি:।
১৯. পূর্ব হতে যথাক্রমে কোরান; ৫১; ৪৭; ২৭, ২১; ৯, ৪৭ দ্র :।
২০. কোরান; ৫, ২৯;৫৯, ১৭।

www.amarboi.org

সুতরাং এসব বিষয় যখন লিপির সাধারণ গড়ন ও তার নিয়মাবলির বিরোধী বলে পরিচিত হল, তখন এগুলোকে সংখ্যায়িত করে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষ এ উদ্দেশ্য সাধনে গ্রন্থ রচনা করল এবং শেষ পর্যন্ত তা পূর্বোল্লেখিত মাগরিবের আবু আমর দানীর হাতে এসে পৌঁছল। তিনি বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বহু পুস্তিকা রচনা করলেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'কিতাবুল মুকনী'। মানুষের কাছে এটা খুবই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল এবং তারা এর ওপর নির্ভরও করল। তারপর এ বিষয়টিকে পূর্বোক্ত আবুল কাসেম সাতেবী 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে একটি বিখ্যাত পদ্যে বর্ণনা করলেন। মানুষ খুব আগ্রহসহকারে তাকে কণ্ঠস্থ করতে লাগল। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে নাজাহ্[২১] এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ আলোচনা করেছেন। ইনি মুজাহিদের আশ্রিত পোষ্য এবং আবু আমর দানীর শিষ্য ছিলেন। দানীর শিক্ষা ও গ্রন্থাদির বর্ণনাকারী হিসেবেই ইনি সমধিক পরিচিত।

অতঃপর এ বিষয়ে আরও মতভেদ দেখা দিল। উত্তরসূরিদের মধ্যে মাগরিবে আল খার্রাজ[২২] 'রেজাখ' ছন্দে এসব লিপিগত বৈষম্য নিয়ে একটি পদ্য রচনা করলেন। তাতে তিনি পূর্বোক্ত 'কিতাবুল মুকনী'র অতিরিক্ত অনেক লিপি-বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে এই নতুন বৈষম্যের উল্লেখকারীদের সূত্রও বিদ্যমান ছিল। পদ্যটি মাগরিবে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মানুষ আগ্রহসহকারে একে কণ্ঠস্থ করার জন্য গ্রহণ করে। এর ফলে আবু দাউদ, আবু আমর ও সাতেবীর গ্রন্থাদি পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। অন্তত লিপিসংক্রান্ত ব্যাপারে এ অবস্থা তাদের মধ্যে দেখা দেয়।

তফসীর

অতঃপর তফসীর সম্পর্কে বলতে গেলে, জেনে রাখুন, কুরআন আরবের ভাষায় ও তাদের বাক্‌বৈদগ্ধ্য অনুসারেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এর ফলে তাদের প্রত্যেকেই এর অর্থ বুঝতে পারত এবং এর একক শব্দাবলির অর্থ ও বাকবিন্যাসের তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হত। কুরআন বিভিন্ন উপলক্ষের পরিপ্রেক্ষিত আল্লাহ্‌র একত্ব ও নানাপ্রকার কর্তব্য নির্দেশে অংশ ও শ্লোকপরম্পরায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে যেমন নিছক বিশ্বাস-নির্ভর ধারণা আছে, তেমনি আছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক বিধিনিষেধ। এর মধ্যে অনেক নির্দেশ পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে ও অনেকগুলো পরে এবং এ পরবর্তীগুলো অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নির্দেশকে রহিত করেছে। নবী (স) এসব সম্পর্কীয় সব কিছুই তাদের জন্য বিশদ করতেন। যেমন আল্লাহ্ মহান বলেছেন, 'যাতে তুমি তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াদি বিশদ করতে পার।'[২৩] সুতরাং নবী (স) সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিশদ করতেন, রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেন এবং সাহাবীদেরকে তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁরা বুঝতে পারতেন এবং বিভিন্ন আয়াত অবতরণের কারণ ও এর যথার্থ উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমে জেনে

২১. ৪১৩-৯৬ (১০২২-১১০৩ খ্রি:) হিঃ।
২২. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৭০৩ (১৩০৫ খ্রি:) হি: (?)
২৩. কোরান; ১৬, ৪৪।

www.amarboi.org

নিতে সমর্থ হতেন। যেমন মহান আল্লাহ্র এ বাণী—'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে'[২৪]—থেকে জানা গিয়েছিল যে, এটি নবী (স)-এর তিরোধানের ইঙ্গিত। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

এসব বিষয় সাহাবীদের—আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন—কাছ থেকে যথা নিয়মে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের পরবর্তীকালে তাবেয়ীগণও এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকেও এগুলো যথারীতি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে পূর্বসূরিদের প্রাথমিক স্তরে এর পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে এবং ক্রমশ সুপরিচিত বিষয়গুলো নিয়ে শাস্ত্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলিত হয় এবং অনেকেই এ বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত এটি এসে তাবারী, ওয়াকেদী, সালাবী এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য কুরআন ব্যাখ্যাতাদের কাছে পৌঁছে। তাঁরা এ বিষয় নিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছায় যতদূর সম্ভব বিচিত্র সংবাদাদি পরিবেশন করেন।

অতঃপর ভাষা সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের পর্যায়ে চলে আসে। কোরানের বাণীতে ব্যবহৃত শব্দাবলির আভিধানিক অর্থ এবং বাকবিন্যাসে স্বরচিহ্ন ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগ সম্পর্কীয় আলোচনা আরম্ভ হয়। এ বিষয় নিয়েও নানাবিধ সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়। যেহেতু এসব বিষয়ে আরবদের স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকায় তারা কোন প্রকার বর্ণনা বা গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করত না, সুতরাং তাদের উৎসাহের অভাবে মানুষ এসব বিষয় ভুলে যেতে থাকায় আরবি ভাষাভাষীদের গ্রন্থাবলি থেকে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা হল। কোরানের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও এগুলোর প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ কুরআনও আরবদের ভাষায় এবং তাদের আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

এসব বিষয়ের তাগিদে কোরানের তফসীর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এর এক ভাগ হল বর্ণিত বিষয়াদি সম্বলিত তফসীর; যা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের সমষ্টিমাত্র। এসব তফসীরে মূলত কোরানের রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদি, অবতরণের কারণ ও বিভিন্ন আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং এসব বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। পূর্বসূরিগণ এ সব বিষয়ে প্রচুর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এবং যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত আকারে একত্র করেছেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁদের গ্রন্থাবলি ও বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে ভাল, মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য ও বর্জনযোগ্য উভয় প্রকার সামগ্রীই বিদ্যমান।

এর কারণ এই যে, আরবরা গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদির কোন ধার ধারত না। তাদের প্রকৃতিতে প্রান্তরীয় জীবন ও নিরক্ষতার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। সুতরাং তারা যখন সাধারণ মানবীয় ঔৎসুক্যের তাড়নায় সৃষ্টির কার্যকারণ, পৃথিবীর প্রারম্ভ, জীবনের রহস্য প্রভৃতি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত, তখন স্বভাবতই তারা তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত এবং তাদের দ্বারা প্রদত্ত সংবাদে নিজেদের

---

২৪. কোরান; ১১০, ১।

www.amarboi.org

উৎসুক্য লাঘব করত। এসব গ্রন্থধারী ব্যক্তি তৌরাতের অনুসারী ইহুদী এবং তাদের পরবর্তী ধর্মানুসারী খ্রিস্টান। আরবদের মধ্যে অবস্থানকারী তৌরাতের অনুসারীরাও তাদের ন্যায় যাযাবর জীবনের অধিকারী ছিল। তারা এসব ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থধারীদের ন্যায়ই সহজ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইহুদী ধর্মগ্রহণকারী হিমিয়ার বংশীয় লোক। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও এমন সব ধ্যান-ধারণা পোষণ করত, যার সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক ছিল না। যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভ সম্পর্কীয় ধারণা, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়াদির বাণী ও আভাস এবং এমন অন্যান্য বিষয়। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাব আল আহবার[২৫] ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ,[২৬] আবদুল্লাহ ইবনে সাল্লাম[২৭] ও অনুরূপ অন্যান্যদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ফলত এ শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বর্ণনায় তফসীর গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত এসব বর্ণনার উৎস তারাই এবং এগুলো এমন বিধি-নিষেধ সম্পর্কীয়ও নয়, যাতে এগুলো কার্যকরী করার জন্য অনুসন্ধান পূর্বক শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কুরআন ব্যাখ্যাতারা এ ব্যাপারে অনুরূপ কারণেই শৈথিল্য দেখিয়ে এ জাতীয় বর্ণনার দ্বারা তাদের তফসীর গ্রন্থগুলো পূর্ণ করে তুলেছেন। এসব বর্ণনার মূল ভিত্তি, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, সেই তৌরাতের অনুসারীদের জ্ঞান, যারা যাযাবরী জীবনচর্চায় অভ্যস্ত। তাদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণের জন্য তাদের খ্যাতি ও ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন প্রামাণ্য উপকরণ নেই। যেহেতু তারা নিজ ধর্ম ও জাতির কাছে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির অধিকারী, সুতরাং তাদের কাছ থেকে এসব বিষয় গ্রহণ করতে কোন অসুবিধার কথা মনে হয়নি।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ এসব বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনার সম্মুখীন হয়েছে। মাগরিব অঞ্চলে উত্তরসূরিদের মধ্যে আবু মোহাম্মদ ইবনে আতিয়া[২৮] এ শ্রেণীর সব তফসীর গ্রন্থের বিষয়াবলিকে সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য শুদ্ধ বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি এসব বিষয়ে সুন্দরভাবে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন, যা মাগরিব ও আন্দালুসে খুবই সুপ্রচলিত হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে কুরতবী[২৯]ও অনুরূপভাবে একই প্রক্রিয়ায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পূর্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তফসীরের দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল মূলত ভাষা সম্পর্কীয়। এতে শব্দার্থ, স্বরচিহ্ন, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যথানিয়মে কোরানের বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তফসীরের এ শ্রেণীটি তুলনামূলকভাবে প্রথমটি থেকে কম সংখ্যক। কারণ প্রথম শ্রেণীর তফসীরের বিবরণধারাই কুরআন ব্যাখ্যার মূল লক্ষ্য। তদুপরি এ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয় একমাত্র ভাষা সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকর্মে পরিণত

---

২৫. প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ নং টীকা দ্র:।
২৬. পূর্বোক্ত।
২৭. আবদ আল্লাহ্ ইবনে সালাম।
২৮. আবদুল হক ইবনে গালেব; ৪৮১-৫৪২ (১০৮৮-১১৪৭ খ্রি:) হি:।
২৯. মুহম্মদ ইবিনে আহমদ ইবনে ফরাহ; মৃত্যু ৬৭১ (১২৭৩ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

হওয়ার পরই উদ্ভাবিত হয়েছে। অবশ্য অনেক তফসীরকার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে এগুলোর বর্ণনায় অনেক স্থানে ব্রতী হয়েছে।

এ বিষয়কে মূল উপজীব্য করে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যে তফসীরটি রচিত হয়েছে তার নাম 'আল কাশ্‌শাফ'। এর রচয়িতা ইরাকের খোয়ারজম নিবাসী আল্লামা জমখশরী।[৩০] ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ইনি মুতাজেলাপন্থী। এর ফলে উক্ত তফসীরকার কোরানের বিভিন্ন আয়াতে যেখানে বিরোধের ব্যাপার আছে, সেখানে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে মুতাজেলাদের বিকৃত মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে আহ্‌লে সুন্নতের বিশেষজ্ঞরা এ তফসীর সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন এবং সাধারণ পাঠককে তার ফাঁদগুলো থেকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত তফসীরটির ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। পাঠক যদি এ তফসীর পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আহ্‌লে সুন্নতের মাতদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণের জ্ঞান তার থাকে, তা হলে অবশ্যই যে উক্ত তফসীরে বর্ণিত বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বস্তুত অনুরূপ অবস্থায় তার উচিত এ তফসীর থেকে উপকৃত হওয়া; কারণ ভাষা সম্পর্কীয় বিরল জ্ঞানসম্ভারে এটা পরিপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে ইরাকের এক বিজ্ঞব্যক্তির রচনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাঁর নাম শরফউদ্দিন তৈয়বী[৩১] এবং তিনি ইরাক আজমের তাবরিজের অধিবাসী। তিনি তাঁর রচনায় জমখশরীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে আক্ষরিক দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করেছেন বটে; কিন্তু মতাদর্শের ক্ষেত্রে মুতাজেলাবাদকে যোগ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি এটিও বিশদ করেছেন যে, কোরানের আয়াতের অন্তর্গত অলঙ্কারশাস্ত্র সেই বক্তব্যকেই উপস্থিত করে, যা আহ্‌লে সুন্নতের; মুতাজেলাদের নয়। তিনি সমস্ত আলঙ্কারিক শস্ত্রজ্ঞানসহ এদিক থেকে একটি উত্তম কাজ করেছেন। বস্তুত তিনি সব জ্ঞানী অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী।[৩২]

---

৩০. ৪২ নং টীকা দ্র:।

৩১. হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্; মৃত্যু ৭৪৩ (১৩৪৩ খ্রি:) হি:।

৩২. কোরান; ১২, ৭৬।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি]

হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংখ্যা প্রচুর এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে রহিতকারী ও রহিতকৃত হাদীস সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা। কেননা আমাদের ধর্মীয় বিধানে এ রহিতকরণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যা কিছু নির্দেশ করেছেন, তাতে অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সহজীকরণের জন্য তিনি পুনরায় নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা এজন্যই কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই, যাতে তার চেয়ে ভাল কিছু, অথবা তার অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারি।'[৩৩]

বস্তুত রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যদিও কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে সাধারণ, তবুও কোরানের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়াটি তফসীর গ্রন্থগুলোতে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। সুতরাং যখন দুটি হাদীস আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং কোন প্রচার ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয়ে ওঠে না তখন ওগুলোর মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের বিষয়টি স্থির করতে হয় এবং তার মাধ্যমে অগ্রবর্তীটি রহিতকৃত ও পশ্চাদ্বর্তীটি রহিতকারী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এ বিষয়টি হাদীসশাস্ত্রে খুবই কঠিন। যুহরী বলেছেন, ধর্মশাস্ত্রবিদগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের মধ্যে রহিত অরহিতের বিষয়টি জানতে গিয়ে খুবই দুরবস্থা ও অসম্ভাব্যতার সম্মুখীন হয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে অদ্ভুত দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

হাদীস[৩৫] শাস্ত্রের একটি দিক হল বর্ণনাসূত্রের বিচার-বিবেচনা এবং সূত্রান্তর্গত পূর্ণ শর্তাদির প্রাপ্তির ভিত্তিতে হাদীসের বিষয়বস্তু অবশ্য পালনীয় প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করা।

---

৩৩. কোরান; ২, ১০৬।

৩৫. নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদের একটি ভিন্ন পাঠ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমাদের ব্যবহৃত পাঠটি তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি মনে করেন এ পাঠটি পরে সংশোধিত হয়। আমাদের ব্যবহৃত মূল সংস্করণের পাদটীকাতেও এ সংশোধিত পাঠটি বিদ্যমান। সুতরাং গ্রন্থের সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা এর অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করছি।
হাদিসশাস্ত্রের একটি দিক হল সেসব নীতির জ্ঞান লাভ করা যা নেতৃস্থানীয় হাদিসবিদগণ বর্ণনাসূত্র সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ, তাদের নাম, তাদের পরস্পর হতে হাদিস গ্রহণের ধারা, তাদের

www.amarboi.org

কারণ হাদীসের মর্মানুযায়ী বিধি-নিষেধ তখনই অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য হবে, যখন তার সম্পর্কে এ বিশ্বাস জন্মাবে যে, সত্যই তা হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছ থেকে

অবস্থা ও শ্রেণী এবং তাদের পরিভাষার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য প্রবর্তন করেছেন। এর ফলাফলের গুরুত্ব এদিক হতে যে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই হাদিসের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হওয়ার জন্য এর সত্যতা সম্পর্কে প্রতীতি জন্মানো প্রয়োজন। সুতরাং গবেষককে অনুরূপ প্রতীতির জন্য অবশ্যই এর সূত্র বিচার করে দেখতে হবে। এটা করতে গিয়ে তারা হাদিসের সূত্রাদি পরীক্ষা করবেন; সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে ন্যায়নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্তি এবং এসব সম্পর্কে ন্যয়নিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় হাদিসবিদদের মন্তব্য অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করবেন। অতঃপর এ ব্যাপারে তাদের স্তরভেদ : তাদের পরস্পরের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণের ধারা, যথা—উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ, তার সামনে উস্তাদের হাদীস পাঠ, উস্তাদের সম্মুখে তার হাদিস পাঠ, তাকে উস্তাদ কর্তৃক হাদিস লিখে দেয়া, লিখে নিতে সাহায্য করা, অনুমতি দেয়া এবং এসব সংক্রান্ত বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে উস্তাদদের মন্তব্য বিচার করে দেখতে হবে।

হাদিসশাস্ত্রবিদদের মতানুসারে সর্বোচ্চ মর্যাদার হাদিস হল 'সহিহ' (শুদ্ধ), এর পর 'হাসান' (ভাল) এবং সর্বনিম্ন মর্যাদার হাদিস 'জয়ীফ' (দুর্বল) বলে খ্যাত। এ সর্বনিম্ন স্তরটিতে 'মুরসাল' (একজনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন), 'মুনকাতি' (একসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'মুঘাল' (দুসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'মুআল্লাল' (কোন প্রকার অনিশ্চয়তা যুক্ত), 'শাখ' (একক), 'গরিব' (বিরল) ও 'মুনকার' (সন্দেহযুক্ত) প্রভৃতি হাদিস বিদ্যমান। এদের মধ্যে অনেকগুলো বর্জন ও অনেকগুলোর গ্রহণ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহিহ্ হাদিস সম্পর্কেও তাদের এ প্রকার মতানৈক্য বিদ্যমান। অনেকে এর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন; আবার অনেকে এ ব্যাপারে মতভেদ উপস্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত এসব সম্পর্কীয় পরিভাষা নিয়েও মতানৈক্যের অন্ত নেই।

অতঃপর তারা হাদিসের অন্তর্গত বক্তব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি বিচারের ক্ষেত্রেও এধারা অনুসরণ করেছেন। এর ফলে বক্তব্যের অসুবিধাগুলো পরিচয়ের জন্য 'গরিব' (অস্বাভাবিক), 'মুশকিল' (কষ্টসাধ্য), 'তাসহিফ (বিকৃত), 'মুকতারিক' (বিচ্ছিন্ন), 'মুখতালিফ' (দ্ব্যর্থবোধক) প্রভৃতি পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। তারা এসব বিষয়ের প্রতিটির জন্য পৃথক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে গিয়েছেন। যাতে এসব বিষয়ের মর্যাদা, শিরোনাম, সূত্রান্তর্গত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্তি সম্ভব হতে পারে।

নেতৃস্থানীয় হাদিসশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তিনি আবু আবদুল্লাহ্ হাকেম। বস্তুত তিনিই এসব নীতিকে সংশোধিত ও সংমার্জিত আকারে পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তার রচনাবলি সর্বজন পরিচিত। অতঃপর নেতৃস্থানীয় বহু হাদীসশাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। উত্তরসূরিদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা হলেন আবু আমর ইবনে সেলাহ। তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। মহীউদ্দিন আন নববী অনুরূপ দক্ষতার সাথে তাঁকে অনুসরণ করেন।

এ শাস্ত্রটি এর বিষয়বস্তুর দিক থেকে অতিশয় সম্ভ্রান্ত। কেননা এর মাধ্যমেই ধর্মপ্রবর্তকের কাছ থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহকে বিচার করে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা সংরক্ষিত করার জ্ঞান লাভ হয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে হাদিস বর্ণনাকারীদের পরিচয় সমগ্র ইসলামী শহর-নগরে সুবিদিত। তাঁদের মধ্যে অনেকে হেজাজে, অনেকে কুফায়, অনেকে বসরায়, অনেকে সিরিয়া ও মিশরে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের সকলেই সমসাময়িককালে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। এক্ষেত্রে হেজাজবাসীদের হাদিস বর্ণনার দ্বারা অন্য সকলের অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের ছিল। তাঁরা সূত্র, মূল বক্তব্য প্রভৃতির ব্যাপারে বিশুদ্ধতার জন্য কঠোর নিয়ম পালন করতেন। তাঁরা বর্ণনায় শর্তাদির ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাকে অত্যধিক মূল্য দিতেন। অপরিচিত ও অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁরা হাদিস গ্রহণ করতে সর্বদা দ্বিধান্বিত হতেন।

www.amarboi.org

বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে সূত্র-বিচারে এ প্রয়োজনীয় বিশ্বাস জন্মায়, তার সম্পর্কে অবশ্যই খোঁজ-খবর নিতে হবে। এটা আর কিছু নয়, হাদীস বর্ণনাকরীদের সততা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করা মাত্র। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সে সব বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ জ্ঞানীদের মতামত দ্বারাই এ বিশ্বাস উৎপাদন হতে পারে, যারা তাদের ন্যায়নিষ্ঠার জন্য দোষত্রুটি মুক্ত রয়েছেন। এরূপভাবে সূত্রবিচারের ফলাফল দ্বারাই আমরা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

এসব হাদীস বর্ণনাকরীদের মধ্যে সাহাবী ও তাবেয়ীগণও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও এ ব্যাপারে স্তরবিন্যাস ও পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়োজন এবং এ অনুসারে প্রত্যেককে বিবেচনা করা দরকার। অনুরূপ বর্ণনাসূত্র কখনও সংযুক্ত এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়। যেমন বর্ণনাকারী যার কাছ থেকে বর্ণনা করছে, তার চাক্ষুস সাক্ষাৎ পায় না। অনেক সময় হাদীসের মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনাসূত্রকে দুর্বল করে তোলে এবং তা সূত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। এদের মধ্যে সর্বোচ্চটি গ্রহণ এবং সর্বনিম্নটি বর্জনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে মতানৈক্য বিদ্যমান। তারা হাদীসের এমন বিভিন্ন অবস্থা বোঝানোর জন্য কিছু সংখ্যক পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'সহিহ' (শুদ্ধ), 'হাসান' (ভাল), 'জয়ীফ' (দুর্বল), 'মুরসাল' (একজনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন), 'মুনকাতি' (একসূত্র বিচ্ছিন্ন) 'মুযাল' (দুসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'শায' (একক), 'গরিব' (বিরল) এবং এমন আরও অনেক পরিভাষা, যা তাদের মধ্যে সুপ্রচলিত। তারা এর প্রতিটি নিয়ে একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছেন এবং তার মধ্যে ভাষাবিদদের সংশ্লিষ্ট মতামত বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বর্ণনাকারীদের একে অপরের কাছ থেকে গ্রহণের পর্যায়টি তারা বিবেচনা করেছেন। তারা কি পাঠের মাধ্যমে, লিপির দ্বারা, লিপিকৃত বিষয়াদির ওপর অনুমতি গ্রহণ অথবা কিছু সংখ্যক হাদীস অন্যকে শিক্ষা দিবার অনুমতিপত্র লাভের সাহায্যে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন! তদুপরি এসব বিষয়ে পর্যায়ক্রমেরও তারতম্য বিদ্যমান। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের এ সম্পর্কে গ্রহণ-বর্জনের যে মতানৈক্য বিদ্যমান, তাও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এর পর তারা এসব বিষয়কে অনুসরণ করে হাদীসের মূল বক্তব্যের অন্তর্গত শব্দাবলির বিবেচনা করতে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রেও 'গরিব' (বিরল), 'মুশকিল' (কষ্টসাধ্য), 'তাসহিফ' (বিকৃত), 'মুফতারিক' (বিচ্ছিন্ন), 'মুখতালিফ' (দ্ব্যর্থবোধক) এবং অনুরূপ অন্যান্য পরিভাষা বিদ্যমান। এগুলোই, যাতে হাদীসশাস্ত্রবিদরা সাধারণভাবে তাদের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে থাকেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়ে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই হিজাজে, অনেকে বসরায়, অনেকে কুফায় এবং অনেকে সিরিয়া ও মিশরে অবস্থান করছিলেন। তাদের সকলেই সমসাময়িককালের কাছে পরিচিত ছিলেন। এক্ষেত্রে হিজাজবাসীদের বর্ণনাসূত্র সমসাময়িক অন্য অঞ্চলের অপেক্ষা উচ্চ পর্যায় এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শুদ্ধতর অবস্থায় বিরাজমান ছিল। কারণ তাঁরা বর্ণনাসূত্রের মধ্যে ন্যায় ও সততাকে অতিশয় কঠোরতার

www.amarboi.org

সাথে পালন করতেন এবং অপরিচিত অবজ্ঞাত কারও কাছে কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করতেন না।

এ হিজাজী বর্ণনাধারায় পূর্বসূরিদের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্ব ে.ন ইমাম মালেক (রা)। তিনি মদিনার বিজ্ঞজন ছিলেন। তারপর তাঁর সহচরবৃন্দের মধ্যে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী (রা) ইবনে ওহাব'[৩৬] ইবনে বুকাইর,[৩৭] আল কানী,[৩৮] মুহম্মদ ইবনে হাসান[৩৯] এবং তাঁদের পরবর্তীকালে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁদের তুল্য অন্যান্য জ্ঞানীরা এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

এ শাস্ত্রালোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বিধানসমূহ একান্ত শ্রুতিনির্ভর মাত্র ছিল। পূর্বসূরিরা এ ব্যাপারে নিয়োজিত হয়ে যথার্থ শুদ্ধ সূত্রাদি খুঁজে বের করতেন এবং তাকে পরিপূর্ণতা দান করতেন। ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ রচনা করলেন এবং তাতে তিনি সর্বসম্মত শুদ্ধ বিধি-বিধানসমূহ একত্র করে তাকে ফেকাহ্শাস্ত্রের ধারা অনুসারে অধ্যায়ে বিভক্ত করলেন। এর পর হাদীস কণ্ঠস্থকারীগণ হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন ধারা ও তার সূত্রাদির বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন। এর ফলে দেখা গেল, অনেক সময় একটি হাদীসই বিভিন্ন বর্ণনাকারী ও বিচিত্র সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেক সময় তার অন্তর্গত বিচিত্র বিষয়ের জন্য একাধিক অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়ার যোগ্যতা বহন করছে। এ সময়ে তৎকালীন হাদীসশাস্ত্রবিদদের শিরোমণি ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারি আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁর সূত্রসিদ্ধ সংকলনে হিজাজী, ইরাকী ও সিরিয়াবী তথা সব ধারায় প্রাপ্ত সব হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করলেন। তিনি তাঁদের সকলের ঐকমত্যের দ্বারা বর্ণিত হাদীসগুলোই সংগ্রহ করেছিলেন এবং যাতে মতভেদ ছিল তা পরিহার করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীসমূহ বিষয় অনুসারে একাধিক অধ্যায়ে বারংবার বর্ণিত হয়েছে এবং এর ফলে তাঁর হাদীসগুলো বারংবার উল্লেখের দ্বারা আবর্তিত হয়েছে। এজন্য বলা হয় যে, তাঁর সংকলনে সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার[৪০] দুইশ হলেও তার মধ্যে তিন হাজারই বারংবার উল্লেখিত। অবশ্য এসব বারংবার উল্লেখিত হাদীসের জন্য প্রতিটি অধ্যায়েই পৃথক ধারা ও সূত্র বিদ্যমান।

অতঃপর আবির্ভূত হলেন ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহঃ)। তিনি তার সূত্রসিদ্ধ সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে বোখারির পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত হাদীসসমূহ ছাড়া বারংবার উল্লেখিত হাদীস ত্যাগ করলেন। তিনি সব ধারা ও সূত্র একত্র করে তাঁর সংগ্রহকে ফেকাহ্শাস্ত্র ও তার শিরোনাম অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে সব শুদ্ধ হাদীস

---

৩৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব; ১২৫-১৯৭ (৭৪৩-৬১৩ খ্রি:) হি:।

৩৭. ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুকাইর; ১৫৪-২৩১ (৭৭১-৮৪৫ খ্রি:) হি:।

৩৮. আল কানাবী (?); আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসলামা; মৃত্যু ২২১ (৮৩৬ খ্রি:) হি:।

৩৯. ইনি সম্ভবত মুহম্মদ ইবনে হাসান আল ওয়াসেতী আল মুজানী, যাকে ইমাম বোখাদ্দা [তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩ (৮০৩ খ্রি:) হিজরী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৪০. অন্যত্র 'সাত হাজার'।

www.amarboi.org

সংকলন করতে সক্ষম হননি। এ কারণে মানুষ নানাবিষয়ে তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহের অতিরিক্ত হাদীস সংযোজনে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

এর ফলে তারপর আবু দাউদ সিজস্থানী, আবু ইসা তিরমিজী ও আবু আবদুর রহমান নেসাঈ তাঁদের হাদীস সংকলনে সহিহ হাদীস অপেক্ষা বেশি ব্যাপক ভিত্তিতে সংগ্রহ কাজ পরিচালনা করেন এবং যাতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী শর্তাদি অনুসারে হাদীসটি গৃহীত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ রাখেন। তাঁদের আরোপিত শর্তাদির ক্ষেত্রে যা উচ্চশ্রেণীর, তাই সহিহ্ (শুদ্ধ) হিসেবে সুপরিচিত এবং এছাড়া যা তারচেয়ে নিম্নশ্রেণীর 'হাসান' (ভাল) ও অন্য কিছু তাও তাঁরা ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা হিসেবে সংগ্রহ করেছেন।

মুসলমানদের কাছে এগুলোই সূত্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন এবং এগুলোই ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সব প্রকার হাদীস সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির উৎসমূল। পরবর্তীকালে এসব গ্রন্থের পরিমাণ যদিও অনেক হয়েছে, তবুও সাধারণভাবে এগুলোকেই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[৪১]

হাদীস আলোচনায় এসব শর্ত ও পরিভাষার জ্ঞান অর্জন করাকেই 'এলমে হাদীস' বলা হয়। কখনও এটি থেকে রহিতকারী ও রহিতকৃত হাদীসসমূহকে পৃথক করে তাকে একটি একক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এরূপ 'গরিব' (বিরল) হাদীসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে মানুষের বহু বিখ্যাত রচনা বিদ্যমান। তারপর সুসামঞ্জস্য ও বিরোধী হাদীসসমূহ একত্রে পৃথকভাবে প্রকাশ করেও অনেকে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বস্তুত এ হাদীসশাস্ত্রে মানুষ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের মধ্যে একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ্ আল হাকেম। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীসের মধ্যকার বহু দোষ-ত্রুটি দূর করে তার সৌন্দর্যকে

৪১. রোজেনথালে এ অনুচ্ছেদ ও এর পরবর্তী অনুচ্ছেদটি পাঠে কিছুটা ব্যতিক্রম ও সংযোজন বিদ্যমান। এটাও পরবর্তী সংশোধিত পাঠ বলে গৃহীত। গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে প্রদান করছি।
এগুলোই ইসলামী জগতে ধর্মীয় বিধানের উৎস হিসেবে গৃহীত হাদিস সংকলন এবং এগুলোই আহলে সুন্নত কর্তৃক গৃহীত হাদিসগ্রন্থ। এ পাঁচটি গ্রন্থের সাথে আরও সংকলন সংযোজিত হয়েছে; যেমন আবু দাউদ তায়ালসীর 'মুসনাদ' এবং আল বাজ্জার, আদব ইবনে হুমাইদ দারেমী, আবু ইয়ালা মোশোলী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুরূপ সংকলনাদি। ইবনে সালেহের মতানুসারে পরবর্তী এসব হাদিস সংকলয়িতার উদ্দেশ্য ছিল সাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত সমুদয় হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ করা, তাদের প্রমাণ উপস্থিত করা নয়।
যাহোক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তৎপুত্র আবদুল্লাহ্র কাছে তাঁর সংকলন গ্রন্থ 'মুসনাদ' সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থিত করতেন, তাতে জানা যায় সংকলনে হাদিসের সংখ্যা একত্রিশ হাজার। ইমাম সাহেবের সহচরদের মাধ্যমে অনুরূপ এক বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, তিনি সাড়ে সাত লক্ষ হাদিসের মধ্যে বাছাই করে উক্ত পরিমাণ হাদিস তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছ থেকে বর্ণিত যে সকল হাদিসের মধ্যে তাদের সত্যতা সম্পর্কে বিতর্ক বিদ্যমান, পাঠক, আপনি তেমন কিছু এ সংকলনে পাবেন না। সুতরাং এগুলো দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভবপর। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইবনে সালেহের পূর্বোক্ত বক্তব্য এস্থলে প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি ইমাম আহমদের বক্তব্যকে ইবনে জওজী রচিত 'মানাকিযে ইমাম আহমদ' নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছি।

www.amarboi.org

প্রকটিত করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল আবু আমর ইবনে সালাহের রচনা। ইনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। মহিউদ্দিন আন নববী অনুরূপভাবে তাঁকে অনুসরণ করে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন।

যাহোক শাস্ত্রটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ; বস্তুত এর সাহায্যে ধর্মপ্রবর্তকের কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো সংরক্ষিত হয়। অবশ্য এ কালে কোন প্রকার হাদীস প্রকাশ করা এবং তা পূর্বসূরিদের সংগ্রহের সাথে যোগ করার বিষয় আর অবশিষ্ট নেই। কেননা স্বভাবতই এর সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ঐসব হাদীসশাস্ত্রবিদ তাঁদের সংখ্যাধিক্য, সমকালীন অবস্থান, যোগ্যতা ও সাধনার দ্বারা সমগ্র হাদীসই সংগৃহীত করেছেন। তাঁরা এমন কোন দিক উদাসীনতার মধ্যে পরিত্যাগ করেন নি, যাতে পরবর্তী লোকেরা নিজেদেরকে ব্যাপৃত করতে পারেন। বস্তুত এরূপ কোন ধারণা পোষণ করা একান্তই অসম্ভব। সুতরাং একালে এ বিষয়ে একমাত্র কর্তব্য দাঁড়িয়েছে মূল গ্রন্থাবলিকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখা, সংকলয়িতাদের কাছ থেকে বর্ণনার ধারা সংরক্ষণ করা এবং তাঁদের বর্ণিত সূত্রাদির সত্যতা যাচাই করে দেখা। এগুলোর ওপর হাদীসশাস্ত্রবিদদের দ্বারা নির্দিষ্ট ও প্রচলিত নীতিমালা এবং শর্তাদি প্রয়োগ করে বিবেচনা করা, যাতে সব বর্ণনাসূত্র তাদের গন্তব্য পর্যন্ত সুসংবদ্ধতায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। বস্তুত এটি ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই এই মূল পাঁচটি সংকলনের বাইরে অতিরিক্ত কিছু করা সম্ভব হয়েছে।

এসব সংকলনের মধ্যে বোখারির মর্যাদা সর্বোচ্চ। মানুষ এর ব্যাখ্যা ও এর বর্ণনাধারা বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন বলে মনে করে। কারণ এরূপ কিছু করতে হলে তাদেরকে হিজাজ, ইরাক ও সিরিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারা, এগুলোর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ, তাদের অবস্থা এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত জানতে হয়। তদুপরি তাঁর অধ্যায়গত শিরোনাম ব্যবহারের ব্যাপারটিতে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কারণ বোখারী একটি অধ্যায় বিশেষ শিরোনাম ব্যবহার করে একটি হাদীসকে বিশেষ সূত্র ও ধারায় এর অধীনে বর্ণনা করেন। এভাবে শিরোনামে শিরোনামে হাদীসটি তার বিচিত্র বিষয় ও বিভিন্নতাসহ বহু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়ে আবর্তিত হয়।[৪২] যে ব্যক্তি একে

৪২. এর পরও রোজেনথালে দুটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে এবং রোজেনথাল কর্তৃক ব্যবহৃত একাধিক সংকলনে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।
অধ্যায়ে ব্যবহৃত শিরোনামগুলো আলোচনা করলে প্রতিটি অধ্যায় ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসটির মধ্যকার সম্পর্কের কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। যাহোক, অনেক ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কটি অস্পষ্ট এবং বহু ব্যক্তিই একে স্পষ্ট করার জন্য বাগবিস্তার করেছেন।
অনুরূপ বিষয় নিম্নলিখিত অধ্যায় শিরোনামটির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। যেমন : 'গৃহটি এমন একজন আবিসিনীয় ব্যক্তির দ্বারা বিনষ্ট হবে যার ক্ষুদ্র দুটি পা থাকবে।' এ হাদিসটি গোলযোগ (ফিতন) অধ্যায়ে বর্ণিভ হয়েছে। এর পর ইমাম বোখারী কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন—'এবং যখন আমরা গৃহটিকে মানুষের মিলনস্থল ও আশ্রয় করলাম'। এছাড়া উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এর ফলে উক্ত অধ্যায় শিরোনামা ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসটির সম্পর্কে মানুষের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অনেকে বলেছেন যে গ্রন্থকার প্রথমে অধ্যায় শিরোনামগুলোকে তাঁর সংকলনের। খসড়ার লিপিবদ্ধ করেছিলেন, পরে তদনুযায়ী প্রাপ্ত হাদিস তাতে সংকলিত করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং এ প্রকার অসম্পূর্ণভাবেই তাঁর গ্রন্থটি বর্ণিত হয়।

www.amarboi.org

ব্যাখ্যা করতে যাবেন, তিনি যদি এসব বৈচিত্র্য সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করতে না পারেন, তা হলে তাঁর ব্যাখ্যা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। যেমন আমরা ইবনে বাত্তাল,[৪৩] ইবনে মুহাল্লাব,[৪৪] ইবনে তীন[৪৫] প্রমুখের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আমরা আমাদের শিক্ষকদের অনেককে বলতে শুনেছি—আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি দিন; বোখারির ব্যাখ্যা জাতির একটি ঋণ বিশেষ। এ কথার দ্বারা তাঁর এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন জ্ঞানীই এদিক থেকে এর যোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে সমর্থ হননি।

মসুলিমদের বিশুদ্ধ সংকলন সম্পর্কে মাগরিববাসীরা খুবই শ্রদ্ধাশীল। তারা একেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং বোখারীর ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা বোখারী আলোচনার জন্য এমন অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর শর্তানুসারে শুদ্ধ নয় এবং তার ব্যবহৃত শিরোনামগুলোতেই এর অধিকাংশ বিদ্যমান। মালেকী মজহাবের শাস্ত্রবিদ ইমাম মারেজী[৪৬] মুসলিমের সংকলনের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'আলমুলেম বেফাওয়ায়েদে মুসলিম'।[৪৭] এতে তিনি এলেম হাদীসের বিচিত্র উৎস এবং ফেকাহশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর একে পূর্ণতা দান করেছেন কাজী ইয়ায[৪৮] এবং পরিশিষ্ট যোগ করে এর নাম রেখেছেন 'ইকমালুল মুলেম'।[৪৯] তাদের উভয়কে অনুসরণ করে তারপর মহীউদ্দিন নববী উক্ত উভয় গ্রন্থের সামগ্রিক ব্যাখ্যার পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং এদের ওপর আরও কিছু যোগ করে বিষয়টি সম্পূর্ণ করে তুলেছেন।

এছাড়া অন্যান্য হাদীস সংকলন, যা থেকে ফেকাহশাস্ত্রবিদরা প্রচুর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, তাদের অধিকাংশের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট ফেকাহ গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান। অবশ্য তাদের এলমে হাদীস সম্পর্কীয় পৃথক রচনাও বিদ্যমান এবং মানুষ এর উপরও কাজ

যাহোক, আমি গ্রানাডার কাজী ইবনে বাক্কারের কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য জানতে পেরেছি। ইনি ৭৪১ (১৩৪০ খ্রি:) হি: সনে তায়িফার যুদ্ধে মারা যান। কাজী ইবনে বাক্কার বোখারীর সংকলনের অধ্যায় শিরোনাম বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেছেন, বোখারী এ অধ্যায় শিরোনাম ব্যবহার করে কোরানের আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। আয়াতের বর্ণনাটিকে তিনি ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে নয়, বরং আইনানুগ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় এক্ষেত্রে যে, আয়াতের অর্থ 'আমরা করলাম' কে 'আমরা ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করলাম' করতে হয়। যদি একে 'আমরা নিয়মানুসারে করলাম' করা যায়, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না এবং দুটি ক্ষুদ্র পা-বিশিষ্ট লোক দ্বারা এর বিনষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমি এ ব্যাখ্যাটি আমাদের শিক্ষক আবুল বরাক্কাত আশ বাকেল্লানীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। ইনি উপরোক্ত ইবনে বাক্কারের বরাত দিয়ে এটি বর্ণনা করেছেন। আল বাকেল্লানী তাঁর একজন সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

৪৩. আলী ইবনে খলফ; মৃত্যু ৪৪৯ (১০৫৭ খ্রি:) হি:।

৪৪. অজ্ঞাত।

৪৫. অজ্ঞাত।

৪৬. আল মাজরী (?); মুহম্মদ ইবনে আলী; ৪৫৩-৫৩৬ (১০৬১-১১৪২ খ্রি:) হি:।

৪৭. মুসলিমের উপকারিতার জ্ঞান দানকারী।

৪৮. ইয়ায; ইবনে মুসা; ৪৭৬-৫৩৪ (১০৮৩-১১৪৯ খ্রি:) হি:।

৪৯. 'মুলেম' নামক গ্রন্থের সম্পূর্ণতা।

www.amarboi.org

করেছে তারা এ সংকলনের মধ্যেও এলমে হাদীস, তার আলোচ্য ধারা এবং বর্ণনা সূত্রের অন্তর্গত সাধারণ হাদীসের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, বর্তমানকালে সব শ্রেণীর হাদীসেরই মর্যাদা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। তার মধ্যে কোনটি সহিহ, কোনটি হাসান, কোনটি জঈফ, কোনটি 'মালুল' (ত্রুটিপূর্ণ) ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এবং বিশেষজ্ঞ তত্ত্ববিদেরা বিশ্লেষণ করে সুপরিচিত করে তুলেছেন। সুতরাং যা পূর্বে শুদ্ধ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাকে শুদ্ধ করার আর কোন অবকাশ নেই। বস্তুত হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সব হাদীসের ধারা ও বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে এতটা অবহিত ছিলেন যে, যদি কোন হাদীস তাঁদের সামনে তার যথার্থ ধারা ও সূত্র ছাড়া উপস্থিত করা হত, তা হলে তার কাঠামোর পরিবর্তন সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন। ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারি সম্পর্কে অনুরূপ একটি ঘটনা বিদ্যমান। তিনি বাগদাদে উপস্থিত হলে সেখানকার হাদীসবিদরা তাঁকে পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা কিছু সংখ্যক হাদীসের সূত্র পরিবর্তন করে সেগুলোর সম্বন্ধে তাঁর অবহিতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এগুলো সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবে আমাকে অমুক এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছে যে,—এ বলে তিনি সবগুলো হাদীসের সঠিক সূত্র এবং প্রতিটির পাঠকে যথাস্থানে সংস্থাপন করলেন। তাঁর এ দক্ষতা দেখে সকলে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলেন।

পাঠক, আরও জেনে রাখুন যে, ধর্মীয় বিধানের গবেষক ইমামগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আধিক্য ও স্বল্পতার অধিকারী। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সতের অথবা তার নিকটবর্তী কোন পরিমাণ। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর কাছে তাঁর 'মুয়াত্তা' সংকলনে যা শুদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে, তার পরিমাণ তিনশ বা অনুরূপ কিছু। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সূত্রসিদ্ধ সংকলনে হাদীসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার।[৫০] তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হাদীসই বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ হীনমনা ব্যক্তি—একথা বলে থাকেন যে, তাদের মধ্যে যারা স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীস সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান অল্প বলেই এটি হয়েছে। বস্তুত তাঁদের ন্যায় সর্বজনমান্য ধর্মশাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কারণ তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মীয় মতামত কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই সংস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং তাঁদের মধ্যে যার প্রত্যক্ষভাবে হাদীসের জ্ঞান স্বল্প, তাঁর উপর অবশ্যই এর অনুসন্ধান ও বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কে আগ্রহ ও আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যাতে ধর্মীয় বিধান যথার্থ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধর্মপ্রবর্তক যে সব নির্দেশ রেখে গেছেন তা অবশ্যই

৫০. কোন কোন সংস্করণে হাদিসের পরিমাণ ৪০ হাজার ও ৩০ হাজার বলেও উল্লেখিত হয়েছে। ৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

তাঁকে জেনে নিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে যারা স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন; এর কারণ হাদীস বর্ণনায় যে বাকবিতণ্ডা দেখা দেয় এবং এর বিভিন্ন ধারায় যে প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান, তা তাঁরা পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। কেননা এ ক্ষেত্রে সূত্রান্তর্গত বিচার-বিবেচনাই অধিকাংশের কাছে অগ্রাধিকার পায়। সুতরাং তাদের গবেষণার প্রয়োজনে তাঁরা হাদীসের এ সূত্রবিচার ও বিভিন্ন ধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে যাননি। এজন্য তাঁদের কাছে যা সুস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

তদুপরি সাধারণভাবে হিজাজবাসীরা ইরাকবাসীদের অপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ মদিনা হিজরতের স্থান ও সাহাবীদের আবাসকেন্দ্র ছিল। সেখান থেকে যাঁরা ইরাকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশ সময় ধর্মযুদ্ধে অতিবাহিত করেছেন। ইমাম আবু হানিফার হাদীস বর্ণনার পরিমাণ স্বল্প হওয়ার কারণ তিনি বর্ণনার শর্তাদি সম্পর্কে কঠোরতা ও সুবিবেচনার ধারা পোষণ করতেন। তিনি অনেক বিশ্বাস্যসূত্রের হাদীসকেও বাস্তবতা বিরোধী হওয়ার ফলে দুর্বল বলে ত্যাগ করেছেন। এ কারণে তাঁর হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হাদীসের সংখ্যা স্বল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি ইচ্ছা করে হাদীস বর্ণনা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর চরিত্র এরূপ কাজ থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর এ পরিচয়ই যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে যে, তিনি ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় গবেষক ইমামদের অন্যতম। হাদীসশাস্ত্রবিদরাও তাঁর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর উপর নির্ভর ও এর নির্দেশের ধারায় গ্রহণ-বর্জন করতে তৎপর হয়েছেন।

অবশ্য তিনি ছাড়া অন্য হাদীসশাস্ত্রবিদগণ, যাদের সংখ্যা প্রচুর, তাঁরা হাদীস সম্পর্কীয় তাঁদের শর্তাদিতে আরও ব্যাপকতার সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁদের হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত তাঁদের প্রত্যেকেই গবেষণায় রত। এমনকি ইমাম আবু হানিফার সহচররাই তাঁর পরবর্তীকালে আরোপিত শর্তাদিতে প্রসারতা সৃষ্টি করায় তাঁদের হাদীস বর্ণনা অনেকগুণে বেড়ে গেছে।

তাহতাবী[৫১] প্রচুর হাদীস বর্ণনা করে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন; যদিও এটি বোখারি ও মুসলিমের ধারায় প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ হাদীসবিদরা বলেন যে, বোখারী ও মুসলিম তাদের সংকলনদ্বয়ে যে শর্তাদি আরোপ করেছেন, তা জাতির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত; কিন্তু তাহতাবীর আরাপিত শর্তাদি তদ্রূপ নয়। তিনি অনেক অবজ্ঞাত ও অন্যবিধ ব্যক্তির কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাঁর গ্রন্থের উপরে বিশুদ্ধ দুটি সংকলন স্থান পেয়েছে। এমন কি 'সুনন' সংকলনরূপে পরিচিত সংকলনগুলোও তাঁর সংকলনকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে গেছে। কারণ তাহতাবী তাঁদের আরোপিত শর্তাদি পূরণ করতেও সমর্থ হননি। এ জন্যই বোখারী ও মুসলিমের সংকলনদ্বয়কে তাঁদের আরোপিত শর্তাদির সর্বসম্মতিক্রমে

৫১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩২১ (৯৯৩ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

গৃহীত বিশুদ্ধতা অনুসারে সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠক, এ ব্যাপারে আপনার মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকার কথা নয়। কারণ তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য যথার্থ অজুহাত সৃষ্টির অধিকার জাতির অবশ্যই আছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সব বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।[৫২]

---

৫২. ইহার পরেও রোজেনথালে একটি সংযোজন বিদ্যমান। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য ইহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি।
হাদীস শাস্ত্রের অন্য একটি দিক হইল এই সকল সংকলনে সংগৃহীত হাদীসমূহকে উহাদের অধ্যায় ও শিরোনাম অনুসারে একের পর এক আলোচনা করা এবং এইরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মাবলি প্রয়োগ করা। এই প্রকার কাজ হাদীসবিশারদ আবু উমর ইবনে আবদুল বার[ক], আবু মুহম্মদ ইবনে হজম[খ], কাজী ইয়ায[গ], মহীউদ্দিন নববী[ঘ], ইবনে আত্তার[ঙ] এবং পূর্ব-পশ্চিমের আরও বহু বিশিষ্ট ধর্মীয় শাস্ত্রাধিনায়কগণ করিয়াছেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহাদের হাদীস সম্পর্কীয় বর্ণনার আরও বহু বিষয়; যেমন হাদীসের পাঠ; ভাষা ও ব্যাকরণ ইত্যাদিও ধারণ করিয়া আছে। তথাপি তুলনামূলকভাবে হাদীস বর্ণনার সূত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই তাঁহাদের আলোচনায় অধিক ও বিস্তারিতভাবে আসিয়াছে।
এইগুলিই বর্তমানকালে নেতৃস্থানীয় হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট প্রচলিত হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। আল্লাহ্ সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং উহা লাভ করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন।
ক. ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ : ৩৬৮-৪৬৩ (৯৭৮-১০৭১ খ্রি:) হি:।
খ. তৃতীয় অধ্যায় ৫৯নং টীকা দ্র:।
গ. ৪৮নং টীকা দ্র:।
ঘ. ৪৮নং টীকা দ্র:।
ঙ. নববীর শিষ্য আলী ইবনে ইব্রাহিম; ৬৫৪-৭২৪ (১২৫৬-১৩২৪ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ফেকাহ্‌শাস্ত্র এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়ভাগ]

ফেকাহ্‌ হল বান্দাদের ওপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদিষ্ট অবশ্য পালনীয়, নিষিদ্ধ, অনুমোদনযোগ্য, অপছন্দনীয়, বৈধ ইত্যাদি বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ করা। এগুলো কুরআন, হাদীস এবং ধর্মপ্রবর্তক প্রচলিত বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুত অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-নিষেধকেই ফেকাহ্‌ বলা হয়।

পূর্বসূরিরা এসব যুক্তি-প্রমাণ থেকে মতানৈক্যের সাথে বিভিন্ন বিধি-বিধান আবিষ্কার করতেন। তাঁদের এমন মতানৈক্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁরা যে বক্তব্য থেকে প্রমাণাদি সংগ্রহ করতেন, তা আরবি ভাষায় লিখিত এবং এসব বক্তব্যের শব্দাবলিতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনার তাগিদে ও বিশেষ করে তার সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধানের যোগ থাকায় তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য খুবই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তদুপরি হাদীসের বিভিন্ন ধারা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্গত বিধি-বিধানের পরস্পর বিরোধিতা যে-কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার দিকে আকর্ষণ করত। এর ফলে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য অনিবার্য হয়ে উঠত। অন্যদিকে কুরআন-হাদীসের নির্দিষ্ট বক্তব্যের বাইরে প্রমাণাদির ক্ষেত্রে সর্বদা মতানৈক্য বিদ্যমান। এটি ছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বক্তব্যে সমাধান অনেক সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত বক্তব্যের মধ্যে সমাধানের যে সম্ভাবনা থাকে, তাকে পরিস্ফুট করতে যেয়ে সমস্যার সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। ফলে এসব বিষয়েই মতানৈক্যের ব্যাপারটি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। এসব দিক থেকেই পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সকলের মধ্যে মাতনৈক্যের বাস্তবতা এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

অতঃপর সাহাবীদের মধ্যে সকলেই ধর্মীয় বিধানদানের যোগ্য ছিলেন না এবং ধর্মীয় মতামতও সকলের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রসর হয়ে আসতেন, যারা কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং এর রহিতকারী ও রহিতকৃত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ও অন্যান্য সব নির্দেশাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। এগুলো তাঁরা স্বয়ং নবী (স) অথবা তাঁর কাছে থেকে শ্রবণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'কারী' (পাঠক) বলে অভিহিত করা হত অর্থাৎ যারা কুরআন পাঠ করতে পারেন। কারণ আরবরা জাতি হিসেবে নিরক্ষর ছিল। এ কারণে তৎকালে তাদের পাঠকের বিরলত্বের জন্যই পাঠকারীদের প্রতি এ বিশেষণ প্রয়োগ করা হত। ইসলামের প্রথম দিকের অবস্থা অনুরূপই ছিল। তারপর ইসলামী নগরগুলোর

www.amarboi.org

অবস্থা প্রসারতা লাভ করল এবং গ্রন্থাদির সাথে পরিচিত হয়ে আরবদের নিরক্ষরতাও দূরীভূত হল। নানাবিধ গবেষণা ও ফেকাহ্শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং তা শিল্পকর্ম ও শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠল। সুতরাং এসব কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তখন 'কারীর' পরিবর্তে 'ফকিহ্' (বোদ্ধা) ও 'আলেম' (জ্ঞানী) বলে ডাকা হল। ফেকাহ্শাস্ত্রও তাঁদের মধ্যে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগে সিদ্ধান্ত ও অনুমানের প্রধান্য দেখা দিল এবং ইরাকবাসীরা এর অনুসারী হলেন। অন্যভাগে হাদীসবিদরা প্রাধান্য বিস্তার করলেন এবং হিজাজবাসীরা একে প্রাধান্য দিলেন। ইরাকবাসীদের মধ্যে হাদীসের প্রসার কম ছিল; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাঁরা অনুমানকেই বেশি ব্যবহার করলেন এবং তাতে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'আহ্লে রায়' (সিদ্ধান্তবাগীশ) আখ্যা দেয়া হল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মতামত প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং যাঁর অনুসারীর ব্যাপকতা দেখা দিল, তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা। হিজাজে এ বিষয়ে প্রথমে নেতৃত্ব দিলেন ইমাম মালেক এবং তাঁর পরবর্তীকালে ইমাম শাফেয়ী।

এর পর কিছু সংখ্যক জ্ঞানী অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং তার দ্বারা কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তাঁরা নীতিবিরুদ্ধ বলে মত দিলেন। তাঁদেরকে 'যাহেরিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁরা ধর্মীয় বিধানের সব উৎসমূল কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সর্বসম্মতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন এবং প্রকাশ্য অনুমান ও বক্তব্য সংলগ্ন কার্যকারণকে বক্তব্যের সুস্পষ্টতায় ফিরিয়ে আনলেন। কারণ যে বিশেষ কার্যকারণ উপলক্ষ করে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, তাই সর্বত্র তার নির্দেশকে বহন করে আনে। এ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দাউদ ইবনে আলী,[৫৩] তাঁর পুত্র[৫৪] ও তাঁদের সহচরবৃন্দ।

উপরোক্ত তিনটি মতাদর্শই জাতির মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সুপরিচিত ছিল। নবী বংশীয়রা তাঁদের অভিনব মতাদর্শের সমন্বয়ে একটি বিরল পন্থা ও সে জন্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ মতাদর্শের ভিত্তি করেছিলেন কতিপয় সাহাবীর প্রতি দোষারোপ, তাঁদের ইমামদের পবিত্রতা এবং তাঁদের মধ্যকার সর্বপ্রকার মতানৈক্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ন্যায় কিছুসংখ্যক কাল্পনিক নীতি-নিয়মকে। খারেজীরাও অনুরূপ বিরল পথের পথিক হয়েছিলেন। সর্বসাধারণ তাঁদের এমন মতাদর্শকে গ্রহণ করেনি; বরং তারা এর সমালোচনা করতে অস্বীকার করেছিল। এর ফলে আমরা এসব মতাদর্শ সম্পর্কে কোন কিছু জানতে পারি না এবং তাঁদের গ্রন্থাদির কোন বর্ণনাও কোথাও দেখতে পাই না। একমাত্র তাঁদের আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোথাও এদের কোন নিদর্শন নেই। শিয়ারা তাদের অঞ্চল এবং মাগরিবে, পূর্বাঞ্চলে ও ইয়ামেনে প্রতিষ্ঠিত তাদের সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিল। খারেজীরাও অনুরূপ প্রচেষ্টার অধিকারী। বস্তুত তাদের প্রতিটি দলই কিছুসংখ্যক গ্রন্থ, অন্যবিধ রচনা এবং বিরল মতামতের পৃষ্ঠপোষক।

---

৫৩. ২০২-২৭০ (৮১৮-৮৮৪ খ্রি:) হি:।
৫৪. মুহম্মদ; ২৫৫-২৯৭ (৮৬৯-৯১০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

পূর্বোক্ত 'যাহেরিয়া' সম্প্রদায়ের মতবাদও বর্তমানকালে তাদের ইমামদের অনস্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের পুস্তকাদি এখনও বর্তমান। অনেক সময় বহু বিদ্যার্থী তাদের মতবাদ সম্পর্কে অবহিত হতে এসব গ্রন্থ পাঠের কষ্ট স্বীকার করে। তাদের ফেকাহ্‌শাস্ত্র ও মাতদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছাতেই তারা অনুরূপ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও তাতে সফলকাম হয় না। তদুপরি এমন প্রচেষ্টায় তারা সাধারণের বিরাগভাজন ও অস্বীকৃতির সম্মুখীন হয়। অনেক সময় অনুরূপ প্রচেষ্টায় নিরত ব্যক্তিদেরকে অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবক বলে মনে করা হয়। কারণ তারা এসব মতবাদ পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলো থেকে গ্রহণ করে মাত্র; কোন শিক্ষকের সাহায্য তারা পায় না।

ইবনে হজম[৫৫] আন্দালুসে এরূপ কাণ্ড করেছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উচ্চমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ যাহেরিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধারণা অনুসারে তাদের বক্তব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের ইমাম দাউদের বিরোধিতা করেন এবং অন্যান্য মুসলিম ইমামদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে তাঁর মতাদর্শকে তুচ্ছজ্ঞান ও অস্বীকার করে। তারা তাঁর গ্রন্থাদির প্রতি উদাসীনতা দেখিয়ে পরিত্যাগ করে; এমনকি এগুলো বাজারে বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় এগুলো ছিঁড়ে টুকরা টুকরাও করে ফেলা হয়। সুতরাং পরিণামে সিদ্ধান্তবাদী ইরাকবাসীদের মতাদর্শ এবং হাদীসবাদী হিজাজবাসীদের মতাদর্শই টিকে রয়েছে।

ইরাকবাসীদের মতাদর্শের কেন্দ্রীয় শক্তি হলেন তাদের ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত। ফেকাহ্‌শাস্ত্রে তাঁর স্থান অতুলনীয়। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষরাই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী এসব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন।

হিজাজবাসীদের ইমাম হলেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস আল আসবাহী। তিনি হিযরতভূমি মদিনার ইমাম; আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন। তিনি ধর্মীয় বিধানের জন্য অন্যদের কাছে সুপরিচিত উৎসগুলো ছাড়াও একটি অতিরিক্ত উৎস সংযোগের মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এ উৎসটি হল মদিনাবাসীদের আচরণ। কেননা তিনি দেখেছেন যে, মদিনাবাসীরা গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, তা তাঁদের পূর্বসূরিদের অনুসরণের ফলেই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এর উৎস সেই পুরুষে গিয়ে পৌঁছায়, যাঁরা হযরত মুহম্মদ (স)-এর ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর আদর্শ তাঁর কাছে থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে বিষয়টি তাঁর কাছে ধর্মীয় প্রমাণাদির একটি নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য অনেকেই এ বিষয়টিকে 'ইজমা' বা সর্বসম্মতির সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে অস্বীকার করেছেন। কারণ সর্বসম্মতির ব্যাপারটি শুধু মদিনাবাসীদের ঐক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা সমগ্র জাতির সম্মতির ব্যাপার।

---

৫৫. তৃতীয় অধ্যায় ৫৯ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

পাঠক, জেনে রাখুন, ইজমা তথা সর্বসম্মতি বলতে যা বুঝায়, তা হল গবেষণালব্ধ কোন ধর্মীয় বিধানের ওপর সকলের মতৈক্য। কিন্তু মালেক (রহঃ) মদিনাবাসীদের আচরণকে এ পর্যায়ে বিবেচনা করেননি। তিনি একে পুরুষানুক্রমে অনুসৃত ও দৃষ্ট এমন একটি ঐকমত্য বলে মেনে নিয়েছেন, যার উৎস ধর্মপ্রবর্তকের ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। এর ফলেই এরূপ ঐকমত্যের অনুসরণের দায়িত্ব সমগ্র জাতির ওপরই বর্তায়। এ বিষয়টিকে সর্বসম্মতির অধ্যায়ে এজন্যই বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তা সর্বসম্মতির সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ। কারণ তাতে যে ঐকমত্য বিদ্যমান, তার সাথে সর্বসম্মতির একটি বাহ্য ঐক্য আছে; যদিও ইজমার বিষয়টি হল গবেষণা ও বিবেচনালব্ধ প্রমাণাদির ওপর ঐকমত্য এবং মদিনাবাসীদের ঐকমত্য হল পূর্বসূরিদের আচরণ প্রত্যক্ষ করে কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করার বিষয়। যদি এ বিষয়টি নবী (সঃ) এর ক্রিয়াকলাপ, বক্তব্য অথবা অন্য প্রকার বিচিত্র প্রমাণ; যেমন—সাহাবীদের কার্যাবলি, পূর্বসূরিদের ধর্মাচরণ, সাহচর্য প্রভৃতির সাথে বর্ণনা করা হত, তা হলে সর্বাপেক্ষা ভাল হত।

অতঃপর মালেক ইবনে আনাসের পরবর্তীকালে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস মুত্তালেবী শাফেয়ী (রঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ইমাম মালেকের পরে ইরাকে গমন করে ইমাম আবু হানিফার সহচরদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে তিনি হিজাজবাসীদের ধারাকে ইরাকবাসীদের ধারার সাথে মিশ্রিত করেন এবং একটি নতুন মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি বহু মতামতে ইমাম মালেকের বিরোধিতা করেছেন।

তাঁদের দুজনের পরে আসেন আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। ইনি হাদীসবিদ হিসেবে খুব উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহচরগণ হাদীসের বিরাট পুঁজির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফার সহচরদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। এর ফলে তাঁরাও একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন।

এভাবে এই চারজন ইমামের মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য সব শহরে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছল এবং অন্য সব মতাদর্শ পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হল। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিচিত্র পরিভাষা ও মতামত সৃষ্টির ব্যাপকতা দেখা দেয়ায় মানুষ মতানৈক্যের বিপুল ধারাকে সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হল। কারণ এর অধিকাংশই যথার্থ গবেষণার বস্তু ছিল না এবং যারা এ কাজের যোগ্য নয়, তারাও আসর জমিয়ে বসছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেকেও ছিল, যাদের মতাদর্শ বা ধর্ম কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদের অযোগ্যতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পেয়ে মানুষকে এ চার ইমামের আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাঁদের প্রত্যেকেই একটি বিশিষ্ট অনুসারী দলের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের একজনকে ছেড়ে অন্যজনকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কেননা এরূপ আচরণের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে খেলা করার একটি প্রবৃত্তি বিদ্যমান। সুতরাং এভাবে বিষয়টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় বর্তমানকালে ফেকাহ্শাস্ত্রের কাজ হল ঐসব ইমামের মতাদর্শ বর্ণনা করা এবং প্রতিটি অনুসারীর তাঁর নিজের ইমামের বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে তাঁর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করা। বস্তুত বর্তমানকালে গবেষণার আর কোন অবকাশ নেই; যে-কোন সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের আলোকে বিচার

www.amarboi.org

করার প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে এবং নতুন কোন গবেষণা ও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এ যুগে পৃথিবীর সব মুসলমান এ চারজন ইমামের অনুসারী হয়ে উঠেছে।

তাঁদের মধ্যে আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীর সংখ্যা কম। এর কারণ তিনি গবেষণা অপেক্ষা বেশি মাত্রায় হাদীসের অকৃত্রিম নির্দেশের উপর নির্ভর করেছেন এবং একটি নির্দেশকে অন্য নির্দেশের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বিধান রচনা করেছেন। তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই সিরিয়া এবং ইরাকের বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী। অন্য সব দল অপেক্ষা তারাই বেশি মাত্রায় হাদীসের বর্ণনায় আগ্রহী এবং সেই অনুপাতে অনুমান প্রক্রিয়ার প্রতি যথাসম্ভব উদাসীন। বাগদাদে এক সময়ে তাদের সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি ছিল। এর ফলে সেখানে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিয়াদের সাথে তাঁদের ঝগড়া লেগেই থাকত এবং ক্রমশ এক সময়ে তা বিরাট আকার ধারণ করে। তাতারীরা বাগদাদে আধিপত্য বিস্তারের পর এ প্রতিপত্তি কমে যায় এবং পুনরায় তা আর ফিরে আসেনি। বর্তমানে হাম্বলীদের অধিকাংশ সিরিয়ায় বাস করে।

ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের সংখ্যা বর্তমানকালে ইরাক, হিন্দ, চীন, মাওরায়ান্নাহার এবং অনারব সব দেশেই প্রচুর বিদ্যমান। যেহেতু তাঁর মতাদর্শটি ইরাক ও ইসলামী রাজধানী বাগদাদের সাথে বিশিষ্ট ছিল এবং আব্বাসী খলিফাদের সহচররা উক্ত মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, এজন্যই তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল। তদুপরী শাফেয়ীদের সাথে বিতর্কিত বিষয়াদির মীমাংসায় তাদের যুক্তি-প্রমাণ অত্যন্ত সুন্দর এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের রচনার পরিমাণ ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সে সব বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ বিষয় এবং যুক্তিতর্কের আশ্চর্য উদাহরণ সবাই মানুষের সামনে বিদ্যমান। অবশ্য মাগরিবে এর সামান্য অংশই আছে এবং তাও কাজী ইবনে আরবি[৫৬] ও আবুল ওলিদ বাজীর[৫৭] ভ্রমণের কল্যাণেই এখানে এসেছে।

ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীর সংখ্যা অন্য সব স্থান অপেক্ষা মিশরেই বেশি। তাঁর মতাদর্শ ইরাক, খুরাসান, মাওরায়ান্নাহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল এবং এক সময়ে হানাফী ধর্মীয় বিধান ও শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সমান তালে সব শহরেই তার প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল। এর ফলে হানাফীদের সাথে তাদের বিতর্ক বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিতর্কিত বিষয়ে তাঁদের সম্মিলিত যুক্তি-প্রমাণে গ্রন্থাদির পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের পতনের ফলে এর সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী মিশরের বনি আবদুল হকমের[৫৮] কাছে উপস্থিত হলে তাদের একটি দল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে আল বুয়ায়তী,[৫৯] আল মুজনী[৬০] ও অন্যান্য অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। বনি আবদুল হকমের অন্তর্গত মালেকী মতাদর্শেরও একটি

---

৫৬. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইশবিলী; মৃত্যু ৫৪৩ (১১৪৮ খ্রি:) হি:।
৫৭. সুলায়মান ইবনে খলফ (একাদশ শতাব্দী খ্রি:)।
৫৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল হকম; মৃত্যু ২১৪ (৮৩০ খ্রি:) হি:।
৫৯. ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ২৩১/৩২ (৮৪৫/৪৬ খ্রি:) হি:।
৬০. ইসমাইল ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ২৬৪ (৮৭৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

দল ছিল; তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশহুব,[৬১] ইবনে কাসেম,[৬২] ইবনে মাওয়াজ[৬৩] ও অন্যান্য অনেকে। তারপর হুরস ইবনে মিসকীন[৬৪] ও তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং এর পর কাজী আবু ইসহাক ইবনে শুবান[৬৫] ও তাঁর সহচরবৃন্দ।

অতঃপর রাফেজীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে মিশর থেকে আহলে সুন্নতের ফেকাহ্‌শাস্ত্র বিদূরিত হয় এবং তার স্থানে আহলে বয়তের ফেকাহ্ প্রতিপত্তি লাভ করে। অন্য সব দল ও মতাদর্শের অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা বিগত ও বিচ্যুত্য বলে মনে হতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আবদুল ওহাব[৬৬] বাগদাদ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে মিশরে পৌঁছান। আমার যতটুকু মনে হয়, তাঁর মিশরে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা অর্জন ও ভাগ্যান্বেষণ। মিশরের উবাইদী খলিফাগণ তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। এরূপ সম্মান প্রদর্শনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আব্বাসী খলিফারা যাতে বুঝতে পারে যে, যোগ্য লোকের মর্যাদা দিতে তাঁরা জানেন। কারণ আব্বাসীরা উক্ত কাজী সাহেবের নিন্দা প্রচার করে তাঁকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাহোক, তাঁর আগমনে মিশরে মালেকী মতাদর্শের কিছুটা সুসার হয়।

অতঃপর সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইউবের হাতে উবাইদী সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে নবী বংশীয়দের এ ফেকাহ্‌শাস্ত্র দূর হয়ে পুনরায় আহলে সুন্নতের ফেকাহ্ প্রবর্তনের সুযোগ আসে এবং সেখানে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সহচরবৃন্দের মতাদর্শ প্রচলিত হয়। ইরাক ও সিরিয়া থেকে এটি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থায় এখানে ফিরে আসে এবং তার প্রসার ঘটে। এ বিষয়ে সিরিয়ায় আইউবী শাসন আমলে প্রতিপালিত মহীউদ্দিন নববী ও ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস্ সালামও[৬৭] খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারপর মিশরে ইবনে রেফাআ[৬৮] ও তকীউদ্দিন ইবনে দাকিকুল ইদ[৬৯] এবং তাঁদের পরে তকীউদ্দিন সবকী[৭০] সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। অনুরূপভাবে এ ধারা বর্তমানকালে মিশরের শায়খুল ইসলামের প্রসিদ্ধ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এ শেষোক্তজনের নাম সিরাজউদ্দিন বালকিনী।[৭১] তিনি বর্তমানে শুধু শাফেয়ী মতাদর্শী জ্ঞানীদের মধ্যে নন; বরং সমগ্র মিশরের আলেম সমাজের শিরোমণি।

ইমাম মালেকের মতাদর্শ মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা বিশেষ আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। যদিও তাঁর মতাদর্শ অন্যত্রও দেখা যায়, তবুও উক্ত দুই এলাকার

৬১. ইবনে আবদুল আজিজ; ১৪০-২০৪ (৭৫৮-৮২০ খ্রি:) হি:।
৬২. আবদুর রহমান; ১৩২-১৯১ (৭১৯-৮০৬ খ্রি:) হি:।
৬৩. মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম; মৃত্যু ২৮১ (৮৯৪ খ্রি:) হি:।
৬৪. ১৫৪-২৫০ (৭৭০-৮৬৪ খ্রি:) হি:।
৬৫. মুহম্মদ ইবনে কাসেম; মৃত্যু ৩৫৫ (৯৬৬ খ্রি:) হি:।
৬৬. ইবনে আলী; ৩৬২-৪২২ (৯৭৩-১০৭১ খ্রি:) হি:।
৬৭. আবদুল আজিজ ইবনে আবদুস সালাম; ৫৭৭-৬৬০ (১১৮২-১২৬৮ খ্রি:) হি:।
৬৮. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; ৬৪৫-৭১০ (১২৪৮-১৩১০ খ্রি:) হি:।
৬৯. মুহম্মদ ইবনে আলী; ৬২৫-৭০২ (১২২৮-১৩০২ খ্রি:) হি:।
৭০. আলী ইবনে আবদুল কাফী; ৬৮৩-৭৫৫ (১২৮৪-১৩৫৪/৫৫ খ্রি:) হি:।
৭১. উমর ইবনে রসলান; ৭২৪-৮০৫ (১৩২৪-১৪০৩ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

লোকেরা প্রায় সামগ্রিকভাবেই তাঁকে অনুসরণ করে থাকে। এর কারণ সম্ভবত এ দুই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভ্রমণের শেষ পর্যায় ছিল হিজাজ এবং তখন মদিনা ছিল শাস্ত্রাদির কেন্দ্রস্থল। তারপর সেখান থেকে তা ইরাকে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভ্রমণ পথে ইরাক না পড়ায় তারা মোটামুটিভাবে মদিনার আলেম সমাজকে অনুসরণ করেছে। ঐ সময়ে সেখানকার ধর্মীয় নেতা ও ইমাম ছিলেন মালেক। তিনি তাঁর পূর্বসূরি শিক্ষক ও উত্তরসূরি শিষ্যবৃন্দসহ সেখানে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। এর ফলে মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা তাঁর শিক্ষাই গ্রহণ করেছে এবং অন্যদের শিক্ষা তাদের মধ্যে না পৌঁছবার ফলে তারা তাঁকেই অনুসরণ করেছে। তদুপরি মাগরিব আন্দালুসের অধিবাসীদের ওপর প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য ছিল অত্যধিক। তারা ইরাকবাসীদের ন্যায় নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত ছিল না। এ কারণে হিজাজবাসীদের সাথে প্রান্তরীয় জীবনবোধের দিক থেকে তাদের মিল ছিল বেশি। এ কারণে এই মালেকী মতাদর্শ তাদের কাছে বেশি সরল মনে হয়েছে। কারণ তা অন্যান্য মতাদর্শের ন্যায় নাগরিক জীবনাদর্শের দ্বারা মার্জিত ও পরিশোধিত হয়নি।

বস্তুত প্রতিটি মতাদর্শ সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদিই উক্ত মতের অনুসারীদের কাছে একটি বিশিষ্ট ধারা। এটা অনুসরণ করতে হলে তাদেরকে গবেষণা ও অনুমানকে কাজে লাগাবার পথ থেকে বিরত থাকতে হয়। তারা শুধু তাদের ইমামের মতামতে নির্ধারিত নিয়মাবলি মেনে নিয়ে সমস্যাকে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে মিলানো এবং সন্দেহের বেলায় পৃথক করার কাজটিই সুচারুরূপে করতে পারে। অবশ্য এরূপ সামঞ্জস্য বিধান ও পৃথকীকরণের জন্যও সুদৃঢ় যোগ্যতার প্রয়োজন; যাতে এ দুটি বিষয়ে যতদূর সম্ভব ইমামের মতাদর্শ অনুসারে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। ফলত এ যোগ্যতাকেই বর্তমানকালে ফেকাহ্শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে মাগরিবের অধিবাসীরা সকলেই ইমাম মালেকের অনুসারী।

তাঁর শিষ্যরা ইরাক ও মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইরাকে ছিলেন কাজী ইসমাইল[৭২] ও তাঁর সমশ্রেণীর আরও অনেকে। যেমন ইবনে খোয়াজ মন্দাদ,[৭৩] ইবনে লাব্বান,[৭৪] কাজী আবু বকর আবহুরী,[৭৫] কাজী আবুল হাসান ইবনে কাস্সার,[৭৬] কাজী আবদুল ওহাব[৭৭] এবং তাঁদের পরবর্তী আরও অনেকে। মিশরে ছিলেন ইবনে কাসেম, আশহুব, ইবনে আবদুল হকম, হারেস ইবনে মিসকীন[৭৮] এবং তাঁদের সমশ্রেণীর অন্যান্য জন। আন্দালুস থেকে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া লায়ছী[৭৯] গমন করে ইমাম মালেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ বর্ণনার

৭২. ইসমাইল ইবনে ইসহাক; ১৯৯/২০০-২৮২ (৮১৫/১৬-৮৯৬ খ্রি.) হি:।
৭৩. আবু আবুদল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে আহমদ; কাজী আবহুরীর শিষ্য।
৭৪. ইবনে মুন্তাব (?); ইনি সম্ভবত কাজী ইসমাইলের শিষ্য; মৃত্যু ৩০৩ (৯১৬ খ্রি:) হি:।
৭৫. মহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্—২৮৯-৩৭৫ (৯০২-৯৮৬ খ্রি:) হি:।
৭৬. আলী ইবনে আহমদ; মৃত্যু ৩৯৮ (১০০৮ খ্রি:) হি:।
৭৭. ৬৬ নং টীকা দ্র:।
৭৮. ইনি ও তার পূর্ববর্তী তিনজনের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৬১-৬৪ নং টীকা দ্র:।
৭৯. মৃত্যু ২৩৪/৩৬ (৮৪৮/৫০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অনুমতি লাভ করেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁর পরে আবদুল মালেক ইবনে হাব্বিব[৮০] গমন করে ইবনে কাসেম ও তাঁর সমশ্রেণীর অন্যান্যদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আন্দালুসে মালেকী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। যিনি এ মতের 'আল ওয়াজেহা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর তাঁর শিষ্যদের অন্যতম উতবী[৮১] নিজ নাম অনুসারে 'উতবিয়া' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আফ্রিকিয়া থেকে আসাদ ইবনে ফুরাত[৮২] গমন করে প্রথমে ইমাম আবু হানিফার সহচরদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে মালেকী মতাদর্শে ফিরে আসেন। তিনি ইবনে কাসেমের কাছে উপস্থিত হয়ে ফেকাহ্শাস্ত্রের সব বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি নিয়ে কায়রোয়ানে ফিরে আসেন এবং আসাদ ইবনে ফুরাতের নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন 'আসদিয়া'। সাহনুন[৮৩] আসাদের কাছেই এ গ্রন্থটি পাঠ করেন এবং তারপর পূর্বাঞ্চলে গমন করে ইবনে কাসেমের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এর ফলে আসদিয়া গ্রন্থের বহু সমস্যার সাথে বিরোধিতার সূত্রপাত হয় এবং সাহনুন এর অনেকগুলোই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সমগ্র সমস্যা একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন এবং আসদিয়া গ্রন্থের সাথে বিরোধী বিষয়গুলোকে তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে কাসেম সাহনুনের কাছে প্রদত্ত একটি পত্রে আসাদকে তাঁর গ্রন্থ থেকে সাহনুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সমস্যাগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে আদেশ দেন এবং বিতর্কিত বিষয়ে সাহনুনকে অনুসরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আসাদ এ নির্দেশ মেনে নেননি। ফলে মানুষ তার গ্রন্থ ত্যাগ করে সাহনুনের গ্রন্থ অনুসরণ করতে থাকে। এ গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিচিত্র বিষয়ের মিশ্রণ থাকায় এর নামকরণ করা হয় 'মুদাব্বানা' ও 'মুখতালাতা'। কায়রোয়ানবাসীরা এ 'মুদাব্বানা' গ্রন্থ এবং আন্দালুসবাসীরা 'ওয়াজেহা' ও 'উতবিয়া' গ্রন্থদ্বয়কে বিশেষ আগ্রহের সাথে অনুসরণ করতে থাকে।

অতঃপর ইবনে আবু যায়েদ[৮৪] এ মুদাব্বানা ও মুখতালাতা গ্রন্থটিকে তাঁর 'মুখতাসর' নামীয় গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করেন এবং কায়রোয়ানের ফেকাহ্শাস্ত্রবিদদের অন্যতম আবু সাইদ বারাদেই[৮৫] তার 'তাহজিব' নামক পুস্তকেও তার একটি সংক্ষিপ্ত সুবিন্যস্ত রূপ তুলে ধরেন। এ শেষোক্ত পুস্তকটিকেই আফ্রিকিয়ার উস্তাদগণ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন এবং এছাড়া অন্যগুলোকে পরিত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীরাও 'উতবিয়া' গ্রন্থটিকে অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করে ওয়াজেহা এবং অন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করেছিল।

এভাবে মালেকী মতাদর্শের আলেমগণ এসব মূল গ্রন্থের ব্যাখা, টীকা-টিপ্পনী ও সংকলন রচনা করতে থাকেন। আফ্রিকিয়াবাসীরা মুদাব্বান গ্রন্থের ওপর আল্লাহ্র ইচ্ছায়

৮০. মৃত্যু ২৩৮/৩৯ (৮৫৩/৫৪ খ্রি:) হি:।
৮১. মুহম্মদ ইবনে আহমদ; মৃত্যু ২৩৫ (৮৬৯ খ্রি:) হি:।
৮২. ১৪২/৪৫-২১৩/১৪ (৭৫৯/৬৩-৮২৮/৩০ খ্রি:) হি:।
৮৩. আবদুস সালাম ইবনে সাইদ; ১৬০-২৪০ (৭৭৭-৮৫৪ খ্রি:) হি:।
৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ; ৩১৬-৩৮৬ (৯২৮-৯৯৬ খ্রি:) হি:।
৮৫. খলফ ইবনে আবুল কাসেম; ইনি উক্ত গ্রন্থ ৩৭২ (৯৮২ খ্রি:) হিজরিতে রচনা করেন।

www.amarboi.org

যা লেখার তা লিখেছে; যেমন ইবনে ইউনুস,[৮৬] আল্ লখমী,[৮৭] ইবনে মুহরিয,[৮৮] আত্তিউনিসী,[৮৯] ইবনে বাশির[৯০] এবং তাঁদের তুল্য আরও অনেকে। অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীরাও উতবিয়ার ওপর আল্লাহ্ চানতো অনেক কিছু লিখেছে; যেমন ইবনে রুশদ[৯১] ও তাঁর তুল্য অন্যান্যরা। ইবনে আবু যায়েদ 'নাওয়াদের' নামক গ্রন্থে মূল গ্রন্থগুলোর সব বিষয়, মতানৈক্য ও নানাবিধ মতামত একত্র করেন। এর ফলে মালেকী মজহাবের সব মূলগ্রন্থ ও তাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদি একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। ইবনে ইউনুস এর অধিকাংশকেই তাঁর মুদাব্বানা সম্পর্কীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন। এভাবে কার্ডোভা ও কায়রোয়ানের সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত উভয় স্থানে মালেকী মতাদর্শের প্রচার ব্যাপক আকৃতি ধারণ করে।

অতঃপর[৯২] মাগরিববাসীরা একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। এ পর্যায়ে আবু আমর ইবনে হাজেবের গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। ইনি এতে উক্ত মজহাবের বিচিত্র ধারা প্রতিটি

৮৬. আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস; মৃত্যু ৪৫৯ (১০৫৯ খ্রি:) হি:। মতান্তরে আবু বকর মুহম্মদ ইবনে ইউনুস।
৮৭. আলী ইবনে আবদুল্লাহ; মৃত্যু ৪২৮ (১০৮৫ খ্রি:) হি:।
৮৮. আবুল কাসেম; পরবর্তী তিউনিসীর সমসাময়িক।
৮৯. আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে হাসান; মৃত্যু ৪৪৭/৪৪৯ (১০৫৬/১০৫৮ খ্রি:) হি:।
৯০. ইনি সম্ভবত ইব্রাহিম ইবনে আবদুস্ সামাদ; খ্রি: একাদশ শতাব্দী (?)
৯১. মুহম্মদ ইবনে আহমদ; ৪৫০-৫২০ (১০৫৮-১১২৬ খ্রি:) হি:; প্রসিদ্ধ দার্শনিকের পিতামহ।
৯২. এ অনুচ্ছেদটির প্রথম দিকের একটি সংযোজিত পাঠ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে না থাকলেও সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।
'মালেকী মাজহাবের তিনটি বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান। এর একটি হল কায়রোয়ানবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা ইবনে কাসেমের শিষ্য 'শাহনুন'। দ্বিতীয়টি হল কার্ডোভাবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা ইবনে হাবিব। ইনি মালেক, মুতারিফ, ইবনে মাজিশুন, আসবাগ প্রমুখ জ্ঞানীদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তৃতীয়টি ইরাকবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা কাজী ইসমাইল ও তাঁর সহচরবৃন্দ। মিশরীয় শাখাটি ইরাকি শাখারই অনুসারী। কাজী আবদুল ওয়াহাব চতুর্থ (দশম) শতাব্দীতে বাগদাদ হতে মিশরে পৌঁছান এবং মিশরীয়রা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে। মিশরে মালেকী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় হারেস ইবনে মিসকিন, ইবনে মুয়ারসের, ইবনে লাহিব, ইবনে রুশিক প্রমুখ শাস্ত্রবিদদের দ্বারা। অতঃপর এটা শিয়া ও আলী বংশীয়দের চরমপন্থী ধর্মীয় বিধানের উদ্ভবের ফলে গুপ্ত অবস্থায় নিজেকে সংরক্ষণ করে।
কায়রোয়ান ও আন্দালুসবাসীরা ইরাকি শাখার মতামত পরিত্যাগ করেছিল। কারণ এটি বহুদূরে অবস্থিত, এর মতামত বর্ণনার সূত্র অস্পষ্ট এবং যে সব ভিত্তির উপর ইরাকি মতাদর্শ দাঁড়িয়েছিল, সে সম্পর্কেও তারা খুব অল্পই অবগত ছিল। বিশেষজ্ঞেরা স্বভাবতই স্বাধীন মতামতের পক্ষপাতী এমন কি তাঁদের মতামত সাধারণ ধ্যান-ধারণার বিরোধী হলেও তারা কেবলমাত্র প্রচলিত ধারণার উপর নির্ভর করেন না এবং একে কোন প্রচার নীতি হিসেবেও মেনে নেন না। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, মাগরিব ও আন্দালুসবাসীরা ইমাম মালেক ও তাঁর সহচরবৃন্দের ব্যবহৃত কোন হাদিসের সহায়তা ছাড়া ইরাকি মতামত মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনেকাংশে একে অপরের সাথে মিলে গেছে।
ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবুবকর আত্তারতুশী আন্দালুস হতে ভ্রমণে বের হন। তিনি জেরুজালেমে থেকে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আন্দালুসীর শাখার অনেক কিছু তাদের মিশরীয় শাখার সাথে মিশ্রিত করে নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন 'তিরাজ' গ্রন্থ রচয়িতা

www.amarboi.org

অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেন এবং প্রতিটি সমস্যায় তাদের মতামতকে একত্র লিপিবদ্ধ করেন। ফলে গ্রন্থটি মালেকী মজহাবের একটি সংক্ষিপ্তসারে পরিণত হয়। মিশর অঞ্চলে হারেস ইবনে মিসকীন,[৯৩] ইবনে মুবাশ্‌শার,[৯৪] ইবনে লুহাইত,[৯৫] ইবনে রশিক,[৯৬] ইবনে শাস,[৯৭] প্রমুখ শাস্ত্রবিদদের সময় থেকেই মালেকী মতাদর্শ প্রচলিত ছিল এবং আলেকজান্দ্রিয়াতেও বনি আউফ,[৯৮] বনি সনদ[৯৯] ও ইবনে আতাউল্লাহ,[১০০] এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি জানি না, আবু আমর ইবনে হাজেব[১০১] তাদের মধ্যে কার কাছ থেকে এ ধারার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি উক্ত অঞ্চল থেকে উবাইদী সাম্রাজ্যের পতন এবং নবী বংশীয়দের ফেকাহ্‌শাস্ত্রের অবসানের পর শাফেয়ী ও মালেকী মজহাবের পুনরাগমনের সময়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর গ্রন্থটি মাগরিব অঞ্চলে পৌঁছলে সেখানকার বিদ্যার্থীদের অধিকাংশই একে

কাজী সনদ ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের কাছে বহুলোক শিক্ষা লাভ করেন। তাদের মধ্যে বনি আউফ ও তাদের অনুসারী বিদ্যমান। আবু আমর আল হাজিবও তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তার পরবর্তীকালে শিহাবউদ্দিন আল কারাফী আবির্ভূত হন। এভাবে সেখানে মালেকী মতাদর্শের একটি ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয়।

আলী বংশীয় উবাইদীদের শাসন আমলে মিশরের শাফেয়ী মতাদর্শও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে খোরাশানী শাফেয়ী জ্ঞানী আর্‌রাফির গ্রন্থকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রবিদগণ একে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সিরিয়ায় অন্য একজন শাফেয়ী মতাদর্শের নেতৃস্থানীয় শাস্ত্রবিদ মহীউদ্দিন আন্‌ নববী এ সময়ে আবির্ভূত হন।

পরবর্তীকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় মালেকী মতাদর্শ ও অশ্‌ শারিমাশীর মাধ্যমে ইরাকি শাখার অনেক কিছু গ্রহণ করে। ইনি পশ্চিমাঞ্চলীয় ও মিশরীয় শাখার একজন অনন্য সাধারণ প্রতিনিধি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। আব্বাসী সম্রাট আজ্‌ জাহিরের পুত্র ও আল মুস্তাসিমের পিতা আল মুস্তানসির যখন বাগদাদে তাঁর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন; তখন তিনি তৎকালীন মিশরের উবাইদী সম্রাটকে আশ্‌ শারিমাশীকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উবাইদী সম্রাট তাকে যেতে অনুমতি দেন এবং তিনি বাগদাদে পৌঁছলে তাঁকে মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেখানে হালাকু খানের অভিযান ৬৫৬ (১২৫৮ খ্রি:) হিজরী পর্যন্ত ছিলেন। অবশ্য তিনি হালাকুর হত্যাকাণ্ডের কবল হতে বেঁচে যেতে সক্ষম হন। সম্ভবত এ কারণেই তিনি সেখানে হালাকু খানের পুত্র আহমদ আবাগার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিশরীয় মতাদর্শের একটি সর্বার্থসার সংগ্রহ, যার সাথে পশ্চিমাঞ্চলীয় উপাদানও মিশ্রিত ছিল, তা, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, আবু আমর ইবনে আল হাজিবের 'মুখতাসর' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে প্রতিটি শাস্ত্রীয় বিধান সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় সমস্যাদি এবং প্রতি সমস্যা সম্পর্কে বিচিত্র মতামত বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে উক্ত গ্রন্থটি মালেকী মতাদর্শের একটি সর্বসার সংগ্রহ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৯৩. ষষ্ঠ অধ্যায় : ৬৪ নং টীকা দ্র:।

৯৪. ইবনে মুয়ায়সের (?); আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩০৯ (৯২২ খ্রি:) হি:।

৯৫. ইবনে লাহিব (?); অজ্ঞাত।

৯৬. হাসান ইবনে আতিক; ৫৪৭—৬৩২ (১১৫৩—১২৩৫ খ্রি:) হি:।

৯৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে নজম; মৃত্যু ৬১৬ (১২১৯ খ্রি:) হি:।

৯৮. ইসমাইল ইবনে মক্কী; ৪৮৫—৫৮১ (১০৯২—১১৭৫ খ্রি:) হি:।

৯৯. সনদ ইবনে ইনান; মৃত্যু ৫৪১ (১১৪৯ খ্রি:) হি:।

১০০. আবদুল করিম ইবনে আতাউল্লাহ্; মৃত্যু ৫১২ (১২৬৬ খ্রি:) হি:।

১০১. উসমান ইবনে উমর; মৃত্যু ৬৪৬ (১২৪৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে; বিশেষ করে বগির অধিবাসীরা। তখন তাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবু আলী নাসেরউদ্দিন যাওয়াবী।[১০২] বস্তুত তিনিই উক্ত গ্রন্থটিকে মাগরিবে আনয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি মিশরে ইবনে হাজেবের সহচরদের কাছে পাঠ করেন এবং তার একটি অনুলিপি প্রস্তুত করে বগিতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এর প্রসারের সুযোগ করে দেন। সেখান থেকে এটি মাগরিবের সব শহরে প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানকালে মাগরিবের সব বিদ্যার্থীই এর পাঠ ও আলোচনা কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কারণ উস্তাদ নাসেরউদ্দিন এর পাঠ ও আলোচনায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। এতদঞ্চলের বহু উস্তাদ এর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন; যেমন ইবনে আবদুস সালাম, ইবনে রাশেদ,[১০৩] ইবনে হারুন।[১০৪] তাঁরা সকলেই তিউনিসের শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্গত। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি যোগ্যতার অধিকারী হলেন ইবনে আবদুস্ সালাম। অবশ্য তাঁরা এতদসত্ত্বেও তাঁদের পাঠ্য-তালিকায় 'তাহজিব' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১০৫]

---

১০২. ষষ্ঠ অধ্যায় : ১০ নং টীকা দ্র:।
১০৩. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল কাফসী; মৃত্যু ৭৩৬ (১৩৩৬ খ্রি:) হি:।
১০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ; ৬০৩—৭০২ (১২০৭—১৩০৩ খ্রি:) হি:।
১০৫. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[দায়ভাগশাস্ত্র]

'এলমে ফরায়েজ' বা দায়ভাগশাস্ত্র হল উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশসমূহকে জানা, কোন সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট প্রাপ্যকে বিশুদ্ধ সংখ্যামানের দ্বারা প্রকাশ করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশের মূল উৎস অথবা তার শাখাগত প্রাপ্তির সুযোগ বিধান বিবেচনা করা। শেষের বিষয়টির বর্ণনা এই যে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার প্রাপ্য অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হবে এবং এ পর্যায়ে একটি সুষ্ঠু হিসাবের প্রয়োজন; যাতে প্রাথমিক প্রাপ্য নির্দিষ্ট হয়ে পুনরায় ঐ মৃত উত্তরাধিকারীর প্রাপ্যটি যথাবিহিতভাবে সকলের অংশে সংযোজিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি হিসাবের সব অংশই প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য অবিভক্তভাবে প্রকাশ পাবে। কখনও এমন উত্তরাধিকারীর মৃত্যু একজন, দুজনের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এভাবে তার সংখ্যা যত বেশি হয়, হিসাবের সংখ্যাও তত বেড়ে যায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক হিসাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুরূপভাবে যদি প্রাপ্য অংশাদির দুটি দিক বের হয়ে পড়ে; যেমন একদিকে কিছু সংখ্যক উত্তরাধিকারী একজনের উত্তরাধিকার স্বীকার করে এবং অন্যদিকে কিছু সংখ্যক তা অস্বীকার করে, তাহলে উক্ত বিষয়টিও দুদিক থেকে হিসাব করে দেখতে হবে। প্রথমে প্রাপ্য অংশের সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং পরে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মূল প্রাপ্য অংশ অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। এরূপ প্রতিটি বিষয়েই যথাযথ হিসাবের প্রয়োজন। এ কারণেই দায়ভাগের এ বিষয়টিকে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের একটি পৃথক অধ্যায় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এতে ফেকাহ্‌র সাথে হিসাবের যোগ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হিসাবের জটিলতার জন্য একে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ের উপর মানুষের মধ্যে বহু রচনা বিদ্যমান। মালেকী মজহাবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা আন্দালুসের উত্তরসূরির মধ্যে ইবনে সাবেতের[১০৬] গ্রন্থ, কাজী আবুল কাসেম হাওফীর 'মুখতাসর',[১০৭] তারপর জাদীর[১০৮] এবং আফ্রিকিয়ার উত্তরসূরিদের মধ্যে ইবনে মুনাম্মার তারাবলেসী[১০৯] ও তাঁর সমতুল্য অন্যান্যদের গ্রন্থাবলি।

---

১০৬. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ; মৃত্যু ৪৪৭ (১০৩৬ খ্রি:) হি: (?)।

১০৭. আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে খলফ; মৃত্যু ৫৮৮ (১১৯২ খ্রি:) হি:।

১০৮. ইনি 'জাদীয়া' নামক গ্রন্থের রচয়িতা আবু মুহম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে জাদ সাকিলী কিনা, জানা যায়নি।

১০৯. খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন।

www.amarboi.org

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মজহাবের অনুসারীদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি বিদ্যমান এবং এমন বিরাট ও জটিল কার্যাদি রয়েছে, যা তাঁদের ফেকাহ্ ও হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশেষভাবে মজহাবের অনুসারী আবুল মুয়ালী[১১০] (রাঃ) ও তাঁর সমতুল্য অন্যান্যদের গ্রন্থাদি।

বস্তুত এটি একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাস্ত্র; কেননা এতে শ্রুতি ও বুদ্ধি উভয়েরই দক্ষতার মিশ্রণ বিদ্যমান। এর সাহায্যে উত্তরাধিকারীদের ন্যায্য প্রাপ্য নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ পন্থায় বের করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে যখন উক্ত প্রাপ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং উত্তরাধিকারীরা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ কারণে প্রত্যেক শহরের জ্ঞানীসমাজ উক্ত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে থাকেন। বিভিন্ন গ্রন্থ রচয়িতারা অনেক সময় এমন আগ্রহের আতিশয্যে হিসাবের ব্যাপারে এবং বিচিত্র সব সমস্যা ধরে নিয়ে তার অজ্ঞাত প্রাপ্যাদির নিকাশের জন্য হিসাবশাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেমন—বীজগণিত, পাটীগণিত ও অনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্রের বেলায় করা হয়। সুতরাং তারা এমন বিষয়ের দ্বারা তাঁদের গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ করে তোলেন। অথচ মানুষের মধ্যে অনুরূপ জটিল হিসাবাদির খুব পরিচিতি নেই। কারণ তারা সাধারণভাবে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের হিসাব করে থাকে, সে তুলনায় এসব গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়াদি বিরল ও দুষ্পাপ্য হওয়ায় এটি দ্বারা তাদের কোন উপকারই হয় না। অবশ্য এসব বিষয় অনুশীলনকারী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যোগ্যতা অর্জনকারীদের জন্য অতিশয় উপকারী বলে গণ্য হতে পারে।

অনেক সময় এ দায়ভাগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালনের জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। তাতে বলা হয়েছে যে, 'ফরায়েজ' জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ এবং তা-ই সর্বপ্রথম বিস্মরণযোগ্য বিষয়। অন্য একটি বর্ণনায়,—জ্ঞানের অর্ধেক। আবু নাইম আল হাফেজ[১১১] এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা দায়ভাগশাস্ত্রীরা এ ধারণার ফলেই প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, এস্থানে ফরায়েজের অর্থ উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় নির্ধারিত প্রাপ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ স্থানে অনুরূপ ধারণা পোষণ একান্ত অবাস্তব। কেননা এ স্থানে ফরায়েজের অর্থ উপাসনা, অভ্যাস, উত্তরাধিকার ও অন্যান্য নানাবিধ পালনীয় কর্তব্য। এদিক থেকে বলতে গেলে তার জ্ঞানের অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিসিদ্ধ হয়। কিন্তু এর অর্থ উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য ধরলে সমগ্র ধর্মীয়শাস্ত্রের তুলনায় এর অংশ একান্তই সামান্য। কারণ এ বিশেষ শাস্ত্রের নাম হিসেবে 'ফরায়েজ' শব্দটির ব্যবহার অথবা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশাদির পরিভাষা হিসেবে এর প্রচলন ফেকাহ্শাস্ত্রের নানাবিধ শাখা-প্রশাখার উদ্ভব এবং সেজন্য পরিভাষা সৃষ্টির সময়ই শাস্ত্রবিদদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এটি এ অর্থে ছিল না। তখন এটি সাধারণ অর্থে 'ফরজ' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছিল; যার আভিধানিক অর্থ ধরে নেয়া অথবা

১১০. আবুল মুয়ালী আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ্ আল জুয়য়নী; ৪১৯—৪৬৮ (১০২৮—১০৮৫ খ্রি:) হি:।

১১১. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ; ৩৩৬—৪৩০ (৯৪৮—১০৩৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কর্তন করা। তখন এটি সব 'ফরজের' বহুবচন হিসেবেই ব্যবহৃত হত; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। বস্তুত ধর্মীয় বিধান অনুসারে এটাই এ শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য। সুতরাং একে তখন তারা যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, তা ছাড়া অন্য অর্থে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ প্রসঙ্গ অনুসারে তাই এ শব্দের যথার্থ অর্থ। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

www.amarboi.org

নবম পরিচ্ছেদ

[ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি এবং এসব সম্পর্কীয় বিতর্ক ও মতপার্থক্য]

জেনে রাখুন যে, অসুলে ফেকাহ্‌ বা ফেকাহ্‌র মূলনীতি ধর্মীয় শাস্ত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী এবং অতিশয় উপকারী। এটি পালনীয় ও কর্তব্য বিধি-নিষেধের উৎস হিসেবে ধর্মীয় প্রমাণাদির পর্যালোচনার জ্ঞান, ধর্মীয় প্রমাণাদির মূল উৎস হল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন এবং তার ব্যাখ্যাকারী হাদীসসমূহ।

নবী (সঃ)-এর কালে বিধি-নিষেধ তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করা হত। তাঁর উপরেই অবতীর্ণ কুরআনকে তিনি নিজ বাক্য ও কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলে এ সম্পর্কের কোন প্রকার বর্ণনা, বিবেচনা ও অনুমানের প্রয়োজন হত না। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর—আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক—সেই সুস্পষ্ট বক্তব্যের ধারা ছিন্ন হল এবং কুরআনকে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতায় সংরক্ষণ করা হল।

হাদীস সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যেসব হাদীস কথা ও কাজের বিশুদ্ধ ধারাবাহিকতায় বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সে সবের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় বলে সব সাহাবীই (রাঃ) ঐকমত্য পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে হাদীস সংক্রান্ত সব বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হবে, যাতে সত্য বলে প্রতীতি জন্মায়।

এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বিধানের উৎস হিসেবে কুরআন ও হাদীস নির্দিষ্ট হয়েছিল। তারপর এ দুটির সাথে 'ইজ্‌মা' এসে সংযুক্ত হল। কেননা সাহাবীরা যে-কোন প্রকার অশোভন ব্যাপারকে ঐক্যের সাথে প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের এমন ঐক্য কোন প্রকারেই ভিত্তিহীন হতে পারে না। কারণ তাঁদের মতো লোকেরা বিনা প্রমাণে কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন না। যুক্তি-প্রমাণ তাঁদের এ দলের পবিত্রতা সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেয়। এ জন্যই ধর্মীয় বিধানে এ সর্বসম্মতি বা ইজ্‌মা ক্রমশ একটি প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অতঃপর আমরা যখন সাহাবী ও পূর্বসূরিদের কুরআন ও হাদীস দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করি, তখন দেখতে পাই তাঁরা তুলনামূলক বিষয়াদির দ্বারা অনুরূপ অন্য বিষয় সম্পর্কে অনুমান করেছেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে একটির দৃষ্টান্তে অন্যটি সম্পর্কে বিবেচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে সমর্থন দিয়েছেন। কারণ নবী (সঃ)-এর তিরোধানের পর যে ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে, সেসম্পর্কে সব সমাধান কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং তাঁরা

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের দ্বারা অনুমান করেছেন এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে উক্ত সমাধানকে মিলাতে চেয়েছেন। অবশ্য এরূপ সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে শর্তাদি ছিল, যাতে দুটি তুল্য বা অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমতার দিক থেকে শুদ্ধ হয়। এর ফলে যেন এরূপ ধারণা জন্মায় যে, এ উভয়ের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ একই। এভাবে উক্ত বিষয়টি একটি ধর্মীয় প্রমাণে পরিণত হয়। তাকেই বলা হয় 'অনুমান'। তা-ই চতুর্থ প্রমাণ নামে অভিহিত।

জ্ঞানীসমাজের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল এগুলোই প্রামাণ্য মূলনীতি। অবশ্য অনেকে এ 'ইজ্‌মা' (সর্বসম্মতি) ও 'কিয়াস' (অনুমান) সম্পর্কে বিরোধিতা করেছেন; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। অন্য অনেকে এ চারটি প্রমাণের সাথে আরও কিছু প্রমাণ যুক্ত করেছেন। এগুলোর উপলব্ধিজাত দুর্বলতা ও মতামতের বিরলত্বের জন্য আমরা এখানে তাদের বিবরণ তুলে ধরতে চাই না। বস্তুত এ শাস্ত্রের প্রথম থেকেই উপরোক্ত চারটি বিষয়কেই প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে।

কোরানের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার বিষয়বস্তুর অকাট্য অলৌকিকত্ব ও তার রচনার সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতাই এমন এক সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারমধ্যে যা বিশুদ্ধ বর্ণনাধারায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কীয় নির্দেশাবলির অবশ্য পালনীয়তা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পত্রলিখন, দূত প্রেরণ প্রভৃতি কাজের মাধমে হাদীসের প্রামাণ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ইজ্‌মা' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাহাবী (রাঃ) গণ তাঁদের বিরোধিতাকে একতার সাহায্যে প্রতিরোধ করেছেন এবং এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে তাঁদের নিরপেক্ষতা জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য। 'কিয়াস' সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, তা সাহাবীদের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এগুলোই প্রামাণ্য মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে এর সংবাদের সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্ণনার ধারা ও বর্ণনাকারীদের সততা বিচার করে দেখতে হয়; যাতে এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে বিষয়টিকে সত্য বলে ধারণা করা যায়। কারণ এরূপ ধারণাই এর অবশ্য পালনীয়তার ভিত্তিভূমি। সুতরাং এ বিষয়গুলোও এ শাস্ত্রের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার ব্যাপারটিও এর সাথে যুক্ত হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোনটি অগ্রবর্তী এবং কোনটি রহিতকারী ও কোনটি রহিতকৃত, তাও জেনে নিতে হয়। এসব বিষয়ও এ শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের অন্তর্গত।

এর পর শব্দাবলির অর্থবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবেচনার বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বস্তুত এদের অর্থগত সাধারণ অবস্থা অনুধাবনের জন্য বাক্যান্তর্গত গঠন সৌকর্য বিচারের প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিচারের জন্য শব্দ ও বাক্যের সুপ্রচলিত অর্থাবলি জানতে হয়। এর জন্য ভাষাতাত্ত্বিক যে নিয়মাবলি রয়েছে, তাকে 'এলমে নুহু' (বাক্‌ বিন্যাসশাস্ত্র), 'এলমে সরফ' (শব্দগঠনশাস্ত্র) ও 'এলমে বয়ান' (অলঙ্কারশাস্ত্র) বলা হয়।

www.amarboi.org

অবশ্য ভাষাভাষীদের কাছে যখন ভাষাগত এ যোগ্যতা স্বতোঃস্ফূর্ত ছিল, তখন এসব নিয়ম ও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়নি; এমন কি ফেকাহ্‌শাস্ত্রও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কারণ তখন তা সহজাত প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপর আরবি ভাষায় এ যোগ্যতা বিকৃত হয়ে পড়লে বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে পৃথক পৃথক প্রণালীবদ্ধ করে ফেলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বিশুদ্ধ শ্রুতি এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাঁদের গবেষণাজাত অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। এর ফলে এগুলো এমন কিছু সংখ্যক শাস্ত্রে পরিণত হল; ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা আল্লাহ্‌র বাণীর নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে এদের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। তারপর সেখানে বাক্যের গঠনপ্রণালি থেকে অন্যবিধ অর্থোদ্ধারের বিষয়টি দেখা দিল। তা-ই বাক্যের গঠনপ্রণালি থেকে উদ্ভূত বিশেষ প্রমাণাদির সাহায্যে তার অর্থান্তর্গত ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে রূপদান করা এবং একেই ফেকাহ্‌শাস্ত্র বলা হয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থাদি জানা-ই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য এমন অনেক বিষয় জানতে হয়, যার উপর বিশেষ অর্থের দিকটি নির্ভর করে। কেননা এ বিশেষ অর্থের দ্বারাই ধর্মশাস্ত্রবিদ ও বিশেষজ্ঞদের গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। কারণ তারা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নিয়মগুলো গ্রহণ করেছেন। যেমন শব্দার্থ অনুমানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের একই প্রসঙ্গে একটির বেশি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 'ওয়াও' (সংযোগমূলক অব্যয়) থাকলেই তার দ্বারা পর্যায়ক্রম বোঝাবে না। সাধারণ থেকে যদি একটি বিশেষ অংশ বের করে নেয়া হয়, তা হলে অন্য অবশিষ্ট অংশ কি প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যাবে? অনুজ্ঞা কি অবশ্য পালনীয়, না শুধু পালনীয়; তৎক্ষণাৎ, না কিছুকাল পরবর্তী এবং নিষেধের উদ্দেশ্য কি বিকৃতি প্রতিরোধ, না সুস্থতাজ্ঞাপক? শর্তহীনকে কি শর্তাধীনের উপর প্রয়োগ করা যায়? কোন বিশেষ কার্যকারণ সংবলিত বক্তব্য কি অন্যত্র প্রযোজ্য, কিংবা প্রযোজ্য নয়? অনুরূপ আরও বহু বিষয়। এদের সবগুলোই এ শাস্ত্রের নিয়মাবলির অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ সবগুলোই ভাষার আর্থিক প্রসারতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতঃপর কিয়াস বা অনুমান সম্পর্কে বিবেচনা করা এ শাস্ত্রের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এতে অনুমানযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে মূল ও শাখার ব্যাপারটি যথার্থতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সেই বিশেষ গুণটি সুস্পষ্টভাবে অধিকার করতে হয়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত শাখা এ দিক থেকেই মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রসঙ্গের অন্যান্য গুণাবলি অথবা শাখার মধ্যে উক্ত গুণটির অবস্থান এমনভাবে বিচার করে দেখতে হয়, যাতে তার উপর নির্দেশ প্রয়োগ করতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। এমন এর অনুসারী আরও বহু সমস্যা। এ সবাই এ শাস্ত্রের নিয়মাবলির অন্তর্গত।

জেনে রাখুন, এ 'অসুলে ফেকাহ্' নামক শাস্ত্রটি জাতির মধ্যে নবাগত শাস্ত্রগুলোর অন্যতম। পূর্বসূরিরা এ বিষয়ে অনেকখানি উদাসীন ছিলেন। তাঁদের ভাষাগত যোগ্যতাই তাঁদেরকে শব্দার্থের বেশি কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

www.amarboi.org

অবশ্য বিধি-নিষেধ নির্ধারণের জন্য বিশেষভাবে যে সব নিয়মের প্রয়োজন হয়, তার অধিকাংশই তাঁদের কাছ থেকে গৃহীত। কিন্তু বর্ণনাসূত্রাদি বিচারের জন্য তাঁরা তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। কারণ সময়ের নৈকট্য বর্ণনাকারীদের সমসাময়িকতা এবং তাঁদের সম্পর্কে অবগতিই এ ব্যাপারে তাঁদেরকে নিরস্ত্র করেছে।

কিন্তু পূর্বসূরিদের তিরোধানের পর যখন প্রাথমিকযুগ অন্তর্হিত হল এবং সব শাস্ত্রই শিল্পকর্ম হয়ে উঠল, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তখন ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ও গবেষকরা প্রমাণাদির দ্বারা বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সুতরাং তাঁরা একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তার নাম রাখলেন ফেকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতি।

এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক রচনা করেন ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে আদেশ, নিষেধ, অলঙ্কার, হাদীস, রহিতকরণ, কিয়াসে বিবেচ্য সুস্পষ্ট কার্যকারণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর হানাফী ফেকাহ্শাস্ত্রবিদরা এ বিষয়ে পুস্তকাদি লিখলেন, তাঁরা এসব নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন এবং তার বিষয়বস্তুকে ব্যাপক করে তুললেন। কালাম শাস্ত্রবিদ্রাও অনুরূপ পুস্তকাদি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের তুলনায় ফেকাহ্শাস্ত্রবিদদের রচনা এ বিষয়ে ফেকাহ্র সাথে বেশি যুক্ত এবং বিচিত্র বিষয়ে বেশি উপযোগী। কেননা এর উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত প্রচুর এবং এর সব সমস্যা ফেকাহ্শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হয়। কিন্তু কালামশাস্ত্রবিদরা অনুরূপ সমস্যাবলিকেই ফেকাহ্র নীতি থেকে মুক্ত করে যতদূর সম্ভব বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এরূপ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করাই তাঁদের শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম ও সবিশেষ উদ্দেশ্য।

হানাফী ফেকাহ্শাস্ত্রবিদরা আলোচ্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সমস্যা থেকে এসব নীতির আবিষ্কারে যথাসাধ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের ইমামদের মধ্যে আবু যায়েদ দবুসী[১১২] কিয়াস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সর্বপ্রকার বক্তব্য ও শর্ত যথা প্রয়োজন একত্র করেছেন এবং তার পরিপূর্ণতার দ্বারা 'অসুলে ফেকাহ্'শাস্ত্রীয় শিল্প হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার সমস্যাবলি সুবিন্যস্ত ও তার নিয়মাবলি সুসংবদ্ধ হয়েছে।

এ বিষয়ে মানুষ কালামশাস্ত্রবিদদের ধারাও অনুসরণ করেছে। এর ফলে কালামশাস্ত্রীরা যেসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ইমামুল হরামাইন-এর 'আল বুরহান' এবং ইমাম গাজ্জালীর 'আল মুস্তাসফা'—পুস্তক দুটি উল্লেখযোগ্য। তাঁরা উভয়েই 'আশায়েরা' পন্থী। এ বিষয়ে আবদুল জব্বারের 'আল আমদ' এবং আবুল হোসাইন বসরী[১১৪] রচিত উক্ত পুস্তকের ব্যাখা 'আল মুতামদ'ও উল্লেখযোগ্য এবং এ দুজন 'মুতাজেলা' পন্থী। বস্তুত এ চারটি পুস্তকই এ বিষয়ের নিয়ম ও স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হত। তারপর পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে বিশিষ্ট দুজন জ্ঞানী এ চারটি

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর; মৃত্যু ৪৩০ (১০১৯ খ্রি:) হি:।
১১৩. আবদুল জব্বার ইবনে আহমদ আসাদাবাদী, মৃত্যু ৪১৫ (১০২৫ খ্রি:) হি:।
১১৪. মুহম্মদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৪৩৬ (১০৪৪ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তাঁরা হলেন, ইমাম ফখরউদ্দিন ইবনে খতিব; উনি আল মাহসুল এবং সাইফুদ্দিন আমিদী,[১১৫]; ইনি 'আল আহকাম' নামে পুস্তক দুটি রচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ধারায় পার্থক্য বিদ্যমান। ইবনে খতিব যুক্তি-প্রমাণের প্রাচুর্যের প্রতি এবং আমিদী বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিচিত্র সমস্যা বিশ্লেষণের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আল মাহসুল পুস্তকটির সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন ইমাম খতিবের শিষ্য সিরাজউদ্দিন আরমাবী[১১৬] ও তাজউদ্দিন আরমাবীর[১১৭] ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি যথাক্রমে 'আত্তাহসীল' ও 'আল হাসেল' নামক পুস্তক দুটিতে। শিহাবউদ্দিন কেরাফী[১১৮] উক্ত দুটি পুস্তক থেকে বিভিন্ন আলোচনা ও নিয়ম চয়ন করে 'তানকিহাত' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। বিদ্যার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ে এ শেষোক্ত দুটি পুস্তিকাকে আগ্রহের সাথে পাঠ করে থাকে। এর ফলে বহুলোক এ দুটির ব্যাখ্যাপুস্তক রচনা করেছে। অবশ্য আমিদীর 'আল আহকাম' গ্রন্থটি সমস্যাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বেশি যোগ্য। সুতরাং তার একটি সংক্ষিপ্তসার আবু আমর ইবনে হাজেব[১২০] 'মুখতাসর কবীর' নামে রচনা করেছেন এবং তা বিখ্যাতও হয়েছে। তারপর তিনি উক্ত গ্রন্থকে অন্য একটি পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। বিদ্যার্থীরা সেটি গ্রহণ করেছে এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সকলেই সেটি গ্রহণ, পাঠ ও এর ভাষ্য তৈরির ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বস্তুত এ শাস্ত্রেকালামশাস্ত্রবিদদের ধারার সারবস্তু এসব সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।

হানাফীদের ধারায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের মধ্যে আবু যায়েদ দবুসীর গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং উত্তরসূরিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সাইফুল ইসলাম বজদবীর[১২১] রচনা। ইনি বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং তাঁর গ্রন্থটিও একটি ব্যাপক পরিধির আলোচনা। হানাফীশাস্ত্রবিদদের মধ্যে ইবনে সাআতী[১২২] আল আহকাম ও বজদবীর গ্রন্থকে একত্র করে দুটি ধারার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম 'আল বাদাই'। বস্তুত এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। বর্তমানকালে বিশিষ্ট জ্ঞানীরা এ গ্রন্থটি পাঠ ও আলোচনা করে থাকেন। বহু অনারব জ্ঞানী ব্যক্তি এর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে আমরা এ অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি।

অসুলে ফেকাহ্ নামক এই শাস্ত্রের এটাই তাৎপর্য; এর আলোচ্য বিষয়ও এমন এবং বর্তমানকালে প্রাপ্য তার বিখ্যাত রচনাবলিও অনুরূপ; যেমন বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্

---

১১৫. আলী ইবনে আবু আলী; মৃত্যু ৬৩১ (১২৩৩ খ্রি:) হি:।

১১৬. মাহমুদ ইবনে আবু বকর ৫৯৪—৬৮২ (১১৯৮-—২৮৩ খ্রি:) হি:।

১১৭. মুহম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৬৫৬ (১২৫৮ খ্রি:) হি:।

১১৮. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নং টীকা দ্র:।

১১৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর; ত্রয়োদশ শতাব্দী।

১২০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০১ নং টীকা দ্র:।

১২১. আলী ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৪৮২ (১০৮৯ খি:) হি:।

১২২. আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দের পরে।

www.amarboi.org

আমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করেন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তার অধিকারী করেন। অবশ্যই তিনি প্রতি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

মত পার্থক্য

মত পার্থক্য সম্পর্কে জেনে রাখুন যে, এ ফেকাহ্ নামক শাস্ত্রটি যেসব শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে গবেষণাকারীদের মধ্যে তাঁদের উপলব্ধি ও দৃষ্টিকোণের কারণ প্রচুর মতানৈক্য দেখা দেয়। এরূপ মতানৈক্য অনিবার্য এবং এর কারণও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে একটা বিরাট উদারতা বিদ্যমান ছিল। অনুসারীরা বিশিষ্ট জ্ঞানীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুসরণ করতে সক্ষম হত। পরে উদারতার এ পর্যায় যখন চারজন ইমামের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলল এবং বিভিন্ন নগরীর লোকেরা তাঁদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করল তখন তাঁদের প্রতি আনুগত্যকেই মানুষ সীমাবদ্ধ করে নিল এবং এছাড়া অন্যদের প্রতি আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করল। কারণ তখন শাস্ত্রাদির অতিমাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বসেছিল। তদুপরি সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এ চারটি মজহাবের বাইরে ভিন্নতর মতাদর্শ সৃষ্টির বিষয়টির জন্য যোগ্যলোকের অভাব দেখা দিয়েছিল। সুতরাং উক্ত চারটি মজহাব জাতির ধর্মীয়-ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। এদের অনুসারীরা পরস্পরের মধ্যে যে মতানৈক্যর সৃষ্টি করল, তাই ধর্মীয় বিধি-বিধান ও শাস্ত্রীয় মূলনীতির মতপার্থক্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠল। যেন তাদের বাইরে আর কোন মতামত নেই।

এভাবে প্রতিটি দল তাঁদের ইমামের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে বিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমামের মতকে বিশুদ্ধ মূলনীতি, সুদৃঢ় ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং যে যা অনুসরণ করে, তাকেই একমাত্র সত্যপথ বলতে উৎসাহী হয়েছে। এ বিরোধ ধর্মীয় সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ফেকাহ্শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা দিয়েছে। কখনও এ বিরোধ দেখা দিয়েছে শাফেয়ী ও মালেকের মধ্যে এবং আবু হানিফা তাঁদের একজনের সাথে মতৈক্য প্রদর্শন করেছেন। আবার কখনও মালেক ও আবু হানিফার মধ্যে এবং শাফেয়ী যে-কোন একজনের সাথে একমত হয়েছেন। আবার কখনও শাফেয়ী ও আবু হানিফার মধ্যে এবং মালেক তাঁদের যে-কোন একজনকে সমর্থন করেছেন। এমন বিরোধ-বিতর্কে ইমামদের যুক্তিপ্রদানের উৎস, মতোনৈক্যের ভিত্তি এবং তাঁদের গবেষণার বাস্তব লক্ষ্য বিশ্লেষণ সর্বদাই স্থান পেয়েছে। সুতরাং এরূপ বিরোধ-বিতর্কের সম্মিলিত রূপকে বলা হত 'মতপার্থক্য'। এ বিষয়ে যিনি অবতীর্ণ হতেন তাঁকেও এসব নিয়ম-কানুন জানতে হত, যার সাহায্যে গবেষকরা একটি বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ গবেষক যদিও তাঁর এমন জ্ঞানের দ্বারা একটি নতুন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন; তবুও মতপার্থক্য প্রতিরোধকারীকে ঐ জ্ঞানের দ্বারাই উক্ত সিদ্ধান্তকে বিরোধীপক্ষের যুক্তি-প্রমাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হয়; যাতে তা তাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত না হয়ে যায়।

www.amarboi.org

এটি, আমার জীবনের শপথ, খুবই উপকারী বিদ্যা। এর চর্চার ফলে ইমামদের যুক্তি-প্রমাণের উৎস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় এবং এ বিদ্যায় অনুশীলনকারীরা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে মালেকীদের অপেক্ষা হানাফী ও শাফেয়ীদের রচনা বেশি। কারণ কিয়াস হানাফীদের মতাদর্শের দিক থেকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি বহুল-ব্যবহৃত ভিত্তি; যেমন, পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন। এ কারণে তাঁরা বিচার ও বিতর্কে বেশি দক্ষ। কিন্তু মালেকীদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের ভিত্তি হাদীস হওয়ায়, তারা বিতর্ক বিচারে অভ্যস্থ নয়। তদুপরি তাদের অধিকাংশই মাগরিবের অধিবাসী, প্রান্তর জীবনে নিবিষ্ট এবং সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র শিল্পকৌশল সম্পর্কে উদাসীন।

এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর 'আল-মাখাজ'; মালেকীপন্থী আবু বকর আরবীর[১২৩] 'আত্তালখীম,'—যা তিনি পূর্বাঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন; আবু যায়েদ দবুসীর[১২৪] 'আত্তালিকা'; মালেকী উস্তাদদের অন্যতম ইবনে কাস্সারের[১২৫] 'উয়ুনুল আদেল্লা' প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইবনে সাআতী তাঁর 'অসুলে ফেকাহ্' সম্পর্কীয় 'মুখতাসর' গ্রন্থে ফেকাহ্শাস্ত্রের সব বিরোধাত্মক বিষয় প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে যথানিয়মে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে একত্রে বর্ণনা করেছেন।

বিতর্ক

বিতর্ক হল ফেকাহ্শাস্ত্রের বিভিন্ন মজহাব ও অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠেয় তর্কযুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রচলিত নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ তর্কযুদ্ধে যেহেতু স্বীকার-অস্বীকারের পরিধি ব্যাপক, সেজন্য তার প্রতিটি পক্ষ অধিকতরভাবে যুক্তি-প্রমাণের মুখাপেক্ষী এবং এর মাধ্যমেই তারা প্রশ্নোত্তর পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে এক পক্ষ শুদ্ধ এবং অন্যপক্ষ ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক থেকে বিবেচনা করেই বিশেষজ্ঞরা তার রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করেছেন; যাতে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ উভয়পক্ষ স্বীকার-অস্বীকারের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকে। কোন অবস্থায় একপক্ষ যুক্তি উপস্থিত করবে এবং অন্যপক্ষ উত্তর দিবে। কোন স্থানে যুক্তি উপস্থাপন উপযুক্ত হবে; কীভাবে বিতর্কিত বিষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; কোন স্থানে আপত্তি ও পাল্টা আপত্তি উত্থাপন করবে; কোথায় এক পক্ষকে নীরব হয়ে প্রতিপক্ষকে বক্তব্য ও যুক্তি উপস্থিত করতে দিতে হবে—এমন বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়। এ জন্যই বলা হয় যে, বিতর্ক অর্থই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাত্রা ও নিয়মাবলির জ্ঞান; যা দ্বারা কোন মতকে সুরক্ষিত ও বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয়। এরূপ মত ফেকাহ্শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অথবা বাইরেরও হতে পারে।

---

১২৩. আবু বকর ইবনে আরবি (?) ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৬ নং টীকা দ্র:।
১২৪. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১২ নং টীকা দ্র:।
১২৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭৬ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

এ বিতর্কের দুটি ধারা বিদ্যমান; একটি 'বজদবী' ধারা[১২৬]; এটি ধর্মীয় যুক্তি-প্রমাণ তথা, কুরআন-হাদীস-ইজমা ইত্যাদির দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধতা। অন্য ধারাটি 'আমিদী' ধারা'[১২৭] নামে পরিচিত; এতে যে-কোন শাস্ত্রের দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব এবং তার অধিকাংশই যুক্তিমাত্র। তার বহিরাঙ্গটি কল্যাণকর হলেও তার অন্তরঙ্গ পরিবেশ বিভ্রান্তিতে ভরা। কারণ আমরা যখন যুক্তিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিবেচনা করি, তখন দেখতে পাই যে, তাতে বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত অনুমান ও তর্কাভাস বিদ্যমান। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাতে যুক্তি উপস্থাপনের ধারা সুরক্ষিত এবং যথেচ্ছা যুক্তি প্রয়োগের বৈচিত্র্য অনায়াসলব্ধ। বস্তুত এ আমিদীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ ধারার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এজন্যই এ ধারাটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। ইনি প্রথমে এ ধারায় 'আল-এরশাদ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে উত্তরসূরিদের মধ্যে নসফী[১২৮] ও অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। বহুলোক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ ধারায় অগ্রসর হয়েছেন; ফলে তাঁদের রচনাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য বর্তমানকালে এ বিষয়টি ইসলামী শহরগুলোতে পরিত্যাক্ত; কেননা সেখানে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার ধারা অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে। তদুপরি এ বিষয়টি একান্তই পরিপূর্ণতা বিধায়ক; মৌলিক অন্তর্গত নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

১২৬. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১২১ টীকা দ্রষ্টব্য; সাধারণভাবে ইনি 'ফখরুল ইসলাম' (ইসলামের গর্ব) নামে খ্যাত।

১২৭. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৬১৫ (১২১৮ খ্রি:) হি:।

১২৮. উমর ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৫৩৭ (১১৪২ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

দশম পরিচ্ছেদ

[এলমে কালাম]

এ শাস্ত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত এবং আহলে সুন্নত ও পূর্বসূরিদের সনাতন পথ থেকে বিচ্যুত অভিনব মতবাদের ধারক ও বাহকদেরকে প্রতিরুদ্ধ করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হল একত্ববাদ। আমরা এখানে সে সম্পর্কে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য চমৎকার প্রমাণ উপস্থিত করব; যাতে সহজতম উপায় ও ভিত্তিতে আমাদের কাছে একত্ববাদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এর পর আমরা এলমে কালাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, মুসলমানদের মধ্যে এর আবির্ভাব এবং এর প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ বর্ণনা করব। এখন আমরা বলছি জেনে রাখুন, সৃষ্টিজগতে অস্তিত্বের সম্ভাবনা; তা সত্তাগত, মানুষ অথবা প্রাণীর কৃতকর্মের ফলে উদ্ভূত, যা-ই হোক না কেন, তার জন্য অগ্রবর্তী কার্যকারণের প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত তার দ্বারা তা স্থায়ী স্বভাবে সংঘটিত এবং তার দ্বারাই তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়। তদুপরি এসব কার্যকারণও নবাগত এবং এদের জন্যও অন্যবিধ কার্যকারণের প্রয়োজন। এভাবে এসব কার্যকারণের ধারা উর্ধ্বগতি হয়ে এমন এক চরম কারণে শেষ হয়, যিনি তাদের অস্তিত্ব বিধায়ক ও স্রষ্টা; তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—পবিত্র তিনি।

এসব কার্যকারণ তাদের উর্ধ্বগতি পরম্পরায় বহুগুণিত হয় এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সুবিশাল হয়ে দাঁড়ায়। তখন বুদ্ধি তাদের উপলব্ধি ও গণনায় দিশা হারিয়ে ফেলে। কারণ একমাত্র সর্বগ্রাসী জ্ঞান ছাড়া তাদেরকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মানুষ ও প্রাণিজগতের কার্যাবলি। তাদের সামগ্রিক কার্যকারণের মধ্যে ইচ্ছা ও আগ্রহ দৃশ্যমান। কেননা কোন কাজই ইচ্ছা ও আগ্রহ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। আবার এ ইচ্ছা ও আগ্রহ পূর্ববর্তী কতিপয় পরস্পর অনুসৃত ধারণা থেকেই সাধারণভাবে জন্মে। সুতরাং এসব ধারণাই কর্মের ইচ্ছার জনয়িত্রী। কখনও এসব ধারণার কার্যকারণ হিসেবে অন্য আরও কিছু ধারণার প্রয়োজন হয়। বস্তুত মানবাত্মায় এসব ধারণার উৎপত্তির যথার্থ কারণ অপরিচিত। কারণ কারও পক্ষে আত্মিক বিষয়াদির প্রারম্ভ ও তার পর্যায়ক্রমিক অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই এসব বিষয়কে তাদের মননে নিক্ষেপ করে থাকেন এবং এর একাংশ অপরাংশকে অনুসরণ করে। মানুষ তাদের আদি ও অন্ত জানতে অক্ষম। সে সাধারণভাবে তাদের বাহ্যিক কারণ সম্পর্কেই অবহিত হতে পারে এবং তাই তার উপলব্ধিতে একটি ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

কেননা মানবাত্মার স্বভাব সীমাবদ্ধ এবং একটি বিশেষ পর্যায়ের অন্তর্গত। অথচ ধারণাসমূহ ও তার বিন্যাস মানবাত্মা থেকে বিস্তৃততর। কারণ তা সেই মননের অন্তর্গত, যা মানবাত্মার পর্যায়কে সর্বদা অতিক্রম করে। সুতরাং মানবাত্মার পক্ষে তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; তার সামগ্রিক আয়ত্তি তো অনেক দূরের কথা। পাঠক, এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মপ্রবর্তকের সেই নিষেধাজ্ঞাকে বিবেচনা করুন, যাতে তিনি কার্যকারণ অনুসন্ধান ও তার অবগতি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ তা এমন এক প্রান্তর, যেখানে মননশক্তি দিশা হারিয়ে ফেলে এবং দীর্ঘকালের প্রচেষ্টাতেও কোন গন্তব্য ও তাৎপর্য তার হস্তগত হয় না। 'বল, আল্লাহ্! তারপর তাদেরকে তাদের অন্বেষণের খেলায় মজে থাকতে দাও'।[১২৯]

কখনও এ কার্যকারণ অন্বেষণের ধারা সামর্থ্যের সীমায় গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন অন্বেষণকারী বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আমরা অনুরূপ প্রকাশ্য ক্ষতি ও নৈরাশ্য থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পাঠক, কখনও মনে করবেন না যে, এরূপ অনুসন্ধানে নিরত হওয়া এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা আপনার সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তির অধীন। বরং তা মানবাত্মার এক প্রকার আসক্তি এবং আমাদের অজ্ঞাত এক ধারায় তা কার্যকারণ অনুসন্ধানের ফলে মানবাত্মায় স্থায়ী হয়ে ওঠে। বস্তুত আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতাম। সুতরাং আমাদের উচিত তার সব কিছু থেকেই দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়া।

অন্যদিকে অস্তিত্বের উপর এ কার্যকারণের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিজ্ঞাত। কারণ একমাত্র স্বভাবের ধারাতেই তার সম্বন্ধে জানা যায়। কার্যকারণ সম্বন্ধে ব্যাপারটি একান্তই বাহ্য-বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার প্রভাবের যথার্থ তাৎপর্য ও ধারা সর্বদাই অজ্ঞাত থাকে। 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে'।[১৩০] এ কারণেই আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে এবং ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা যেন আমাদের সব আগ্রহ সেই সর্ব কারণের আধার, তার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াবিধায়কের প্রতি নিবদ্ধ করি। যেন আমাদের আত্মশক্তিতে একত্ববাদের অনুভূতি দৃঢ় হয়। কারণ, আমরা জানি, ধর্মপ্রবর্তক আমাদের ধর্মীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পন্থা সম্পর্কে বেশি অবগত। কারণ তিনি অনুভূতির অতীত বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায় যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ কার্যকারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল সে এ সাক্ষ্যদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তার উপর ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ সত্য হয়ে উঠল। যদি সে এমন মনন ও আলোচনার সাগরে সাঁতার দেয় এবং তাদের প্রভাবের পর্যায়ক্রম একের পর এক বিবেচনা করতেও সক্ষম হয়, তবুও আমি তাকে এ বিষয়ে আশ্বাস দিতে পারি যে, সে নৈরাশ্য ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে ফিরতে সমর্থ হবে না। এজন্য ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে কার্যকারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে এবং শর্তহীনভাবে একত্ববাদের দ্বারস্থ হতে

১২৯. কোরান; ৬, ৯১।
১৩০. কোরান; ১৭, ৮৫।

www.amarboi.org

নির্দেশ দিয়েছেন। 'বল, তিনি আল্লাহ্ এক; আল্লাহ্ অভাবশূন্য, তিনি জনক নন, জাতও নন; তাঁর সমতুল্য অন্য কিছু নেই'।[১৩১]

পাঠক, আপনার মননশক্তি যদি এ ধারণা জন্মায় যে, সে এ সৃষ্টিজগত ও তার কার্যকারণ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানতে পারবে এবং অস্তিত্বের সব পর্যায় জানতে পারবে, তা হলেও তার উপর নির্ভর করবেন না। কারণ এরূপ ধারণা নিছক বোকামী মাত্র। জেনে রাখুন, উপলব্ধিকারীর কাছে তার বাহ্য ধারণা অনুসারে প্রতিটি অস্তিত্ব সম্পর্কীয় উপলব্ধিই সীমাবদ্ধ এবং সেই সীমা অতিক্রম করার সাধ্য তার নেই। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি অনুরূপ নয় এবং অস্তিত্বগত সত্য এ সীমাবদ্ধতা থেকে বড়। পাঠক, আপনি কি দেখতে পান না, একজন বধির কীভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে চারটি ইন্দ্রিয় ও তদ্‌জাত বিবেচনার ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শ্রোতাব্য সবকিছু তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়! অনুরূপভাবে অন্ধের জন্যও দ্রষ্টব্য সব কিছু রহিত হয়ে পড়ে। তারা যদি না পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সমসাময়িক অন্য সবার পদাঙ্ক অনুসরণ করত, তা হলে তাদের অভিজ্ঞতার অতীত সব ব্যাপারই অস্বীকার করে বসত। কিন্তু তারা অন্য সবার ধারা অনুসরণ করেই তাদের উপলব্ধির অতীত এসব বিষয় স্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও উপলব্ধির ধারা কোন সাহায্যই করে না। মূক প্রাণীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে যদি তারা কথা বলতে পারত, তা হলে অবশ্যই বলত যে, মননশক্তি বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং থাকলে অবশ্যই তাদের মধ্যেও থাকত।

পাঠক, এ বিষয়টি যদি আপনি বুঝে থাকেন, তা হলে এও বুঝবেন যে, সেখানে এমন একটি উপলব্ধির অস্তিত্ব আছে, যা আমাদের উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেননা আমাদের উপলব্ধি সৃষ্ট ও নবাগত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বিরাট। সীমাবদ্ধতাই অজ্ঞানতা; অথচ অস্তিত্ব এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বিস্তৃত। 'একমাত্র আল্লাহ্ই সবাইকে বেষ্টন করে আছেন।'[১৩২] সুতরাং আপনার উপলব্ধি ও উপলব্ধ বিষয় সবকিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করুন এবং ধর্মপ্রবর্তক আপনার বিশ্বাস ও কর্তব্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করেন, তাকে অনুসরণ করুন। কেননা তিনি আপনার কল্যাণ সম্পর্কে বেশি আগ্রহী এবং আপনার উপকার সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। কারণ তাঁর উপলব্ধির পর্যায় আপনার উপলব্ধি থেকে উন্নত এবং তাঁর বিবেচনাশক্তি আপনার বুদ্ধিমত্তা থেকে ব্যাপকতর পরিধিতে বিধৃত।

পাঠক, এ বিষয়টিকে বুদ্ধিমত্তা ও তার উপলব্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে কটাক্ষপাত বলে মনে করবেন না। বরং বুদ্ধিমত্তা একটি বিশুদ্ধ তুলাদণ্ড এবং তার নিয়মাবলিও বিশ্বস্ত; তাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তা দিয়ে আপনি আল্লাহ্‌র একত্ব, পরকাল, নবুয়তের তাৎপর্য, আল্লাহ্‌র গুণাবলির যথার্থতা এবং অনুরূপ যা কিছু তার আয়ত্তের বাইরে, তা মেপে দেখতে যাবেন না। কারণ এরূপ কিছু করার অর্থ হল অসম্ভবের জন্য লোভ করা।

---

১৩১. কোরান; ১১২।
১৩২. কোরান; ৮৫, ২০

www.amarboi.org

এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির কাজের দ্বারা দেয়া যায়, যে তুলাদণ্ডে স্বর্ণ ওজন করতে দেখে তা দিয়ে পর্বত মেপে দেখতে লালায়িত হয়ে উঠল। তার এ অসম্ভব বাসনা অবশ্যই এটি প্রমাণ করে না যে, তুলাদণ্ডের রীতিনীতি মিথ্যা। বরং বুদ্ধির একটি সীমা আছে; এর কাছে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সে এর পর্যায় কখনই এত ব্যাপক করে তুলতে পারে না, যা দিয়ে সে আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলিকে বেষ্টন করে ফেলতে পারে। কারণ সে তো তাঁর মধ্য থেকে বিস্তারমান সৃষ্টিপ্রবাহের একটি কণা মাত্র। পাঠক, এ থেকেই সেসব ব্যক্তির ভুলের পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারবেন, যারা উপরোক্ত বিষয়গুলোতে শ্রুতির উপর বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বস্তুত এটি তাদের বিবেচনাশক্তির ত্রুটি এবং তাদের মননশক্তির বিভ্রান্তি মাত্র। পাঠক, এ থেকে আপনি অবশ্যই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

যখন এ বিষয়টি পরিস্ফুট হল, তখন এটি অবশ্যই সম্ভব যে, কার্যকারণ তার পরম্পরাগত ঊর্ধ্বগতিতে আমাদের উপলব্ধি ও অস্তিত্বের পর্যায় অতিক্রম করে যায় এবং তখন তা আর উপলব্ধির বিষয়বস্তু থাকে না। সুতরাং তার অনুসন্ধানে রত বুদ্ধি তখন কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকে এবং ক্রমশ তা দিশাহারা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই একত্ববাদ হল কার্যকারণ ও তার প্রভাবের চরম উপলব্ধির অক্ষমতা এবং তার স্রষ্টা ও বেষ্টনকারীর অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কোন কর্তা নেই এবং সবকিছুর গন্তব্য তিনি ও তাঁর মহিমাই সকলের আশ্রয়স্থল। তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিচয় হল এই যে, আমরা তাঁর মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছি; অন্য কিছু নয়। এটাই সেই জ্ঞানীর তাৎপর্য; যা বিশিষ্ট সত্যনিষ্ঠদের কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে; তাঁরা বলেছেন, 'উপলব্ধির অক্ষমতাও এই প্রকার উপলব্ধি।'[১৩৩]

অতঃপর এ একত্ববাদের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাসই বিবেচনাযোগ্য নয়। কারণ তাতো একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মাত্র; যা জীবাত্মার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। বরং তার পরিপূর্ণতার জন্য জীবাত্মাকে সেই গুণে গুণান্বিত হতে হবে। যেমন উপাসনা ও ক্রিয়াকর্মের আসল উদ্দেশ্য হল আনুগত্যের যোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং অন্তরকে উপাস্য ছাড়া অন্য সব বিষয় থেকে মুক্ত করা। এর ফলে পরিণামে যাতে ইচ্ছুক সাধনাকারী আল্লাহ্ময় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দশার পার্থক্য হল কথা ও গুণের পার্থক্য।

এর ব্যাখ্যা এই : বহু লোক জানে যে, অসহায় ও অনাথের প্রতি দয়া করা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় এবং তাঁর কাছে এটা পছন্দনীয়। তারা এ সম্পর্কে কথা বলে, স্বীকার করে এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে তার সমর্থনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তারাই যদি নিপীড়িত লোকদের, অনাথ শিশু ও অসহায় সন্তানকে দেখে, তা হলে তৎক্ষণাৎ দূরে সরে যায়। তারা এদের কাছেই যেতে চায় না; এদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া এবং তার আরও পরবর্তী পর্যায়ে জড়িয়ে ধরা, কোলে তুলে নেয়া ও কিছু দান করা তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, তার কেবল মাত্র অসহায়ের প্রতি দয়ার জ্ঞান আছে; কিন্তু উক্ত জ্ঞান অনুসারে তা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত

১৩৩. এ উক্তিটি অনেক জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের বাণী বলে মনে হয় না।

www.amarboi.org

করার অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির জন্য, অনাথকে দয়া করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়—এ জ্ঞানসহ অন্য অবস্থাটিও লাভ হয়, তা হলে সে অবশ্যই পূর্বোক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি উন্নত। এটাই দয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং তা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন। কাজেই সে যখন কোন অনাথ-অসহায়কে দেখে, তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে যেয়ে তার মাথায় হাত বুলায় এবং তার প্রতি দয়া দেখিয়ে পুণ্যের প্রত্যাশা করে। সে এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না; এমনকি বাধা দিলেও সে এগিয়ে যায় এবং তার হাতে যা উপস্থিত আছে তা দিয়েই অনাথকে সাহায্য করে থাকে।

পাঠক, একত্ববাদ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও তার গুণে গুণান্বিত হওয়ার অবস্থাও এমন। গুণান্বিত হওয়ার মধ্যদিয়ে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং এটি গুণান্বয়ের পূর্ববর্তী জ্ঞানের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ শুধু জ্ঞান লাভ করলেই গুণের অবস্থা জন্মায় না; বরং সেজন্য বারবার অসংখ্যবার অনুশীলন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই যোগ্যতার স্থায়িত্ব ও গুণান্বয়ের যথার্থতা অর্জিত হয়ে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, যা পরকালের কল্যাণ বহন করে আনে। কারণ গুণহীন প্রথম জ্ঞানের মূল্য ও উপকারিতা খুব একটা কিছু নেই। অধিকাংশ চিন্তাবিদদের জ্ঞান এ পর্যায়ের। কিন্তু লক্ষ্য হল সেই জ্ঞান, যা অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত অবস্থার সাথে একাত্ম হয়ে অবস্থান করে।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক যেসব বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে পরিপূর্ণতার স্বরূপটি হল এই। বিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তাতে পরিপূর্ণতা হল সেই গুণে গুণান্বিত হওয়ার দ্বিতীয় জ্ঞান এবং উপাসনার ক্ষেত্রে যে পালনীয় কার্যকলাপের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানেও পরিপূর্ণতা হল তার গুণ ও তাৎপর্যের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে সজ্জিত করা। কাজেই উপাসনা সম্পর্কে আগ্রহ ও তার নিয়মানুবর্তিতা পালনের মাধ্যমেই সেই মহৎ ফল অর্জনের অবস্থা দেখা দিতে পারে। হযরত (সঃ) সব উপাসনার সার হিসেবে বলেছেন, 'নামাজ আমার চোখের মণি।'[১৩৪] কেননা নামাজ তাঁর জন্য এমন একটি গুণ ও দশার সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে তিনি চরম পুলক আস্বাদন করেন এবং ঐ কারণেই তা তাঁর চোখের মণি। তাঁর এ অবস্থার সাথে সাধারণ মানুষের নামাজের কি কোন তুলনা হতে পারে এবং আর কে তাদেরকে এ পথ দেখাতে পারে? 'সর্বনাশ সেই নামাজীদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন!'[১৩৫] হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শক্তি দিন। 'আমাদেরকে সেই সরল পথ প্রদর্শন করুন, যে পথে আপনার অনুগৃহীত বান্দারা পদচারণা করেছেন; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথ নয়।'[১৩৬]

এ প্রসঙ্গে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা দিয়ে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বান্দার পালনীয় সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধের উদ্দেশ্য হল তার মধ্যে এমন একটি দৃঢ় যোগ্যতার সৃষ্টি করা, যাতে মানবাত্মা বাধ্য হয়ে সেই জ্ঞানের দ্বারস্থ হয়, যাকে

---

১৩৪. হাদিসে উল্লেখিত হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর প্রিয় বস্তুত্রয়ের একটি; অন্য দুটি হল স্ত্রীলোক ও সুগন্ধী।

১৩৫. কোরান, ১০৭, ৪-৫।

১৩৬. কোরান, ১, ৬-৮।

www.amarboi.org

একত্ববাদ বলা হয়ে থাকে। এটাই বিশ্বাসের বিষয় এবং এর দ্বারাই পারলৌকিক কল্যাণ অর্জিত হয়ে থাকে। এ অবস্থাটি মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ভিত্তি ও উৎস হল এ বিশ্বাস।

বাস্তবিকই বিশ্বাস এমনই এক মর্যাদায় বিভূষিত এবং এদিক থেকে তার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। তার প্রথম স্তর অন্তরের বিশ্বাসকে মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তার সর্বোচ্চ স্তর অন্তরের বিশ্বাসকে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবায়িত করা, যাতে অন্তরের প্রভাবের আকর্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। তার নির্দেশে বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হবে, যা দিয়ে অন্তরের সেই বিশ্বাসের গভীরতা প্রকটিত হয়ে উঠবে। এটাই বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। এটাই সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস, যার প্রভাবে বিশ্বাসী ছোট-বড় কোন অন্যায় অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয় না। কারণ এর যোগ্যতা ও দৃঢ়তা তাকে এক পলকের জন্য এর নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যাভিচারীই এমন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, যখন সে বিশ্বাসী।'[১৩৭] হিরাক্লিয়াসের হাদীসে আছে, যখন তিনি হযরত (সঃ) এর অবস্থাদি সম্পর্কে আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন তাঁর সহচরদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাঁর ধর্মে প্রবেশ করার পর কেউ কি রাগ করে ফিরে গেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, না। হিরাক্লিয়াস বললেন, বিশ্বাসের অবস্থাই এই; যখন এর আনন্দ শিহরণ হৃদয়কে স্পর্শ করে।' এর অর্থ বিশ্বাসের প্রভাব যখন একবার দৃঢ়মূল হয়, তখন জীবাত্মার পক্ষে তার বিরোধিতা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি প্রভাবের অবস্থাই এমন; তা সহজাত প্রবৃত্তির ন্যায় বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এটাই বিশ্বাসের সেই চরম পর্যায়। এটি পবিত্রতার তুলনায় দ্বিতীয় স্তরের। কারণ পবিত্রতা নবীদের জন্য পূর্ব থেকেই অবশ্যম্ভাবী এবং এটি বিশ্বাসীরা তাদের সততা ও কার্যকলাপের দ্বারা পরে অর্জন করে থাকেন। বিশ্বাসের এরূপ যোগ্যতা ও দৃঢ়তার ফলেই এর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়ে থাকে এবং পাঠক, এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আপনি পূর্বসূরিদের কথাবার্তার মধ্যে দেখতে পাবেন।

বোখারীর হাদীস সংকলনের শিরোনাম ব্যবহারে দেখা যায়, বিশ্বাসের অধ্যায়ে লিখেছেন; যেমন 'বিশ্বাস কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে'; 'নামাজ ও রোজা ইমানের অংশ'; 'রমজানের নফল এবাদত ইমানের অংশ'; 'লজ্জা ইমানের অংশ' ইত্যাদি। এখানে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে; যার দিকে ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং তার প্রভাবের কথাও বলেছি। এটাই কার্যকরী বিশ্বাস। অন্যথায় যে সত্য স্বীকৃতি বিশ্বাসের প্রাথমিক স্তরে বিদ্যমান, তাতে কোন প্রকার পার্থক্যের অবকাশ নেই। সুতরাং যারা তাকে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থায় বিবেচনা করেন এবং তাকে স্বীকৃতি বলে মেনে নেন, তারা পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন না। যেমন কালামশাস্ত্রবিদগণ এ মত পোষণ করেন। আর যারা যে পর্যায়ের কথা বিবেচনা করে এ

১৩৭. বোখারী দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

স্বীকৃতিকে সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উপর ন্যাস্ত করেন, যা বিশ্বাসীর মধ্যে গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়, তারা পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এ পার্থক্য বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থা স্বীকৃতির যথার্থতায় কোন প্রকার ত্রুটির জন্ম দেয় না। কেননা স্বীকৃতি তার সর্বাবস্থায় বিদ্যমান।

কারণ প্রথম অবস্থায় যাকে ইমান বলা হয়, তার কাজ হল বিশ্বাসীকে 'কুফুর' (অবিশ্বাস) থেকে মুক্তি দেয়া এবং তার দ্বারাই 'মোমেন' (বিশ্বাসী) ও 'কাফের' (অবিশ্বাসীর) মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। সুতরাং তা থেকে কম কোন কিছুর দ্বারা তা সিদ্ধ হওয়ার নয়। বস্তুত তার অস্তিত্বের দিক থেকে তা একক বিষয়; পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। পার্থক্য যা কিছু, তার সবাই তার প্রভাবে সৃষ্ট কার্যকলাপের মধ্যে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। অতএব এটি বুঝে নিন।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক আমাদের জন্য এ ইমামের বলে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, তা হল এ প্রাথমিক স্তরের, যাকে স্বীকৃতি বলা হয়। তিনি কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় স্থির করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে অন্তরের সাথে তা স্বীকার করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই অন্তরে এদের ধারণা পোষণ করব এবং এর সঙ্গে আমাদের জিহ্বা দিয়েও এদের স্বীকৃতি প্রদান করব। এগুলো বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে ধর্মীয় বিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'তা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর গ্রন্থাদি, তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করা এবং নির্ধারিত বিষয়াদি ও তার ভালোমন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা।'[১৩৮]

এগুলোই সেই বিশ্বাসের বিষয়, যা এলমে কালামে আলোকিত হয়েছে। পাঠক, আমরা সংক্ষেপে এর প্রতি ইঙ্গিত করব, যাতে এ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য এবং তার আবির্ভাবের কারণ আপনার সামনে পরিস্ফুট হতে পারে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে সেই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন, যাঁকে তিনি সর্বকর্মের উৎস বলে মনে করেন এবং এককভাবে তাঁকেই তিনি নির্দেশ করেছেন; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তিনি আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে, এ বিশ্বাসই আমাদের মোক্ষলাভের উপায়; যদি মৃত্যুর সময় আমরা এটি পোষণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ স্রষ্টা উপাস্যের অস্তিত্বরহস্য সম্পর্কে কিছুই বলে যাননি। কেননা তা আমাদের উপলব্ধি ও অনুভবের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত এবং আমরা তাতে অক্ষম।

এ কারণেই তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন স্রষ্টার সেই সত্তাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা থেকে পবিত্র রাখি। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এদের স্রষ্টা, এ বিষয়টি অশুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের কোন প্রকার কারণ নির্দেশ সম্ভবপর হয় না। তারপর তিনি তাঁর গুণাবলিকেও নশ্বর গুণাবলির সাথে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতেও সেই পরম স্রষ্টা সৃষ্টির অনুরূপ হয়ে দাঁড়ান। তারপর তিনি সেই পরম স্রষ্টার একক সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে

১৩৮. মুসলিম দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

বলেছেন। কেননা তিনি একক না হলে বিরোধিতার জন্য সৃষ্টিকর্ম কখনও সম্পূর্ণ হত না। তারপর তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, তিনি জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। কেননা এর ফলেই তাঁর কার্যকলাপ পূর্ণতা লাভ করে একটি সুসম্পন্ন উদ্ভাবন ও সৃজনশক্তির পরিচয় বহন করে। তিনি ইচ্ছাময়; নয়তো তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। তিনি প্রতিটি বস্তুকে নির্ধারিত রূপদানকারী; নয়তো তাঁর ইচ্ছাশক্তি নবোদ্ভূতে হয়ে পড়ত। তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে তাঁর উদ্ভাবনের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যই জীবিত করবেন। কেননা এ সৃষ্টিকর্ম যদি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য করা হত, তা হলে তা অনর্থক বলে মনে হত। বরং তা মৃত্যুর পরেও চিরকালীন জীবনের জন্যই নির্ধারিত।

অতঃপর ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে এ পারলৌকিক জীবনের মন্দভাগ্য থেকে মুক্তির জন্য রসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বাস করতে বলেছেন। কারণ তৎকালীন জীবনের অবস্থা সৌভাগ্যে-দুর্ভাগ্যে বিচিত্র এবং সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই বললেও চলে। তিনি সেই অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান করে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের পরিমাণকে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি দুটি পথের কথা উল্লেখ করেছেন। এক পথের শেষে বেহেশত; যেখানে সম্ভোগের প্রাচুর্য এবং অন্য পথের শেষে দোজখ; যেখানে শাস্তির অফুরন্ত সম্ভার।

এগুলোই বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়; বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা যাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এদের প্রমাণের প্রাচুর্য বিদ্যমান। এসব প্রমাণ থেকেই পূর্বসূরিগণ এগুলো গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানীরা এদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিশেষজ্ঞরা এদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব বিশ্বাস্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এরূপ মতানৈক্যের অধিকাংশেরই ভিত্তিভূমি কোরানের দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকসমূহ। সুতরাং এগুলোর অর্থ নিয়ে বিবাদ, বিতর্ক ও শ্রুতির অতিরিক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োগ দেখা দিয়েছে। এগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে এলমে কালামের উদ্ভব ঘটেছে।

পাঠক, আমরা এখন আপনার সামনে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশদ করতে চেষ্টা করব। এটি এই যে, কোরানের বহু আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উপাস্যের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রকার তুলনা থেকে পবিত্র। এগুলোর প্রতিটিই অব্যাখ্যেয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন। সুতরাং তাদের যথাযথ বিশ্বাসই অবশ্য কর্তব্য। ধর্মপ্রবর্তক (সঃ), সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণীতে এদের স্পষ্ট বক্তব্যকেই বিশদ করা হয়েছে। তারপর কোরানে এমন কিছু সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা দ্বারা কখনও সত্তায় আবার কখনও গুণাবলিতে তুলনার একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু পূর্বসূরিগণ এক্ষেত্রে পবিত্রতার প্রমাণ-প্রাচুর্য ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের আধিক্যের জন্য তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কোন প্রকার তুলনাকে অসম্ভব বলে জেনেছেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে, আয়াতগুলো আল্লাহ্র কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং কোন প্রকার আলোচনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা এদের অর্থ পরিস্ফুট করতে উদ্যোগী হননি। এটাই তাঁদের অধিকাংশের সেই বাণীর তাৎপর্য

www.amarboi.org

যেখানে তাঁরা বলেছেন, এগুলোকে পাঠ কর, যেমন এসেছে; অর্থাৎ বিশ্বাস কর যে, এগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। এদের ব্যাখ্যা ও বিশদীকরণের কোন চেষ্টা কর না। কারণ, এমনও হতে পারে যে, এগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিরতি ও আনুগত্য অবশ্য প্রদর্শনীয়।

তাঁদের সমসাময়িককালে অভিনব মতের অনুসারীরা সংখ্যায় স্বল্প ছিল। তারা এসব দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের বক্তব্য অনুসরণ করে তুলনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিত। তাদের মধ্যে একদল স্রষ্টার সত্তায় তুলনা আরোপ করে তাঁর হাত, পা ও মুখমণ্ডল আছে বলে মনে করত। এক্ষেত্রে তারা কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যকে কাজে লাগাত। সুতরাং তারা সুস্পষ্ট সাকারবাদের অধীন হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রমাণগুলোর বিরোধিতা করত। কারণ কোন প্রকার আকারের বোধগম্যতা অভাব ও ত্রুটির অধীন হতে বাধ্য। তদুপরি সম্পূর্ণ পবিত্রতার সপক্ষে প্রামাণ্য আয়াতগুলো, যা সংখ্যায় বেশি ও বক্তব্যে সুস্পষ্ট; তা ঐসব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে বেশি ভাল, যাদের বক্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণের কোন প্রকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ দু শ্রেণীর আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা না করে অধিকাংশ আয়াতের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিতে পারি।

অতঃপর এরূপ সাকারবাদীরা তাদের বক্তব্যের দুর্ভাগ্য থেকে পলায়নের জন্য বলেছে, 'এ দেহ অন্যান্য দেহের মতো নয়।' কিন্তু এটি তাদের দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করে না। কারণ এ বক্তব্যটি ত্রুটিপূর্ণ এবং 'ইতি' ও 'নেতি'র এক অপূর্ব মিশ্রণ। কেননা এটি দেহের বোধগম্য স্বরূপের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তারা এ দুই দেহের ধারণার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তা হলে তারা অবশ্যই সুপরিচিত ধারণাকে নস্যাৎ করছে এবং এক্ষেত্রে তারা আমাদের পবিত্রতার মতের সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য। এর পর দেহ শব্দটি তাদের একটি নাম হিসেবেই শুধু অবশিষ্ট থাকছে। অবশ্য আল্লাহ্‌র এমন নাম গ্রহণও অনুমতিসাপেক্ষ।

এমন অভিনব মতের অধিকারীদের একদল গুণাবলির মধ্যে তুলনার বক্তব্য উপস্থিত করেছে। যেমন আল্লাহ্ সম্পর্কে দিক, আরোহণ, অবতরণ, শব্দ, অক্ষর ও অনুরূপ অন্যান্য গুণের মত তারা পোষণ করে। এ মতও তাদেরকে সাকারবাদের দিকে আকর্ষণ করে এবং এজন্যই তারা পূর্ববর্তীদের ন্যায় বলতে বাধ্য হয় যে, এ শব্দ অন্যান্য শব্দের মতো নয়; এ দিক অন্যান্য দিকের মতো নয়; এ অবতরণ অন্যান্য অবতরণের মতো নয়—যাকে সাধারণ দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়।

তাদের এমন মতবাদের প্রতিরোধকল্পে ইতিপূর্বে যে প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই এখানে প্রযোজ্য। এর পর কোরানের আয়াতের এ প্রকাশ্য বক্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের বিশ্বাস ও তাঁদের মতাদর্শই অবশিষ্ট থাকছে। তা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থকে যথাযথ বিশ্বাস করা মাত্র। কারণ তাদের এ অর্থ নস্যাৎ করতে গেলে তাদেরকেই নস্যাৎ করার অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এগুলো কোরানের বিশুদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আয়াত; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পাঠক, এ জন্যই আপনি এ বিশেষ সাক্ষাৎ লাভ করবেন ইবনে যায়েদের 'রেসালা'[১৩৯] ও তাঁর 'মুখতাসর' নামক গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার[১৪০] ও

১৩৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮৪ নং টীকা দ্র:।
১৪০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫২ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

অন্যান্যদের রচনায়। সেখানে তারা উপরোক্ত বক্তব্যেরই সমর্থন দিয়েছেন। তাঁদের আলোচনার ধারা অনুসরণ করলে সেখানকার বিশেষ ইঙ্গিত কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

অতঃপর যখন শাস্ত্র ও শিল্পের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং মানুষ সব দিকে গ্রন্থ রচনায় ও আলোচনায় মনোনিবেশ করল, তখন কালামশাস্ত্রবিদরা পবিত্রতা সম্পর্কে পুস্তকাদি লিখলেন। মুতাজেলাদের অভিনব মতবাদ প্রকাশ পেল। তারা অব্যাখ্যেয় আয়াতগুলোতেও এ পবিত্রতার নীতি সাধারণভাবে প্রয়োগ করে জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও জীবন সম্পর্কীয় গুণাবলির অর্থকেও নস্যাৎ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা এগুলোকে বিধি-নিষেধের অতিরিক্ত বলে ভাবল। কারণ এসব গুণের অনাদিত্ব স্বীকার করে নিলে তাদের ধারণা মতে অনাদিতে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা গুণাবলি কখন সত্তার অন্তর্গত ও তার বহির্ভূত কিছু নয়। তারা ইচ্ছার অনাদিত্বও অস্বীকার করেছে। এর ফলে তাদেরকে নির্ধারণের ব্যাপারটিও অস্বীকার করতে হয়েছে। কারণ এ নির্ধারণের অর্থই হল সৃষ্টির পূর্বে ইচ্ছার অস্তিত্ব বর্তমান থাকা। তারা শ্রুতি ও দৃষ্টিকেও অস্বীকার করেছে; কারণ এগুলোও দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তাদের এ মতও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে দেহের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তা শুধু শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুর উপলব্ধিমাত্র। তারা শ্রুতি ও দৃষ্টির ন্যায় বাক্যকেও অস্বীকার করেছে। অথচ বাক্য যে স্বয়ম্ভু হতে পারে, এ বিষয়টি তারা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারা এর সূত্র ধরে এ মতও প্রকাশ করেছে যে, কুরআন সৃষ্ট। পূর্বসূরিরা এ অভিনব মতবাদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। তবুও এ অভিনব মতে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। কোন কোন খলিফা মুতাজেলাদের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করে মানুষকে এর অনুসারী করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরি বিশেষজ্ঞরা এর বিরোধিতা করেছেন এবং এ বিরোধের ফলে প্রচুর সম্পদ নষ্ট হয়েছে ও রক্তপাত ঘটেছে।

এসব কারণে আহলে সুন্নতদের জন্য বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়; যাতে এরূপ অভিনব মতামতের প্রসার রোধ করা সম্ভব হয়। কালামশাস্ত্রবিদ শিরোমণি উস্তাদ আবুল হাসান আশআরী[১৪১] এ প্রতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান এবং সব মত ও পথের মধ্যে তুলনাহীনতার একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কার করেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাকে পূর্বসূরিদের নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করেন। তিনি বিশেষ বিশেষ যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রেও সাধারণ ধারণার প্রতিষ্ঠা অবারিত করে তোলেন। এর ফলে তিনি শ্রুতি ও মনন উভয়বিধ প্রমাণের সাহায্যে চারটি তাত্ত্বিক গুণ—শ্রুতি, দৃষ্টি, বাক্য ও স্বয়ম্ভরতার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। অভিনব মতবাদের সর্বক্ষেত্রে তিনি বিরোধিতা করে তাকে নস্যাৎ করেন। অভিনব মতামত পোষণকারীরা তাদের যুক্তির ভিত্তি হিসেবে কল্যাণ, সর্বোত্তম, সৎ ও অসৎ প্রভৃতির যে ধারণা তুলে ধরেছিল, তিনি তারও যথাযথ আলোচনা করেন। তিনি রসূল প্রেরণ, পারলৌকিক

১৪১. আলী ইবনে ইসমাইল; ২৬০—৩২৪ (৮৭৪—৯৩৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অবস্থা, বেহেশ্‌ত, দোজখ, পুণ্য ও শাস্তির ধারণাগুলোকে পূর্ণতা দান করেন। এদের সাথে তিনি 'ইমামত' সম্পর্কীয় আলোচনাও সংযুক্ত করেন। কারণ তখন শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিনব মত—'ইমামের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অংশ'—এটি প্রকাশ পেয়েছিল। তারা ধারণা করে, নবীর জন্য এ ইমাম নির্দিষ্ট করে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং এ ব্যাপারে দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে, তার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া শুধু তাঁর নয়, সমগ্র জাতিরও অবশ্য করণীয়। ইমামত সম্পর্কীয় এ ধারণার ত্রুটি এই যে, এটি একান্তই সামাজিক কল্যাণের বিষয়; এর সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ তাদের এমন ধারণার জন্যই এ বিষয়টিকে আলোচ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কালামশাস্ত্রবিদগণ এসব আলোচনার সমষ্টিকে 'এল্‌মে কালাম' নামকরণ করেছেন। এর কারণ, হয়—এতে আভিনব মতের পোষকদের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তারের বিষয় আছে, যা বাকসর্বস্ব ব্যাপার মাত্র; কখনই এটি কর্তব্যকর্মের মধ্যে বিধৃত হয় না; নয়ত এ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বয়ম্ভু বাক্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাদের যুক্তি-প্রমাণ অন্বেষণ। এ জন্যই এটি 'এলমে কালাম' (বাকশাস্ত্র) বলে অভিহিত হয়েছে।

উস্তাদ আবুল হাসান আশআরীর অনুসারীদের সংখ্যা প্রচুর এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর পথ অনুসরণ করে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, যেমন ইবনে মুজাহেদ[১৪২] ও অন্যান্যরা খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে কাজী আবু বকর বাকেল্লানী[১৪৩] এটি গ্রহণ করে ইমামত সম্পর্কীয় বিষয়ে তাঁদের ধারা অনুসারে আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি এ মতটিকে আরও পরিস্ফুট করেছেন এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এমন বহু প্রস্তাবনার সৃষ্টি করেছেন, যার উপর শাস্ত্রান্তর্গত যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। যেমন অণু ও শূন্যের প্রতিষ্ঠা; একটি বহিরাগত অবস্থা নির্ভর করতে পারে না; একই বহিরাগত অবস্থা দুটি কালে স্থায়ী হয় না এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়, যার উপর তাদের যুক্তি-প্রমাণ নির্ভর করে। তিনি এসব নিয়মকে ধর্মীয় বিশ্বাসাদির অনুসারী করেছেন এবং বিশ্বাসকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এ বিশ্বাসের প্রয়োজনেই এসব যুক্তি-প্রমাণের উদ্ভাবনা। সুতরাং যুক্তি-প্রমাণ নস্যাৎ হলেই বিশ্বাস নস্যাৎ হয়ে যাবে—এ ধারণার উদ্ভব যেন না হয়।

এর ফলে এ ধারা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং একটি উৎকৃষ্ট বিতর্কশাস্ত্র ও ধর্মীয় জ্ঞানের শাখায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য অনেক সময় উক্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত যুক্তি-প্রমাণের বাহ্যিক রূপটি শিল্পসৌষ্ঠব সম্পন্ন বলে মনে হতে না পারে। এর কারণ জাতি তখনও সারল্যের মধ্যে অবস্থান করছে; তখনও তাঁদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার সেই স্বরূপ প্রকটিত হয়নি, যা দিয়ে প্রমাণের সৃষ্টি হয় এবং অনুমানের সূত্রাদি বিবেচনা করা হয়। বস্তুত যুক্তিবিদ্যা তখনও প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং তার যে অস্তিত্ব তখন বর্তমান ছিল, কালামশাস্ত্রবিদগণ তার সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ তা তখন দর্শনের অন্তর্গত

১৪২. আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আহমদ তাই; মৃত্যু ৩৬০—৭০ (৯৭০—৮০ খ্রি:) হিজরীর মধ্যে।

১৪৩. ভূমিকার ৮৩ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

এবং সে দিক থেকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একারণেই যুক্তিবিদ্যা তাঁদের প্রমাণ উপস্থাপনে সম্পূর্ণ পরিত্যাক্ত ছিল।

কাজী আবুবকর বাকেল্লানীর পরে এ ধারায় আশায়েরাপন্থী বিখ্যাত ইমামুল হরমাইন আবদুল মুআলী[১৪৪] আবির্ভূত হন। তিনি এ ধারার একটি ব্যাপক গ্রন্থ রচনা করে সেখানে আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করেন। তারপর তিনি তার সংক্ষিপ্তসার 'আল ইরশাদ' গ্রন্থটি রচনা করে এবং মানুষ একে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে দিক নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে।

এর পর মুসলমানদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটে। মানুষ এটি পাঠ করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ তারা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে সক্ষম হয়। যুক্তিবিদ্যা প্রমাণের জন্য একটি মাপকাঠি ও নিয়মবিশেষ। এর দ্বারা যেমন এ শাস্ত্রে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়; তেমনি অন্যান্য শাস্ত্রেও করা সম্ভব। তারপর তারা পূর্ববর্তীদের কালামশাস্ত্র সম্পর্কীয় নিয়ম ও প্রস্তাবনাগুলোতে দৃষ্টি দেয় এবং এ নবলব্ধ প্রমাণাদির দ্বারা তার বহু বিষয়ের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। অনেক সময় তারা এ প্রসঙ্গে যে যুক্তি-প্রমাণ দেখতে পেত তার অধিকাংশই ছিল পদার্থবিদ্যা ও আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে নেওয়া। সুতরাং তারা যখন এগুলোকে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার করে দেখল, তখন ঐসব যুক্তির অনেকগুলোই পূর্বের স্থানে ফিরে গেল। কিন্তু এর ফলে তারা প্রমাণের ত্রুটিতে প্রামাণ্যকে অবিশ্বাস করতে বসল না। যেমন কাজী বাকেল্লানীও করেননি। সুতরাং তাদের এ নব্য প্রচেষ্টা তার পরিভাষাদিসহ পূর্ববর্তী ধারা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল এবং একে পরবর্তীদের ধারা বলে অভিহিত করা হল।

এ পরবর্তীরা অনেক সময় এ আলোচনায় ধর্মীয় বিশ্বাসাদি সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবিরোধেরও প্রতিবাদ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মতামত অভিনব মতবাদীদের সাথে এক হয়ে যাওয়ায় তারা দার্শনিকদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসের শত্রু বলে ভেবেছেন। এ ধারায় সর্বপ্রথম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কালামশাস্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন ইমাম ইবনে খাতিব।[১৪৫] তারপর একদল তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু এর পরে পরবর্তীর দর্শন গ্রন্থাদির বিষয় ব্যবহারে আতিশয্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে উক্ত দুটি শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পার্থক্য লোপ পেয়ে বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা উভয় শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা ঐক্য থাকার ফলে সেগুলোকে এক বলে ভাবতে লাগলেন।

পাঠক, জেনে রাখুন, কালামশাস্ত্রবিদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সৃষ্টজগৎ ও তার অবস্থাদির দ্বারা স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলির প্রমাণ উপস্থিত করতেন এবং সাধারণভাবে এটাই ছিল তাঁদের প্রমাণের অন্যতম বিষয়। পদার্থবিদ্যার আলোচনায় দার্শনিকগণ যে স্বাভাবিক দেহের প্রতি দৃষ্টি দেন, তাও এ সৃষ্টজগতেরই অংশবিশেষ। অবশ্য দার্শনিক

---

১৪৪. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১০ টীকা দ্র:।

১৪৫. তৃতীয় অধ্যায়ের ৫০ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

যে দৃষ্টিতে সেটাকে দেখেন, তা থেকে কালামশাস্ত্রবিদের দৃষ্টি ভিন্ন। তিনি এ দেহকে তার গতি ও স্থিতির দিক থেকেই বিবেচনা করেন। অথচ কালামশাস্ত্রী তাকে একজন কর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে লক্ষ করেন। এভাবে আধ্যাত্মবাদে দার্শনিক কেবলমাত্র একটি শর্তহীন অস্তিত্ব ও তার সত্তাসম্পর্কীয় বিষয়াদি নিয়েই বিচার করেন। কিন্তু কালামশাস্ত্রী এ অস্তিত্ব সম্পর্কেই এমনভাবে বিবেচনা করেন, যাতে তা একজন স্রষ্টার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করতে পারে। সুতরাং মোটামুটিভাবে কালামশাস্ত্রবিদদের কাছে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল সেসব ধর্মীয় বিশ্বাস, যা সত্য বলে ধর্মীয় বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। যাতে এ নির্ধারিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অভিনব মতামত দূর হয় এবং কোন প্রকার দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ না থাকে, সে জন্যই তাঁরা এগুলো সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করে থাকেন। পাঠক, আপনি যদি এ শাস্ত্রের উদ্ভব, যুগ পরম্পরায় এর সম্পর্কে মানুষের বিচিত্র আলোচনা এবং সবাই এগুলোকে সঠিক মেনে নিয়ে যেভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেন, কেবল তা হলেই এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি তা আপনার বোধগম্য হবে এবং দেখবেন তা কখনও সীমা অতিক্রম করে না।

কিন্তু এ উত্তরসূরিদের কাছে এ দুটি ধারা একত্রে মিলে গেছে এবং কালামশাস্ত্রের সমস্যাদির সাথে দর্শনশাস্ত্রের অনুরূপ বিষয় এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেয়েছে যে, তাদের একটি অন্যটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বিদ্যার্থীরা তাঁদের অনুরূপ গ্রন্থাদি থেকে কোন বিষয়ই সুষ্ঠুভাবে জানতে সক্ষম হয় না, যেমন বায়জাবীর 'আত্তাওয়ালি' নামক গ্রন্থ এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য অনারব শাস্ত্রবিদদের গ্রন্থাবলি। অবশ্য এ মিশ্রধারায় রচিত গ্রন্থাবলি পাঠে বিভিন্ন মতাদর্শ এবং যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যার্থীরা উপকৃত হতে পারে। কেননা এসব বিষয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু কালামশাস্ত্রের বিশ্বাসাদি সম্পর্কে পূর্বসূরিদের ধারা জানতে হলে, তা একমাত্র কালামশাস্ত্রবিদদের প্রাচীর ধারাতেই পাওয়া যাবে এবং তার মূল ভিত্তি হল 'কিতাবুল ইরশাদ' ও তার অনুসারী অন্যান্য গ্রন্থ।

যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মতামতের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক তারা ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে খতিবের গ্রন্থাবলি পাঠ করুন। কারণ তাঁদের রচনাবলিতে যদিও প্রাচীন পরিভাষার বিরোধিতা বিদ্যমান, তবু এগুলোতে সমস্যাদির মিশ্রণ ও আলোচ্য বিষয়ের বিভ্রান্তি নেই; যেমনটি আমরা তাঁদের পরবর্তীদের রচনার লক্ষ করেছি।

অবশ্য মোটামুটি বলতে গেলে এটি জেনে রাখা দরকার যে, এ শাস্ত্রটি, যাকে এলমে কালাম বলা হয়, তা বর্তমানকালে বিদ্যার্থীদের আর পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পথভ্রষ্ট ও অভিনব মনের অধিকারীদের সংখ্যা বহুলাংশে কমে গেছে। তদুপরি আহলে সুন্নতের বিশিষ্ট জ্ঞানীরা এ বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন, তাই এজন্য যথেষ্ট। কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের দরকার তখনই পড়ে, যখন প্রতিরোধ ও সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে অনুরূপ পরিস্থিতির মাত্র একটি দিকই

www.amarboi.org

অবশিষ্ট আছে; তা হল সর্বপ্রকার বল্গাহীন উক্তি ও অসৎ ধারণা থেকে স্রষ্টার পবিত্রতাকে মুক্ত রাখা।

একদল কালামশাস্ত্রবিদের শাস্ত্রালোচনাকালে জুনায়েদ (রহঃ)[১৪৬] তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ তাঁকে তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাঁদের পরিচয় কী? বলা হল, এ দল যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পরিবর্তনশীল গুণাবলি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিলতা থেকে আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে রক্ষা করেন। এর উত্তরে তিনি বললেন, যেখানে ত্রুটি একান্তই অসম্ভব, সেখান থেকে ত্রুটি দূর করাও এক প্রকার ত্রুটি। অবশ্য এসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ও বিদ্যার্থীদের এ শাস্ত্রালোচনার উপকারিতা সর্বজনস্বীকৃত। কারণ সুন্নতের অনুসারীদের জন্য নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণের অনভিজ্ঞতা কোনক্রমেই শোভন বলে বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের বন্ধু।[১৪৭]

১৪৬. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৪ নং টীকা দ্র:।

১৪৭. কোরান; ৩, ৬৮।

www.amarboi.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

[পরিবর্তমান ক্রিয়াশীল জগৎ একমাত্র মননশীলতার দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়]

জেনে রাখুন, সৃষ্টিজগৎ, শুদ্ধসত্তা যথা, উপাদান ও তার প্রতিক্রিয়া এবং সেগুলোর ফলে উদ্ভূত ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণী—এ তিন সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত। এদের সমস্ত কিছুই ঐশ্বরিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া এ সৃষ্টিজগতে আছে প্রাণিসমাজের উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যকলাপ। এগুলোও, আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করেন, সেদিক থেকে তাঁর ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। এসব কার্যকলাপের মধ্যে কিছু আছে সুপরিকল্পিত সুবিন্যাস্ত; এগুলোই মানুষের কাজ এবং কিছু আছে অপরিকল্পিত অবিন্যস্ত; এগুলো হল মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর কাজ।

এর কারণ এই যে, মননশক্তি স্বাভাবিকভাবে অথবা প্রচলিত ধারায় পরিবর্তমান বস্তুপুঞ্জের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং সে যখন কোনো একটি বস্তু উদ্ভাবন করতে ইচ্ছা করে, তখন পরিবর্তমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যকার বিন্যাসের জন্য তাকে তৎসংশ্লিষ্ট কারণ, লক্ষ্য অথবা শর্তাদি জেনে নিতে হয়। এ জানা মোটের উপর তার প্রারম্ভ বিশেষ। কারণ তা প্রাথমিক প্রস্তুতির পরই অস্তিত্বে আসে। এ জন্যই অগ্রবর্তী বিষয়কে পশ্চাদ্বর্তী করা যায় না এবং পশ্চাদ্বর্তীকেও অগ্রবর্তী করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত প্রারম্ভের জন্য কখনো অন্য একটি প্রারম্ভ থাকে, যা ঐ প্রারম্ভসমূহেরই অন্তর্গত এবং একমাত্র পশ্চাদ্বর্তী হিসেবে অস্তিত্বে আসে। কখনো এটা ক্রমান্বয়ে উপরে উঠতে থাকে অথবা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তা যখন প্রারম্ভের শেষ দুই, তিন অথবা ততোধিক পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঐ ক্রিয়াটি আরম্ভ করা হয়, যা দিয়ে বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তখন সেই শেষ প্রারম্ভ থেকে ক্রিয়াটি আরম্ভ করা হয়, যেখানে মননশক্তি গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই ঐ শেষ প্রারম্ভটি ক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হয়ে থাকে। তারপর তাকে অনুসরণ করে কর্তা সেই কার্যকারণ ধারায় পৌঁছে, যেখানে সে প্রথম মনন কাজ আরম্ভ করেছিল। যেমন কেউ যদি আচ্ছাদনের জন্য একটি ছাদের পরিকল্পনা করে, তা হলে তার ধীশক্তি তাকে সেই প্রাচীরের দিকে নিয়ে যাবে, যা দিয়ে ঐ ছাদটি রক্ষিত হতে পারে। এর পর তার দৃষ্টি পড়বে সেই ভিত্তির দিকে, যার উপর ঐ ছাদটি দাঁড়াতে পারে এবং এটিই মননের শেষ পর্যায়। তারপর সে প্রথমে ভিত্তি নির্মাণ করবে, এর পরে প্রাচীর এবং এর পরে ছাদ। এটা তার ক্রিয়ার শেষ পর্যায়।

তাঁদের সেই বক্তব্যের অর্থও এটাই, যেখানে তাঁরা বলেন, কাজের আরম্ভ চিন্তার শেষ এবং চিন্তার আরম্ভ কাজের শেষ। সুতরাং বাহ্যিকভাবে মানুষের ক্রিয়া এসব

www.amarboi.org

পর্যায়ক্রমের পরস্পরের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে মননশক্তির প্রয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। একমাত্র এ চিন্তার পরই সে কাজ শুরু করতে পারে। তার চিন্তার প্রথম পর্যায় কার্যকারণ হিসেবে অন্তিম এবং তা-ই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়। তার কার্যের প্রথম পর্যায় কার্যকারণ হিসেবে প্রথম এবং তাই চিন্তার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়। এমন পর্যায় বিন্যাস সম্পর্কে অবহিতির ফলেই মানুষের কার্যকলাপে শৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে।

কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর কার্যাবলিতে এ শৃঙ্খলাবোধের বালাই নেই। কারণ তাদের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়বিন্যাস সম্পর্কীয় মননশীলতার অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য প্রাণীরা ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে অনুভূতি লাভ করলেও তাদের উপলব্ধ জ্ঞান পৃথক-পৃথকভাবে অবস্থান করে এবং তাতে সমন্বয় সাধনের কোনো প্রক্রিয়া নেই। কারণ একমাত্র মননশক্তির সাহায্যেই এ সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এ সৃষ্টিজগতে যেহেতু শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিকেই একমাত্র ধর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয় এবং শৃঙ্খলাবোধহীন উপলব্ধি তার অনুগত হয়ে থাকে, সে জন্য প্রাণিজগতের কার্যাবলিকে এ পর্যায়ে ফেলে তাকে মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। মানুষের কার্যাবলি এ পরিবর্তমান জগতের উপর তার সক্রিয়তাসহ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে এবং এর ফলে জগতের সবকিছুই তাদের অনুগত ও বাধ্য হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে প্রতিনিধিত্বের কথা বলে এরই প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করব'।[১৪৮]

এ সেই মননশক্তি, যা মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্য সব প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করে দিয়েছে। তার এ মননশক্তির কার্যকারণ ও উপলক্ষ সম্পর্কীয় পর্যায়ক্রমিক অবগতি মাত্রা অনুসারে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা এ কার্যকারণের দু স্তর, তিন স্তর পর্যন্ত অবহিত হতে পারেন; অনেকে এ সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হন না; আবার অনেকে পাঁচ স্তর, ছয় স্তর পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হন এবং এদিক থেকে তাঁদের মনুষ্যত্বও উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে। পাঠক, দাবা খেলোয়াড়কে দিয়ে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রচলিত পর্যায়ক্রমে তিন চাল এমনকি পাঁচটি চাল পর্যন্ত ধারণা করে রাখতে পারেন; আবার অনেকে তাদের ধীশক্তির ত্রুটির জন্য অনুরূপ কিছু ধারণা করতে অক্ষম। অবশ্য একদিক থেকে এ উদাহরণটি যদিও যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ দাবা খেলার বিষয়টি অর্জিত যোগ্যতামাত্র এবং কার্যকারণ ও উপলক্ষের পর্যায়ক্রমিক অবগতির স্বভাবজাত; তবুও এ উদাহরণের সাহায্যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি এসব সম্পর্কীয় নিয়মাবলির বিন্যাসধারা বুঝতে সক্ষম হবেন। 'আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তাঁর জন্য অনেক সৃষ্টির উপর দর্শনীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।[১৪৯]

১৪৮. কোরান; ২, ৩০।
১৪৯. কোরান; ১৭, ৭০।

www.amarboi.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি ও তার উদ্ভবের প্রক্রিয়া]

পাঠক, আপনি অবশ্যই শুনেছেন যে, দার্শনিকদের গ্রন্থে লেখা রয়েছে, মানুষ স্বভাবতই নাগরিক। তাঁরা নবুয়ত ও অন্যান্য বিষয় প্রতিষ্ঠার জন্য এর উল্লেখ করেছেন। এ বক্তব্যে তাঁরা মানুষকে নগরীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন বটে; কিন্তু এটি তাঁদের কাছে মানব সমাজেরই রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে, একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয় এবং তার স্বজাতির সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্বই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ সে একা তার অস্তিত্ব ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে অপারগ। সুতরাং সে সর্বদা তার সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণে অপরের সাহায্যের উপর স্বভাবতই নির্ভরশীল। এ সাহায্যের জন্য তাকে সর্বপ্রথম পরস্পর নির্ভরতার উপলব্ধি জাগ্রত করতে হয় এবং পরে পরস্পর সহযোগিতা ও অন্যবিধ কার্যাদিতে অগ্রসর হতে হয়। অনেক সময় এ পারস্পরিক ব্যবহার উদ্দেশ্যের সমতার জন্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দেয় এবং এর ফলে ঈর্ষা ও সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরই বৃহৎ পরিণতি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তির পর্যায় ডেকে আনে।

এসব অবস্থা যে-কোন পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, কোনক্রমেই অসংবদ্ধ প্রাণীদের অনুরূপ নয়। বরং আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে মননশক্তির দ্বারা কার্যাবলিকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবোধের জন্ম দিয়েছেন। তাদেরকে এসব কাজ শাসনতান্ত্রিক পন্থায় ও দার্শনিক পদ্ধতিতে সংঘটিত করার অনায়াস নৈপুণ্যও দান করেছেন। বস্তুত এগুলোর মাধ্যমে তারা অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে এবং অশুভ থেকে শুভের দিকে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য এর পূর্বে তারা অশুভ ও অকল্যাণকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে এবং এ ব্যাপারে তারা তাদের কৃতকর্মের ফলে সঞ্চিত সুষ্ঠু অভিজ্ঞতা ও সুপরিচিত অভ্যাসাদির সাহায্য নিয়েছে। সুতরাং এসব কাজের দ্বারা উদ্দেশ্যহীন পশুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছে এবং তাদের কার্যাবলির উপর মননশীলতার সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, যা দিয়ে তারা অকল্যাণ থেকে দূরে সরে এসেছে।

এসব তাৎপর্য, যা দিয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে, কোন দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে অনুভূতির বাইরে নয়। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সে জন্য গভীরভাবে তলিয়ে

www.amarboi.org

দেখতে হয় না। বরং তার সবকিছুই অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তা দিয়ে উপযোগিতার পর্যায়ে আসে। কেননা এগুলো অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত আংশিক তাৎপর্য; কখনও সত্য হয়, কখনও মিথ্যা হয় এবং ঘটনাবলির মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে প্রকাশ পায়, যা দিয়ে তার অন্বেষণকারী তৎসম্পর্কিত জ্ঞানলাভে উপকৃত হয়ে থাকে। বস্তুত প্রতিটি মানুষের জন্যই স্বজাতির সাথে তার ব্যবহারের ফলে সংঘটিত পরিস্থিতিতে তার ক্ষমতা অনুসারে অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভবনা বিদ্যমান। এমনকি এটি থেকেই সে তার ন্যায্য ও উচিত গ্রহণ-বর্জনের ধারণা লাভ করে। স্বজাতির সাথে এরূপ ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতাই তাকে যোগ্য করে তোলে। যে ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সারা জীবন ধরে অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানে সমর্থ হয়, তার পক্ষে প্রতিটি সমস্যায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এজন্য তাকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

কিন্তু আল্লাহ্ খুব অল্প সময়ের অভিজ্ঞতার দ্বারাই মানুষকে অনুরূপ ব্যুৎপত্তি লাভের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কারণ এ ব্যাপারে সে পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনদেরকে অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষায় যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তার মাধ্যমে সে দীর্ঘকাল ধরে সংঘটিত ঘটনাবলিকে লক্ষ করে জ্ঞান সংগ্রহের বিপুল আয়াস থেকে বেঁচে যায়। যে ব্যক্তি অনুরূপ জ্ঞান লাভ ও অনুসরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অথবা স্বেচ্ছায় শোনার ও অনুগত হওয়ার প্রবৃত্তি ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি লাভ খুবই কষ্টসাধ্য। কেননা সে অনবরত অপরিচয়ের দ্বারা বিব্রত এবং সম্পর্কহীনতার মধ্যে অবগত হবে। এর ফলে তার আচার ও ব্যবহার অসংলগ্ন ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে এবং সে স্বজাতির মধ্যে সাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হবে না।

এটাই সম্ভবত সেই বিখ্যাত বাণীর তাৎপর্য; যাকে পিতামাতা শিক্ষা দেয়নি, তাকে সময় শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে পিতামাতা ও তাঁদের সমস্থানীয় শিক্ষক ও গুরুজনদের কাছ থেকে দীক্ষা ও শিক্ষা কোনটাই গ্রহণ করেনি, তাকে অবশ্যই স্বাভাবিক পর্যায়ে সংঘটিত ঘটনাবলির ধারা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তখন সময় হবে তার শিক্ষক ও সংশোধক। কারণ তার অন্তর্গত সহযোগিতার স্বাভাবিক প্রেরণাই তাকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।

একেই বলা হয় অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি। এটি কার্যাবলির সংঘটক বিবেক-বুদ্ধির পরে আবির্ভূত হয়ে থাকে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। বুদ্ধির এ দুটি পর্যায়ের পরে আরও একটি পর্যায় বিদ্যমান; তাকে বলা হয় তাত্ত্বিকবুদ্ধি। জ্ঞানীরা এর ব্যাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; সুতরাং আমাদের এ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা প্রদান করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন; কী অল্পই না তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।'[১৫০]

---

১৫০. পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৯ টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[মানুষের জ্ঞান ও ফেরেশতাদের জ্ঞান]

আমরা আমাদের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বলে তিনটি জগৎকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এদের প্রথমটি অনুভূতির জগৎ। আমরা এ জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে বিবেচনা করি এবং এ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক থেকে আমরা প্রাণিজগতের সাথে একই পর্যায়ে অবস্থিত। তারপর আমরা বিবেচনা করি সেই মননশক্তিকে, যা দিয়ে মানুষের বিশিষ্টতা সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমেই আমরা অনিবার্যভাবে জ্ঞাত হই যে, মানুষের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। কারণ এ আত্মাই ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞানজগতের সাথে আমাদের সংযুক্তি সাধন করে। এর ফলে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে অবস্থিত একটি জগতের সন্ধান পাই। তারপর আমরা আমাদের উর্ধ্বস্থিত এমন একটি তৃতীয় জগতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, যার প্রভাব আমাদের হৃদয়ে ইচ্ছা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে আমাদেরকে ক্রিয়াশীল গতির দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেখানে আমাদের জগতের উপরে অন্য একটি জগৎ আছে, যেখানকার কর্তা আমাদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে। তাই আত্মা ও ফেরেশতাজগৎ। উক্ত জগতের সাথে আমাদের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে এমন অনুভূতিশীল সত্তা বিদ্যমান, যার প্রভাব আমাদের উপর সক্রিয় রয়েছে।

অনেক সময় এ উন্নত আত্মিকজগৎ ও তার সত্তাদি সম্পর্কে স্বপ্ন এবং নিদ্রার মধ্যে প্রাপ্য অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। সেখানে আমাদের উপর এমন সব বিষয়ের প্রক্ষেপ ঘটে, যার সম্পর্কে আমরা জাগরণে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকি। এর পর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়ে বাস্তব ঘটনা দেখা দেয় এবং তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তা সত্য ও এক সত্য-জগৎ থেকেই তা এসেছে। অবশ্য সেখানে দুঃস্বপ্নও আছে; এগুলো বস্তুত কিছু কাল্পনিক চিত্র, যা অনুভূতি তার গোপন স্তরে সঞ্চিত করে রাখে এবং অনুভূতির অতীত অবস্থার মননশক্তি তাকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়। পাঠক, আমরা এ আত্মিকজগৎ সম্পর্কে এটি ছাড়া খুব সুস্পষ্ট কোন প্রমাণের সাক্ষাৎ পাইনি। সুতরাং এটি থেকে মোটামুটিভাবে সে সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা সৃষ্টি করতে পারি মাত্র; এর বিস্তারিত জানার কোন উপায় নেই।

আধ্যাত্মতত্ত্ববিদ দার্শনিকরা উক্ত জগতের সত্তা ও তার বিন্যাসগত যে বিশদ ধারণা পোষণ করেন, যাকে তাঁরা বুদ্ধি বলে অভিহিত করেন, তার কোন বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি নেই। কারণ উক্ত ব্যাপারে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণের শর্তাদিতে ত্রুটি বিদ্যমান; যেমন এ

www.amarboi.org

সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যায় তাদের আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা তার শর্তের একটি দিক হল তার প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাথমিকভাবে সত্তাগত হবে। কিন্তু উক্ত জগতের এ আত্মিক সত্তাগুলোর প্রকৃত অবস্থা অপরিজ্ঞাত। সুতরাং উক্ত ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থিত করার কোন উপায় নেই। কাজেই ইমান সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে ধর্মীয় বিধান তাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে এবং যে নির্দেশ দেয় তা থেকে সংগ্রহ ছাড়া উক্ত জগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার উপলব্ধিগত কোন পথ নেই।

বস্তুত এ জগৎত্রয়ীর মধ্যে যে জগৎটি আমাদের উপলব্ধিতে অতিমাত্রায় স্পষ্ট, তা হল মানবিক জগৎ। কেননা তা প্রজ্ঞার দ্বারা আমাদের দৈহিক ও আত্মিক উপলব্ধিতে গোচরীভূত। এটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক দিয়ে প্রাণিজগতের সাথে যুক্ত এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে ও আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সেই ফেরেশতা জগতের সাথে সম্পৃক্ত, যা সত্তার দিক থেকে বুদ্ধি ও আত্মারই সমগোত্রীয়। ফেরেশতারা দৈহিক আকার ও উপাদান থেকে মুক্ত এবং তাদের সত্তা এমন শুদ্ধ বুদ্ধিস্বরূপ, যার মধ্যে বুদ্ধি, বোদ্ধা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেন তারা উপলব্ধি ও বুদ্ধিরই সত্তাস্বরূপ। সুতরাং তাদের স্বভাব অনুসারেই সর্বদা তারা বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ করছে, যার মধ্যে কোন প্রকার বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই।

মানুষের জ্ঞান হল জ্ঞাত বস্তুর একটি আকৃতি তার সত্তার মধ্যে এমনভাবে বিধৃত হওয়া, যা ইতিপূর্বে হয়নি। এর সবটুকুই অর্জিত এবং যে সত্তায় এ জ্ঞাত বস্তুসমূহের আকৃতি বিধৃত হয়, তা বস্তুগত উপাদানে জীবাত্মা গঠিত। এটি জ্ঞাত বস্তুপুঞ্জের জ্ঞান লাভ দ্বারা ক্রমশ বিকশিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে তার সত্তাগত ও উপাদানগত পূর্ণতা যথাস্থানে উপনীত হয়। তার আত্মার ঈপ্সিত বিষয়াদি সর্বদাই ইতি ও নেতির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে এবং তাদের যে-কোন একটিকে কামনা করার জন্য এ উভয় প্রান্তের মধ্যভাগে একটি যোগসূত্র স্থাপিত থাকে। তাদের যে-কোন একটি যখন অর্জিত হয়, তখন তার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাকে কলাকৌশলগত যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বিশদ করা হয়; কিন্তু তা যবনিকার অন্তরালেই থেকে যায়। কখনই তেমনভাবে গোচরীভূত হয় না, যেমনটি ফেরেশতাদের জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান। আবার কখনও এ যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং চাক্ষুষ উপলব্ধির মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ঘটে থাকে।

এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবত অজ্ঞ। কারণ তার জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে অস্থিরতা বিদ্যমান। সে শুধুমাত্র অর্জন ও কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞানী হয়। এক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করার জন্য তাকে কৌশলগত শর্তাদির অনুধাবনে যত্নবান হতে হয়। যবনিকা উত্তোলনের যে ব্যাপারটির প্রতি আমরা ইঙ্গিত প্রদান করেছি, তা কেবল নামজপের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এ নামজপের মধ্যে নামাজই শ্রেষ্ঠ; কেননা তা অসৎ কথা ও কার্য থেকে বিরত রাখে। তদুপরি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ-সম্ভোগ থেকেও পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এবং তার মুখ্য পন্থা হল রোজা। সর্বোপরি সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্র হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। 'আল্লাহ্ মানুষকে তাই জানিয়েছেন, যা তার জানা ছিল না।[১৫১]

১৫১. কোরান; ৯৫, ৫।

www.amarboi.org

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[নবী (আঃ) দের জ্ঞান]

আমরা দেখতে পাই, এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা বিদ্যমান, যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অবস্থা থেকে ভিন্ন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে ঐশী একাগ্রতা সমগ্র মানবিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে এবং লোভ, ক্রোধ ও অন্যান্য দৈহিক অবস্থা অতিক্রম করার একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা জাগ্রত হয়। এ কারণে, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন তাঁরা ঐশী অবস্থার দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্তির পরিচয়বাহী তপজপ তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এ অবস্থায় তাঁদের কাছে যেসব প্রত্যাদেশ আসে, তা দিয়ে তাঁরা স্বজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের সংবাদ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রদর্শিত পথ ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য বিদ্যমান। এর পরিবর্তন খুবই কম হয়ে থাকে; দেখে মনে হয়, এরূপ সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে যেন আল্লাহ্ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ গ্রন্থের প্রথমদিকে আমরা অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারীদের আলোচনায় ওহি বা প্রত্যাদেশ সম্পর্কে কথা বলেছি। আমরা সেখানে বর্ণনা করেছি যে, সমস্ত সৃষ্টজগৎ-ই তার অবিমিশ্র ও মিশ্র স্বরূপে একটি স্বাভাবিক পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত। উক্ত বিন্যাস সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। প্রতিটি জগতের শেষ দিগন্তে যে সত্তাগুলোর অবস্থিতি, তারা সর্বদাই নিম্ন ও উর্ধ্বদিক থেকে তাদের সন্নিহিত সত্তার সাথে মিলিত হতে উৎসুক। এ ঔৎসুক্য একান্তই স্বভাবজ; যেমন অবিমিশ্র দৈহিক উপাদানগুলোর মধ্যে দেখা যায়। যেমন উদ্ভিদজগতের শেষ প্রান্ত খেজুর ও আঙুরের সাথে প্রাণিজগতের প্রান্ত শামুক ও ঝিনুকের সংযুক্তি। যেমন বানর জগতে,[১৫২] যেখানে অনুভূতি ও চাতুর্য এসে একত্র হয়েছে, তার সাথে দূরদর্শী ও মননশীল মানুষের অবস্থান। এ পরিবর্তনশীল যোগ্যতা, যা প্রতিটি জগতের উভয় প্রান্তে বিদ্যমান, তাকেই সংযুক্তি বলা হয়েছে।

এ মানবিক জগতের উর্ধ্বে একটি আত্মিক-জগৎ বিদ্যমান; আমাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট তার বিভিন্ন নিদর্শনই তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। বস্তুত তারই কল্যাণে আমাদের মধ্যে উপলব্ধি ও এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জগতের জ্ঞানী সত্তাগুলো শুদ্ধ উপলব্ধি ও নিছক বুদ্ধিমাত্র। তা-ই ফেরেশতাজগৎ। সুতরাং উপরোক্ত সব দিক থেকে বিবেচনা করলে এ বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে, মানবিক সত্তার মধ্যেও ফেরেশতীয়

---

১৫২. প্রথম অধ্যায়ের ১১১ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার একটা যোগ্যতা বিদ্যমান। এভাবে মানবিক সত্তা কোন কোন সময়ে ও বিশেষ মুহূর্তে ফেরেশতীয় সত্তায় পরিণত হতে সক্ষম হয়। এর পর পুনরায় সে মানবিক সত্তায় ফিরে আসে এবং ফেরশতীয় জগৎ থেকে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে তাকে স্বজাতির কাছে প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়; এটাই প্রত্যাদেশ ও ফেরেশতাদের ভাষণের যথার্থ তাৎপর্য। নবীগণ (আঃ) সকলেই এ সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। তা-ই যেন তাঁদের স্বভাব এবং এর ফলে তাঁরা এরূপ রূপান্তরিত হওয়ার সময় যে প্রকট কষ্ট ও চাপ অনুভব করেন, সে সম্পর্কে তাঁদের আশঙ্কার প্রকাশ সর্বজন পরিচিত। এরূপ অবস্থায় তাঁরা যে জ্ঞান লাভ করে থাকেন, প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ জ্ঞানের মতই তা সাবলীল। তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার অবকাশ নেই। বরং এতে অদৃশ্যের যবনিকা অপসারিত হওয়ায় এবং সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করায় তাঁদের এ জ্ঞান সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুনরায় তাঁদের মানবিক সত্তায় ফিরে আসাতেও এ সুস্পষ্ট জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ তাঁরা পূর্ব থেকেই অনুরূপ একটি অবস্থার সাহচর্যে গমনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। তদুপরি এ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এমন একটি বিচক্ষণতা বিদ্যমান, যা তাঁদেরকে অনায়াসে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়।

বস্তুত জ্ঞান লাভের এ প্রক্রিয়া সর্বক্ষণ ধরে তাঁদের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রেরিতত্ব পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; শুধু আমার উপর প্রত্যাদেশ অর্পিত হয়েছে। অবশ্যই তোমাদের উপাস্য একমাত্র প্রভু; তোমরা তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[১৫৩]

পাঠক, এটি বুঝে নেন এবং অতিরিক্ত অবগতির জন্য আমরা এ গ্রন্থের প্রথমদিকে অদৃশ্যের সংবাদ উপলব্ধিকারীদের প্রকারভেদ বর্ণনায় যা বলেছি, পাঠ করুন। এর ব্যাখ্যা ও বিবরণে আপনার কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কেননা আমরা সেখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও যথেষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছি। আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়ক।

---

১৫৩. কোরান; ৪১, ৬।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[সত্তাগত দিক থেকে মানুষ অজ্ঞ; অর্জনের দ্বারাই সে জ্ঞানী হয়]

আমরা এ পরিচ্ছেদগুলোর প্রথম দিকে বর্ণনা করেছি যে, মানুষ প্রাণিজগতের অন্তর্গত জীববিশেষ। আল্লাহ্ তাকে তৎপ্রদত্ত মননশক্তির দ্বারা অন্য সকলের মধ্যে বিশিষ্ট করেছেন। এ মননশক্তি দ্বারাই সে তার কার্যাবলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে থাকে; এটাই তার বিবেক-বুদ্ধি। অথবা সে এর দ্বারা বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার স্বজাতির মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণকে উপলব্ধি করে; এটাই তার অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি। অথবা সে এর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের যথার্থ অবস্থার ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়; এটাই তার তাত্ত্বিক বুদ্ধি।

এ মননশক্তি তার প্রাণী হিসেবে তার পূর্ণতা আসার পরই দেখা দেয়। এর আরম্ভ হয় পার্থক্য বিচারের দ্বারা এবং এই বিচারশক্তির উদ্ভবের পূর্বে সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকে। তাকে তখন একটি জীবমাত্র বলে গণ্য করা যায় এবং সে তখনও তার অস্তিত্বের সেই প্রাথমিক অবস্থা বীর্য, রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত।[১৫৪] তারপর তার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তার কারণ আল্লাহ্ তার মধ্যে ইন্দ্রিয় ও হৃদয় প্রদান করেছেন; ওটাই মননশক্তি। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন।[১৫৫]

সুতরাং মানুষ তার এ বিচারশক্তির পূর্বাবস্থায় একটি দৈহিক কাঠামো মাত্র। কারণ তখন সব বিষয় সম্পর্কেই সে জ্ঞানহীন। তারপর তার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তার প্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করে এবং তার মনুষ্য সত্তার অস্তিত্ব পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পাঠক, আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি প্রত্যাদেশের প্রারম্ভেই যা বলেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, 'তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর এবং তোমার প্রভু অতিশয় সম্মানিত, যিনি লেখনির সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১৫৬] অর্থাৎ তিনি তাকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন, যা পূর্বে তার ছিল না। কারণ এর পূর্বে সে ছিল রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ড। এর মাধ্যমে আমরা মানুষের প্রকৃতি ও সত্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে

১৫৪. তুল, কোরান; ১২, ৫।
১৫৫. কোরান; ১৬, ৭৮।
১৫৬. কোরান; ৯৬, ১—৫; এটাই কোরানের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত বলে গণ্য।

www.amarboi.org

পেরেছি; তা তার সত্তাগত অজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান। কোরানের মহতি আয়াত এর প্রতিই ইঙ্গিত করে তার অস্তিত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রদর্শিত অনুগ্রহের পর্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত এটাই মনুষ্যত্ব এবং তারই সহজাত ও অর্জিত দুটি অবস্থা আমরা কোরানের সর্বপ্রথম ও প্রত্যাদেশের প্রারম্ভে দেখতে পাচ্ছি। 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞান ও মহা-বিচক্ষণতার অধিকারী'।[১৫৭]

১৫৭. কোরান; ৪, ১৭; ৯২; ১০৪; ১১১; ১৭০।

www.amarboi.org

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের রহস্য উন্মোচন এবং এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে অসৎ ও অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের বর্ণনা]

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তাঁর নবী (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আমাদেরকে মোক্ষ ও সুখ-সম্ভোগের সৌভাগ্যের দিকে আহ্বান করতে পারেন। তিনি তাঁর নবীর উপর সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকে প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এতে তিনি আমাদের এমন সব দায়িত্বের কথা বলেছেন, যা আমাদেরকে সেই গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে। এ সম্পর্কীয় বক্তব্যের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনেই তাঁর গুণাবলি ও পবিত্র নামের বর্ণনা এসেছে, যাতে আমরা তাঁর সত্তার পরিচয় লাভ করতে পারি। আমাদের সাথে সম্পর্কিত আত্মার কথা, প্রত্যাদেশের কথা এবং আমাদের কাছে প্রেরিত রসূল ও তাঁর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী ফেরেশতাদের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান দিবসের কথা ও এর সম্পর্কে বিচিত্র সতর্কবাণীর উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর কোন কিছু সম্পর্কেই সময় নির্দিষ্ট করে দেননি।

এ সম্ভ্রান্ত কোরানে কতিপয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে আরবি বর্ণমালার বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণ রয়েছে। এগুলোর যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধির কোন পথ আমাদের জানা নেই। কোরানের এমন সব বিষয়কেই দ্ব্যর্থবোধক বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এগুলোর অর্থানুসন্ধানের প্রবৃত্তির নিন্দা করে বলেছেন, তিনিই তোমার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; যাতে সুস্পষ্ট নির্দেশবাহী আয়াতসমূহ রয়েছে, ওগুলোই গ্রন্থজননী এবং অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক। তারপর যাদের অন্তঃকরণে কলুষ বিদ্যমান, তারা গোলযোগ সৃষ্টি ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে সেগুলোর এমন দ্ব্যর্থবোধকতার তাৎপর্য অনুসন্ধান ব্যাপৃত হয়। বস্তুত ওগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন এবং জ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা বলেন, 'আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে। একমাত্র হৃদয়বানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।[১৫৮]

সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যকার জ্ঞানী পূর্বসূরিরা এ আয়াতকে লক্ষ করে বলেছেন যে, তার মধ্যে নির্দেশবাহী আয়াতসমূহই সুস্পষ্টভাবে বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্য ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ্গণ তাঁদের পরিভাষা বিশ্লেষণে বলেছেন, নির্দেশবাহী আয়াতের অর্থ, যার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলো সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান। বলা হয় যে, দ্ব্যর্থবোধক অর্থ, যার তাৎপর্য নির্ধারণে যুক্তি ও ব্যাখ্যার

১৫৮. কোরান; ৩, ৬।

www.amarboi.org

প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ এগুলো অন্য আয়াত বা বুদ্ধির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে সেগুলোর যথার্থ তাৎপর্যই উহ্য হয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গেই ইবনে আব্বাস বলেছেন, দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্বাস করতে হয়; পালন করতে হয় না।[১৫৯] মুজাহেদ[১৬০] ও আকরামা[১৬১] বলেছেন, বিধি-নিষেধ ও কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতগুলো ছাড়া সবাই দ্ব্যর্থবোধক। কাজী আবু বকর ইমামুল হরমাইনও এ মত পোষণ করেন। ইমাম সউরী,[১৬২] শাবী[১৬৩] পূর্বসূরিদের একদল জ্ঞানী বলেছেন, দ্ব্যর্থবোধক বলতে বোঝায়, যার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই। যেমন—মহাপ্রলয়ের শর্তাদি, সতর্কীকরণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সময় এবং কোরানের বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রারম্ভে অবস্থিত আরবি বর্ণমালা।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র উক্তি—'এগুলো গ্রন্থজননী', অর্থাৎ এগুলোই অধিকাংশ ও সাধারণ। সেই তুলনায় দ্ব্যর্থবোধক আয়াত খুবই কম। কখনও এ নগণ্য সংখ্যা থেকেও অনেকগুলোকে নির্দেশবাহী আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর আল্লাহ্ ব্যাখ্যার দ্বারা অথবা এমন সব অর্থের দ্বারা এদের তাৎপর্য অনুসন্ধান করার নিন্দা করেছেন, যা কোরানের ভাষণে ব্যবহৃত আরবি ভাষায় বোধগম্য নয়। তিনি অনুরূপ সন্ধানে নিয়ত ব্যক্তিদেরকে 'কলুষময়' বলে অভিহিত করেছেন; অর্থাৎ এসব ব্যক্তি বলতে ধর্মদ্বেষী, নাস্তিক ও অভিনব মতের পোষক সেসব মূর্খকে বোঝায়, যারা সত্য বিচ্যুত হয়েছে। তাদের অনুরূপ কাজে ব্যাপৃত হওয়ার উদ্দেশ্য হল সেরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করা, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্ব অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা বিদ্যমান। অথবা তাদের অভিনব মতবাদের পরিপোষকতায় যা অনুসরণ করতে চায়, তদ্রূপ কোন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করা।

অতঃপর পবিত্র আল্লাহ্ আমাদেরকে সংবাদ জানিয়েছেন যে, তিনি এসব দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন এবং তিনি ছাড়া এগুলোর প্রকৃত অর্থ কেউ জানে না। এজন্য তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া এর ব্যাখ্যা অন্য কেউ জানে না। এর পর জ্ঞানীদেরকে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা বলেন, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এ কারণে পূর্বসূরিরা জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ী বাক্যাংশটিকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান দিয়েছেন এবং সংযোগমূলক অব্যয় 'এবং' দ্বারা একে আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ অদৃশ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই বেশি প্রশংসনীয়। অথচ সংযোগমূলক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করলে তা দৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন জ্ঞানীরাও এর ব্যাখ্যা অবগত; সুতরাং তা আর অদৃশ্য থাকে না। একে আল্লাহ্‌র এই উক্তি আরও দৃঢ় করে—'সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে।' এতে বোঝা যায় যে, এর ব্যাখ্যা মানুষের অবগতির অতীত।

---

১৫৯. ইমাম সিউতীর 'ইতকান' গ্রন্থ দ্র:।
১৬০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০০ নং টীকা দ্র:।
১৬১. মৃত্যু ১০৪/১০৭ (৭২৩/৭২৬ খ্রি:) হি:।
১৬২. তৃতীয় অধ্যায়ের ২২৫ নং টীকা দ্র:।
১৬৩. আমির ইবনে শারাহিল; মৃত্যু ১০৩/৬ (৭২১—৭২৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বস্তুত প্রতিটি আভিধানিক শব্দের সেই অর্থই আমরা বুঝতে সক্ষম, যা আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছে প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে বক্তব্যকে বক্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে শব্দের অর্থ নিয়ে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়ি। অনুরূপ বিষয় যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে, তা হলে তার অবগতিকে আমরা আল্লাহ্‌র উপরেই ন্যাস্ত করি এবং আমাদের ঈপ্সিত অর্থ খোঁজা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি। কারণ এছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন সেসব লোককে দেখবে, যারা কোরানের অর্থ নিয়ে বিতর্কে ব্যাপৃত, বুঝবে, তাদেরকেই আল্লাহ্ বোঝাতে চেয়েছেন। তাদের কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে থাক।' দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ সম্পর্কে এটাই পূর্বসূরিদের মতাদর্শ। হাদীসেও অনুরূপ শব্দাবলি এসেছে এবং সেগুলোর ক্ষেত্রেও তাঁরা কোরানের আয়াতের অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কারণ উভয়ের উৎস একই।

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে যেহেতু দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং আমরা এখন এ সম্পর্কে মানুষের মতানৈক্য বর্ণনায় মনোনিবেশ করব। অবশ্য এগুলোর মধ্যে তারা মহাপ্রলয় ও তার শর্তাদি, সতর্কীকরণমূলক বিভিন্ন ঘটনার সময়, দোজখের দারোগাদের সংখ্যা এবং এমন অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, আদৌ দ্ব্যর্থবোধক নয়। কারণ সেখানে কোন সংক্ষিপ্ত শব্দ বা অন্য কিছু আসেনি; বরং এগুলো কিছু সংখ্যক ঘটনাবলির সময়, যার নিশ্চিত আবির্ভাব সম্পর্কীয় জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নবীর বাচনিক বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তিনি বলেছেন, 'এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে।'[১৬৪] সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এগুলোকে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

কোরানের বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো বিদ্যমান, সেগুলোর তাৎপর্য এই যে, এগুলো আরবি বর্ণমালা এবং এগুলোর অনুরূপ অবস্থানের নিশ্চয়ই কোন একটা অর্থ আছে। যমখশরী[১৬৫] এগুলো সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এদের অবস্থান কোরানের অনুকরণীয় প্রাঞ্জলতার কথাই বোঝায়। কারণ কুরআন এসব বর্ণে এবং এগুলোর সম্মিলিত রূপেই অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষও এগুলোর দ্বারা রচনার ক্ষেত্রে সম-মর্যাদার দাবিদার। কিন্তু রচনার পরই কেবল তাদের অর্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্য এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কোন ভিন্নমত পোষণ করতে হলে তা একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসাদির দ্বারাই সম্ভব। যেমন তাঁরা বলেছেন, 'তাহা' অর্থ 'তাহির' (পবিত্র) ও 'হাদি' প্রদর্শক এবং এমন অন্যান্য বিষয়। কিন্তু এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীসাদির প্রকাণ্ড অভাব। এদিক থেকেই এগুলোকে দ্ব্যর্থবোধক বলা যায়।

প্রত্যাদেশ, ফেরেশতা, আত্মা ও জিন; এগুলোর দ্ব্যর্থবোধকতার কারণ এগুলোর যথার্থ তাৎপর্য অপরিচিত এবং এ দিক থেকেই এগুলো দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে। অনেকেই এগুলোর সাথে অনুরূপ অন্যান্য বিষয় যোগ করেছেন; যেমন কিয়ামত

---

১৬৪. কোরান; ৭, ১৮৭; ৩৩, ৬৩।
১৬৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

সম্পর্কীয় বিভিন্ন অবস্থা, বেহেশত, দজ্জাল, গোলযোগ, প্রলয়ের শর্তাদি এবং যা কিছু সুপরিচিত স্বভাবের বিরোধী। এগুলো অসম্ভব নয়; কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে কালামশাস্ত্রবিদ্গণ; তাঁরা এগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। পাঠক, আপনি তাঁদের গ্রন্থাদিতে এগুলোর বিবরণ দেখতে পাবেন।

সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক বলতে সে সব গুণই শুধু অবশিষ্ট থাকে, যা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নবীর বাচনিকে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। এসব গুণের বাহ্যিক দিকে লক্ষ করলে এগুলোতে কিছুটা ত্রুটি, কিছুটা অক্ষমতার রেশ পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ববর্ণিত পূর্বসূরিদের মতাদর্শের পরে মানুষ এগুলোর বাহ্যিক অর্থ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং তাদের তর্ক-বিতর্কের ফলে বিচিত্র অভিনব মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমরা সেসব মতাদর্শ এবং তার মধ্যে বিকৃত মতের উপর বিশুদ্ধ মতের প্রাধান্য দানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করব। প্রারম্ভেই বলছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই।

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নিজের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জ্ঞানী, ক্ষমতাবান, ইচ্ছাময়, জীবিত, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কথক, মহিমাময়, সম্ভ্রান্ত দাতা, অনুগ্রাহী, পরাক্রান্ত ও মহান। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর জন্য দুই হাত, দুই চোখ, মুখমণ্ডল, পা ও জিহ্বা ইত্যাদি গুণের কথাও বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির জন্য কতকগুলোর প্রয়োজন; যেমন—জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছা। তারপর জীবন এই সবগুলোর শর্তস্বরূপ। এদের মধ্যে অনেকগুলো পূর্ণতা বিধায়ক গুণ; যেমন—শ্রুতি, দৃষ্টি ও বচন। এদের মধ্যে অনেকগুলোতে ত্রুটির আভাস বিদ্যমান; যেমন—আরোহণ, অবতরণ ও আগমন এবং যেমন—মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই চোখ; যেগুলো নশ্বর জীবের গুণ। তারপর ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে তেমনভাবে দেখতে পাব, যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখি। এ দর্শনে কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হবে না; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যকার পূর্বসূরিরা আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক শক্তি ও পূর্ণতা বিধায়ক গুণগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং যেসব গুণে কিছুটা ত্রুটির আভাস পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে চিন্তা না করে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছেন। তারপর তাঁদের পরবর্তীকালে মানুষ এসব গুণ নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। মুতাজিলা সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়ে এসব গুণকে নিছক মানসিক ধারণা বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এগুলোকে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে স্থায়ীগুণ বলতে অস্বীকার করেছে। তারা এরূপ গুণমুক্ত অবস্থাকেই একত্ববাদ বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা মানুষকে তাদের কৃতকর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে এবং এর সাথে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার সংযুক্তিকে অস্বীকার করেছে। বিশেষ করে দুষ্কর্ম ও পাপ সম্পর্কে এ যুক্তি প্রয়োগ করেছে; কেননা কোন বিচক্ষণের পক্ষেই অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তারা বান্দার জন্য সর্বোত্তম কল্যাণের বিষয়টি আল্লাহর উপর অবশ্য কর্তব্য বলে ধরেছে। একেই তারা বলেছে ন্যায়পরায়ণতা। যদিও এর পূর্বে তারা পূর্বনির্ধারণের

www.amarboi.org

অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা বলেছেন। এভাবে সমস্ত বিষয়েই তথা নবার্জিত জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন তুলেছে, যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ মতামত পোষণকারী মাবাদ আল জুহনী[১৬৬] ও তার সহচরদের পক্ষ ত্যাগ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বের হয়ে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারণের অসম্ভাব্যতার মতটি তাদের মধ্যে ওয়াসেল ইবনে আতা আল গাজ্জালীর[১৬৭] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি হাসান বসরীর শিষ্য এবং আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ানের সময় জীবিত ছিলেন। তারপর এটি মামার আস্সুলামীর[১৬৮] সময় পরিত্যাক্ত হয় এবং এ সম্ভাব্যতার মত পরিত্যাগকারীদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নেতা আবু হুজাইল আল্লাফও[১৬৯] ছিলেন। ইনি উসমান ইবনে খালেদ আত্তাওবীলের[১৭০] মাধ্যমে ওয়াসেল থেকে এ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। উসমানও এ পূর্বনির্ধারণের সম্ভাব্যতার মত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে তিনি তৎকালে প্রচারিত তাদের মতাদর্শ অনুসরণের অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট গুণাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মতামত অনুসরণ করতেন।

অতঃপর ইব্রাহীম নাজ্জাম[১৭১] এসে পূর্বনির্ধারণের কথা বললেন এবং মুতাজিলারা তাঁর কথা মেনে নিল। তিনি দর্শনের গ্রন্থাদি পাঠ করে গুণাবলি অস্বীকারের মতামতকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলেন। তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নীতিমালা প্রবর্তন করলেন। তারপর আবির্ভূত হলেন জাহেয,[১৭২] কাবী[১৭৩] ও জুবাঈ।[১৭৪] তাঁদের প্রবর্তিত এ পন্থাকেই বলা হত 'এলমে কালাম'। এর এরূপ নামকরণের কারণ তাতে যুক্তি-প্রমাণ ও বিতর্ক ছিল; যাকে 'কালাম' বা আলোচনা বলা হয়ে থাকে। অথবা তাদের পন্থার মূল ছিল, আল্লাহ্র বাক্শক্তির অর্থাৎ কালামের গুণকে অস্বীকার করা। এ জন্যই শাফেয়ী বলতেন, এদেরকে খেজুরের শাখা দিয়ে পিটানো এবং মানুষের দর্শনীয় স্থানে ফেলে রাখা উচিত।

যা হোক, মুতাজিলারা তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাতে গ্রহণ ও বর্জনের কাজ চালিয়ে যায়। তারপর উস্তাদ আবুল হাসান আশআরী[১৭৫] আবির্ভূত হন এবং তাদের অনেক নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীর সাথে কল্যাণ ও সর্বোত্তম কল্যাণের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক-প্রবৃত্ত হন; তিনি তাদের পন্থা ত্যাগ করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইদ ইবনে কেলাব,[১৭৬] আবুল আব্বাস কেলানেসী,[১৭৭] হরস ইবনে আসাদ মুহাসেবী[১৭৮] প্রমুখ

---

১৬৬. মৃত্যুকালে ৮০ হিজরির পরবর্তী।
১৬৭. জীবনকাল ৮০—১৩১ (৭০০—৭৩৯ খ্রি:) হি:।
১৬৮. (মুআম্মার) ইবনে আব্বাস; মৃত্যু ২১৫ (৮৩১ খ্রি:) হি:।
১৬৯. মুহাম্মদ ইবনে হুজাইল; মৃত্যু ২২৬—২৩৫ (৮৪০—৮৫০ খ্রি:) হি:।
১৭০. পরিচয় অস্পষ্ট।
১৭১. ইব্রাহীম ইবনে সাইয়ার; মৃত্যু ২২০—২৩০(৮৩৫—৮৪৫ খ্রি:) হি:।
১৭২. আমর ইবনে বহর; ১৬০—২৫৫ (৭৭৬—৮৬৯ খ্রি:) হি:।
১৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলখী; মৃত্যু ৩১৯ (৯৩১ খ্রি:) হি:।
১৭৪. মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব; ২৩৫—৩০৩ (৮৫০—৯১৬ খ্রি:) হি:।
১৭৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
১৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ; কুল্লাব (?); খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধ।
১৭৭. পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়; শহরস্তানী রচিত 'মেলাল ও নেহালে' উল্লেখিত।
১৭৮. অধ্যায়তত্ত্বের প্রসিদ্ধ লেখক; ১৬৫—২৪৩ (৭৮২—৮৫৫ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

পূর্বসূরিদের অনুগামীবৃন্দের মতাদর্শ গ্রহণ করেন। এটাই আহলে সুন্নতের পন্থা। তিনি তাঁদের বক্তব্যকে কালামশাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে জোরদার করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র জন্য সত্তার সাথে স্থায়ী গুণাবলির প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কারণ এগুলো ছাড়া প্রতিরোধ স্থাপন ও নবীদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য বচন, শ্রুতি ও দৃষ্টির মত পোষণ করতেন। যদিও এগুলোতে আকারবিশিষ্ট শব্দ ও বর্ণের দিক থেকে বাহ্যিকভাবে কিছুটা ত্রুটির ধারণা পোষণ করা হয়, তবুও যেহেতু বচনের জন্য আরবি ভাষাভাষীদের মধ্যে শব্দ ও বর্ণ ছাড়া অন্য একটি অর্থও বিদ্যমান এবং তা হল 'যা আত্মার মধ্যে আবর্তিত হয়'; সেজন্য তাঁরা পূর্বের মতের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এ অর্থ অনুযায়ী বচনকে মহান আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ত্রুটির ধারণাকে নস্যাৎ করে দেন। বচনের এ গুণকে তাঁরা অনাদি গুণাবলির মধ্যে ধরে অন্য সবে গুণের সাথে এর সম্পর্ককে সাধারণ করে দেন। এর ফলে কুরআন মহান আল্লাহ্‌র অনাদিগুণ তথা অন্তর্নিহিত বচন এবং নবোদ্ভূত বর্ণসমষ্টি ও পঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত শব্দাবলির মিশ্র নাম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং কুরআনকে যখন বলা হয় 'অনাদি', তখন তা দিয়ে প্রথমটি এবং যখন বলা হয়, তা শ্রুত ও পঠিত; তখন তার পাঠ ও লিপি বলতে যা বোঝায়, তা-ই মনে করা হয়ে থাকে।

অথচ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোরানের উপর নবায়নের গুণ আরোপ থেকে বিরত ছিলেন। কারণ তিনি এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শোনেননি। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, তিনি লিপিবদ্ধ কুরআনকে এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে তার পাঠকে অনাদি বলতেন। বরং তা যে নবায়িত হয়, তা তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন। একমাত্র ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি তা স্বীকার করে নিতে পারেননি। এছাড়া অন্য যা কিছু,—তা প্রয়োজনের জন্যই তিনি অস্বীকার করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যায় না।

শ্রুতি ও দৃষ্টি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ধারণা সৃষ্টি করে, তবুও তাদের দ্বারা আভিধানিক দিক থেকে শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুকেও বোঝায় এবং এক্ষেত্রে ত্রুটির পূর্ব ধারণাও নস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ তাদের শেষোক্ত এ অর্থও অভিধানের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। আরোহণ, আগমন, অবতরণ, মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই চোখ ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য হল, এগুলোর মধ্যে তুলনামূলক যে ত্রুটির ধারণা বিদ্যমান, তার জন্যই আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে আরবের প্রথা অনুসারে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে। তাদের প্রথা এই যে, যে সব শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেস্থানে তারা রূপক অর্থ গ্রহণ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী '(প্রাচীরটি) পড়ে যেতে ইচ্ছুক হচ্ছিল'[১৭৯] এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ রূপক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি তাদের একটি সুপ্রচলিত প্রথা; এটি অস্বীকৃত নয়, অভিনবও নয়।

অবশ্য উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের এ ব্যাখ্যা পূর্বসূরিদের সমর্পণসুলভ মতাদর্শের বিরোধী। সম্ভবত এ কারণেই পূর্বসূরিদের অনুগামী হাদীসশাস্ত্রবিদ্ ও

১৭৯. কোরান; ১৮, ৭৭।

www.amarboi.org

উত্তরসূরি হাম্বলীদের একটি দল উপরোক্ত গুণাবলি আরোপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা এসব গুণ মহান আল্লাহ্‌র জন্য সুনির্দিষ্ট বলে মনে করেন; যদিও এদের যথার্থ পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ্ আরশের উপর আরোহণ করলেন'[১৮০]—এক্ষেত্রে শব্দের অর্থের দিক থেকে আরোহণ তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত; অন্যথায় শব্দার্থ অনর্থক বলে প্রতিপন্ন হবে। তেমনি আমাদের পক্ষে এ আরোহণের যথার্থ তাৎপর্য বলা সম্ভব নয়; অন্যথায় তা নেতিবাচক আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিষেধের বিরোধী তুলনায় পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তাঁর ন্যায় কিছু নেই;[১৮১] তারা যে গুণ আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র;[১৮২] অত্যাচারীরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে;[১৮৩] তিনি জনক নন, জাতও নন।'[১৮৪] অথচ এসব আয়াতের নির্দেশ অনুসরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য আরোহণের শব্দার্থ সম্পর্কীয় গুণ নির্দিষ্ট করে তুলনার মধ্যে প্রবেশ করে বলেছেন। কারণ ভাষাভাষীদের কাছে আরোহণের অর্থ হল স্থিরতা ও স্থান গ্রহণ এবং এটি দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। শব্দার্থের অনর্থক হওয়ার যে দোষটি তাঁরা অপছন্দ করেছেন, তা শব্দের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য এবং তাতে কোন অসুবিধা নেই। একমাত্র অসুবিধা হল শব্দান্তর্গত সক্রিয়তাকে নস্যাৎ করে দেয়ায়। অনুরূপভাবে বান্দার উপর অসম্ভব দায়িত্ব অর্পণের বিষয়টিকেও তাঁরা অপছন্দ করেছেন। বস্তুত এটি একটি ভ্রান্তধারণা মাত্র। কারণ দ্ব্যর্থবোধক নির্দেশে কখনও দায়িত্ব বর্তায় না। অথচ এগুলো সত্ত্বেও তাঁরা দাবি করেন যে এটাই পূর্বসূরিদের মতাদর্শ। আল্লাহ্ না করুন, এটি আদৌ তা নয়। পূর্বসূরিদের মতাদর্শ হল, আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, এসব শব্দার্থের বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং তা জানার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা।

কখনও তারা আল্লাহ্‌র আরোহণের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইমাম মালেকের বক্তব্যকে উপস্থিত করে। তিনি বলেছেন, আরোহণের বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত এবং আল্লাহ্‌র জন্য তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর অর্থ তারা যা ভেবেছে, তা নয়। কারণ ইমাম মালেক আরোহণের অর্থ জানতেন। এক্ষেত্রে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা এই যে, আরোহণের অর্থ অভিধানের দিক থেকে সুস্পষ্ট; তা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তার অবস্থা অর্থাৎ তাৎপর্য,—কেননা, গুণাবলির তাৎপর্যই হল তাদের অবস্থা; আল্লাহ্‌র জন্য অপরিজ্ঞাতভাবে প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে তারা 'সওদা'র একটি হাদীস দ্বারা আল্লাহ্‌র স্থান নির্দেশে যুক্তি দিয়ে থাকে। হাদীসটি এই যে, তাঁকে নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আকাশে। তখন হযরত বললেন, তাঁকে মুক্ত করে দাও, সে বিশ্বাসীনী। নবী (সঃ) তাঁর আকাশে আল্লাহ্‌র জন্য স্থান নির্ধারণকে তাঁর ঈমানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং তিনি যে বাহ্যিক

১৮০. কোরান; ৭, ৫৪।
১৮১. কোরান; ৪২, ১১।
১৮২. কোরান; ২৩, ৯১; ৩৭, ১৫৯।
১৮৩. কোরান অনুরূপ উদ্ধৃতি নয়।
১৮৪. কোরান; ১১২, ৩।

www.amarboi.org

অর্থে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাকেই গণ্য করেছেন এবং 'আল্লাহ্ আকাশে আছেন' তাঁর এ বিশ্বাসের ফলেই তিনি সেসব জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ীদের অন্তর্গত হয়ে গেছেন, যারা দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। আল্লাহ্‌র কোন স্থানে নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি মূলত সেই বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা নস্যাৎ হয়, যাতে এর প্রয়োজনের অস্বীকৃতি বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বিধায়ক নেতিবাচক আয়াতগুলোর দ্বারা সমর্থিত। যেমন, 'তার তুল্য অন্য কিছু নেই' এবং এর অনুরূপ অন্যান্য আয়াত। আল্লাহ্‌র উক্তি—তিনি আল্লাহ্ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে।[১৮৫] এতেও যেহেতু একটি অস্তিত্ব একই সময়ে দুই স্থানে অবস্থান করে না, সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে এতে স্থান নির্দেশ করা হয়নি; এর উদ্দেশ্য ভিন্ন।

অতঃপর তারা তাদের আবিষ্কৃত এ অভিনব ব্যাখ্যাকে মুখমণ্ডল, দুই চোখ, দুই হাত, অবতরণ, বচন, বর্ণ ও শব্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এদের অর্থ দৈহিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা থেকে ব্যাপক করে তুলেছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে এসব গুণের দেহসম্পর্ক থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। অবশ্য অভিধানে অনুরূপ অর্থের কোন সম্ভাবনা কোথাও নেই। তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই পর্যায়ক্রমিকভাবে এ মতবাদের অনুসরণ করেছে। আহলে সুন্নতের আশায়েরা ও হানাফী কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এ মতবাদের দরুন তাদেরকে খুব সুনজরে দেখতে পারেননি এবং তাঁরা সর্বতোভাবে এসব মতবাদ এড়িয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে বোখারায় হানাফী কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ ও ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারীর মধ্যে যা অনুষ্ঠিত হয়, তা সকলের কাছেই সুপরিচিত।

আল্লাহ্‌র দেহবাদীরাও অনুরূপভাবে তাঁর দেহ প্রতিষ্ঠিত করে বলেছে যে, তা অন্যান্য দেহের মতো নয়। কারণ ধর্মীয় বিধানের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্লাহ্‌র দেহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং একমাত্র অনুরূপ শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থই তাদেরকে এমন বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করেছে। পরিণামে তারা এ বাহ্যরূপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে তারা আল্লাহ্‌র দৈহিক আকৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ব্যাপারে তারা পূর্বোল্লেখিত ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং একটি ক্রটিপূর্ণ শিথিল যুক্তির সাহায্যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে বলেছে, 'দেহ আছে, তবে অন্যান্য দেহের মতো নয়।' অথচ দেহ আরবি অভিধানে তার অর্থ এমন কিছু, যার মধ্যে বেধ ও সসীমতা বিদ্যমান। এ ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যত্র আছে, যা স্বাবলম্বী অথবা স্বনির্ভর উপাদানে গঠিত ইত্যাদি। কিন্তু কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের পরিভাষার অর্থ এ আভিধানিক তাৎপর্য থেকে ভিন্ন। এ কারণে দেহবাদীরা অতিরঞ্জনের মাধ্যমে এক অভিনব মত তথা ধর্মদ্রোহিতার সৃষ্টি করেছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন একটি গুণের কথা বলছে, যা ক্রটির ধারণা জন্মায় এবং যা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর বাণীতে কোথাও নেই।

---

১৮৫. কোরান; ৬, ৩।

www.amarboi.org

পাঠক, আমাদের এ আলোচনার দ্বারা আশা করি, আপনার কাছে পূর্বসূরি আহলে সুন্নত, হাদীসশাস্ত্রবিদ্, মুতাজিলা ও দেহবাদী অভিনব মতের ধারক প্রমুখ কালামশাস্ত্রবিদ্দের মধ্যকার মতাদর্শের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাদীসশাস্ত্রবিদ্দের মধ্যেও এমন অনেক অতিরঞ্জনপ্রিয় লোক ছিল, যাদেরকে প্রকাশ্য তুলনার জন্য 'তুলনাবাদী' বলে অভিহিত করা হতো। তাদের অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছে, আমাদেরকে আল্লাহ্র দাঁড়ী ও গুপ্তস্থান সম্পর্কে ক্ষমা কর এবং এ দুটি ছাড়া অন্য যা কিছু তোমাদের মনে আসে জিজ্ঞাসা করতে পার।'[১৮৬] বস্তুত এ ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোন কাজেই আসে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য তারা এসব বিষয়কে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু সংখ্যক শব্দের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং এক্ষেত্রে তারা নেতৃবৃন্দের পথই অনুসরণ করছে মাত্র। অন্যথায় এমন উক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মদ্রোহিতা। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এমন অভিনব মতামতের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নত রচিত গ্রন্থাবলি যুক্তিপ্রমাণে পরিপূর্ণ এবং সেখানে অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রমাণাদির দ্বারা এগুলো নস্যাৎ করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন; তিনি যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন, তাহলে আমরা কখনও পথ খুঁজে পেতাম না।[১৮৭]

অন্যান্য প্রকাশ্য বিষয়, যেগুলোর প্রমাণ ও প্রামাণ্য উভয়ই কিঞ্চিৎ উহ্য; যেমন— প্রত্যাদেশ, ফেরেশতা, আত্মা, জিন, 'বরজখ' (প্রেতপুরী), প্রলয়ের বিভিন্ন অবস্থা, 'দজ্জাল', গোলযোগ, প্রলয়ের শর্তাদি এবং যা কিছু দুর্বোধ্য অথবা অস্বাভাবিক; আমরা সেসবকে আশায়েরাপন্থীদের বিস্তারিত মতামতের উপর স্থাপন করেছি। তাঁরা আহলে সুন্নত এবং তাঁদের মতে দ্ব্যর্থবোধক কিছু নেই। এর পরও আমরা যদি এসব বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধকতার প্রশ্রয় দেই, তা হলে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য আমাদেরকে কিছুটা বিশদ আলোচনায় অবতীর্ণ হতে হবে। সুতরাং আমরা বলি, জেনে রাখুন, মনুষ্য জগৎ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত। তার মধ্যে যদিও মনুষ্যত্বের তাৎপর্য সংহতভাবে অবস্থান করছে, তবুও তা কিছু পর্যায়ে বিভক্ত এবং তার প্রতিটি পর্যায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ অবস্থার জন্য অন্যটি থেকে ভিন্ন। ফলত মনে হবে, তার প্রতিটি পর্যায়ের তাৎপর্যই ভিন্ন প্রকৃতির।

তার প্রথম পর্যায় দৈহিক জগৎ; এর বাহ্যেন্দ্রিয়, এর জীবনধারণ সম্পর্কীয় মননশীলতা এবং এর বর্তমান অস্তিত্বের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম তৎপরতা।

দ্বিতীয় পর্যায় স্বপ্ন জগৎ। এটি মানুষে মনোজগতের বিচিত্র ধারণার কাল্পনিক উপলব্ধি, যা স্থান-কাল ও দৈহিক যাবতীয় অবস্থার বন্ধন মুক্ত হয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং এমন এক স্থানে হয়, যেখানে স্বপ্নদর্শী নিজে উপস্থিত নয়। সৎ স্বপ্নদর্শীর জন্য এর মাধ্যমে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ঈঙ্গিত সুসংবাদ লাভ ঘটে থাকে; যেমন সত্যবাদী (সঃ) এ অঙ্গীকার রেখে গেছেন।

---

১৮৬. এ উক্তিটি দাউদ আল জাওবারিবীর বলে বলা হয়।
১৮৭. কোরান; ৭, ৪৩।

www.amarboi.org

এ দুটি পর্যায় সমগ্র মানব সমাজের প্রতিটি বক্তির জন্য সাধারণ এবং পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, উপলব্ধির দিক থেকে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

তৃতীয় পর্যায়টি নবুয়তের পর্যায়। এটি মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য বিশিষ্ট। কারণ আল্লাহ্ই তাঁদেরকে তাঁর পরিচয় ও একত্ববাদের দ্বারা বিশিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর প্রত্যাদেশ নিয়ে তাঁদের কাছে ফেরেশতা আগমন করে এবং মানব সমাজের যাবতীয় অবস্থা সংশোধনের এমন দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়, যা মানব জীবনের বাহ্যিক অবস্থার সাথে সর্বাংশে এক নয়।

চতুর্থ পর্যায়টি মৃত্যু। এতে প্রতিটি মানুষ তার বাহ্যিক জীবন ত্যাগ করে প্রলয় পূর্ববর্তী এমন এক অস্তিত্বে গমন করে, যাকে 'বরজখ' বলা হয়। সেখানে সে তার কর্মানুযায়ী সুখ অথবা শাস্তি ভোগ করে। তারপর তাকে মহাপ্রলয় দিনের দিকে পরিচালিত করা হয়। সেই বিশাল প্রতিদান প্রাপ্তিস্থানে সে সুখের অধিকারী হয়ে বেহেশতে যায় অথবা দুঃখের অধিকারী হয়ে দোজখে যায়।

পূর্বোক্ত দুটি পর্যায়ের সাক্ষাৎ হল প্রজ্ঞা। তৃতীয় নবুয়ত পর্যায়ের সাক্ষ্য হল অলৌকিক ক্রিয়া ও নবীদের বিশিষ্ট অবস্থা। চতুর্থ পর্যায়ের সাক্ষ্য হল মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে পুনরুত্থান, বরজখের অবস্থা ও বিচারদিন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য বুদ্ধিও অনুরূপ কিছুই কামনা করে। কেননা আল্লাহ্ পুনরুত্থান সম্পর্কীয় তাঁর বহু বাণীতে আমাদেরকে এ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এর সত্যতার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ হল প্রতিটি মানুষের জন্য যদি তার এ জীবন ছাড়া মৃত্যুর পরপারে অন্য কোন জীবন ও তার সংশ্লিষ্ট যোগ্য অবস্থা না থাকত, তা হলে তার প্রথম অস্তিত্ব নিতান্ত অনর্থক হয়ে দাঁড়াত। কারণ মৃত্যুর অর্থ যদি নিতান্ত নাস্তি হয়, তা হলে প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্যই নাস্তিতে পর্যবসিত হয় এবং তার অস্তিত্বের জন্য কোন প্রকার বিচক্ষণতারই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ বিচক্ষণ স্রষ্টার জন্য এ অনর্থক সৃষ্টি একান্তই অসম্ভব।

যখন এ চারটি অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আমরা এগুলো সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে পারি। পাঠক, এ উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য বিদ্যমান, তা থেকে আপনি দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির রহস্য বুঝতে পারবেন।

প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে মানুষের উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। মহান আল্লাহ্ বলেছেন—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, যখন তোমরা কিছুই জান না এবং তিনি তোমাদেরক শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন।[১৮৮] এসব উপলব্ধির মাধ্যমে সে পরিচয়ের যোগ্যতা অর্জন করে, তার মনুষ্যত্বের তাৎপর্য পরিপূর্ণ হয় এবং মোক্ষ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনার দায়িত্ব সে পালন করতে সক্ষম হয়।

তার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপলব্ধি, যাকে স্বপ্ন বলা হয়েছে, তা বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপলব্ধিরই অনুরূপ; কিন্তু তাতে জাগরণের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল থাকে না।

১৮৮. কোরান; ১৬, ৭৮।

www.amarboi.org

অবশ্য স্বপ্নদর্শী তার স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতিটি বিষয়কেই যথাযথ বলে মনে করে; এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ও দ্বিধা থাকে না,—যদিও তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া স্থগিত থাকে। মানুষ এ অবস্থার ব্যাখ্যায় দুই দলে বিভক্ত; একদল,—দার্শনিকবৃন্দ; তাঁদের ধারণা,—কাল্পনিক দৃশ্যাবলিকে কল্পনাশক্তি মননের সাহায্যে মিশ্র অনুভূতির কাছে উপস্থিত করে এবং এ মিশ্র অনুভূতি বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী একটি স্তর। এর ফলে অনুভূত বিষয় প্রকাশ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সামনে প্রকটিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের এ ধারণায় অসুবিধার দিক হল এই যে, আল্লাহ্ বা ফেরেশতাদের তরফ থেকে যেসব সৎস্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তা কাল্পনিক ও বিশৃঙ্খল স্বপ্নের চেয়ে উপলব্ধিতে বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকে; অথচ কল্পনাশক্তি এ দুটির মধ্যে তাঁদের বর্ণনা মতে এক।

অন্য দলটি হলেন কালামশাস্ত্রবিদ্গণ। তাঁরা এ ব্যাপারটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এটি এক প্রকার উপলব্ধি, যা আল্লাহ্ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেন, যেমন জাগ্রত অবস্থায় সৃষ্টি হয়। এটাই যোগ্যতর ব্যাখ্যা; যদিও আমরা এর যথার্থ অবস্থা কল্পনা করতে পারি না। এই নিদ্রার উপলব্ধি এর পরবর্তী স্তরগুলোর উপলব্ধির জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়টি নবীদের পর্যায়। এ পর্যায়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এ বৈশিষ্ট্যের যথাযথ অবস্থা সংশ্লিষ্ট নবীর প্রজ্ঞাতেও অপরিজ্ঞাত; অথচ এটি তাঁদের কাছে বিশ্বাসের চেয়েও সুস্পষ্ট। এজন্য নবী আল্লাহ্কে দেখেন, ফেরেশতাকে দেখেন; আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর কথা শোনেন অথবা ফেরেশতার কাছ থেকে আল্লাহ্র কথা শোনেন; তিনি বেহেশত-দোজখ দেখেন, 'আরশ' 'কুর্সী' দেখেন,; তাঁর রাত্রিকালীন ভ্রমণে তিনি 'বোরাকে' চড়ে সপ্তাকাশ ভেদ করে চলে যান; সেখানে নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের সাথে নামাজ পড়েন; তিনি এমন অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় উপলব্ধি করেন, যা তিনি তাঁর দৈহিক পরিধিতে জাগরণে ও নিদ্রায় উপলব্ধি করে থাকেন। আল্লাহ্ই এজন্য তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সৃষ্টি করেন। এটি মানুষের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি নয়।

এ ব্যাপারে ইবনে সিনার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নবুয়তের ব্যাপারটিকে নিদ্রার পর্যায়ে নামিয়ে সেই কল্পনাশক্তির মিশ্র অনুভূতির কাছে দৃশ্য পাঠানোর সাথে মিলিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের সমালোচনা নিদ্রা অপেক্ষাও কঠোর হতে বাধ্য। কারণ আমরা পূর্বে যেমন বর্ণনা করেছি, এক্ষেত্রেও স্বভাবত একটিই; সুতরাং এ দিক থেকে নবীর কাছে ওহী এবং স্বপ্নের তাৎপর্য ও বিশ্বাস একই পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, পাঠক, আপনিও জানেন যে, বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। এজন্য নবী (সঃ) ওহী অবতরণের পূর্বে ছয়মাস স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং এটি ওহীর সময়ের মধ্যে গণ্য হলেও তার ভূমিকা হিসেবেই স্থান পেয়েছিল। তদুপরি এটি যে যথার্থ অর্থে স্বপ্ন, তাও জানা গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ওহীর বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি এর অবতরণকে কঠিন এবং এর তীব্রতাকে অসহ্য মনে করতেন; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে প্রথম দিকে খণ্ড খণ্ড আয়াত অবতীর্ণ হত এবং পরবর্তীকালে তবুক যুদ্ধের সময় তাঁর উপর সূরা 'বারাআত' অবতীর্ণ হয়; অথচ তিনি তখন সহজভাবে তাঁর উটনীর উপর বসেছিলেন। কাজেই এটি যদি মননের

www.amarboi.org

কল্পনাশক্তিতে ও কল্পনাশক্তির মিশ্র অনুভূতিতে অবতরণের ব্যাপার হত, তা হলে এ অবস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকত না।

চতুর্থ পর্যায়টি মৃত ব্যক্তিদের বরজখে অবস্থানের ব্যাপার এবং এর প্রারম্ভ হল কবর। তখন তারা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা তাদের পুনরুত্থানের সময়, যখন তারা দেহের মধ্যে ফিরে আসবে। যে-কোন অবস্থাতেই হোক, তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বর্তমান। সুতরাং মৃত ব্যক্তি কবরে প্রশ্নকারী দুজন ফেরেশ্তাকে দেখতে পায়; সে তার এ দু চোখের দ্বারাই বেহেশ্ত বা দোজখে তার স্থান দেখতে সক্ষম হয়; সে জানাজায় উপস্থিত লোকদেরকে দেখে, তাদের কথা শোনে, এমনকি তাকে কবর দিয়ে তারা যখন ফিরে যায়, তাদের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত তার কানে এসে বাজে; তারা তাকে আল্লাহ্র একত্ব ও দুই কলেমা উচ্চারণ করার জন্য যেভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাও সে শুনতে সক্ষম হয়; অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপার। বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বদরের চিহ্নিত স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখানে কোরায়েশের নিহত ব্যক্তিরা ছিল; তিনি তাদেরকে নামধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন। উমর (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ্! আপনি কি কতকগুলো গলিত শবের সাথে কথা বলছেন? তিনি (সঃ) বললেন, তাঁর শপথ, যার হাতে আমার আত্মা, তারা আমার কথা তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে শুনতে পায়।[১৮৯]

এর পরও তারা পুনরুত্থানের দিনে সেই কিয়ামতের সময় প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামসহ সবকিছু চাক্ষুষ দেখতে পাবে, যেমন তারা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত। তারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে বেহেশ্তের ভোগ-সম্ভোগ এবং দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। তারা ফেরেশ্তামণ্ডলীকে দেখতে পাবে এবং তাদের প্রভুকেও দেখবে; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও; তাঁর দর্শনলাভে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। উপলব্ধির এই যে বিশেষ পর্যায়, তা জীবিতাবস্থায় তার মধ্যে ছিল না; কিন্তু যখন হবে, তখন এ দৈহিক অনুভূতির মতোই স্পষ্ট হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আল্লাহ্ই তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টি করবেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

এর রহস্য জানার জন্য, পাঠক, এ বিষয়টি বুঝে নিতে হবে যে, মানুষের আত্মা, দেহ ও তার ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আবির্ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং তা যখন নিদ্রা, মৃত্যু অথবা নবীর কাছে ওহী অবতরণের অবস্থায় মানবিক অনুভূতি থেকে ফেরেশ্তীয় অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে, তখন সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন সেই মানবিক অনুভূতিকেই তার সঙ্গে নিয়ে যায়। কাজেই এ অবস্থায় সে যা ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার উপলব্ধি দৈহিক উপলব্ধি থেকে উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। এটি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর বক্তব্য। তিনি তার উপর আরও বলেছেন যে, মানবিক আত্মা দেহ বিচ্যুত হয়েও তার একটি আকৃতি বিদ্যমান থাকে; ঠিক যেমনি দুই চোখ, দুই কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুল্যভাবে অবস্থান করতে থাকে, যেমন দেহের মধ্যে এর আকৃতিসহ ছিল।

আমি বলি, এর দ্বারা সেই যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উপলব্ধির অতিরিক্ত দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাঠক, আপনি যদি এ

১৮৯. বোখারী (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

বিষয়টি বুঝে থাকেন, তা হলে অবশ্যই জানতে পেরেছেন যে, উপলব্ধির এ মাধ্যমগুলো উপরিউক্ত চারটি পর্যায়েই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এগুলো তখন জীবনের অনুরূপ নয়। বরং তা শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আবর্তিত হয়। কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এর প্রতিই সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ এসব উপলব্ধিতে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের সৃষ্টি করেন, সেই উপলব্ধি যেভাবেই হোক না কেন। এর দ্বারা তার সেই পরিমাণই বোঝাতে চেয়েছেন, যা আমরা উপরে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

দ্ব্যর্থবোধক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এটাই আমাদের সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য সামান্য আলোচনা। আমরা যদি এটি অপেক্ষা অতিরিক্ত বিশদ করতে যাই, তা হলে তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। আমাদের উচিত পবিত্র আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নবী ও গ্রন্থাদি বোঝার এবং সে সম্পর্কে সঠিক পথ পাবার জন্য আকুল আবেদন উপস্থিত করা। একমাত্র এ পথে আমরা একত্ববাদের যথার্থতা এবং আমাদের মোক্ষলাভের সফলতা লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকেন।[১৯০]

---

১৯০. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক শাস্ত্র]

এ শাস্ত্রটি মুসলিম ধর্মীয় বিধানে নবাগত। এর মূল ভিত্তি হল, এ শাস্ত্রের অধিকারীদের জীবনধারা সর্বদাই সাহাবী, তাবেয়নি ও তাঁদের পরবর্তী জাতির পূর্বসূরি ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সত্য ও সৎপথ প্রাপ্তির পন্থা হিসেবে বিরাজমান ছিল। এর মূল বিষয় আল্লাহ্‌র উপাসনায় ব্যাপৃত থেকে নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা; পার্থিব সম্পদ ও সৌন্দর্য থেকে দূরে অবস্থান করা; সাধারণ মানুষের কাছে লোভনীয় সম্পদ ও পদমর্যাদার লালসাকে ত্যাগ করা এবং মানুষের সংস্পর্শ থেকে একাকী নির্জনতার মধ্যে উপাসনায় নিজকে নিয়োজিত করা—এসব কিছুই সাহাবী ও পূর্বসূরিদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার ছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে যখন পার্থিব জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠল এবং মানুষ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সম্পদকে প্রাধান্য দিতে লাগল, তখন যারা উপাসনার মধ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলেন, তাঁরা সুফী বা সুফীতত্ত্ববিদ্ নামে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। কুশায়রী (রহঃ)[১৯১] বলেছেন, 'আরবি ঐতিহ্য হিসেবে এ নামের শ্রুতি বা অনুমানগত কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যত মনে হয়, এটি উপাধি বিশেষ। যারা একে আরবি 'সাফা' (শুদ্ধি) অথবা 'সিফত' (গুণ) থেকে ব্যুৎপন্ন বলে মনে করেন; তাদের বক্তব্যও আভিধানিক যুক্তির দিক থেকে ধোপে টিকে না।' তিনি বলেছেন, 'অনুরূপভাবে 'সুফ' (পশম) থেকেও যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ তারাই এককভাবে পশম পরিধান করতেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, প্রকাশ্যভাবে এ ধারণাই প্রচলিত যে, শব্দটি 'সুফ' থেকেই ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তাঁরা সাধারণভাবে এ পশমিবস্ত্র পরিধানের দ্বারাই বিশিষ্ট ছিলেন। কারণ তাঁরা সাধারণের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদের বিরোধিতার জন্যই এ পশমকে বেছে নিয়েছিলেন। তারপর তারা যখন সংযম ও লোকজনের কাছ থেকে দূরে সরে নির্জনে উপাসনা করার বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচিত হয়ে উঠলেন, তখন যা দিয়ে তাঁদেরকে বোঝা যায়, তা দিয়েই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

বস্তুত বক্তব্য এই যে, মানুষ যা দিয়ে মানুষ, তা একমাত্র তার সেই উপলব্ধি, যার কল্যাণে সে সমগ্র প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট। তার এ উপলব্ধি দুই প্রকারের; একটি জ্ঞান ও তত্ত্বকথা বিশ্বাস, ধারণা, সন্দেহ ও কল্পনা ইত্যাদির উপলব্ধি এবং অন্যটি বিচিত্র দশা

---

১৯১. তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

তথা আনন্দ, বেদনা, সংকীর্ণতা, উদারতা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধি। বুদ্ধিমান ও বিবেচক আত্মা দেহের মধ্যে উপলব্ধি, ইচ্ছা ও এসব দশার মাধ্যমে পরিবর্ধিত হয়ে ওঠে এবং এগুলোর দ্বারাই সে মানুষ হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। এর কতক অপর কতকাংশ থেকে জন্মায়; যেমন জ্ঞান জন্মায় যুক্তি-প্রমাণ থেকে, আনন্দ ও বেদনা যথাক্রমে উপাদেয় ও দুঃখজনক উপলব্ধি থেকে, উদ্যম বিশ্রাম থেকে এবং আলস্য ক্লান্তি থেকে। অনুরূপভাবে সাধকের সাধনা ও উপাসনাতেও তার জন্য একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যাকে তার উক্ত সাধনার ফল বলে আখ্যায়িত করা যায়।

বস্তুত সাধকের এ অবস্থা বা দশা, হয় তার এক প্রকার উপাসনা, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার দৃঢ়তা ও বিশেষ স্থান নির্দেশ করে; অথবা তা কোন প্রকার উপাসনা নয়, শুধুমাত্র আত্মার অর্জিত একটি গুণ, যা বেদনা, আনন্দ-উদ্যম, আলস্য বা অন্য প্রকার উপলব্ধিগত অবস্থানের জন্য জন্মে থাকে। এভাবে সাধক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উন্নীত হতে থাকে এবং পরিণামে সেই একত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হয়, যা সৌভাগ্যের চরম গন্তব্য বলে গণ্য হয়ে রয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই'—এ স্বীকৃতিসহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করে। বস্তুত সাধকের জন্য সাধনার এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ পর্যায়ের সামগ্রিক ভিত্তিই হল আনুগত্য ও আন্তরিকতা। এর প্রারম্ভ বিশ্বাস থেকে ও এর সঙ্গেও বিশ্বাসের অভিযাত্রা এবং এ বিশ্বাস থেকেই দশা, গুণ, ফল ও ফসল সবই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে একের পর এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে একত্ব ও দিব্যজ্ঞানের পর্যায়ে এসে দেখা দেয়। যখন কোন ফলে ত্রুটি দেখা দেয় বা অসুবিধা জন্মায়, তখন আমরা বুঝতে পারি, তা পূর্ববর্তী স্তরের ত্রুটি থেকেই জন্মেছে। এ বিষয়টি আত্মিক ধারণা ও হার্দিক অনুভবের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ জন্যই সাধককে তার সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে বিচার-বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। কারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে ফললাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত; সুতরাং নিষ্ফল হলে সে জন্য প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতিই দায়ী। সাধক তার আস্বাদের মাধ্যমে এর সংবাদ পেয়ে থাকেন এবং এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেই নিজেকে পরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তাঁদের উপলব্ধিকে বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ এক্ষেত্রে উদাসীনতা সর্বত্রই বিদ্যমান।

উপাসনাকারীদের উদ্দেশ্য যদি অনুরূপ কোন পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বাসনা না হয়, তা হলে বলতে হবে, তাঁরা ধর্মীয়শাস্ত্রকে অনুসরণ করে আন্তরিকভাবে শুধু তার পালন ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মাত্র। অথচ এ অধ্যাত্মতত্ত্বের অধিকারীরা উক্ত বিষয়াদির ফলাফলকেই আস্বাদ ও অনুভবের দ্বারা বিশ্লেষণ করে থাকেন। কেননা এর মাধ্যমেই তারা বুঝতে পারেন যে, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ, না ত্রুটিশূন্য। বস্তুত এদিক থেকে প্রকাশ পায় যে, তাদের পন্থার মূল ভিত্তি হল গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আত্মার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাধনা থেকে প্রাপ্ত এমন আস্বাদ ও অনুভবের মাত্রা বিশ্লেষণ। এগুলোর মাধ্যমেই সাধকের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত হয় এবং সেখান থেকে অন্যত্র গমনের পথরেখা নির্দেশিত হয়। এসব অনুষ্ঠানসহ তাদের মধ্যে প্রচলিত নীতিমালা ও পরিভাষা

www.amarboi.org

বিদ্যমান। কারণ প্রতিটি শব্দই তার আভিধানিক অর্থে একটা পরিচিত বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং ওটাকে যখন অপরিচিত ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন স্বভাবতই আমরা ওটার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এমন পরিভাষারূপে গ্রহণ করি, যাতে উদ্দিষ্ট ভাব সহজে বোধগম্য হতে পারে। এ কারণেই এ সম্প্রদায় তাদের পরিভাষাসহ এমন একটি শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে, যাতে তারা ছাড়া অন্য ধর্মবিদ্‌দের বলার কিছু নেই। এর ফলে—ধর্মীয়শাস্ত্রের পরিধিই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটি ভাগ ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্‌ ও ফতোয়া দানকারীদের অধীনস্থ; যাতে উপাসনা, অভ্যাস ও ব্যবহার সম্পর্কীয় সাধারণ বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। অন্য ভাগটি এমন একদল লোকের দায়িত্বে ন্যস্ত, যাঁরা সাধনা, আত্মার পরীক্ষা, সাধনার পন্থায় লব্ধ আস্বাদ ও অনুভবের বিশ্লেষণ, এক আস্বাদ থেকে অন্য আস্বাদে গমন এবং তাদের মধ্যকার এ সম্পর্কীয় বিচিত্র পরিভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নিয়োজিত।

যখন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হল এবং জ্ঞানীরা ফেকাহ্‌, অসুলে ফেকাহ্‌, কালাম, তফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা লিপিবদ্ধ করলেন, তখন এ পন্থার বিভিন্ন লোকও এ সম্পর্কে গ্রন্থাদি লিখতে উদ্যোগী হলেন। তাদের মধ্যে আল মুহাসেবী তাঁর 'রেয়াআ' নামক গ্রন্থে সাধারণ ধার্মিকতা ও গ্রহণ-বর্জনের দিক থেকে আত্মার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তাদের মধ্যে অনেকে উক্ত পন্থার নীতিমালা সাধকদের আস্বাদ ও বিভিন্ন অবস্থা, বিচিত্র দশা সম্পর্কে লিখলেন; যেমন আল-কুশায়রী তাঁর 'রেসালা' নামক গ্রন্থে, আস্‌সোহরোয়ার্দী[১৯২] তার 'আওয়ারেফুল 'মাআরেফ' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অনুরূপ গ্রন্থাদিতে লিখেছেন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর 'এহিয়া' নামক গ্রন্থে এ উভয় বিষয়কে একত্র করেছেন। তিনি এতে ধার্মিকতা ও শিষ্যত্বের বিষয় বর্ণনা করে উক্ত পন্থার নীতি, প্রথা এবং তাদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যের পরিভাষাসমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে সুফীতত্ত্ব জাতির কাছে একটি সুসংবদ্ধ শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অথচ এর পূর্বে এ পন্থাটি উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিধি-নিষেধগুলো একের অন্তর থেকে অপরের অন্তরে দীক্ষার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতো মাত্র। অবশ্য এক সময়ে গ্রন্থবদ্ধ সব শাস্ত্রের তথা তফসীর, হাদীস, ফেকাহ্‌, অসুলে ফেকাহ্‌ ইত্যাদির অবস্থাও অনুরূপভাবে প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এ সাধনা, নির্জনতা ও নামজপ; সাধক সাধারণভাবে এগুলো অনুসরণ করে এসে উপনীত হয় ইন্দ্রিয়ের যবনিকা উন্মোচন এবং আল্লাহ্‌ মহিমার জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপে। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অধিকারীর জন্য অনুরূপ উপলব্ধির কোন অবকাশ নেই। অথচ আত্মা সেই মহিমাজগতের অধিবাসী। অনুরূপ উপলব্ধির কারণ এই যে, আত্মা যখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের দিক থেকে অন্তরেন্দ্রিয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন বাহ্যোপলব্ধি দুর্বল হয়ে আত্মার অবস্থা-ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।। তার প্রভাব বিস্তৃত হয় ও তার বৃদ্ধি নবীন জীবন লাভ করে। নামজপ একে সাহায্য করে থাকে; কেননা আত্মার শক্তি বৃদ্ধিতে এটি খাদ্যতুল্য। এভাবে আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ও বিস্তৃত হয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাকে বলা যায় জবানের স্তর থেকে চাক্ষুষ দর্শনের স্তরে

১৯২. উমর ইবনে মুহম্মদ; ৫৩৯—৬৩২ (১১৪৫—১২৩৫ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

উপনীত হওয়া। এ সময় ইন্দ্রিয়াদির যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং আত্মা তার সত্তাগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কারণ সে ঐ নিছক উপলব্ধিরই স্বগোত্রীয়। তখন তার সামনে ঐশ্বরিক বদান্যতা প্রজ্ঞা ও মুক্তির অসীম দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং তার সত্তা তার যথার্থ তাৎপর্যে বিধৃত হয়ে উন্নত স্তরে—ফেরেশেতার জগতে উন্নীত হয়।

সাধকদের অধিকাংশের জন্যই এ দিব্যজ্ঞান এসে দেখা দেয়। এর ফলে তাঁরা সৃষ্টির এমন অনেক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা বহু ঘটনাকে সেগুলো সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই জানতে পারেন এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা ও আত্মশক্তির বলে সৃষ্টির নিম্নস্তরে হস্তক্ষেপ করে অঘটন ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে সৃষ্টি তাঁদের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ওঠে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তিরা এ দিব্যশক্তিকে কিছুই গণ্য করেন না; তাঁরা অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ, কোন কিছুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ প্রদান এবং এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্যোগী হন না; বরং তাঁরা অনুরূপ দিব্যশক্তিতে তাঁদের জন্য পরীক্ষার বিষয় বলে মনে করেন এবং তার আবির্ভাব ঘটলে তাঁরা আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়ে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হন। সাহাবীরা (রাঃ) এ দিব্য সাধনার অধিকারী ছিলেন এবং এমন দিব্যশক্তির প্রাচুর্য তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। অথচ তাঁরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) সম্পর্কে প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান। অধ্যাত্মবাদীরা এক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন। আল কুশায়রীর গ্রন্থ 'রেসালায়' তাঁদের কথা এবং তাদের অনুসারী উত্তরসূরিদের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর উত্তরসূরিদের মধ্যে একটি দল ইন্দ্রিয় যবনিকা উন্মোচন এবং তার অন্তরালবর্তী উপলব্ধির আলোচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের অনুশীলনের ধারা বিচিত্র হয়ে দাঁড়াল। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মৃত্যু এবং মননসর্বস্ব আত্মাকে নামজপের দ্বারা সঞ্জীবিত করার শিক্ষাপ্রণালীতে মতভেদ দেখা দিল। কেননা এ প্রক্রিয়ায় আত্মা এমন একটি উপলব্ধির অধিকারী হয়, যা এর সত্তার খাদ্য গ্রহণ ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। এরূপ উপলব্ধি অর্জিত হলে, তাঁরা ধারণা করেন যে, অস্তিত্ব তখন এই একটি উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর কল্যাণে তাঁরা সৃষ্টির রহস্যসত্তা অনুধাবন ও আরশ থেকে ফরাশ পর্যন্ত যাবতীয় বস্তুর তাৎপর্য অনুসরণ করতে সক্ষম হন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর 'এহিয়া' গ্রন্থে সাধনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করার পর অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন।

পুনরায় এ দিব্যজ্ঞান তাঁদের মতে তখনই বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়, যখন তা নিষ্ঠার দ্বারা অর্জিত হয়। কেননা অনেক সময় বিশ্বাসের এ নিষ্ঠা ব্যতিরেকেই ক্ষুধা ও নির্জনতার কল্যাণে একপ্রকার দিব্যানুভূতির জন্ম সম্ভব; যেমন যাদুকর ও অন্যান্য যোগসাধনাকারীদের মধ্যে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা একমাত্র সেই দিব্যজ্ঞানের কথা বলছি, যা নিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এর উদাহরণ হল, যদি কোন দর্পণকে কুব্জাকৃতি অথবা গর্তাকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা হলে তাতে প্রতিবিম্বিত বস্তুর আকৃতি যথার্থ না হয়ে বিকৃত আকারে দেখা যাবে। কিন্তু যদি উক্ত দর্পণটি সরলভাবে

www.amarboi.org

বিস্তৃত থাকে, তা হলে তাতে প্রতিটি বস্তুর আকৃতি বিশুদ্ধভাবেই দেখা যাবে। বস্তুত আত্মার জন্য বিশ্বাসের নিষ্ঠা দর্পণের এ সরল বিস্তৃতির ন্যায় এবং তাতে প্রতিবিম্বিত অবস্থাদিও অনুরূপভাবেই তুলনীয়।

সুতরাং উত্তরসূরিরা যখন অনুরূপ দিব্যজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তখন তারা উর্ধ্বজগৎ নিম্নজগতের যাবতীয় বস্তুর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ফেরেস্তা, আত্মা, আরশ, 'কুর্সী' এবং এমন অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণে নিয়োজিত হলেন। যারা তাঁদের এসব বিষয় সম্পর্কীয় উপলব্ধির কোন ধারণা রাখতেন না, তাদের পক্ষে এদের মধ্যকার আস্বাদ ও অনুভবের প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ধর্মীয় ফতোয়া দানকারীর অনেকেই তাদেরকে অস্বীকার করলেন, আবার অনেকে মেনে নিলেন। অবশ্য এ পন্থায় কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের কোন উপযোগিতা নেই। কারণ এর সব ব্যাপারটিই প্রজ্ঞার লীলা-খেলা।

বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ

হাদীস ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্‌দের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় বক্তব্যের বহুস্থানে এ কথা ব্যক্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্যে আছে, তিনি ভিন্নও নন; যুক্তও নন। দার্শনিকরা বলেন, তিনি জগতের মধ্যেও নন; বাইরেও নন। উত্তরসূরি সুফীসাধকদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির সাথে এক; হয় তা তাঁর অবতরণের মাধ্যমে, নয়ত তিনিই একমাত্র সত্তা। কেননা বিশেষ বা সাধারণ কোন দিক থেকে তিনি ছাড়া অন্য কারও অস্তিত্ব নেই।

এখানে আমরা এসব মতাদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রতিটির যথার্থ তাৎপর্য প্রদান করব। যাতে প্রতিটির অর্থ আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুতরাং আমরা বলি, ভিন্নতার দুটি অর্থ হতে পারে।

এর একটি হল, তিনি দেশ ও দিকে ভিন্ন এবং এর বিপরীত হল তিনি সংযুক্ত। তাঁর এমন বিপরীত হবার বিষয়টি তাঁকে কোন বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট করা থেকে বোঝা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দিষ্টকরণ প্রকাশ্য হবে এবং এটাই দেহের অধিকারী হওয়ার ধারণা। অথবা আবশ্যকীয়ভাবে তা দেখা দিবে এবং এটাই দেহের বহিত তুলনা, যহা৷ তাঁর বিশেষ কোন দিকে হওয়ার মতবাদের অনুরূপ। পূর্বসূরিদের অনেকের কাছ থেকে অনুরূপ সুস্পষ্ট ভিন্নতার মতাদর্শ বর্ণিত হয়েছে; অবশ্য তার অর্থ এমন ভিন্নতা ছাড়া অন্য কিছু মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এমন ভিন্নতার কথা অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন,—স্রষ্টা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন; আবার সংযুক্ত বলারও উপায় নেই। কারণ এ উভয়টি একমাত্র নির্দিষ্ট স্থানের অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব।

কোন স্থান সম্পর্কে যা বলা হয় যে, তা কোন একটি বিশেষ গুণ অথবা তার বিপরীত কোন কিছুর সাথে সংযুক্তি ব্যতিরেকে থাকতে পারে না; তা একমাত্র সংযুক্তির বাস্তবতা ও অবাস্তবতার দ্বারাই সত্য বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তার অভাব হলে তা আর সত্য হয় না; বরং তখন তা যে-কোন বিশেষ গুণ বা তার বিপরীতের সাথে সংযুক্তি

www.amarboi.org

ব্যতিরেকেই অবস্থান করে। যেমন জড়পদার্থ সম্পর্কে বলা হয়, জ্ঞানী নয়, মূর্খ নয়, ক্ষমতাবান নয়, অক্ষম নয়, শিক্ষিত নয় ও অশিক্ষিত নয়। এক্ষেত্রে অনুরূপ ভিন্নতার গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হওয়ার জন্য তাকে প্রতিষ্ঠিত অর্থানুসারে যে-কোন একটি দিকে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। অথচ স্রষ্টা অনুরূপ কোন বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইমামুল হরমাইনের গ্রন্থ 'আল লুমা'র ব্যাখ্যায় ইবনে তিলমেসানী[১৯৩] এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, স্রষ্টা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি জগৎ থেকে ভিন্ন, জগতের সাথে সংযুক্ত, তিনি জগতের মধ্যে এবং তিনি জগতের বাইরে। কারণ দার্শনিকরা যা বলেন, তা এরূপ যে, তিনি জগতের মধ্যেও নন, বাইরেও নন। তাঁদের এ বক্তব্যের ভিত্তি হল, স্থান বিরহিত উপাদানের অস্তিত্ব। কিন্তু এ ভিত্তিকে কালামশাস্ত্রবিদ্গণ অস্বীকার করেছেন। কেননা এতে উক্ত উপাদানের সাথে স্রষ্টাকে একটি বিশেষ গুণের দিক থেকে সমান বলে গণ্য করা হয়। কালামশাস্ত্রে এর বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান।

ভিন্নতার অন্য অর্থটি হল পৃথক ও বিরোধী। এতে বলা যায়, স্রষ্টা তাঁর সত্তা, পরিচয়, অস্তিত্ব ও গুণাবলির দিক থেকে সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। এর বিপরীতে আসে ঐক্য, মিশ্রণ ও একত্রীভবন। এ ভিন্নতাই সমগ্র পূর্বসূরি, ধর্মতত্ত্ববিদ্, কালামশাস্ত্রবিদ্, প্রাচীন সুফীতত্ত্ববিদ্ তথা সব তত্ত্বানুসারীর মতাদর্শ। যেমন 'রেসালা' গ্রন্থের অনুগামী এবং তাঁদের পথের পথিক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

পরবর্তী সুফীসাধকদের মধ্যে একটি দল, যারা প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিকে বিতর্কেয় জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করেছেন, তাঁরা এ মত পোষণ করেন যে, মহান স্রষ্টা তাঁর পরিচয়, অস্তিত্ব ও গুণাবলির দিক থেকে সৃষ্টির সাথে এক। অনেক সময় তাঁরা ধারণা করেন যে, এটি এরিস্টটলের পূর্ববর্তী প্লেটো ও সক্রেটিসের ন্যায় দার্শনিকদের মত। এটাই সেই মত, যা কালামশাস্ত্রবিদ্রা সুফীসাধকদের বিশেষ মত হিসেবে কালামশাস্ত্রে বর্ণনা করেন এবং তার প্রতিবাদ করতে তৎপর হন। অবশ্য তাঁরা এটি মনে করেন না যে সেখানে দুটি সত্তার সম্ভাবনা আছে। তার একটি অন্যটির অস্তিত্বের পরপন্থী অথবা একটি অন্যটিতে অংশ হিসেবে পর্যবসিত হয়। কারণ এরূপ ধারণার মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধিতাই বিদ্যমান। তাঁরা এরূপ কোন কিছু বলেন না। বস্তুত সুফীসাধকদের কথিত এ একত্ব সেই অবতারবাদ, যা খ্রিস্টানগণ ঈসা (আঃ)-এর জন্য দাবি করে থাকে। বরং এটি সেই অবতারবাদ থেকেও অদ্ভুত প্রকৃতির। কেননা এটি অবিনশ্বরের নশ্বরে অবতরণ এবং তার সাথে একত্রীভবন। এটি সেই মতের সাথেও অবিকল এক, যা ইমামিয়া শিয়াগণ তাদের ইমামদের সম্পর্কে পোষণ করে থাকেন। তাদের আলোচনায় এই একত্বের বর্ণনা দুভাবে এসেছে।

প্রথমত এই যে অনাদি সত্তা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সমগ্র নশ্বরতায় সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত করছে এবং উভয় উপলব্ধির ক্ষেত্রেই সে এক হয়ে ধরা দিচ্ছে। বস্তুত সে-ই তার প্রকাশকারী এবং সে-ই তার রক্ষাকারী; অর্থাৎ সে-ই সব কিছুর অস্তিত্বের বিধায়ক। এর অর্থ তার অভাবে সব কিছুই নাস্তিতে পর্যবসিত হত। এটাই অবতারবাদীদের মত।

১৯৩. আবদুল্লাহ্ ইবেন মুহম্মদ; মৃত্যু ৬৫৮ (১২৬০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়টি হল সম্পূর্ণ একত্ববাদীদের মত। তারা যেন অবতারবাদীদের মতের মধ্যে এ সামগ্রিক ঐক্যের বিরোধী একটি চেতনা আবিষ্কার করেছে। সুতরাং তার সেই অনাদিশক্তি ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে সত্তা, অস্তিত্ব ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভিন্নতার ধারণা অস্বীকার করেছে। তারা মানবিক উপলব্ধি ও মননের মধ্যে সে সম্পর্কে যে প্রকাশ্য বিভিন্নতার ধারণা বিদ্যমান, তাকে একান্তই মানবিক উপলব্ধির বিষয় বলে ভ্রমাত্মক গণ্য করেছে। বস্তুত এগুলো ধারণা মাত্র। তদুপরি এ ধারণা বলতে তারা সে ধারণার কথাও বোঝাতে চায় না, যা জ্ঞান, কল্পনা ও সন্দেহের সাথে জড়িত; বরং তারা বলতে চায় যে, অনুরূপ কোন কিছুরই যথার্থ অস্তিত্ব নেই। কেবল মাত্র মানবিক উপলব্ধিতেই এটি বিদ্যমান। কারণ একমাত্র অনাদি সত্তা ছাড়া দৃশ্যমান জগতে কোথাও অন্য কারও কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

বস্তুত এ বিষয়টি বোঝার জন্য মানবিক উপলব্ধিসমৃদ্ধ যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করায় কোন লাভ নেই। কেননা এটি একমাত্র ফেরেশতীয় উপলব্ধির মাধ্যমেই বর্ণিত হতে পারে। নবীগণ একমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে অনুরূপ উপলব্ধির অধিকারী হন এবং ওলীরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এর আস্বাদ লাভ করে থাকেন। কিন্তু যারা এরূপ উপলব্ধিকে জ্ঞানের দ্বারা অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, তাদের সেই ইচ্ছা পথভ্রষ্টতা মাত্র। অনেক সময় অনেক গ্রন্থকার প্রকাশ্য (বস্তু)-বাদীদের ধারা অনুসারে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে এ তত্ত্বকে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন। এর ফলে তারা রহস্যময়কে আরও রহস্যময় করে তোলেন মাত্র।

অনেক সময় গ্রন্থরচয়িতারা সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও তার তাৎপর্যের পর্যায়ক্রম বিন্যাসে তাদের মতাদর্শের কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করেন; কিন্তু এতে বিষয়টি মনন, পরিভাষা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শাস্ত্রগুলোর তুলনায় একান্তই রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ফরগানী[১৯৪] ইবনে ফারেজের[১৯৫] দীর্ঘ কবিতাটির ব্যাখ্যার ভূমিকায় অনুরূপ একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি একজন কর্তার মাধ্যমে সৃষ্টির আবির্ভাব ও তার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টিজগৎ সামগ্রিকভাবে একত্বের এমন একটি গুণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যাকে একত্বের প্রকাশস্থান বলে অভিহিত করা যায়। বস্তুত এ উভয় গুণ এমন একটি সম্ভ্রান্ত সত্তা থেকে বের হয়ে এসেছে, যা অন্যান্য এককত্বের স্বরূপবিশেষ। এ বহিঃপ্রকাশকে তারা জ্যোতির্ময়তা বলে আখ্যায়িত করেন।

এরূপ জ্যোতির্ময় বহিঃপ্রকাশের যতগুলো পর্যায় আছে, তাদের কাছে এর প্রথম পর্যায় হল নিজের কাছে জ্যোতিষ্মান হওয়া। এটি আবির্ভাব ও বহিঃপ্রকাশের পূর্ণতাকে বহন করে। কারণ তাদের বর্ণিত একটি হাদিসে অনুরূপ একটি বক্তব্য বর্তমান। সেখানে পরম সত্তা বলেছেন, 'আমি একটি গুপ্ত খনি ছিলাম, আমি পরিচিত হতে আগ্রহী হলাম; সুতরাং আমি এ সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলাম, যাতে তারা আমাকে জানতে পারে।'[১৯৬]

১৯৪. সাইদউদ্দিন মুহম্মদ ইবনে আহমদ; খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।
১৯৫. উমর ইবনে ফারেজ; ৫৭৭—৬৩২ (১১৮২—১২৩৫ খ্রি:) হি:।
১৯৬. এটিই 'হাদিসে কুদসী' নামে পরিচিত।

www.amarboi.org

এ পূর্ণতা তাদের কাছে, অস্তিত্বের মধ্যে অবতরণশীল আবির্ভাব এবং তাৎপর্যাদির বিস্তার। এটাই তাদের কাছে তত্ত্বের জগৎ, পূর্ণতার অবস্থান ও 'মুহম্মদী' তাৎপর্যের পর্যায়। এ পর্যায়ে গুণাবলির তাৎপর্য, 'লওহ' কলম, সব নবী-রসূলের সব তাৎপর্য এবং মুহম্মদী সম্প্রদায়ের পূর্ণত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থান। এ পর্যায়কে মুহম্মদী তাৎপর্যের বিস্তার বলে গণ্য করা হয়। এসব তাৎপর্য থেকে অন্যবিধ বহু তাৎপর্য বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে। একেই তুলনীয়তার পর্যায় বলা হয়। তারপর তা থেকে 'আরশ', কুর্সী, আকাশমণ্ডল, মৌল উপাদানের জগৎ এবং এর পরে মিশ্রণের জগৎ। এটাই সংশোধনের জগৎ; কিন্তু যখন এগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, তখনই বিস্ফোরণের জগতে উপনীত হয়। শেষ।

এ মতাদর্শটিকে জ্যোতির্ময় বহিঃপ্রকাশ ও অবস্থানবাদীদের মতাদর্শ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমন আলোচনার যথার্থ তাৎপর্য তার রহস্যময়তা ও জটিলতার জন্যই যুক্তিবাদীদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বস্তুত এটি প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিবাদী ও যুক্তিবাদীদের মধ্যকার এক ব্যবধান সৃষ্টিকারী পর্যায় মাত্র। অনেক সময় উপরোক্ত পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে প্রকাশ্য ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে অস্বীকার করা হয়; কেননা সেখানে এমন কোন কিছুর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে অন্য অনেকে সম্পূর্ণ একত্ববাদের ধারণা পোষণ করতে অগ্রসর হয়েছেন। এ মতটি বোধগম্যতা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে পূর্বটি অপেক্ষাও অদ্ভুত প্রকৃতির। তাদের ধারণা অস্তিত্বের বিস্তারের মধ্যেই তার শক্তি নিহিত এবং এর দ্বারাই বস্তু, তার আকৃতি ও উপাদানের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

বস্তুত মৌল উপাদান একমাত্র তার অন্তর্গত শক্তির দ্বারাই বর্তমান। অনুরূপভাবে তার অভ্যন্তরীণ উপাদানে যে শক্তি ছিল, তার কল্যাণেই সে অস্তিত্বে এসেছে তারপর তার মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে যে শক্তি দেখা যায়, তা সেই শক্তিকেই বহন করছে, যা দিয়ে এ মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে। যেমন খনিজ পদার্থের শক্তি, তার মধ্যে মৌল উপাদানের শক্তি তার আকৃতিসহ বিদ্যমান এবং তদুপরি অতিরিক্ত খনিজশক্তি। তারপর প্রাণীশক্তি, তাতে খনিজ পদার্থের শক্তির অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও তার নিজস্ব শক্তি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে মানবিক শক্তি প্রাণীশক্তিসহ অবস্থান করছে। তারপর আকাশীয় শক্তি মানবিক শক্তি ও তার অতিরিক্ত শক্তির আধার। অনুরূপ আত্মিক সত্তার শক্তি ও কোন প্রকার বিশেষত্ব ব্যতিরেকেই সব কিছুর সম্মিলিত আধার রূপ শক্তি। এটাই ঐশ্বরিক শক্তি, যা সব সমগ্র ও অংশের মধ্যে অস্তিত্বের স্রোতধারায় প্রবহমান। এটাই সবাইকে একত্র করে সবাইকে বেষ্টন করে রেখেছে। তার এ অবস্থান, বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে নয়, গোপনীয়তার দিক থেকে নয়, আকৃতির দিক থেকে নয় এবং উপাদানের দিক থেকেও নয়। বরং সবই এক এবং তাই ঐশ্বরিক সত্তার স্বরূপ। যথার্থ অর্থে এ সত্তা এক সরল একক মাত্র। বিবেচনাই তাকে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে চিহ্নিত করে। যেমন মানবিক শক্তির প্রাণীশক্তিসহ অবস্থান। পাঠক, আপনি কি দেখতে পান না যে, তা ঐ শক্তির অন্তর্গত এবং তার অস্তিত্বে অস্তিত্ববান। এ কারণে বারেক মাত্র হলেও সে তার বৈশিষ্ট্যসহই সাধারণত্বকে প্রকটিত করে তোলে। এটি সর্বপ্রকার অস্তিত্বেই বিদ্যমান,

www.amarboi.org

যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আবার কখনও অংশ হয়েও তুলনার ধারায় সে সমগ্রকে প্রস্ফুটিত করে দেয়।

ফলত তারা এ মতবাদে যে-কোন প্রকারেই হোক, সর্বদা ও সর্বত্র মিশ্রণ ও আধিক্য থেকে পালিয়ে বেড়ায়। একমাত্র ধারণা আর কল্পনাই এরূপ আচরণকে তাদের জন্য অনিবার্য করে তুলেছে। এ মতবাদের আলোচনায় ইবনে দহকানের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায়, তা এই যে, তারা একত্ববাদ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তাকে দার্শনিকের বর্ণ সম্পর্কীয় বক্তব্যের সাথে তুলনা করা যায়। তারা বলেন, বর্ণের অস্তিত্ব কিরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; কাজেই কিরণের অভাব দেখা দিলে বর্ণনাদির অস্তিত্ব কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে তাদের কাছে অনুভবযোগ্য সব অস্তিত্বই সচেতন অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; বরং বুদ্ধিগ্রাহ্য ও কাল্পনিক অস্তিত্ব ও তার বিদ্যমানতার জন্য মননশীল উপলব্ধির উপর নির্ভর করছে। সুতরাং এদের সব বিশিষ্ট অস্তিত্বের জন্যই মানবিক উপলব্ধির অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি সামগ্রিকভাবে মানবিক উপলব্ধির অস্তিত্বহীনতা ধরে নেয়া যায়, তা হলে অস্তিত্বের মধ্যে বিশিষ্টতাসূচক কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং তা তখন সরল এককমাত্র। কাজেই উষ্ণ ও শৈত্য, কঠোরতা ও কোমলতা; বরং মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, আকাশ, নক্ষত্রমালা সব কিছুই একমাত্র তাদেরকে অনুভবকারী ইন্দ্রিয়াদির কল্যাণেই অস্তিত্ববান। এর জন্যই উপলব্ধির মধ্যে তাদের সেই বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান, যা তাদের অস্তিত্বে নেই; কেবলমাত্র উপলব্ধিতেই বিরাজ করছে। সুতরাং বৈশিষ্ট্যকারী উপলব্ধি যখন থাকে না, তখন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না; তখন উপলব্ধিও একক—তা আমি, অন্য কেউ নয়।

তারা একে ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করেন। কারণ সেই ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয় বলে সব বস্তুরই সম্পর্ক বিরহিত থাকে। সে এ অবস্থায় থাকাকালে একমাত্র কল্পনাশক্তিই তাকে যা কিছু বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বস্তুর সন্ধান দেয়। তারা বলেন, অনুরূপভাবে জাগ্রত ব্যক্তির অবস্থাও একই পর্যায়ের; তার মানবিক উপলব্ধির কল্যাণেই সে সব অস্তিত্বের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক জ্ঞান লাভ করে থাকে। যদি তার এ উপলব্ধির অস্তিত্বহীনতা ধরে নেয়া যায়, তা হলে ঐসব বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ধান করবে। এটাই তাদের কথিত সেই ধারণার অর্থ। বস্তুত এ ধারণা মানবিক উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নয়।

ইবনে দহকানের[১৯৭] আলোচনা থেকে যা বোধগম্য হয়েছে, এটি তারই সংক্ষিপ্ত সার। বস্তুত এরূপ যুক্তি একান্তই পরিত্যাজ্য। কারণ আমরা যে নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তা আমাদের চোখের সামনে না থাকলেও তার বিদ্যমানতা সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস না করে পারি না। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, সেখানে আকাশ আছে, সেই আকাশে নক্ষত্রমালা আছে এবং আরও এমন অনেক কিছু আছে, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে নেই। মানুষ মাত্রেই এগুলো অকাট্যরূপে বিশ্বাস করে। বস্তুত কেউই তার মধ্যকার অনুরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে সক্ষম নয়। তদুপরি উত্তরসূরি তত্ত্ববিশারদ

---

১৯৭. পরিচয় অজ্ঞাত।

www.amarboi.org

সুফীসাধকরা বলছেন, সাধকের দিব্যজ্ঞান জন্মানোর পর অনেক সময় এরূপ একত্বের ধারণা এসে উপস্থিত হয়; তারা একে 'সম্মিলনস্থান' বলে অভিহিত করেন। তারপর সে এ স্থান থেকে উন্নীত হয়ে অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির পর্যায়ে এসে পৌঁছে। তারা একে 'বিয়োজনস্থান' বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত এটাই তত্ত্ববিদ্ বিচক্ষণ সাধকের পর্যায়। তাদের কাছে প্রত্যেক সাধককেই এ সম্মিলনঘাঁটি অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য এ ঘাঁটিটি খুবই কঠিন স্থান; কারণ সেখানে সাধকের থেমে পড়ায় আশঙ্কা বিদ্যমান। এর ফলে তার সব প্রচেষ্টাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে সুফীসাধকদের সাধনার বিচিত্র পর্যায়ক্রমকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

অতঃপর সুফীসাধকদের এ উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্গণ, যারা দিব্যজ্ঞান ও বাহ্যানুভূতির অতীত বিষয়ে আগ্রহী, তারা এ ব্যাপারে আতিশয্যের অনুসারী হয়ে উঠলেন। সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকেই একত্ব ও অবতারবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, যেমন আমরা তার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। তারা এ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থাদি পূর্ণ করে তুললেন। যেমন হারাবী[১৯৮] তার 'মকামাত' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা। তাদেরকে অনুসরণ করলেন ইবনেল আ'রাবী ও ইবনে সাবঈন[১৯৯] এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। তারপর এ ধারায় কবিতা রচনায় অগ্রসর হলেন ইবনে আফিফ,[২০০] ইবনে ফারেজ ও নজম ইসরাইলী[২০১]। তাদের পূর্বসূরিরা রাফেজী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি ইসমাইলীদের সাথে জড়িত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ও অবতারত্ব ও ইমামদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে এমন মতামত পোষণ করত, যা তাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না। এর ফলে এদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করে বসল; তাদের আলোচনা মিশ্রিত এবং তাদের বিশ্বাসাদি সমতুল্য হয়ে উঠল।

এরই ফলশ্রুতিতে সুফীসাধকদের আলোচনায় 'কুতব'-এর আবির্ভাব ঘটল। এ শব্দের অর্থ দিব্যজ্ঞানীদের শিরোমণি। তাদের ধারণা, তাঁকে এ দিব্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য কেউই অতিক্রম করতে সমর্থ হবে না এবং এমন অবস্থায় তিনি তিরোহিত হবেন। তারপর দিব্যজ্ঞানীদের মধ্য থেকে অন্য কেউ তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন। ইবনে সিনা তাঁর 'ইশারাত' নামক গ্রন্থের সুফীতত্ত্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'সত্যের মর্যাদা এমনই মহিমান্বিত যে, তা প্রত্যেক অনুসন্ধানীর জন্যই লভ্য নয় অথবা তা এককালে একাধিক ব্যক্তির পক্ষেও জ্ঞাতব্য নয়।' বস্তুত এটি এমন একটি বক্তব্য, যার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ও ধর্মীয় বিধানসম্মত কোন প্রমাণ নেই। এটি কেবলমাত্র একটি বাক্‌সর্বস্ব বক্তব্য এবং রাফেজী সম্প্রদায় তাদের ইমামদের দিব্য উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যা বলে থাকে, তারই অনুরূপ একটি মত। পাঠক লক্ষ করেন, কীভাবে এসব সুফীসাধকের মনোভাব রাফেজী সম্প্রদায়ের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাঁরা এর নিকটবর্তী হয়েছেন।

---

১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ; ৪০১—৪৮১ (১০১১—১০৮৯ খ্রি:) হি: (?)।

১৯৯. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৭ নং টীকা দ্র :।

২০০. শামসুদ্দিন মুহম্মদ ইবনে আফিফুদ্দিন সুলায়মান ইবনে আলী ভিলমিসানী; মৃত্যু ৬৮৮ (১২৮৯ খ্রি:) হি: (?)।

২০১. নজমুদ্দিন ইবনে ইসরাইল; ৬০৩—৬৭৭ (১২০৬—১২৭৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অতঃপর তারা উক্ত কুতবের পরে সুবিন্যস্তভাবে 'আবদাল'দের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, যেমন শিয়ারা 'নকীব'দের সম্পর্কে বলে থাকে। এমনকি তারা সূত্র পরম্পরায় অধ্যাত্মতত্ত্বের নিদর্শন হিসেবে 'খিরকা' পরিধানকে তাদের পন্থা ও সম্প্রদায়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল, তখন তাকেও হযরত আলীর সাথে সংযুক্ত করতে দ্বিধা করল না। বস্তুত এটিও সেই শিয়া মতের পরিপূরক। অন্যথায় আলী (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে অনুরূপ কোন পন্থা বা মতের পোশাক ও দশার দ্বারা বিশিষ্ট ছিলেন না। বরং আবুবকর ও উমর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মনিষ্ঠ ও উপাসনা পরায়ণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না, যাঁকে ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। বরং সাহাবীদের সকলেই ধর্মত্যাগ ও সংযমের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে বিরাজমান ছিলেন। তাঁদের চরিত্র ও ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য শিয়ারা তাদের সুপরিচিত শিয়া মতামতের জন্য এ ব্যাপারে অন্য সবার চেয়ে আলীকে বেশি গুণগ্রামের অধিকারী বলে মনে করে।

এ ব্যাপারে যা সুস্পষ্ট, তা এই যে, ইরাকে যখন ইসলামিয়া সম্প্রদায়ের শিয়ারা আত্মপ্রকাশ করল এবং তাদের সর্বজনবিদিত ইমাম সম্পর্কীয় ধারণা ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় প্রকাশ পেল, তখন সেখানকার সুফীসাধকরা তাদের মতামত থেকে তত্ত্বচয়ন করে প্রকাশ ও গোপনের মধ্যে একটি তুলনামূলক ভারসাম্যের সৃষ্টি করলেন। তাঁরা ইমামকে ধর্মীয় বিধানের প্রতি মানুষের আনুগত্য সম্পাদনের জন্য শাসনক্ষমতার অধিকারী করলেন এবং ধর্মীয় বিধানে যেমন বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী যাতে মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তাঁকে এককভাবে এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারপর তারা আল্লাহ্র তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য কুতবের প্রতিষ্ঠা করলেন; কেননা তিনি দিব্যজ্ঞানীদের শিরোমণি। তারা তাঁকে ইমামের সাথে প্রকাশ্য তুলনার ভিত্তিতে একক দায়িত্ব অর্পণ করে গোপন তত্ত্বের জন্য নির্দিষ্ট করলেন। যাতে তিনি এ বিষয়ে ইমামের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। তারা তাঁর নাম রাখলেন 'কুতব' তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র নির্ভর তাঁর উপর। এভাবে তারা তুলনার চূড়ান্ত পর্যায় অনুসরণ করে 'নকীব' (নেতা) এর অনুরূপ 'আবদাল' (সাধু) নিয়োজিত করলেন। পাঠক, বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন।

সুফীসাধকদের অনুরূপ মনোভাবের সাক্ষ্য দেয় প্রতীক্ষিত ইমাম ফাতেমী সম্পর্কে তাদের আলোচনা। তারা এ বিষয় দিয়ে তাদের গ্রন্থাবলি পূর্ণ করে রেখেছেন। অথচ পূর্বসূরি সুফীসাধকদের আলোচনায় এ সম্পর্কে ইতি বা নেতিবাচক কোন বক্তব্যই নেই। এটি একমাত্র শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও মতাদর্শ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।[২০২]

টীকা

এখানে আমাদের উস্তাদ দিব্যজ্ঞানী আন্দালুসের ওলীশ্রেষ্ঠ আবু মাহদী ইসা ইবনে যিয়াতের[২০৩] একটি আলোচনা পরিচ্ছেদ আকারে সন্নিবেশিত করাকে আমি প্রয়োজনীয়

২০২. কোরান; ১০; ৩৫; ৪৬, ৩০।
২০৩. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

www.amarboi.org

মনে করছি। ইনি অধিকাংশ সময় হারাবীর[২০৪] মকামাত নামীয় গ্রন্থের কিছু সংখ্যক পদ্যাংশ নিয়ে এ আলোচনার সূত্রপাত করতেন। তাতে যে বক্তব্য আছে, তা সার্বিক একত্ববাদের ধারণা জন্মাতো অথবা প্রায় অনুরূপ কিছুর কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করত। তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

সেই একের একত্ববাদকে কেউই বর্ণনা করতে পারে না;
কেননা যে কেউ তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে বলতে চায়, সে অস্বীকার করে।
তাঁর প্রশংসা করার জন্য যারা তাঁর একত্বের কথা বলে,
তারা প্রকৃতপক্ষে দ্বিত্বের কথাই বলে এবং একক সত্তা তা নস্যাৎ করেন।
তাঁর একত্ব! তা একমাত্র তাঁরই জ্ঞাত একত্ব;
যে ব্যক্তি প্রশংসাস্থানে তার উল্লেখ করে, সে পথভ্রষ্ট।

উস্তাদ আবু মাহ্‌দী এ বক্তব্যের অসুবিধার দিক উল্লেখ করে বলেছেন যে, হারাবী কর্তৃক যারা এই একের একত্বের কথা বলেছে, তারা অস্বীকারকারী এবং যারা তাঁর স্তুতি ও প্রশংসা করেছে, তারা পথভ্রষ্ট, এরূপ উক্তি মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা অনুরূপ পদ্যাংশকে কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে তাঁর লেখককে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী করেছে। বস্তুত মানুষ এ বক্তব্যকে খুবই শিথিলভাবে গ্রহণ করেছে। আমরা এ দলের মতামত অনুসারে বলতে পারি যে, তাদের কাছে একত্বের অর্থ অনাদিসত্তার যথার্থতা প্রতিপাদন করে সৃজ্যমানতার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা এবং সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব যে একটিমাত্র সত্তা ও একটিমাত্র আধার—এটাই প্রতিপন্ন করা। উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম আবু সাইদ আলজাজ্জার[২০৫] বলেছেন, সত্য যা প্রকাশ পেয়েছে ও যা গোপন রয়েছে, তা-ই। তাদের মত এই যে, অস্তিত্বের মধ্যে একাধিক্যের বিদ্যমানতা দ্বিত্ববাদকেই প্রকটিত করে তোলে। বস্তুত অনুভূতির উপস্থিতির জন্যই এমন একাধিক্যের ধারণা মায়া-মরীচিকা ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যাদির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এর জন্যই একমাত্র অনাদি সত্তা ছাড়া অন্য যা কিছু তাকে যদি যথাযথ অনুসরণ করা যায়, তা হলে নাস্তি বলেই প্রতীতি জন্মাবে। এটাই সেই বাণীর অর্থ, যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ছিলেন এবং তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুই ছিল না। বর্তমানেও তিনি তাই—অন্তত তাদের কাছে, যা তিনি ছিলেন। কবি লাবিদের যে বক্তব্যকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সত্য বলে স্বীকার করেছেন, তাও এমন। লাবিদ বলেছেন, 'সাবধান, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা'।[২০৬] তারা বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একত্ব ও স্তুতির কথা বলে, সে এমন একটি সৃজিত অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করছে, যা সে নিজে স্বয়ং; সে এমন একটি সৃজিত একত্বের কথা বলছে, যা তারই কর্ম এবং এমন একজন অনাদি সৃজকের বার্তা জানাচ্ছে, যিনি একমাত্র উপাস্য।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, একত্বের অর্থ সৃজ্যমানতার স্বরূপে অস্বীকৃতি। অথচ এ সৃজ্যমানতার স্বরূপ বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত; বরং একাধিক্যে পরিপূর্ণ সুতরাং একত্ববাদ

২০৪. হারাবী; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯৮ নং টীকা দ্র:।
২০৫. আল-খাররাজ (?); আহম্মদ ইবনে ইসা; মৃত্যু ২৮৬ (৮৯৯ খ্রি:) হি: (?)।
২০৬. বোখারী দ্র:। লাবিদ ইবনে রাবিয়া; মৃত্যু ৪১ (৬৬১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অস্বীকৃত এবং সে সম্পর্কিত দাবি মিথ্যা। যেমন একই গৃহে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি তার সঙ্গীকে বলে, এ গৃহে তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই! তখন তার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, হাঁ, একমাত্র তুমি অস্তিত্বহীন হলেই তা সত্য হতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ তাদের ঐ কথায় যে আল্লাহ্ সময় সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন, এ শব্দগুলো তাদের মূলের বিরোধিতা করছে। কেননা সময়ের সৃষ্টি অবশ্যই সময়ের পূর্বকালীন এবং এ সৃজনটি এমন একটি ক্রিয়া, যা অনুষ্ঠিত হবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। বস্তুত এরূপ ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারটি তাৎপর্যাদি বিশ্লেষণের অপারগতা এবং ভাষার পক্ষে তাদের যথার্থ সত্য প্রকাশ ও বর্ণনার অক্ষমতার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং যখন এটি স্থির হল যে, যথার্থ একত্ববাদী তিনিই, যিনি একক এবং তিনি ছাড়া সবই নাস্তি, তখনই একত্ব যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এটাই তাদের সেই বাণীর অর্থ, যেখানে তারা বলেছেন, আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই জানতে পারেন।'

অবশ্য যারা তাদের নিজ অস্তিত্বের চিহ্ন ও নির্দেশাদিসহ সত্যের একত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশ করে, তাদের কোন অসুবিধা নেই। কারণ বিষয়টি একান্তই সেই পর্যায়ের, যেখানে বলা হয়, 'পুণ্যবানদের পুণ্য নৈকট্যপ্রয়াসীদের জন্য পাপ।' কেননা এরূপ মত প্রকাশ বস্তুত বশ্যতা, আনুগত্য ও দ্বৈতচেতনার অনিবার্য ফলশ্রুতি। এদিক থেকে যে সম্মিলনস্থানে উন্নীত হয়, সে তার বিশেষ মর্যাদার জ্ঞানসহ ত্রুটির সম্মুখীন না হয়ে পারে না। কারণ এটি এমন এক বিভ্রান্তি, যা আনুগত্যের সাথে জড়িত রয়েছে। একমাত্র চাক্ষুষ দর্শনই তা দূর করতে পারে এবং সম্মিলনের স্বরূপগত উপলব্ধি নশ্বরতার অপবিত্রতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যারা সামগ্রিক একত্বের কথা বলেন, তারা সম্মিলনের এরূপ একটি ধারণার মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত রয়েছেন। যাহোক যে-কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য হল একের সাথে মিলন। কবির কবিতায় এ বিষয়টি সেই উন্নত অবস্থার উপলব্ধি, সতর্কতা ও উৎসাহের জন্যই প্রকাশিত হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমেই দ্বৈতভাবে দূরীভূত হয়ে, ধারণা নয়, স্বরূপের দিক থেকে সামগ্রিক একত্ব লাভ হয়ে থাকে। সেই কথা—যে মেনে নিয়েছে, সেই স্বস্তি লাভ করেছে—তার অর্থ ও অনুরূপ। এর তাৎপর্য যার কাছে দুরূহ হয়, সে যেন এ কথাটি বুঝে নেয়, যেখানে পরম সত্তা বলেছেন, "আমি তার শ্রুতি ও দৃষ্টি ছিলাম।'

পাঠক, এগুলোর অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে শব্দ নিয়ে কলহের কোন অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ের ঊর্ধ্বস্থিত চেতনান্তরে উপনীত হতে সক্ষম, কেবল তারই কাছে সমগ্র বিষয়টির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হতে পারে। অন্যথায় এ সম্পর্কে বলার বা সংবাদ দিবার কোন কিছু নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত আভাসদানই যথেষ্ট; কেননা এমন বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এর কথা এ সম্পর্কীয় আলোচনায় সর্বত্রই সুপরিচিত।

এখানে আবু মাহদী যিয়াতের বক্তব্য শেষ হল। আমি এটি উজির ইবনে খতিবের[২০৭] অধ্যাত্মপ্রেম সম্পর্কীয় রচনা 'আত্তারীফ বিল হুব্বেশ্ শরীফ' (মহান প্রেমের পরিচয়) নামক গ্রন্থ থেকে এটা বর্ণনা করেছি। আমি এটি আমাদের উস্তাদের কাছে

২০৭. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্; ৭১৩—৭৭৬ (১৩১৩—১৩৭৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বহুবার শুনেছি। অবশ্য আমি মনে করি উক্ত গ্রন্থে তা আরও বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কারণ উক্ত গ্রন্থের সাথে পরিচয় বহুদিন পূর্বের। আল্লাহ্ই শক্তিদাতা!

অতঃপর ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ও ফতোয়াদানকারী ধর্মজ্ঞানীরা এ উত্তরসূরি সুফীসাধকদের উপরোক্ত বক্তব্য এবং অনুরূপ বিষয়কে প্রতিবাদযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে এ পন্থায় তাদের জন্য যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা-ও ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ্গণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন। যথার্থ অবস্থা হল এই যে, তাঁদের অনুরূপ বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তাদের সমগ্র বক্তব্যকে চারটি আলোচ্য বিষয়ে সন্নিবেশিত করা যায়। প্রথমত, সাধনার বিভিন্ন পর্যায়, তার দ্বারা প্রাপ্ত আস্বাদ ও অনুভূতি এবং কার্যাবলির মধ্যদিয়ে আত্মাকে পরীক্ষা করার আলোচনা; যাতে এগুলোর মাধ্যমে সেই আস্বাদ লভ্য হয়ে ওঠে, যা একটি স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য স্থানে উত্তরণের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে—যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

দ্বিতীয়ত, দিব্যজ্ঞান এবং অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অনুভূতির যথার্থ তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা। যেমন ঐশ্বরিক গুণাবলি, আরশ, কুর্সী,[২০৮] ফেরেশতা, ওহী, নবুয়ত, আত্মা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্বপ্রকার অস্তিত্বের তাৎপর্য স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হতে আরম্ভ হবার পর যাবতীয় সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, বিচিত্র বিভূতির দ্বারা বিভিন্ন জগৎ ও সৃষ্টির মধ্যে প্রভাব বিস্তারের আলোচনা।

চতুর্থত, এমন কিছু বাহ্যিক দুর্বোধ্যতাযুক্ত শব্দ, যা ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং যাকে তারা তাদের পরিভাষায় 'ভাবোল্লাস' বলে অভিহিত করে থাকে। এগুলোর বাহ্য স্বরূপ বুঝে ওঠা খুবই দুঃসাধ্য। এজন্য এদের কতকাংশ অস্বীকৃত, কতকাংশ শোভন এবং অপর কতকাংশ একান্তই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

সাধনার বিভিন্ন পর্যায় ও স্থান, তা দিয়ে লব্ধ বিচিত্র আস্বাদ ও অনুভূতি এবং তাদের কার্যকারণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আত্মাকে পরীক্ষার মধ্যে ন্যাস্ত করা এমন কিছু বিষয়, যাতে কারও প্রতিবাদ করার কিছু নেই। এক্ষেত্রে তাদের আস্বাদও যথার্থভিত্তিক এবং এর যথাযথ প্রাপ্তিও সৌভাগ্যের নামান্তর মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিভূতি, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং সৃষ্টজগতে তাদের প্রভাব বিস্তারের স্বরূপও বিষয় হিসেবে যথার্থ ও স্বীকৃতির যোগ্য। যদিও বহু জ্ঞানী এগুলোকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তা ঠিক নয়। আশায়েরা সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারায়নী[২০৯] অলৌকিক ক্রিয়ার সাথে তাদের বিভ্রান্তিকর মিশ্রণের কারণস্বরূপ ঐসব বিভূতিকে অস্বীকার করার যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, তাও আহলে সুন্নতের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উত্থাপিত এ দুটির মধ্যে দাবিজনিত পার্থক্যের দরুন কার্যকরী হচ্ছে না। কারণ নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট অলৌকিক ক্রিয়া নবী আনীত বক্তব্যের সমর্থনে উত্থাপিত হয়ে থাকে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, মিথ্যা দাবির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান স্বাভাবিক নয়। কেননা সত্যের সাথে

২০৮. আরশ = সিংহাসনদ; কুর্সী = আসন।
২০৯. প্রথম অধ্যায়ের ১০৭ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

অলৌকিক সংশ্লিষ্ট হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য এবং তার অন্তর্নিহিত স্বরূপই হল সত্যতা। সুতরাং তা যদি কোন মিথ্যাবাদীর দাবি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে সত্যের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং কার্যত এটি অসম্ভব। তদুপরি উপরোক্ত বিচিত্র বিভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। সুতরাং এরূপ একটি বিষয়কে অস্বীকার করার মধ্যে কিছুটা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

সাহাবী ও পূর্বসূরি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও অনুরূপ বিভূতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এগুলো সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ।

আলোচ্য সম্প্রদায়ের দিব্যজ্ঞান, ঊর্ধ্বস্তরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং সৃষ্টির আবির্ভাবের পর্যায়বিন্যাস সম্পর্কীয় আলোচনায় অধিকাংশ বক্তব্যই একপ্রকার দ্ব্যর্থবোধক কেননা তা তাদের কাছে প্রজ্ঞাজাত। বস্তুত এ প্রজ্ঞা ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের আস্বাদ কখনই সম্পূর্ণ নয়। অথচ ভাষার এমন কোন শক্তি নেই, যা দিয়ে তাদের এ আস্বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায়। কারণ ভাষার প্রচলন এমন সুপরিচিত ভাবপ্রকাশের জন্য নির্ধারিত, যার অধিকাংশই অনুভূতিজাত। সুতরাং আমাদের উচিত তার এ সম্পর্কীয় আলোচনায় কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করা এবং অন্যান্য দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদিকে আমরা যে অবস্থায় পরিত্যাগ করেছি, এগুলোকেও অনুরূপভাবে পরিত্যাগ করা। বস্তুত যাঁরা ধর্মীয় বিধানের সাথে মিলিয়ে এসব বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করার আল্লাহ্‌দত্ত শক্তি অর্জন করেছেন, তাঁদের এ ক্ষমতাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করা উচিত।

তাঁদের সেই দুর্বোধ্য শব্দাবলি, যাকে 'ভাবোল্লাস' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে ধর্মীয় বিধানের অধিকারীরা সর্বদাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। পাঠক, জেনে রাখুন, এ সম্প্রদায়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার হল এই যে, তারা ইন্দ্রিয়ের অতীত অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। ভাবের আবেগ এমনভাবে তাঁদেরকে আবিষ্ট করে ফেলে যে, তারা যা বলতে চায় না, তাও বলে বসেন। বস্তুত বাহ্যেন্দ্রিয় বিরহিতদের কোন নির্দেশের অধীনে আনা যায় না এবং যারা কোন কার্য সম্পাদনে বাধ্যবাধকতার বশ, তারা সর্বদাই ক্ষমার যোগ্য।

সুতরাং তাঁদের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে, তার অনুরূপ বক্তব্য ও অন্যান্য কার্যকে সদিচ্ছা প্রণোদিত বলে মনে করতে হবে। কারণ তাদের প্রজ্ঞাজাত অনুভূতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন মাধ্যমের অভাবেই সম্ভব নয়। যেমন আবু ইয়াজিদ বস্তামী[২১০] ও অন্যান্য সাধকদের বেলায় দেখা গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি কারও শ্রেষ্ঠত্ব জানা না যায় এবং তার প্রসিদ্ধি লাভও না ঘটে, তাহলে অনুরূপ বক্তব্যাদির জন্য তার বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারবে। কারণ তার সম্পর্কে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যা দিয়ে আমরা তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে পারি। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কোন প্রকার দশার অধীন না হয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করবে, তাকেও বিচারের আওতায় আনতে হবে। এ কারণেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ ও নেতৃস্থানীয়

২১০. প্রসিদ্ধ অধ্যায়বিদ্; মৃত্যু ২৬০ (৮৬৪ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

সুফীসাধকরা হাল্লাজের[২১১] হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ ইনি কোনরূপ দশাগ্রস্ত না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

'রেসালা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বসূরি সুফীসাধকগণ উক্ত পন্থায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ছিলেন; যাদের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আভাস দিয়েছি। তাঁদের দিব্যজ্ঞানের প্রতি এবং অনুরূপ কোন অনুভূতি সম্পর্কে কোন প্রকার লালসা ছিল না। তাঁরা কেবলমাত্র যথাসাধ্য আনুগত্য ও অনুসরণের ইচ্ছাই পোষণ করতেন। তাদের কারও যদি অনুরূপ কোন বিষয় দেখা দিত, তাঁরা তা থেকে দূরে সরে যেতেন এবং কাউকেও জানাতেন না। বরং তাঁরা এগুলোকে বাধা ও পরীক্ষার বিষয় মনে করে যথাসম্ভব দূরে পলায়ন করতেন। কারণ এ জাতীয় উপলব্ধি আত্মারই বিচিত্র প্রসারের নিদর্শন এবং সেদিক থেকে এটা সৃষ্ট ও নশ্বর। অথচ সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিধি কোন সময়েই মানবিক উপলব্ধির দ্বারা সীমিত হতে পারে না। আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বব্যাপী এবং তার সৃষ্টি আরও বিশাল। তাঁর ধর্মীয় বিধান সুপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বেশি দৃঢ়; সুতরাং তাঁরা তাঁদের অনুভূত বিষয়াদির কোন কিছুই বলতে চাইতেন না। বরং এসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করাকে বিপজ্জনক মনে করতেন এবং তাঁদের সঙ্গীসাথীদেরকে অনুরূপ অনুসন্ধান ও অবগতির মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তাঁরা এ দিব্যজ্ঞান লাভের পূর্বে যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থায় আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে ছিলেন, তেমনি অবস্থাকে অপরিত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য সঙ্গীসাথীদেরকে নির্দেশ দিতেন। বস্তুত সাধকের অবস্থা এরূপই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ই যথার্থ জ্ঞানের শক্তি প্রদান করে থাকেন।

২১১. হুসাইন ইবনে মনসুর; ২৪৪—৩০৯ (৮৫৯—৯২২ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র]

এটিও ধর্মীয়শাস্ত্রাদির অন্তর্গত এবং সাধারণভাবে শাস্ত্রাদি শিল্পকর্মে পরিণত হলে এটিও আবির্ভূত হয়েছে ও মানুষ এ বিষয়াদি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে। অবশ্য স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারটি এ উত্তরসূরিদের ন্যায় পূর্বসূরিদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। হয়ত পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও এর প্রচলন ছিল; কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। তদুপরি ইসলামী জগতের স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাদের বক্তব্যই এ বিষয়ে যথেষ্ট ছিল। নয়তো স্বপ্নের ব্যাপার তো সমগ্র মানবজাতিরই সাধারণ বিষয়; সুতরাং এর ব্যাখ্যাও নিশ্চয়ই ছিল। কোরানে যেমন এসেছে, সত্যবাদী ইউসুফ নবী (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ হাদিস নবী (সঃ) ও আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বপ্ন অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধির মাধ্যম বিশেষ। হযরত (সঃ) বলেছেন, সুস্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আরও বলেছেন, সুসংবাদের মধ্যে একমাত্র সুস্বপ্নই অবশিষ্ট রয়েছে; সৎব্যক্তি তা দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা নবী (সঃ)-এর কাছে ওহী আসার সূত্রপাত হল, তা স্বপ্ন এবং তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তাই প্রভাতের আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হত। নবী (সঃ) ভোরের নামাজের শেষে তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, রাতে তোমাদের কেউ কি স্বপ্ন দেখেছ? তিনি সুসংবাদ লাভ করার জন্যই এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। কারণ এর মধ্যে ধর্মের প্রকাশ ও তার গৌরব বৃদ্ধির অবকাশ ছিল।

অদৃশ্য জগতের সংবাদ আহরণের মাধ্যম হিসেবে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ এই যে, হৃদয়ের মাংসল অবস্থান হতে সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে উত্থিত হার্দিক সজীবতা, যা শিরা-উপশিরায় রক্তের সাথে দেহে পরিব্যাপ্ত হয়, তার দ্বারাই জৈবিক শক্তি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে থাকে। সুতরাং তা যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের অত্যাধিক ব্যবহার ও বাহ্যিক শক্তির তৎপরতার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দেহের উপরিভাগকে রাত্রিকালীন শীতলতা আবৃত করে ফেলে, তখন এ হার্দিক সজীবতা দেহের সমস্ত সীমা থেকে সংকুচিত হয়ে হৃদয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। তা ঐ স্থানে তার কর্মতৎপরতা পুনরায় আরম্ভ করার জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে। তখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সব তৎপরতা রহিত হয়ে যায়। এটাই নিদ্রার অর্থ; যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে।

এ হার্দিক সজীবতাই হল মানুষের বিবেকবুদ্ধির বাহন এবং এ বিবেকবুদ্ধিই সম্ভাব্য সত্তাগত জগতের যাবতীয় বিষয়াদি উপলব্ধিকারী। কেননা তার যথার্থ স্বরূপ ও সত্তাই

www.amarboi.org

হল এ উপলব্ধি। সে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এ কারণেই উপলব্ধি করতে অপারগ হয়, যেহেতু দৈহিক শক্তি ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের পরিচালনার ব্যস্ততা তাকে বাধা দিয়ে থাকে। সুতরাং যখন সে এ প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে এককভাবে অবস্থান করে, তখন সে তার যথার্থ স্বরূপে সেই নিছক উপলব্ধির জগতে প্রত্যাবর্তন করে এবং সে উপলব্ধিযোগ্য সবকিছুই বুঝতে সক্ষম হয়। কাজেই তার এ তৎপরতা কতকাংশ রহিত হয়ে গেলে সে তার একাকিত্বের পরিমাণ অনুসারে আবশ্যিকভাবে সেই জগতে প্রত্যাবর্তনের একটি মুহূর্তে লাভ করে। সে এ নিদ্রার অবস্থায় থাকাকালে তার বাহ্যেন্দ্রিয়ের সমস্ত তৎপরতাই বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত এ তৎপরতাই সর্বাপেক্ষা বিরাট প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার অভাবে সে এ সময়ে সেই জগতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যোগ্য উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়। এভাবে সে যা কিছু সেই জগৎ থেকে জানতে পারে তা নিয়েই দেহের সীমায় ফিরে আসে।

কারণ যতক্ষণ সে দেহের মধ্যে আছে, ততক্ষণ দেহকে কেন্দ্র করে সে আবর্তিত হয় এবং দৈহিক উপলব্ধিগত মাধ্যম ছাড়া কোন প্রকার তৎপরতা চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ দৈহিক উপলব্ধিগত মাধ্যমগুলোর সমস্তই মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত এবং তাদের পরিচালিকা শক্তির নাম কল্পনা। তাই উপলুব্ধ দৃশ্যাদি থেকে কাল্পনিক দৃশ্যাদির উদ্ভব ঘটায় এবং প্রয়োজনের সময় যুক্তি-প্রমাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য এগুলোকে স্মরণশক্তির কাছে গচ্ছিত রাখে। অনুরূপভাবে জীবাত্মাও ঐসব দৃশ্য থেকে অন্যবিধ বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্মিক দৃশ্যাদির পৃথক উদ্ভব ঘটিয়ে ঐসব উপলুব্ধ দৃশ্যাদিকে একান্তভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে এবং তাদের মধ্যেও মাধ্যম হিসেবে সেই কল্পনাশক্তিই কাজ করে থাকে। অনুরূপভাবে জীবাত্মা যখন সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে যা জানার জেনে নেয়, তখন সে তাকে কল্পনাশক্তির কাছে অর্পণ করে এবং উক্ত শক্তি তাকে যোগ্য দৃশ্যাদিতে রূপান্তরিত করে। তারপর সে একে মিশ্র অনুভূতির কাছে প্রেরণ করে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি তাকে বাস্তব আকারে দেখতে সমর্থ হয়। এ পর্যায়ে সেই আত্মিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়টি একান্তই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে নেমে আসে। এখানেও এর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে কল্পনা। বস্তুত এটাই স্বপ্নের যথার্থ তাৎপর্য।

পাঠক, এ বর্ণনা থেকে আপনি সৎস্বপ্ন এবং অলীক অসৎ স্বপ্নের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারবেন। বস্তুত এর সবগুলোই নিদ্রাবস্থায় কাল্পনিক দৃশ্যাবলির সমষ্টি। যদি এ দৃশ্যাবলি আত্মিক বুদ্ধিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়ে নেমে আসে, তা হলেই যথার্থ স্বপ্ন অন্যথায় এগুলো যদি কল্পনার দ্বারা স্মৃতিশক্তির কাছে গচ্ছিত দৃশ্যাবলি থেকে গৃহীত হয়, যা জাগরণে সংগৃহীত হয়েছিল, তা হলে সেগুলোকে বলা হয় অলীক অসৎ স্বপ্ন।

পাঠক, জেনে রাখুন, সৎস্বপ্নের জন্য এমন কিছু বিদ্যমান, যা তার সত্যতার আভাস ও যথার্থতার সাক্ষ্য বহন করে। এর ফলে স্বপ্নদর্শী তার নিদ্রাকালে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে সুসংবাদ তার কাছে পাঠানো হয়েছে তা বুঝে ফেলতে সক্ষম হয়। তার মধ্যে স্বপ্নদর্শনকারী স্বপ্ন দেখার পরই খুব তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে; যেন অতিশীঘ্র জাগরণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে ফিরে আসে। কারণ এর পর যদি সে নিদ্রায় নিমজ্জিত

www.amarboi.org

থাকত, তা হলে তার উপর নিক্ষিপ্ত সেই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি একান্ত দুর্বহ হয়ে দাঁড়াত। এ কারণেই সে সেই অবস্থা থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন এক অবস্থায় ফিরে আসে, যাতে জীবাত্মা দেহ ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা নিমজ্জিত থাকে।

সৎস্বপ্নের চিহ্নের মধ্যে আরও একটি হল উপলব্ধির তার বিস্তারিত অবস্থাসহ স্মৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং উক্ত স্বপ্নের স্মৃতির স্থায়িত্ব লাভ করা; যাতে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা না দেয়। তা এমনভাবে স্মৃতিতে বিজড়িত থাকে, তার জন্য কোন চিন্তা ও রোমন্থনের প্রয়োজন হয় না; বরং জাগ্রত হবার সময় তার দৃশ্যাদি স্বপ্নদর্শকের অন্তরে ভাসতে থাকে। তা থেকে কোন কিছু বিলুপ্ত হয় না। কারণ এ আত্মিক উপলব্ধির জন্য কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং তার কোন বিন্যাসক্রমও নেই; বরং তা পলকের মধ্যে উপলব্ধির জগতে আবির্ভূত হয়। অথচ স্বপ্নের জন্য সময়ের প্রয়োজন। কারণ তার উৎসস্থল মস্তিষ্কশক্তি; সেখান থেকে স্মৃতিশক্তির মধ্যদিয়ে কল্পনাশক্তির দ্বারা মিশ্র অনুভূতির কাছে আনীত হয়; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

বস্তুত দেহের সব তৎপরতাই সময়সাপেক্ষ এবং এ কারণেই তাতে উপলব্ধির অগ্রপশ্চাতের দ্বারা বিন্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণেই মস্তিষ্কশক্তি তা সংগৃহীত করতে গিয়ে ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী আত্মার উপলব্ধি অনুরূপ নয়; কেননা তা সময়সাপেক্ষ নয় এবং তাতে বিন্যাসের কোন অবকাশ নেই। তাতে যেসব উপলব্ধি উদ্ভূত হয়, তা চোখের পলক অপেক্ষাও দ্রুততর সময়ে হয়ে থাকে। এজন্যই সৎস্বপ্ন শুধু জাগরণের পর নয়; বরং জীবনের বহুকালব্যাপী স্মৃতিতে জাগরণ থাকে। কোন প্রকার উদাসীনতাই ওটাকে চিন্তা থেকে দূর করতে সক্ষম হয় না। কারণ ওটার প্রথম উপলব্ধি ছিল খুবই সুদৃঢ়।

যদি এমন হয় যে, জাগরণের পর নিদ্রায় দৃষ্ট স্বপ্নকে চিন্তা করে ও তার প্রতি একান্ত আগ্রহী হয়ে স্মরণ করতে হয় এবং তার বিস্তারিত অনেক কিছু বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার জন্য কষ্ট করে স্মরণে আনতে হয়, তা হলে তা কখনই সৎস্বপ্ন নয়; বরং তাই-ই বিশৃঙ্খল অসৎ স্বপ্ন।

বস্তুত স্বপ্নের এসব নিদর্শন ওহীরই বৈশিষ্ট্য বিশেষ। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তুমি দ্রুততার জন্য তাতে তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না। অবশ্যই আমাদের উপর তা একত্র ও পাঠ করার দায়িত্ব। তারপর আমরা যখন তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠকে অনুসরণ কর। এর পর আমাদের উপরই তা বিশদ করার ভার।[২১২] তদুপরি নবুয়ত ও ওহীর সাথে স্বপ্নের সম্পর্ক বিদ্যমান; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে। হযরত (সঃ) বলেছেন, 'স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।' সুতরাং তার বৈশিষ্টগুলোও এ তুলনায় নবুয়তের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। সুতরাং পাঠক, একে অসম্ভব মনে করবেন না। এটাই সত্যের ধারা। আল্লাহ্ ইচ্ছামত অনেক কিছুই সৃষ্টি করে থাকেন।

ব্যাখ্যার বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে, জেনে রাখুন যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্মা যখন কোন বিষয়কে উপলব্ধি করে, তখন সে তাকে কল্পনাশক্তির কাছে প্রেরণ করে এবং সে তাকে

২১২. কোরান; ৭৫, ১৬—১৯।

www.amarboi.org

দৃশ্যে রূপান্তরিত করে দেয়। এ রূপান্তরণ এমন বিষয়াদির দ্বারা সংঘটিত হয়, যা কতকাংশে তারই সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। যেমন সে মহান সম্রাটের তাৎপর্য উপলব্ধি করল, এক্ষেত্রে কল্পনাশক্তি তাকে সমুদ্রের রূপে প্রকাশ করবে। অথবা যে শত্রুতার স্বরূপ উপলব্ধি করল; কল্পনা তাকে সাপের আকারে রূপ দিবে। ফলত জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নদ্রষ্টা অনুরূপ কিছুই বুঝতে পারে না; কারণ সে সমুদ্র বা সাপের আকৃতিই দেখেছে। এক্ষেত্রে স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী এ সমুদ্র যে এটি অনুভূত বিষয়মাত্র এবং যথার্থ উপলব্ধি এর অন্তরালে অবস্থান করছে, এর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তুলনার সাহায্যে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসেন। তিনি যথার্থ উপলব্ধিকে উদ্ধার করার জন্য আরও বহু চিহ্নের দ্বারা পরিচালিত হন এবং তারপর তুলনা করে বলেন যে, এটি সম্রাটেরই নামান্তর। কেননা সমুদ্র একটি বিরাট সৃষ্টি, তার সাথে সম্রাটের তুলনা করাই যোগ্য হয়। অনুরূপভাবে সাপও তার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির বিরাটত্বের দিক থেকে শত্রুর সাথে তুল্য হবার যোগ্য। এভাবে বাসন-পত্র নারীর সাথে তুলনীয়; কেননা তারা আধার বিশেষ। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

দৃষ্ট স্বপ্নাদির মধ্যে কতকগুলো এমন স্পষ্ট হয় যে, তার জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কেননা তার প্রকাশ্যতা, স্পষ্টতা কিংবা উপলব্ধি বিষয় ও তার সাথে তুলনীয় বিষয়ের মধ্যকার নৈকট্যের জন্য তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। এজন্য বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, স্বপ্ন তিন প্রকার; আল্লাহ্‌র কাছ থেকে স্বপ্ন, ফেরেশতার কাছ থেকে স্বপ্ন এবং শয়তানের কাছ থেকে স্বপ্ন। এক্ষেত্রে যে স্বপ্ন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দেখানো হয়, তার সুস্পষ্টতার জন্যই কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ফেরেশ্‌তার কাছ থেকে যে স্বপ্ন আসে, তাও সৎস্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারপর শয়তানের কাছ থেকে যে স্বপ্নের উদ্ভব হয়, তা একান্তই বিশৃঙ্খল বিষয়।

আরও জেনে রাখুন যে, আত্মা তার উপলব্ধিকে কল্পনাশক্তির কাছে পাঠালে সে তাকে অনুভূতির অভ্যস্ত দৃশ্যাদির কাঠামোতেই রূপ দিয়ে থাকে। সুতরাং স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভূতি যদি কোন প্রকার দৃশ্য-কাঠামোর সাথে পরিচিত না থাকে, তা হলে তা অনুরূপভাবে রূপায়িত হয় না। কাজেই যে ব্যক্তি অন্ধ ও মূক হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার স্বপ্ন দর্শনে সম্রাটকে সমুদ্র, শত্রুকে সাপ এবং নারীকে আধার হিসেবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। কেননা সে এসব বিষয়বস্তুর কোনটির উপলব্ধি করতে পারেনি। সুতরাং কল্পনাশক্তি তখন ঐগুলোকে তার উপলব্ধির অনুরূপ শ্রোতব্য ও ঘ্রাবত্য বিষয়াদির সাথে তুল্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রূপায়িত করে। এরূপ স্বপ্নাদিতে ব্যাখ্যাকারীকে সতর্ক হয়ে এগোতে হয়। কারণ অনেক সময় অনুরূপ বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা মিশ্রিত হয়ে ওঠে এবং তার নিয়মাবলি বিকৃতি লাভ করে।

পুনরায় এ স্বপ্নব্যাখ্যা এমন একটি শাস্ত্র যার জন্য কতকগুলো সর্বজনীন নিয়ম বিদ্যমান। ব্যাখ্যাকারী স্বপ্নের বিবরণের সাথে মিশিয়ে তার তাৎপর্য নিরূপণ করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয়। যেমন তারা বলেন, সমুদ্র সম্রাটকে বোঝায়। অন্যত্র তারা বলেন, সমুদ্র ক্রোধকে বোঝায়; অন্যত্র এরই অর্থ হয় দুশ্চিন্তা ও দুর্যোগ। যেমন তারা বলে থাকেন, সাপ শত্রুকে বোঝায়; অন্যত্র বলেন জীবন, আবার অন্যত্র

www.amarboi.org

গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী এসব সাধারণ নিয়মকানুন মুখস্থ করেন এবং স্বপ্নের সাথে এসব নিয়মের মধ্য থেকে যা যুক্তিযুক্ত হয় ও তার চিহ্নাদি অনুরূপ যৌক্তিকতার আভাস দেয়, তিনি তারই নির্দেশ অনুসরণ করে স্বপ্নের অর্থ বলেন। এসব আভাসের কিছুটা জাগরণে, কিছুটা স্বপ্নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাকারীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সুগম করে তোলে।

এ স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে পূর্বসূরিদের মধ্যে পরস্পরের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জ্ঞানী হলেন মুহম্মদ ইবনে সিরিন।[২১৩] তাঁর কাছ থেকে এ শাস্ত্রের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ তার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার ধারা রক্ষা করে চলেছে। তাঁর পরে কেরমানী[২১৪] এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারপর উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। বর্তমানকালে মাগরিববাসীদের মধ্যে কায়রোয়ানের জ্ঞানীদের অন্যতম ইবনে আবু তালেব কায়রোয়ানীর[২১৫] গ্রন্থাদি সুপ্রচলিত; যেমন 'আল-মুমাত্তি' ও অন্যান্য গ্রন্থ। এ বিষয়ে সালেমীর[২১৬] 'আল-ইশারাত' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উপকারী ও আধুনিক। অনুরূপভাবে তিউনিসে আমাদের উস্তাদদের অন্যতম ইবনে রাশেদের[২১৭] গ্রন্থ 'আল মারকাবাতুল উলিয়া' সুপরিচিত।

বস্তুত এটি নবুয়তের কিরণে উজ্জ্বল এক শাস্ত্র। কারণ এ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং এটি নবুয়তের উপলব্ধিগত ধারার অন্তর্ভুক্ত; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ই সর্বপ্রকার অদৃশ্য বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।[২১৮]

---

২১৩. মৃত্যু ১১০ (৭৭৯ খ্রি:) হি:।
২১৪. আবু ইসহাক ইব্রাহিম; (?)
২১৫. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।
২১৬. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উমর; (?)
২১৭. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।
২১৮. কোরান; ৯, ৭৮।

www.amarboi.org

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রাদি ও তাদের প্রকারভেদ]

বুদ্ধিগ্রাহ্য সব শাস্ত্রজ্ঞানই মানুষের স্বভাবজ; কেননা মানুষ চিন্তাশীল। তা কোন জাতি বিশেষের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সব জাতির মধ্যেই এসব বিষয়ে চিন্তা-চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তাদের সকলেই তার উপলব্ধি ও আলোচনার ক্ষেত্রে সমতার অধিকারী। বস্তুত সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এসব শাস্ত্রকে দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এগুলোর চারটি শাখা রয়েছে।

প্রথম যুক্তিবিদ্যা : এটা জ্ঞাত ও অর্জিত বিষয়াদি থেকে অজ্ঞাত বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে মননশক্তিকে ত্রুটিমুক্ত রাখে। চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সৃষ্টিজগতের বস্তুপুঞ্জ ও তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত যথার্থ স্বরূপের ইতি ও নেতিবাচক জ্ঞান লাভের জন্য যখন সাধ্যানুসারে তার চিন্তাকে ব্যবহার করেন, তখনই এ শাস্ত্রের মাধ্যমে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের দ্বারা এর উপকারিতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর একদিকে তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানের আকৃতি ও তা দিয়ে সৃষ্ট খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী; গ্রহ-নক্ষত্র ও তাদের স্বাভাবিক গতি এবং অন্যদিকে আত্মা ও তার সৃষ্ট বিচিত্র তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তায় ব্যাপৃত হন। এরূপ বিষয়াদির পর্যালোচনাকে পদার্থশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এটাই উক্ত ধারার দ্বিতীয় শাস্ত্র। এর পর তাঁদের অনুসন্ধান এ পদার্থ সম্পর্কীয় বিষয়াদির অতীত আত্মিক জগৎ নিয়ে নিয়োজিত হয় এবং একে অধ্যাত্মতত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাই উক্ত ধারার তৃতীয় শাস্ত্র। চতুর্থ শাস্ত্রটি হল পরিমাণ সম্পর্কে বিবেচনা করা। এতে চারটি শাখা বিদ্যমান। সাধারণভাবে এগুলোকে 'শিক্ষণীয় বিষয়' বলে নামাঙ্কিত করা হয়।

এদের প্রথমটি জ্যামিতিশাস্ত্র। এটি সাধারণভাবে পরিমাণের বিচার-বিবেচনাকে বোঝায়। এর মধ্যে কিছু পরিমাণ সংখ্যা হিসেবে অসংযুক্ত এবং কিছু পরিমাণ সংযুক্ত। আবার এ সংযুক্তটি হয় এক মাত্রাবিশিষ্টি, যেমন—রেখা; দুই মাত্রাবিশিষ্ট, যেমন—সমতল অথবা তিন মাত্রাবিশিষ্ট যেমন—শিক্ষণীয় দেহ। তাঁরা এসব পরিমাণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে তাদের সত্তাগত এবং পরস্পরের প্রতি তাদের সম্পর্কগত দিক থেকে বিবেচনা করে থাকেন।

এদের দ্বিতীয়টি গণিতশাস্ত্র। এতে অসংযুক্ত পরিমাণ অর্থাৎ সংখ্যার মধ্যকার বিচিত্র অবস্থা, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিবেচনা।

www.amarboi.org

এ ধারায় তৃতীয়টি হল সঙ্গীতশাস্ত্র। এটি শব্দাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুরের বিচিত্র অবস্থা এবং সেসবকে সংখ্যার দ্বারা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। এর ফলশ্রুতি হল সঙ্গীতের বিচিত্র সুরলহরী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা।

চতুর্থটি হল জ্যোতিষশাস্ত্র। এটি আকাশমণ্ডলের অবস্থান, তাদের আকৃতি এবং প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা। আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণযোগ্য তাদের বাস্তব গতির সাহায্যে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে, তাদের প্রত্যাবর্তন, স্থিরতা, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা।

এগুলোই দর্শনশাস্ত্রাদির মূল শাখা এবং এদের সংখ্যা সাত। এদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যাই সর্বপ্রথম; এর পর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। এদের সর্বপ্রথম গণিত, এর পর জ্যামিতি, এর পর জ্যোতিষশাস্ত্র, এর পর সঙ্গীত, এর পর পদার্থবিদ্যা এবং এর পর অধ্যাত্মতত্ত্ব। আবার এদের প্রতিটির জন্যই তার সংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। যেমন পদার্থবিদ্যার শাখা চিকিৎসাশাস্ত্র; গণিতের শাখা হিসাবশাস্ত্র, দায়ভাগ ও ব্যবহারিক গণিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখা হল জ্যোতিষীর ছকবিন্যাস; এতে গ্রহণ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতি নিরূপণ করার জন্য কতিপয় নিয়মের সহায়তা গ্রহণ করা হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় তাদের অবস্থান জানতে পারা যায়। এ গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কীয় বিদ্যার অন্য একটি শাখা হল নক্ষত্রপ্রভাবের জ্ঞান (জ্যোতিষী)। আমরা একের পর এক এদের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করব।

পাঠক, জেনে রাখুন, বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে যারা এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন এবং যাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তাদের মধ্যে প্রাক্-ইসলামী যুগের দুটি বৃহৎ জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। তারা হল পারসিক ও রোমান। আমরা যতদূর জেনেছি, তাদের মধ্যে জনবসতির প্রাচুর্যের জন্য উপরোক্ত শাস্ত্রাদির বাজার খুবই তেজী ছিল। তাদের শাসনব্যবস্থা, তাদের সাম্রাজ্য; বস্তুত প্রাক্-ইসলামী যুগে তাদেরই যুগ; এ কারণে তাদের অঞ্চল ও নগরসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র উথলে উঠেছিল। কেলাদীয়গণ ও তাদের পূর্ববর্তী আসিরীয়গণ এবং তাদের সমসাময়িক কিবতীগণ যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ ও এ সম্পর্কীয় ইন্দ্রজালাদির প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহী ছিল। তাদের কাছ থেকে পারস্য ও গ্রিসবাসীরা এটি গ্রহণ করেছে। তবুও কিবতীরাই এ বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে এর প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। কোরানে হারূত-মারূতের কাহিনী এবং যাদুকরদের বর্ণনা বিদ্যমান।[২১৯] জ্ঞানীরাও উচ্চমিশরের বহু মন্দিরের কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বিভিন্ন ধর্মমত একের পর এক এসব বিদ্যা পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধ করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে এসব শাস্ত্র এমনভাবে পরিত্যাক্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে যে, যেন কখনও তাদের অস্তিত্বই ছিল না। তবুও এসব শাস্ত্রের অনুসারীরা এর অনেক কিছুই বর্ণনা করে থাকে; অবশ্য এগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তদুপরি ধর্মীয় বিধানের তরবারী এখনও এগুলোর উপর উদ্যত এবং এগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানের বিরোধী।

২১৯. তুল কোরান; ২, ১০২ এবং ফেরাউনের যাদুকরী কাহিনী।

www.amarboi.org

পারস্যবাসীদের কাছে এসব বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রের বিরাট সম্ভার ও ব্যাপক পরিধি বিদ্যমান ছিল। কারণ তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তার ধারাবাহিকতা ছিল বিশাল ও সুদৃঢ়। এ কারণে বলা হয় যে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের কাছ থেকেই গ্রিকদের কাছে পৌঁছেছিল। আলেকজান্ডার দারাকে হত্যা করে কায়ানী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারকালে এ ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রিকরা তাদের গ্রন্থাবলি ও শাস্ত্রাদির উপরও আধিপত্য বিস্তার করে। অবশ্য মুসলমানরা পারস্য বিজয়কালে তাদের শাস্ত্রাদি সংবলিত গ্রন্থাদি ও পুস্তক-পুস্তিকার এমন এক বিরাট সঞ্চয় লাভ করেছিল, যা গণনার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সাদ ইবনে আদি-ওক্কাস এ গ্রন্থাবলি সম্পর্কে কী করণীয় এবং তা মুসলমানদের জন্য আনয়ন করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে অনুমতি প্রার্থনা করে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে পত্র লিখেছিলেন। হযরত উমর উত্তরে তাঁর কাছে লিখেছিলেন যে, ঐগুলোকে যেন পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। কারণ এগুলোতে যদি সৎপথ প্রদর্শনের কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ আমাদেরকে তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। অন্যথায় এগুলোতে যদি পথভ্রষ্টতার কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ই এগুলো থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এ নির্দেশ অনুসারে সৈন্যরা এসব গ্রন্থকে পানি অথবা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের কাছে পৌঁছবার পথে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রোমানদের মধ্যে প্রথম দিকে সাম্রাজ্যশক্তির অধিকারী গ্রিকগণ। তাদের মধ্যে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল। তাদের মধ্যকার দার্শনিক শিরোমণি ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে পরিব্রাজক অলিন্দবিহারীগণ[২২০] এসব বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম পথ আবিষ্কার করেছিলেন। জ্ঞানীদের ধারণামতে শীতাতপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাঁরা অলিন্দে বসে পাঠাভ্যাস করতেন। এসব বিষয়ে তাঁদের শিক্ষাদানের ধারা, জ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে, জ্ঞানী লোকমানের কাছ থেকে তাঁর শিষ্য পিপার সক্রেটিসের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিল।[২২১] এর পর তাঁর শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল, এরিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডার আফ্রোদিসিয়াস ও থেমিসিয়াস প্রমুখ জ্ঞানীদের মাধ্যমে তা আবর্তিত হয়েছে। এরিস্টটল গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। এ আলেকজান্ডারই পারস্যবাসীদের রাজ্য আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। বস্তুত এরিস্টটল গ্রিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি ও প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। এজন্য তাকে 'প্রথম শিক্ষক' বলা হয়। পৃথিবীব্যাপী তাঁর সুখ্যাতি বিদ্যমান।

---

২২০. মূলে আছে 'মাশ্শাউন' ও 'আহলু রোয়াক' সম্ভবত এক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'স্টয়িক ও সফিস্ট' দার্শনিকদের কথা বলতে চেয়েছেন।

২২১. এক্ষেত্রেও সম্ভবত ডায়োজেনিস ও সক্রেটিসের ঐতিহ্য সম্পর্কীয় একত্র করা হয়েছে। লোকমান সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি গ্রিক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি হযরত দাউদের সমসাময়িক এবং তাঁর শিষ্য হিসেবে এমপিডকলিসের নাম উল্লেখ করা হয়। কোরানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

www.amarboi.org

অতঃপর গ্রিকদের আধিপত্যের অবসান ঘটলে রোমান সম্রাটগণ ক্ষমতা হস্তগত করলেন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ধর্মমত ও ধর্মীয় বিধানের প্রেরণা অনুসারে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিত্যাক্ত বলে বিবেচিত হয় এবং এদের সঞ্চয় ও সংকলন গ্রন্থাকারে তাদের রাজকোষে সংরক্ষিত থাকে। এমনকি রোমানরা সিরিয়া অধিকার করার পরও এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি তাদের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

এর পর আল্লাহ্ ইসলামের আবির্ভাব ঘটালেন। মুসলমানরা চতুর্দিকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করল, যা তৎকালীন পরিবেশে তুলনারহিত। তারা রোমানদেরকে তাদের ক্ষমতাসহ অন্যান্য জাতির উপর তাদের আধিপত্যকে কুক্ষিগত করে নিল। মুসলমানদের প্রাথমিক বিকাশ একান্ত সারল্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে উদাসীনতার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। এর পর তাদের মধ্যে যখন শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের স্বরূপ সুদৃঢ় হয়ে উঠল, তখন তারা নানাদিক থেকে এমনভাবে নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটাল, যা অন্যান্য জাতির মধ্যে সহজলভ্য নয়। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের বৈচিত্র্য সম্পাদনে নিয়োজিত হল এবং তাদের অধীনস্থ প্রজা খ্রিস্টান বিশপ ও পাদ্রীদের কাছ থেকে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা শুনে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। সাধারণভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা আত্মবিকাশের যে ধারা অনুসরণ করে, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সম্রাট আবু জাফর আল-মনসুর রোমান সম্রাটের কাছে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ পাঠানোর জন্য পত্র লিখলেন। রোমান সম্রাট তাঁর কাছে ইউক্লিডের গ্রন্থ এবং পদার্থবিদ্যা সম্পর্কীয় অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমানরা তা পাঠ করল এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হল। এর ফলে তাদের মধ্যে এসম্পর্কীয় অন্যান্য গ্রন্থাদির সংবাদ জানার ও সংগ্রহ করার লোভে প্রবল হয়ে উঠল।

এর পর সম্রাট আল মামুনের আবির্ভাব ঘটল। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অতিমাত্রায অনুরক্তি ছিল। এর ফলে তাঁর মধ্যে এসব শাস্ত্রাদির সংগ্রহের লোভ জাগল। তিনি রোমান সম্রাটের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রিক ঐতিহ্য বের করে দেয়ার এবং তাকে আরবি লিপিতে ভাষান্তরিত করার অনুমতি চেয়ে দূত পাঠালেন। সম্রাট আল মামুন যথারীতি অনুবাদকও পাঠিয়েছিলেন। তারা এ সুযোগে সামগ্রিকভাবে গ্রিক ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে সংগ্রহ করেছিলেন।

অতঃপর মুসলিম চিন্তাবিদরা এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে তাঁদের বিচার-বিবেচনা একটা চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হল। অনেক বিষয়ে তারা প্রথম শিক্ষকের মতামতের বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর বিশেষ খ্যাতির জন্য তাঁকেই তাঁরা গ্রহণ-বর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাঁদের লক্ষ্যস্থানী বলে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁরা এসব বিষয়ে প্রচুর সংকলন তৈরি করলেন এবং পূর্বসূরিদের অনুরূপ প্রচেষ্টাকে তাঁরা আরও ব্যাপকতা দান করলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ছিলেন আবু নসর ফারাবী ও আবু আলী ইবনে সিনা এবং আন্দালুসে ছিলেন কাজী আবুল ওলিদ

www.amarboi.org

ইবনে রুশদ ও উজির আবুবকর ইবনে সায়েগ।[২২২] শেষোক্ত এ দুজন উল্লেখিত বিষয়াদিতে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। এভাবে উপরোক্ত সকলেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির মধ্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন।

তাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র উল্লেখিত শিক্ষণীয় বিষয়াদি (গণিতশাস্ত্র) সম্পর্কেই নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষ্ক, যাদু ও ইন্দ্রজাল ইত্যাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এসব বিষয়ে নিয়োজিতদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে জাবের ইবনে হাইয়ান এবং আন্দালুসে মাসলামা ইবনে আহমদ মাজারিতী ও তাঁর শিষ্যগণ প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

এসব বিষয়ে সাধনার ফলে জাতির ধর্মমত ও তার অনুসারীদের মধ্যে যা অনুপ্রবেশ করার করেছে। যারা এসব বিষয়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরকে তা কতকাংশে প্রলোভিতও করেছে। এক্ষেত্রে পাপ তাদের উপরই অর্সাবে, যারা তার অনুষ্ঠান করেছেন। যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন, তা হলে তারা তা করতে পারত না।'[২২৩]

অতঃপর মাগরিব ও আন্দালুসে জনবসতির প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল এবং শাস্ত্রাদির চর্চা তার পরিমাণ অনুসারে হ্রাস পেল, তখন স্বভাবতই এ অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। অবশ্য এসব সত্ত্বেও সেখানে, পাঠক, মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিদর্শন আপনি দেখতে পাবেন, যা আহলে সুন্নতের জ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অথচ পূর্বাঞ্চলবাসীদের যে সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাতে বোঝা যায় যে, সেখানে এখনও এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিশেষভাবে ইরাকে আজম এবং তার পরবর্তী মাওরায়ান্নাহার অঞ্চলে এদের প্রাচুর্য রয়েছে। বস্তুত তারা এখনও চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় ধারাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ায় অবস্থান করছেন। কারণ এখনও তাদের জনবসতি পরিপূর্ণ এবং এখনও তাদের নাগরিকত্ব দৃঢ়ভাবে স্থায়ী।

মিশরে আমি খোরাসানের হিরাতের অধিবাসী নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাদউদ্দিন তাফতাজানীর[২২৪] বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির উপর রচিত একাধিক গ্রন্থ দেখেছি। তার মধ্যে কালামশাস্ত্র, ফেকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতি ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি বিদ্যমান এবং এসব গ্রন্থ এ কথারই সাক্ষ্য যে, এসব বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য রয়েছে। তদুপরি এসব গ্রন্থ থেকেই বুঝতে পারি যে, উপরোক্ত গ্রন্থকার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে জ্ঞান ও আগ্রহ রাখেন এবং সব চিন্তামূলক শাস্ত্রাদিতেই তাঁর একটি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বিদ্যমান। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর সহায়তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন।[২২৫]

অনুরূপভাবে আমাদের কাছে এ সংবাদও পৌঁছেছে যে, ফিরিঙ্গীদের দেশে রোম ও তার নিকটবর্তী সমুদ্রের উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এসব দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয়

---

২২২. মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ৫৩৩ (১১৩৯ খ্রি:) হি:।

২২৩. কোরান; ৬, ১৩৭।

২২৪. মাসউদ ইবনে উমর; ৭২২—৭৯২ (১৩২২—১৩৯০ খ্রি:) হি:।

২২৫. কোরান; ৩, ১৩।

www.amarboi.org

বিষয়াদির বাজার অতিশয় তেজী। এদের নিদর্শনাবলি সেখানে নিত্য নবীন, এদের শিক্ষাদানের প্রণালী সংখ্যাহীন, এদের সংকলনাদি ব্যাপক, এদের ধারকের সংখ্যা পরিপূর্ণতাজ্ঞাপক এবং এদের অন্বেষণকারীর দল প্রতিনিয়ত বিস্তারমান হয়ে উঠছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, সেখানে কী ঘটছে। 'তিনিই যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা নির্বাচন করে থাকেন।'[২২৬]

২২৬. কোরান; ২৮, ৬৮।

www.amarboi.org

বিংশ পরিচ্ছেদ

[সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এদের প্রথম গণিতশাস্ত্র। এটি সংযুক্তির দিক থেকে সংখ্যাসমূহের বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা। এ সংযুক্তি পর্যায়ক্রমিকভাবে অথবা গুণিতক আকারে অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন সংখ্যাগুলো যখন এক সংখ্যার অতিরিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়, তখন তাদের দুটি দিকের যোগফল যে-কোনো সমদূরত্ববিশিষ্ট দুটি দিকের যোগফলের সমান হয়। যেমন মধ্যবর্তী সংখ্যার গুণিতক, যদি এসব সংখ্যার সংখ্যামান অযুগ্ম হয়; যেমন সংখ্যাসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস, যুগ্ম সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস এবং অযুগ্ম সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস। যেমন সংখ্যাগুলো যদি একটি বিশেষ সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়; যেমন এদের প্রথমটি দ্বিতীয়টির অর্ধেক, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির অর্ধেক এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত কিংবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত; তা হলে তাদের পর্যায়ক্রমের দুটি দিকের একে অপরের সাথে গুণফল সমদূরত্ববিশিষ্ট যে-কোনো দুটি সংখ্যার একে অপরের সাথে গুণফলের সমান হবে। যেমন মধ্যবর্তী সংখ্যার বর্গফল, যদি সংখ্যামান অযুগ্ম হয়; এটি যেমন পর্যায়ক্রমিকভাবে যুগ্ম সংখ্যার যুগ্মত্ব—দুইয়ের পরে চার, আট ও ষোল।

যেমন সংখ্যাগত ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ ও ষড়ভুজ গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যা-বৈশিষ্ট্যের যে নতুনত্ব দেখা দেয়; যখন এগুলোকে পর্যায়ক্রমে রেখায় বিন্যস্ত করে এক থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত যোগ করা হয়; তখন এর ফলে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ত্রিভুজগুলো অনুরূপভাবে বিভিন্ন বাহুর নিম্নে রেখায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়; এর ফলে প্রতিটি ত্রিভুজ তার সম্মুখবর্তী বাহুর এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা বর্ধিত হয়ে চতুর্ভুজে পরিণত হয়। এভাবে প্রতিটি চতুর্ভুজ তার সম্মুখবর্তী বাহুর দ্বারা বর্ধিত হয়ে পঞ্চভুজ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে শেষ পর্যন্ত।

বাহুগুলোর পর্যায়ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে এমন একটি ছকের সৃষ্টি করে, যা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রেখাবিশিষ্ট। তার প্রস্থে সংখ্যাগুলো পর্যায়ক্রমে থাকে। তারপর ত্রিভুজগুলো, চতুর্ভুজগুলো, পঞ্চভুজগুলো এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়। দৈর্ঘ্যে প্রতিটি সংখ্যা ও তার নকশা যতদূর সম্ভব হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এদের যোগফল ও পরস্পরের ভাগফল দ্বারা অভিনব বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব ঘটে। এগুলো অনুশীলনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এবং শাস্ত্রবিদ্‌দের সংকলনসমূহে এসব সমস্যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে যুগ্ম, অযুগ্ম, যুগ্মের যুগ্ম, অযুগ্মের যুগ্ম, যুগ্ম ও অযুগ্মের যুগ্ম সংখ্যাগুলোতে নতুনত্ব সংঘটিত হয়। বস্তুত এদের প্রতিটির জন্যই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা একমাত্র এ শাস্ত্রেই পাওয়া যায়; অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে এ শাস্ত্র প্রথম এর সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ এবং গণিতের প্রমাণ হিসেবে গৃহীত পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি দার্শনিকদের জন্য এ বিষয়ে রচনা বিদ্যমান। অবশ্য অধিকাংশই একে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করেন; গ্রন্থ রচনার দ্বারা একে পৃথক করতে চান না। পূর্বসূরিদের মধ্যে ইবনে সিনা তাঁর 'শেফা' ও 'নাজাত' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উত্তরসূরিদের কাছে এটি পরিত্যাক্ত; কারণ প্রচলনের অভাব। তার উপকারিতা যেহেতু প্রমাণ উপস্থাপনের সীমাবদ্ধ—গণিতে নয়, এজন্য তারা এটি পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এর পূর্বে তারা গাণিতিক প্রমাণাদিতে এর সার-সংকলন করে রেখেছেন। যেমন ইবনে বান্না[২২৭] তাঁর 'রফয়েল হেজাব' গ্রন্থে ও অন্যত্র করেছেন। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং সর্বজ্ঞ।

হিসাবশাস্ত্র

সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির একটি শাখা হিসাবশাস্ত্র। এটি সংযুক্তি ও বিযুক্তির মাধ্যমে সংখ্যাসমূহের দ্বারা হিসাবের একটি ব্যবহারিক শিল্প। সংখ্যাসমূহের মধ্যে সংখ্যামানের সংযুক্তিকরণকে বলা হয় 'যোগ', কখনও এ সংযুক্তিকরণ গুণিতকের মাধ্যমে হয়; যেমন সংখ্যার একাদিক্রমে অন্য সংখ্যার সাথে গুণিতকে বর্ধিত হয়; একে বলা হয় 'গুণ'। সংখ্যাসমূহের মধ্যে বিযুক্তিকরণও বিদ্যমান। এটি যদি একক মান অনুসারে হয়; যেমন কোনো সংখ্যা হতে অন্য একটি সংখ্যা পৃথক করা এবং অবশিষ্ট সংখ্যার জ্ঞান লাভ করা; তা হলে তাকে বলা হয় 'বিয়োগ'। অথবা কোন সংখ্যাকে বিভাজনের দ্বারা সম অংশে বিভক্তি করা ও তার সংখ্যামানকে ফল হিসেবে লাভ করা; একে বলা হয় 'ভাগ'।

এ সংযুক্তি ও বিযুক্তি সমস্ত সংখ্যা অথবা ভগ্নাংশে সমভাবে প্রযোজ্য। ভগ্নাংশ বলতে একটি সংখ্যার অন্য সংখ্যার সাথে সম্বন্ধকে বোঝায় এবং এ সম্বন্ধকেই ভগ্নাংশ বলা হয়। অনুরূপভাবে সংযুক্তি ও বিযুক্তি বর্গফল লাভ হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় যে সংখ্যাটি বিষদ হয়, তাকে বলা হয় 'মূলদ' এবং তার বর্গ ও অনুরূপ; এর ফলে তার জন্য অঙ্ক করার প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। এভাবে যে সংখ্যাটি বিষদ হয় না, তাকে বলা হয় 'করণী' এবং তার বর্গটি হয় মূলদ হয়, যেমন তিনের বর্গমূলের বর্গ হল তিন; নয়ত করণী হয়, যেমন তিনের বর্গমূলের বর্গ হল তিনের বর্গমূল। এটি করণী এবং এর জন্য অঙ্ক করার প্রয়োজন হয়। এসব বর্গমূলেও সংযুক্তি ও বিযুক্তি দেখা দিয়ে থাকে।

অঙ্ক করার এ শিল্পটি নবাগত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিসাবাদির জন্য এর প্রয়োজন হয়। মানুষ এ বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেছে এবং নগরগুলোতে বিদ্যার্থীদেরকে এভাবে শিক্ষাদানের প্রথা প্রচলন করেছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি দ্বারা আরম্ভ করা উত্তম। কারণ এ বিষয়টি সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট এবং এর প্রমাণগুলো সুবিন্যাস্ত। সাধারণভাবে এটি দ্বারা দীপ্ত বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনিষ্ঠার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এজন্য বলা হয়

২২৭. প্রথম অধ্যায়ের ১৩৪ নং টীকা দ্র.।

www.amarboi.org

যে, যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে অঙ্ক শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জন আরম্ভ করে, তার উপর সত্যনিষ্ঠার প্রভাব বিস্তৃত হয়। কেননা হিসাবশাস্ত্র শুদ্ধভিত্তি ও আত্মপরিক্ষার দ্বারা সুসজ্জিত। এর ফলে তা তার চরিত্রের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায় এবং সে এ সততার দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে তাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

বর্তমানকালে মাগরিবে এ বিষয়ের উপর রচিত সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিশদ গ্রন্থ হল 'আল হিসারুস্ সগীর'।[২২৮] এ বিষয়ে ইবনে বান্না আল মারাকেষীর ব্যবহারিক নিয়মাবলির সংক্ষিপ্তসার পুস্তকটি খুবই উপকারী। তারপর তিনি এ পুস্তকের 'রফ্য়েল হিজাব' নামে যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন, তা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই কঠিন। কেননা তাতে দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণাদি বিদ্যমান। অবশ্যই গ্রন্থটি উন্নতমানের এবং আমাদের উস্তাদদেরকে তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখেছি। বস্তুত তা এ শ্রদ্ধার যোগ্য। এ গ্রন্থে লেখক ইবনে বান্না, আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন, ইবনে মুনয়েমের[২২৯] 'ফেকহুল হিসাব' ও আল আহদাবের[২৩০] 'কামেল' নামক দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি উক্ত দুটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার বর্ণনা করে তাদের বর্ণ সংকেতের পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং সেজন্য বুদ্ধিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত করেছেন। এটাই বর্ণ সংকেতের রহস্য ও তার সার-সংক্ষেপ। ফলে এর সবগুলোই দুরূহ। এগুলো প্রমাণ হিসেবে আসার জন্যই এ দুরূহতা জন্মেছে। বস্তুত সব শিক্ষণীয় বিষয়ের ধরনই এই। কেননা তাদের সমস্যা, ব্যবহারিক প্রয়োগ সবই সুস্পষ্ট। যখন তাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তখন এ ব্যবহারিক দিকগুলোরই কার্যকারণ উপস্থিত করতে হয়। এর ফলেই কিছুটা দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়; যা সমস্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে নেই। পাঠক, এটাকে বুঝে নিন। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর আলোর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই সক্ষম ও সুদৃঢ়।[২৩১]

বীজগণিত[২৩২]

গণিতশাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল বীজগণিত। এটি এমন এক শিল্পকর্ম, যা দিয়ে জ্ঞাত উপাত্ত থেকে অজ্ঞাত সংখ্যা বের করা হয়; যদি তাদের মধ্যকার সম্বন্ধের মধ্যে অনুরূপ কিছুর চাহিদা থাকে। এ শাস্ত্রবিদরা এর জন্য পরিভাষা সৃষ্টি করে গুণনের দ্বারা গুণিতকের পন্থায় অজ্ঞাত বিষয়াদির জন্য পর্যায়ক্রম নির্দিষ্ট করেছেন। এর প্রথমটি হল 'সংখ্যা'; কেননা তার দ্বারা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য, তার প্রতি আরোপিত অজ্ঞাত সম্বন্ধের প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এর দ্বিতীয়টি 'বস্তু'; কেননা প্রতিটি অজ্ঞাত বিষয় তার বিমূর্ত অবস্থার দিক থেকে বস্তুবিশেষ। এর সঙ্গে তা বর্গমূলও; কেননা দ্বিতীয় পর্যায়ে তার গুণনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এর তৃতীয়টি হল 'সম্পদ' এবং তা একটি বিমূর্ত বিষয়।

---

২২৮. আল হাসসারের 'সগীর' নামক পুস্তক (.); মুহম্মদ ইবনে আইয়াশ।

২২৯. মুহম্মদ ইবনে ইসা ইবনে আবদুল মোনেম; সিসিলির ২য় রোজাবেব দাবারে প্রতিপালিত।

২৩০. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

২৩১. কোরান; ২৪, ৩৫

২৩২. মূল : এলমুজ জবরে ওল মোকাবেলা।

www.amarboi.org

এর পরবর্তী তৎপরতা গুণনীয়ের অন্তর্গত মূল অনুসারে দেখা দেয়। এর পর উপান্ত সম্পর্কীয় কার্যধারা সমস্যার মধ্যে আবর্তিত হয় এবং এতে দুটি অথবা বেশি সংখ্যক অনুরূপ বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সমীকরণে অগ্রসর হয়। ফলে এদের কতকাংশ অপর কতকাংশের মুখোমুখি হয় এবং এদের অন্তর্গত ভগ্নাংশকে পূরণ করে রাশিটিকে সমস্ত করে তোলে। সমীকরণের এ পর্যায়ক্রম যতদূর সম্ভব স্বল্প মৌখিক বিন্যাসে সীমিত রাখার প্রয়াসে তাঁদের কাছে গৃহীত বীজগণিতের নির্ভর সেই ত্রয়ীতে পর্যবসিত হয়; এরা হল সংখ্যা, বস্তু ও সম্পদ।

যখন সমীকরণ একক ও এককের মধ্যে হয়, তখন তা নির্দিষ্ট থাকে এবং 'সম্পদ' ও বর্গমূলের বিমূর্ত অবস্থা দূরীভূত হয়ে তা নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। 'সম্পদ' যখন সমীকৃত হয়, তখন তার সংখ্যামান দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সমীকরণ যদি এক ও দুয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে জ্যামিতিক প্রক্রিয়া তাকে বিশ্লেষাত্মক গুণনের দ্বারা দুয়ের মধ্যে প্রকাশ করে এবং তা বিমূর্ত হয়ে থাকে। এ বিশ্লেষণাত্মক গুণন তাকে নির্দিষ্ট করে। দুই ও দুয়ের মধ্যে সমীকরণ সম্ভব নয়। বীজগণিতজ্ঞদের কাছে সমীকরণ সম্পর্কীয় সমস্যাদির সর্বাধিক সংখ্যা হল ছয়। কারণ সংখ্যা, বর্গমূল ও সম্পদের মধ্যকার অমিশ্র ও মিশ্র সমীকরণের সংখ্যা ছয় হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারীর নাম আবু আবদুল্লাহ্ আলখোয়ারজমী[২৩৩] ও তাঁর পরবর্তীকালে আবু কামেল মুজা ইবনে আসলাম।[২৩৪] মানুষ এ বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। বীজগণিতের ছয়টি সমস্যা নিয়ে লিখিত তাঁর গ্রন্থটি এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আন্দালুসবাসীরা এর প্রচুর ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করেছে এবং এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এসব ব্যাখ্যা-পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হল আল কোরাশীর রচনা।[২৩৫]

আমরা জানতে পেরেছি যে, বিষয়সমূহের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা পূর্বাঞ্চলে সমীকরণকে এ ছয়টি বিষয় অপেক্ষা বেশি প্রসারিত করেছেন এবং তার সংখ্যাকে তাঁরা বিশের বেশি করে তুলেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের জন্যই জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য সমাধান বের করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা পরিবর্ধিত করেন এবং তিনি মহান ও পবিত্র।[২৩৬]

ব্যবহারিক গণিত ও দায়ভাগ

গণিতশাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল ব্যবহারিক গণিত। এটি নাগরিক জীবনে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে, হিসাব সম্পর্কীয় তৎপরতায় ব্যবহৃত হয়; যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ভূমি জরিপ, জাকাত এবং এমন অন্যান্য বিষয় যাতে সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে হিসাবের দুটি দিকই অজ্ঞাত ও জ্ঞাত, ভগ্নাংশ ও সমস্ত, বর্গমূল ও অন্যান্য

২৩৩. মুহম্মদ ইবনে মূসা; জীবনকাল খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।
২৩৪. খুব সম্ভব নবম শতাব্দী (খ্রি:)।
২৩৫. বগি অঞ্চলের আবুল কাসেম আল কোরাশী।
২৩৬. কোরান; ৩৫, ১।

www.amarboi.org

রাশির মাধ্যমে কার্যকরী হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমস্যাদির বর্ণনায় আতিশয্যের উদ্দেশ্য হল, যাতে এগুলো বারবার অনুসরণ করার মাধ্যমে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটে এবং হিসাবের কাজে একটি স্থায়ী যোগ্যতা লাভ হয়। আন্দালুসের হিসাবশাস্ত্রবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর রচনা বিদ্যমান; তার মধ্যে জাহরাবী[২৩৭] ইবনে সামাহ,[২৩৮] আবু মসলিম ইবনে খলদুন[২৩৯] এবং অন্য অনেকের ব্যবহারিক গণিত সুপ্রসিদ্ধ। উল্লেখিত সকলেই মাসলামা মাজরিতীর শিষ্য।

এর অন্য একটি শাখা দায়ভাগ। এটি উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশাদি হিসাব করার শিল্পকর্ম বিশেষ। কেননা অনেক সময় একাধিক উত্তরাধিকার লাভের প্রসঙ্গ দেখা দেয়; তেমনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর ফলে এ উত্তরাধিকার পুনরায় সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অথবা একাধিক ব্যক্তির জন্য অনুরূপভাবে প্রাপ্য অংশের একত্র ও একাধিক হওয়ায় তাদের সমগ্র প্রাপ্যের পরিমাণ সমগ্র সম্পত্তি অপেক্ষা বেশি[২৪০] হয়। কিংবা কোন উত্তরাধিকারে কারও প্রতি বিশেষ অঙ্গীকার অথবা অস্বীকৃতি হিসাবের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তোলে। ফলে অনুরূপ সব সমস্যায় উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট সংখ্যামানের দ্বারা তাকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে হয়; যাতে প্রতিটি উৎস থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ অনুসারে সম্পদ লাভ করতে পারে।

এর ফলে হিসাবশাস্ত্রের একটি বিরাট অংশ এতে ব্যবহৃত হয়; সেই সমস্ত ভগ্নাংশ, বর্গমূল, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রাশির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ধর্মীয় বিধান ও সে-সম্পর্কীয় সমস্যাদির ভিত্তিতে এ হিসাবাদিকে বিন্যস্ত করা হয়। এর ফলে এ হিসাবশাস্ত্র তখন কতকাংশে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়; কেননা এগুলো তখন নির্দিষ্ট প্রাপ্য, প্রাপ্য বিশেষের হ্রাস, অঙ্গীকার, অস্বীকৃতি, হেবা, দাসত্ব মোচন সম্পর্কীয় হেবা[২৪১] প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় নির্দেশরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধান অনুসারে ন্যায্য প্রাপ্য সংশোধন করে নিশ্চিত করার জন্য হিসাবশাস্ত্রের একটা অংশও এতে ব্যবহার করা হয়।

বস্তুত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। অনেক সময় এ শাস্ত্রবিদরা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে নবীর একাধিক হাদীসের উল্লেখ করেন; যেমন তা সমগ্র জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ; তা-ই সেই শাস্ত্র, যা সর্বপ্রথম নিশ্চিহ্ন হবে এমন অন্যান্য বক্তব্য। আমার মত এই যে, এসব হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত 'ফরায়েজ' শব্দটি তা মূল অর্থ অবশ্যকর্তব্য এর দিক হতেই সর্বত্র প্রযোজ্য; উত্তরাধিকারের প্রাপ্যাদি অর্থে নয়। কেননা, শেষোক্ত

২৩৭. আলী ইবনে সুলায়মান (?)।

২৩৮. আসবাগ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৪২৬ (১০৩৫ খ্রি:) হি:।

২৩৯. আমর ইবনে আহম্মদ; মৃত্যু ৪৪৯ (১০৫৯ খ্রি:) হি:।

২৪০. যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও পিতা-মাতা রেখে মারা যায়, তাহলে দুই মেয়ে পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। পিতা-মাতা এক-তৃতীয়াংশ এবং স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ। এতে প্রাপ্য অংশাদি সমগ্র সম্পত্তির বেশি হয়। এমতাবস্থায় সকলের প্রাপ্যাদি হ্রাস করে হিসাব সম্পূর্ণ করতে হবে।

২৪১. যদি কোন ক্রীতদাসকে নির্দিষ্ট বিনিময় বা সময় অন্তর মুক্তির অঙ্গীকারপত্র দেয়া হয়।

www.amarboi.org

অর্থে ব্যবহৃত হলে এর পরিমাণ সামগ্রিক জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অনেক কম। অথচ 'অবশ্যকর্তব্যে'র পরিমাণ এটি অপেক্ষা অনেক বেশি।

এ বিষয় নিয়ে পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতাদর্শ অনুসারে যারা এ দায়ভাগ নিয়ে পুস্তকাদি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনা হল ইবনে সাবেতের পুস্তক, কাজী আবুল কাসেম হওফীর 'মুখতাসর' এবং ইবনে মুনাম্মার, জাদী[২৪২] ও সওদী এবং অন্যান্যদের পুস্তকাবলি। কিন্তু এক্ষেত্রে হওফীরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর গ্রন্থটি সর্বোচ্চ স্থান পাবার যোগ্য। ফেজের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে আমাদের শিক্ষক আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান উক্ত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাপুস্তক রচনা করেছেন। শাফেয়ী মতাদর্শ অনুযায়ী ইমাম হরমাইন উক্ত বিষয়ে গ্রন্থ বচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর শাস্ত্রাদি সম্পর্কীয় দক্ষতা এবং গভীরতার পরিচয় বিদ্যমান। এ বিষয়ে হানাফী ও হাম্বলীদেরও রচনা রয়েছে। বস্তুত শাস্ত্রাদির ব্যাপারে মানুষের স্থান বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

২৪২. অন্যান্যদের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০৬—১০৯ নং টীকা দ্র. এবং সওদী আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে ইয়াহিয়া; জন্ম ৬৪৩ (১২৪৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যামিতি বিষয়ক শাস্ত্রাদি]

এ শাস্ত্রটি পরিমাণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে। উক্ত পরিমাণ কখনও সংযুক্ত হয়; যেমন রেখা, সমতল ও ঘনবস্তু এবং কখনও বিযুক্ত হয়, যেমন—সত্তাগত ক্রিয়াশীল উপাদানসহ সংখ্যাসমূহ। যথা, যে-কোন ত্রিভুজের একটি কোণ অন্য দুটি সমকোণের সমান। যথা, দুটি সমান্তরাল রেখা অন্তহীনভাবে একই দিকে বিস্তৃত হলেও পরস্পর মিলিত হয় না। যথা, দুটি রেখা পরস্পরকে কর্তন করার ফলে উৎপন্ন দুটি বিপরীত কোণ একে অপরের সমান। যথা, চারটি সমপরিমাণের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির গুণফল দ্বিতীয় ও চতুর্থটির গুণফলের সমান। এমন অন্যান্য বিষয়।

এ বিষয়ে গ্রিকদের যে গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে এসেছে, তা হল ইউক্লিডের গ্রন্থ; তাকে 'মূলনীতি ও ভিত্তি'র গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় তাতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সম্রাট আবু জাফর আল মনসুরের সময় গ্রিক গ্রন্থাদি অনূদিত হয়। অনুবাদকের আধিক্যের ফলে উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদ বিদ্যমান। তার মধ্যে হুনাইন ইবনে ইসহাক,[২৪৩] সাবেত ইবনে কুর[২৪৪] ও ইউসুফ ইবনে আল-হাজ্জাজের[২৪৫] গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থটিতে পনেরটি আলোচনা রয়েছে। তার মধ্যে চারটি সমতল সম্পর্কীয়; একটি সমপরিমাণ সম্পর্কীয়; একটি এক সমতলের অন্য সমতলের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কীয়; তিনটি সংখ্যা সম্পর্কীয় এবং দশমটি মূলদ ও সে সম্পর্কীয় শক্তি নিয়ে বিবৃত হয়েছে; এর অর্থই বর্গমূল। অবশিষ্ট পাঁচটি ঘনবস্তুর আলোচনায় নিয়োজিত।

মানুষ এ গ্রন্থটির বহু সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেছে। যেমন ইবনে সিনা তাঁর 'শেফা' নামক গ্রন্থের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে করেছেন। তিনি তার একটি অংশকে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে আবু সেল্‌ত[২৪৬] তাঁর 'এক্তেসার' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র করেছেন। অন্য অনেকে এ গ্রন্থের প্রচুর ব্যাখ্যাপুস্তকও রচনা করেছেন। বস্তুত এ গ্রন্থটি সাধারণভাবে এ জ্যামিতিশাস্ত্র জ্ঞানের উৎস।

---

২৪৩. মৃত্যু ২৬০ (৮৭৩ খ্রি:) হি: (?)।
২৪৪. মৃত্যু ২৮৮ (৯০১ খ্রি:) হি:)।
২৪৫. সম্ভবত প্রসিদ্ধ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনে মতর (?)।
২৪৬. ইনি সম্ভবত আবুস্ সেল্‌ত উমাইয়া ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবুস্ সল্‌ত; মৃত্যু ৪৬০ (১০৬৮ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

পাঠক, জেনে রাখুন, জ্যামিতি তার অধিকারীকে বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার সৌকর্য প্রদান করে। কেননা তার সমগ্র যুক্তি-প্রমাণই সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সুসজ্জিত; এ বিন্যাস ও শৃঙ্খলার জন্য তার অনুমানসমূহের মধ্যে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ খুব সহজসাধ্য নয়। এর ফলে উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলনের চিন্তাশক্তি ভ্রান্তি হতে দূরে সরে আসে এবং উক্ত শাস্ত্রাধিকারীর জন্য এমন বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের এক স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তার জন্ম দেয়। জ্ঞানীরা মনে করেন, প্লেটোর গৃহের দ্বারদেশে লিখিত ছিল যে, 'যিনি জ্যামিতিবিদ নন, তিনি যেন আমাদের এ গৃহে প্রবেশ না করেন।' আমাদের উস্তাদগণ, আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি দিন, বলতেন, মননশক্তির জন্য জ্যামিতি কাপড়ের জন্য সাবান তুল্য; তা দ্বারা ধৌত করলে ময়লা দূরীভূত হয় এবং পরিচ্ছদকে তৈলসিক্ততা ও মালিন্য থেকে পরিষ্কার করে। এর এমন বৈশিষ্ট্য আমাদের সেই পূর্বকথিত বিন্যাস ও শৃঙ্খলারই ফল।

এই জ্যামিতিরই অন্য একটি শাখা হল ভূগোলকের বিভিন্ন আকৃতি ও শাঙ্কব বিভাগ। ভূগোলকের আকৃতি সম্পর্কে গ্রিকদের রচিত দুটি গ্রন্থ বিদ্যমান। এর একটি থিউডোসিয়াস ও অন্যটি মিনালেয়াসের রচনা। থিউডোসিয়াসের গ্রন্থটি অধিকাংশ যুক্তি-প্রমাণের ব্যবহারিক দিক থেকে মিনালেয়াসের গ্রন্থটির পূর্ববর্তী। যে ব্যক্তি জ্যোতিষচর্চা করতে ইচ্ছুক, তার জন্য এ দুটি গ্রন্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এ-সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণ উক্ত দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। কেননা জ্যোতিষের সব আলোচনাই ভূগোলক সম্পর্কীয় এবং গতির ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বিভাগ ও চক্র, যা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন পরে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এ কারণে তাদের বিভিন্ন সমতল ও বিভাগের জ্ঞান ভূগোলকের অনুরূপ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

শাঙ্কব বিভাগগুলোও জ্যামিতির শাখা বিশেষ। এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা শঙ্কুসদৃশ আকৃতিগুলোর গঠন ও কর্তন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর জ্যামিতিক প্রমাণ উপস্থিত করে। এসব প্রমাণ প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এর উপকারিতা হল, আকৃতি বিশিষ্ট ব্যবহারিক শিল্পকর্মে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা। যেমন—কাষ্ঠশিল্প ও স্থাপত্য; অদ্ভুত আকৃতি ও বিরল স্থাপত্য নিদর্শনের প্রক্রিয়া; কপিকল ও অন্যান্য কৌশলের সাহায্যে ভারী বোঝা ও বিরাট আকৃতির বস্তু পরিবহন ও উত্তোলন সংক্রান্ত কলা-কৌশল এবং এমন অন্যান্য বিষয়। অনেক গ্রন্থ রচয়িতা এ বিষয় নিয়ে ব্যবহারিক কৌশলগত পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোতে অদ্ভুত শিল্পকর্ম ও বিরল কলা-কৌশলের চূড়ান্ত রূপ দেখানো হয়েছে। অনেক সময় এগুলোর জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণের দুরূহতার জন্য দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। অনুরূপ গ্রন্থাদি মানুষের কাছে বিদ্যমান। তারা এগুলোকে বনি শাকেরের[২৪৭] সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকে। মহান আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

জরিপ

জরিপ জ্যামিতিরই একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয়, যা পৃথিবী পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এর অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগকে বিঘত, হাত অথবা অন্য কোন মাপ

---

২৪৭. তারা খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর অন্তর্গত।

www.amarboi.org

দ্বারা তার পরিমাণ বের করা কিংবা কোন ভূভাগের সাথে অন্য ভূভাগের সম্পর্ক তুলনা করার সময় অনুরূপ কিছু করা। শস্যক্ষেত্র, খামার, বাগান প্রভৃতির খাজনা নির্দিষ্ট করতে এবং উত্তরাধিকারী অথবা অংশীদারদের মধ্যে দেয়াল, ভূমি ইত্যাদি ভাগ করতে এ শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ এ বিষয় নিয়ে প্রচুর ও উত্তম পুস্তকাদি রচনা করেছে। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় যথার্থ উপলব্ধির শক্তি দান করেন।

দৃষ্টিবিদ্যাও জ্যামিতির একটি শাখা। এ শাস্ত্রের দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কারণসহ বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে দর্শন প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করা হয়। এর ভিত্তি এই যে, দর্শনকার্যটি আলোকরশ্মির দ্বারা সৃষ্ট শাঙ্কব প্রতিফলনের মাধ্যমে সমাধা হয়। এর সর্বোচ্চ পর্যায় দৃষ্টিকোণ ও এর ভিত্তি দৃষ্ট বস্তু। তারপর এ দর্শন প্রক্রিয়ায় নিকটবর্তী বস্তুকে ক্ষুদ্র দৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বহু ভুল-ভ্রান্তি দেখা দেয়। অনুরূপভাবে জলের নিচে ও স্বচ্ছবস্তুর অন্তরালবর্তী আকৃতিকে বৃহৎ দেখায়; পতনশীল বৃষ্টিবিন্দুকে সরলরেখায় দেখা যায়; শিখাকে চক্রকার মনে হয় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ শাস্ত্রে এসব বিষয়ের কার্যকারণ ও অবস্থা জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। অনুরূপভাবে এর দ্বারা চন্দ্রদর্শনের বিভিন্নতাকে বিশদ করা হয় এবং এর উপরই নতুন চন্দ্রের উদয় ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কীয় বিষয়াদি সেগুলোর সংশ্লিষ্ট কারণের বৈচিত্র্যসহ নির্ভরশীল। অনুরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়।

এ বিষয়ে গ্রিকদের প্রচুর রচনা বিদ্যমান। ইসলামী জগতে এ বিষয়ে যার রচনা সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত তিনি হলেন ইবনে হায়ছম।[২৪৮] অন্য অনেকেও এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বস্তুত এ বিষয়টি উক্ত গণিতশাস্ত্রাদি ও সেগুলোর শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত।

---

২৪৮. হাসান (হুসাইন) ইবনে হাসান (হুসাইন) ইবনে হায়ছম; ৩৫৪—৪৩০ (৯৬৫—১০৩৯ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যোতিষশাস্ত্র]

এটি এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা স্থির, গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রাবলির গতি নিরীক্ষণ করা হয় এবং উক্ত গতিজনিত অবস্থা থেকে আকাশমণ্ডলের আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। এসব প্রমাণ অনুভূত গতি থেকে জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন এ শাস্ত্র প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্যমণ্ডলের কেন্দ্র থেকে ভিন্ন; কেননা অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের গতি বিদ্যমান। যেমন এটি প্রমাণ করে যে, নক্ষত্রের প্রত্যাবর্তন ও স্থিরতা সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র গোলকের বর্তমানতা বোঝায়; যা সেগুলোর ব্যাপক কক্ষপথে পরিক্রমণশীল। যেমন এটি প্রমাণ উপস্থিত করে যে, স্থির নক্ষত্রের গতি একটি অষ্টম আকাশের বিদ্যমানতা বুঝিয়ে থাকে। যেমন এটি প্রমাণ দেয় যে, নক্ষত্রসমূহের বিচিত্র প্রবণতা সেগুলোর একাধিক কক্ষপথের ইঙ্গিত বহন করে। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

নক্ষত্রসমূহের এ গতি, অবস্থা ও বৈচিত্র্য একমাত্র পর্যবেক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কেননা একমাত্র এরই সাহায্যে আমরা অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের গতি জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডল এবং প্রত্যাবর্তন ও স্থিরতার বিষয়টি জানা যায়। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

গ্রিকগণ এ বিষয়ে অতিমাত্রায় পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁরা নির্দিষ্ট নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণের জন্য বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা এগুলোকে 'জাতুল হলক'[২৪৯] বলে অভিহিত করতেন। এগুলো ব্যবহার করার প্রক্রিয়া এবং আকাশমণ্ডলের গতির সাথে এগুলোর গতির সামঞ্জস্য বিধান করে তা দিয়ে প্রমাণ গ্রহণ করার পদ্ধতি সবই মানুষের কাছে ঐতিহ্য হিসেবে বিদ্যমান।

ইসলামী জগতে এ ব্যাপারে খুব কমই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট মামুনের শাসন আমলেই এর যৎসামান্য দেখা গিয়েছিল এবং 'জাতুল হলক' নামীয় এ যন্ত্রটির নির্মাণকার্যও আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর এর তৎপরতা লোপ পায় এবং পরিত্যক্ত হয়। তারপর প্রাচীন পর্যবেক্ষণাদির উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তার কোন কার্যকারিতাই অবশিষ্ট ছিল না। কারণ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের গতির সাথে আকাশমণ্ডল ও নক্ষত্রমালার গতির সামঞ্জস্যবিধান একমাত্র নিকটবর্তী অনুমানের ধারাতেই লব্ধ বলে গণ্য হয়; কখনই

---

২৪৯. অর্থ 'বৃত্তবিশিষ্ট'; 'অ্যাস্ট্রোল্যাব' (রোজেনথাল)।

www.amarboi.org

যথার্থ তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং সময়ের ব্যবধান বেড়ে গেল এ নৈকট্যসুলভ অনুমানের পার্থক্যও বেড়ে যায়।

এ জ্যোতিষশাস্ত্র একটি সম্ভ্রান্ত শিল্পকর্ম। সাধারণভাবে যা বোঝা যায় যে, এ শাস্ত্র আকাশ, কক্ষপথ ও নক্ষত্রমালার যথার্থ চিত্র তুলে ধরে, বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। বরং এটি সংশ্লিষ্ট সব কিছুর ঐ গতি থেকে ধার্যকৃত আকাশমণ্ডলের আকৃতি-প্রকৃতির জ্ঞান দান করে। পাঠক, আপনি জানেন যে, যে-কোন বস্তুর পক্ষে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ফল প্রদান করা অসম্ভব নয়। আমরা যদি বলি যে, গতি অবশ্যই আছে, তা হলে এ অবশ্যগতি থেকে গতিময় বস্তুটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; কিন্তু এটি কোনক্রমেই সেই বস্তুটির যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান দান করে না। এসত্ত্বেও জ্যোতিষশাস্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি শিক্ষণীয় বিষয়াদির একটি বিশেষ স্তম্ভ স্বরূপ।

এ শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা সুন্দর রচনা হল 'ম্যাজেস্টি' নামক গ্রন্থ। টলেমীর সাথে একে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাপুস্তক রচয়িতারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই টলেমী গ্রিক সম্রাট টলেমীদের কেউ নন। ইসলামী জগতের দার্শনিকদের নেতৃস্থানীয় অনেকেই এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেছেন; যেমন ইবনে সিনা অনুরূপ সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করে তা তাঁর 'শেফা' নামক গ্রন্থের শিক্ষণীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আন্দালুসের দার্শনিক ইবনে রুশদও এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে সামাহ্ এবং ইবনে আবুস্ সেল্‌ত তাঁর 'এক্তেসার' নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্তির কাজ করেছেন। ইবনে ফরগানীরও[২৫০] একটি সংক্ষিপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্র বিদ্যমান। তিনি সেটাকে সহজ করেছেন এবং সেটার জ্যামিতিক প্রমাণগুলো বাদ দিয়েছেন। 'আল্লাহ্ মানুষকে তা-ই জানিয়েছেন, যা তার জানা ছিল না।'[২৫১] পবিত্র তিনি, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—নিখিল জগতের প্রতিপালক।

জ্যোতিষ তালিকাশাস্ত্র

জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার মধ্যে জ্যোতিষ তালিকাশাস্ত্র অন্যতম। এটি সংখ্যার দ্বারা হিসাব সংরক্ষণ জাতীয় শিল্প বিশেষ। এতে গতির দিক থেকে প্রতিটি নক্ষত্রকে বিশিষ্ট করা হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে তার অবস্থান সম্পর্কীয় দ্রুততা, ধীরতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর দ্বারা নক্ষত্রসমূহের গতি হিসাব করে যে-কোন সময়ে কক্ষপথে সেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এ শিল্পটির নীতিমালা বিদ্যমান; যেমন প্রস্তাবনা ও মূলনীতি। এগুলোর দ্বারা মাস, দিন ও অতীত তারিখের জ্ঞান লাভ করা যায়। এর কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে; এগুলোর দ্বারা অপভূ, অনুভূ, বিষুবলম্ব এবং বিভিন্ন প্রকার গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোর পরস্পরের বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলোর হিসাব

২৫০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যুকাল ২৪৭ (৮৬২ খ্রি:) হিজরীর পরবর্তী।
২৫১. কোরান ৯৬, ৫।

www.amarboi.org

ছকের মাধ্যমে সহজভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। একেই বলা হয় জ্যোতিষতালিকা। এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে নক্ষত্রমালার নির্দিষ্ট অবস্থানের জ্ঞান লাভ করাকে বলা হয় উপযোজন ও তালিকাবদ্ধকরণ।

পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন— আলবাত্তানী[২৫২] ও ইবনে কুম্মাদ।[২৫৩] বর্তমানকালে মাগরিবের উত্তরসূরি শাস্ত্রবিদ্‌রা তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে একটি জ্যোতিষতালিকাকে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের তিউনিসের জ্যোতিষবিদ্‌দের অন্যতম ইবনে ইসহাকের নামের সাথে জড়িত।[২৫৪] তাদের ধারণা ইবনে ইসহাক এ তালিকা নির্মাণে পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সিসিলি দ্বীপের একজন ইহুদী পণ্ডিত, যিনি জ্যোতিষ ও শিক্ষণীয় বিষয়াদিতে দক্ষ এবং এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, তিনিই তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ নক্ষত্রের অবস্থা ও গতির সংবাদ ইবনে ইসহাককে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মাগরিববাসীরা তাদের এ ধারণা অনুসারে উক্ত গ্রন্থটির ভিত্তি নির্ভরযোগ্য বলে সেটির সাহায্য গ্রহণ করে। ইবনে বান্না[২৫৫] এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করে 'আল মিনহাজ' নামে অন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে হিসাবের বিষয়টি সহজতর হওয়ায় মানুষ একে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। অবশ্য তাদের এমন আগ্রহ একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন জানার জন্যই এবং সে জন্যই তারা কক্ষপথে নক্ষত্রের অবস্থান জানতে এত ব্যাগ্র হয়ে থাকে। তাতে এ বিষয়টুকুই জানা যে, নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানের ফলে মনুষ্যজগতের রাজশক্তি, সাম্রাজ্য, মানুষের জন্ম, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি ইত্যাদির উপর কী প্রভাব পড়ে থাকে। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব এবং আল্লাহ্ চান তো তাদের যুক্তি-প্রমাণাদিও বিশ্লেষণ করব। আল্লাহ্ যা ভালবাসেন, যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তার জন্যই সহায়ক হন এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

---

২৫২. মুহম্মদ ইবনে জাবির; ২৪৪—৩১৭ (৮৫৮—৯২৯ খ্রি:) হি: (?)।

২৫৩. আহমদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কুম্মাদ; মৃত্যু ৫৯১ (১১৯৫ খ্রি:) হি: (?)।

২৫৪. আবুল আব্বাস আলী ইবনে ইসহাক; হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

২৫৫. অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২২৭ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[যুক্তিবিদ্যা]

এ শাস্ত্রটি এমন কতিপয় নীতির সমষ্টি যা দিয়ে বস্তুর সত্তাগত সংজ্ঞায় শুদ্ধাশুদ্ধির পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এবং সত্যোপলব্ধির প্রমাণ প্রয়োগে ভ্রান্তির অপনোদন সম্ভব হয়। এর কারণ এই যে, উপলব্ধি কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ চেতনারই সমষ্টি। বুদ্ধিমান অবুদ্ধিমান নির্বিশেষে সব প্রাণীই এ উপলব্ধিতে অংশীদার। মানুষ একমাত্র এ ইন্দ্রিয়জাত চেতনার অতীত সার্বিক ধারণার উপলব্ধির দ্বারাই সবার মাঝে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

এর বিবরণ এই যে, মানুষ সমতুল্য ব্যষ্টিসমূহ থেকে তার কল্পনায় এমন একটি ধারণা জন্মায়, যা ঐসব অনুভূত ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে এবং একেই সার্বিক ধারণা বলে। তারপর মানুষের ধারণা এসব ব্যষ্টি ও অন্যতর ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে বিবেচনা-শক্তি প্রয়োগ করে এবং কতকাংশে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়। এর ফলে সে এ দুটির ঐক্যের ভিত্তিতে এমন একটি ধারণা লাভ করে, যা তাদের উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এভাবে ক্রমশ সে অগ্রসর হয়ে এমন একটি একক সার্বিক ধারণায় উপনীত হয়, যার সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে এমন কোন অন্য সার্বিক ধারণায় অস্তিত্ব থাকে না। এ কারণে উক্ত ধারণাটি একক হয়ে দেখা দেয়।

এর উদাহরণ, যেমন মানুষের ব্যষ্টি থেকে জাতির এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা, যা তাদের সবার উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তারপর এ ধারণাকে পশুর সাথে মিলিয়ে এমন গুণের ধারণা লাভ করা যায়, যা এ দুটির উপর প্রযোজ্য হয়। এর পর এ দুটি ও বৃক্ষের মধ্যে বিবেচনা করে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা যায়, যা মহাগণের কাছে পৌঁছে দেয় এবং এটাই বস্তুসত্তা। এর পর আর এমন কোন সার্বিক ধারণা পাওয়া যায় না, যার সাথে এর সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি এখানে এসে ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে থমকে দাঁড়ায়।

অতঃপর আল্লাহ্ এ মানুষের মধ্যে এমন এক মননশক্তি প্রদান করেছেন, যা দিয়ে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা উপলব্ধি করতে পারে। তার এ জ্ঞান হয় বস্তুসত্তার ধারণা মাত্র অর্থাৎ এমন একটি সবল উপলব্ধি যার সাথে কোন সিদ্ধান্ত নেই। অথবা সত্যোপলব্ধি অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন বিষয়ের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। এর ফলে উদ্দেশ্য সাধনে মননশক্তির তৎপরতা হয়, উক্ত সব সার্বিক ধারণাকে পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করবে, যাতে কল্পনায় এমন একটি সার্বিক ধারণার সৃষ্টি হয়, যা

www.amarboi.org

বাস্তবে তার অন্তর্গত সব অংশের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং এ কাল্পনিক ধারণার দ্বারা সব ব্যষ্টির বস্তুসত্তার জ্ঞান লাভ সুগম হতে পারে। অথবা তা কোন বিষয়ের জন্য কোন বিষয়ের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এমনভাবে দান করবে যাতে তার দ্বারা সত্যোপলব্ধি জন্মায়। অবশ্য বাস্তবিক পক্ষে এ সত্যোপলব্ধির চরম পর্যায় ধারণাতেই পর্যবসিত হয়। কেননা তার এ উপলব্ধি জন্মানোর পর দেখা যায়, তা বস্তুপুঞ্জের সেই স্বরূপকেই গোচরীভূত করে, যা সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের ফলশ্রুতি মাত্র।

বস্তুত মননশক্তির এ তৎপরতা কখনও শুদ্ধ পন্থায়, আবার কখনও অশুদ্ধ পন্থায় আবর্তিত হয়ে থাকে; এর ফলেই যে পন্থায় মননশক্তি উদ্দিষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য তৎপর হবে, তাকে স্পষ্ট করে তোলা দরকার; যাতে শুদ্ধাশুদ্ধির পার্থক্য নির্ণীত হয়ে যায়। এজন্যই এ বিষয়টি যুক্তিবিদ্যার নীতিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বসূরিরা প্রথম দিকে এ বিষয়ে সামান্য সামান্য ও পৃথক পৃথকভাবে কথা বলতেন এবং তাঁরা এর পন্থাগুলোকে বিন্যস্ত ও এর সমস্যাগুলোকে একত্র করেননি। এ অবস্থায় গ্রিস দেশে এরিস্টটল আবির্ভূত হলেন। তিনি এ বিদ্যার আলোচ্য বিষয়কে বিন্যস্ত এবং এর সমস্যা ও পরিচ্ছেদগুলোকে সজ্জিত করলেন। তিনি এটাকে দার্শনিক শাস্ত্রাদির প্রথম পাঠ্য ও উপক্রমণিকা হিসেবে স্থান দিলেন। এজন্যই তাঁকে 'প্রথম শিক্ষক' বলে অভিহিত করা হয়। এ যুক্তিবিদ্যার জন্য তাঁর বিশিষ্ট রচনাটির নাম 'নস' (পাঠ)। এতে আটটি গ্রন্থ বিদ্যমান : এর চারটি অনুমান প্রক্রিয়া এবং চারটি তার বিষয়বস্তুর উপর বিন্যস্ত।[২৫৬]

এর বর্ণনা এই যে, উদ্দিষ্ট সত্যোপলব্ধি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে উদ্দিষ্ট বিষয় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসরূপে দেখা দেয়। তার মধ্যে উদ্দিষ্ট ধারণার আকারের আসে এবং এর কয়েকটি পর্যায় বিদ্যমান। এর ফলে অনুমানকে উদ্দিষ্টের দিক থেকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয়, যা তার উপকারে আসে। এ বিবেচনার দিক থেকে তার প্রস্তাবনাগুলো কোন্ প্রকৃতির হওয়া বিধেয়। তারপর এটি কোন্ গণের অধীনে হবে—জ্ঞান, না ধারণার! কখনও এ অনুমানকে বিশেষ কোন উদ্দিষ্ট সামনে রেখে দেখা হয় না; বরং তার ফলশ্রুতির দিক থেকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এদিক থেকে প্রাথমিক বিবেচনাকে বলা হয় বস্তু অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা সেই বিশেষ উদ্দেশ্যজাত বস্তুকেই বুঝি, যা জ্ঞান বা ধারণারূপে অস্তিত্বে আসে। এ দিক থেকে দ্বিতীয় বিবেচনাকে বলা হয় আকৃতি এবং সাধারণভাবে অনুমানের বিকাশ। এসব কিছু মিলিয়ে যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থের সংখ্যা আট।

প্রথম গ্রন্থ : সেই মহাগণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা কল্পনায় সমস্ত অনুভূত বস্তুর অতীতরূপে তার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ মহাগণের পরবর্তী অন্য কোন গতি নেই। একে বলা হয় 'কিতাবুল মাকুলাত' বা ধারণার গ্রন্থ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ : সত্যোপলব্ধির প্রস্তাবনা এবং তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করে। একে বলা হয় 'কিতাবুল ইবারত' বা ব্যাখ্যার গ্রন্থ।

---

২৫৬. রোজেনথালে 'ফস্', বলে উল্লেখিত; গ্রন্থবিভাগ ও অন্য সংস্করণে তিন ও পাঁচ এবং এ বিভাগই শুদ্ধ।

www.amarboi.org

তৃতীয় গ্রন্থ : অনুমান এবং সাধারণভাবে তার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। একে বলা হয় 'কিতাবুল কিয়াস' বা অনুমানের গ্রন্থ। আকৃতির দিক থেকে বিবেচনার এটাই শেষ পর্যায়।

অতঃপর চতুর্থ গ্রন্থ 'কিতাবুল বুরহান' বা প্রমাণের গ্রন্থ; এটি বিশ্বাস উৎপাদনকারী অনুমান সম্পর্কে বিবেচনা করে। কীভাবে তার প্রস্তাবনাগুলো বিশ্বাস্য হতে বাধ্য এবং কীভাবে তা উক্ত বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য শতাব্দীর সাথে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেয়। যেমন তার সত্তাগত ও প্রাথমিক হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ গ্রন্থে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কেননা এর উদ্দেশ্য হল একমাত্র বিশ্বাস। কারণ সংজ্ঞা ও সংজ্ঞিতের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সামঞ্জস্যের তা ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই পূর্বসূরিগণ এ গ্রন্থে এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম গ্রন্থ : 'কিতাবুল জদল' বা বিতর্কের গ্রন্থ; এটি সেই উপকারী অনুমান শক্তিতে জাগ্রত করে, যা দিয়ে বিরোধী বক্তব্য কর্তন ও শত্রুর মুখ বন্ধকরণের ক্ষমতা জন্মে এবং কীভাবে তার জন্য প্রসিদ্ধ বিষয়াদি ব্যবহার করতে হবে, তা সে সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়। এটি অন্যবিধ শতাব্দীর দ্বারাও এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে। এগুলোর বর্ণনা সেখানে বিদ্যমান। এ গ্রন্থে সেসব উৎসের কথা বর্ণনা করা হয়, যে স্থান থেকে অনুমানকারী তার অনুমানকে চয়ন করতে পারে এবং সেজন্য মধ্যবর্তী নামীয় উদ্দেশ্যের উভয় দিকের একত্রকারীকে পৃথক করতে সক্ষম হয়। এ গ্রন্থের প্রস্তাবনার বিপরীতধর্মী ব্যবহারও বিদ্যমান।

ষষ্ঠ গ্রন্থ : 'কিতাবুস্ সফস্‌তা' বা তর্কাভাসের গ্রন্থ; এটি এমন এক অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করে, যা সত্যের বিরোধীপক্ষকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার্কিক সেটার দ্বারা তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে; যদিও সে নিজেই ভ্রান্ত। এ আলোচনা এজন্যই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাকে ভ্রান্ত অনুমান সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

সপ্তম গ্রন্থ : 'কিতাবুল খেতাবা' বা বাগ্মিতার গ্রন্থ; এটি এমন এক উপকারী অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করে, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। এটি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারযোগ্য বক্তব্যাদি সম্পর্কেও অবহিত করে।

অষ্টম গ্রন্থ : 'কিতাবুশ্‌শের' বা কবিতার গ্রন্থ; এ এমন এক অনুমান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, যা উপমা উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে বিশেষভাবে কোন বিষয়ের আগ্রহ অথবা ঘৃণা সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য কাল্পনিক প্রস্তাবনাগুলোর জ্ঞানদান করে।

এগুলোই হল পূর্বসূরিদের কাছে সুপরিচিত যুক্তিবিদ্যার আটটি গ্রন্থ। তারপর এ শিল্পজ্ঞান সংস্কৃত ও সজ্জিত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে গ্রিক দার্শনিকগণ এ মতে উপনীত হলেন যে, পাঁচটি সার্বিক ধারণার জন্য পৃথক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত এগুলো বহির্বস্তু, তার অংশাদি ও তাতে আপতিক বিষয়াদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা সৃষ্টির জন্য খুবই উপকারী। এ পাঁচটি হল গণ, বিভেদক, জাতি, বিশেষ ও সাধারণ

www.amarboi.org

আপতিক। তাঁরা এগুলোর জন্য আলোচ্য যুক্তিবিদ্যায় একটি আলোচনা সংযোজ. করলেন এবং এভাবে আলোচনার সংখ্যা নয়টিতে উপনীত হল।

এসব কিছুই ইসলামী জগতে অনুবাদের মাধ্যমে এলো এবং ইসলামী দার্শনিকগণ এগুলোর সংক্ষিপ্ত-সার ও ব্যাখ্যা রচনার মাধ্যমে এগুলোকে গ্রহণ করলেন। যেমন ফারাবী ও ইবনে সিনা এবং তারপর আন্দালুসের ইবনে রুশদ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুশ্‌শেফ' নামক গ্রন্থে—দর্শনের সাতটি বিষয়কেই পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর উত্তরসূরিরা এসে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষার পরিবর্তন করলেন। তারা এ পাঁচটি সার্বিক ধারণার বিবেচনার সাথে সেগুলোর ফলাফলও সংযুক্ত করলেন। বস্তুত এগুলো সংজ্ঞা ও ধারা সম্পর্কীয় আলোচনা; তারা এগুলোকে প্রমাণের গ্রন্থ থেকে স্থানান্তরিত করেছেন। তাঁরা কিতাবুল মাকুলাত বা ধারণার গ্রন্থকে বাদ দিয়েছেন; কেননা যুক্তিবিদ্‌গণ তাতে সত্তাগতভাবে নয়; বরং আপতিকভাবে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁরা ব্যাখ্যার গ্রন্থে অনুমানে বিপরীত প্রক্রিয়াকে যুক্ত করেছেন; যদিও পূর্বসূরিদের কাছে তা বিতর্কের গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছিল। অবশ্য তা অনেক দিক থেকেই প্রস্তাবনাসমূহের অনুসারী বিষয়। তারপর তাঁরা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বস্তুর দিক থেকে নয়। তাঁরা বস্তুর দিক থেকে তাতে আরও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বস্তুত যে অনুমান এ পাঁচটি গ্রন্থে তথা প্রমাণ, বিতর্ক, বাগ্মিতা, কবিতা ও তর্কাভাসে বিধৃত রয়েছে, তাঁদের আলোচনা সেটাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অনেক সময় সেগুলোর আংশিক মাত্র তাঁরা স্পর্শ করেছেন এবং অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে উদাসীন রয়েছেন; যেন সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। অথচ এগুলোই আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরস্থল গ্রন্থাবলি।

অতঃপর তাঁরা তাঁদের গৃহীত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং এগুলোকে এমনভাবে বিবেচনা করেছেন যে, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র; এটি আদৌ অন্যান্য শাস্ত্রের মাধ্যম নয়। এর ফলে তাঁদের এ সম্পর্কীয় আলোচনা দীর্ঘ ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম যিনি এ বিষয়ে সূত্রপাত করেছেন, তিনি হলেন ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে খতিব এবং তাঁর পরে আফজালউদ্দিন খোনজী;[২৫৭] শেষোক্তজনের গ্রন্থাবলি পূর্বাঞ্চলীর জ্ঞানীদের কাছে বর্তমানকালেও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি এ শাস্ত্রে 'কাশফুল ইসরার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন; এ গ্রন্থটি দীর্ঘ। তাঁর রচনা 'মুখতাসর আল মুযেজ' শিক্ষাদানের জন্য উত্তম। এর পর 'মুখতাসর আল জুমল' চার পৃষ্ঠা পরিমাণ একটি পুস্তিকা, যাতে যুক্তিবিদ্যার সার-সংক্ষেপ ও তার নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বর্তমানকালে তাকে গ্রহণ করেছে এবং উপকৃত হচ্ছে।

বর্তমানকালে পূর্বসূরিদের গ্রন্থাবলি পরিত্যাক্ত হয়েছে; যেন ঐগুলোর অস্তিত্ব কখনও ছিল না। অথচ এসব গ্রন্থই যুক্তিবিদ্যার ফলাফল ও তার উপযোগিতার দ্বারা সর্বাংশে পরিপূর্ণ রয়েছে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্‌ই যথার্থ সত্যের প্রতি পথ দেখিয়ে থাকেন।

২৫৭. মুহম্মদ ইবনে নামোয়ার; ৫৯০-৬৪৬ (১১৯৪-১২৪৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

পাঠক, জেনে রাখুন যে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়াকে পূর্বসূরি ও কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা খুবই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁরা এর মারাত্মক সমালোচনা করেছেন এবং এ বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তাঁরা এর শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারপর উত্তরসূরিদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে খতিবের সময় থেকে বিষয়টির প্রতি কিছুটা সদয় দৃষ্টি পোষণ করা হয়েছে। তবুও ঐ সময় থেকে খুব কম লোকই এ বিষয়ের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে। অধিকাংশ লোকই সেই পূর্বসূরিদের মতামতের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর ফলে তারা অনুরূপভাবে একে অস্বীকার করে ও এটি থেকে দূরে সরে থাকে। পাঠক, আমরা আপনার সামনে এ গ্রহণ-বর্জনের রহস্য বর্ণনা করব, এর ফলে আপনি জ্ঞানীদের বিচিত্র ও বিভিন্ন মতাদর্শের সঠিক উদ্দেশ্য জেনে নিতে সক্ষম হবেন।

এর বিবরণ এই যে, কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ যখন ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় ধ্যানধারণাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাহায্য করার জন্য এলমে কালামের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তাঁরা এ উদ্দেশ্যে যুক্তি-প্রমাণের উপস্থাপন তাঁদের বিশেষ ধারাতেই করেছিলেন। এসব যুক্তি-প্রমাণ তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করেছেন; যেমন তাঁরা প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে পৃথিবীর সৃজন প্রক্রিয়াকে তার মধ্যের আপতন ও তার সৃজনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেননা দেহ মাত্রই সৃজন-প্রক্রিয়ার অধীন; সুতরাং যা সৃজন-প্রক্রিয়ার অধীন তা অবশ্যই সৃষ্ট। যেমন তাঁরা পারস্পরিক প্রতিরোধের অসম্ভাব্যতার দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন তাঁরা দৃশ্যমান গুণাবলির ধারা অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র জন্য অদৃশ্য ব্যাপক গুণ চারটিকে অনাদি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অনুরূপ অন্যান্য আরও যুক্তি-প্রমাণ তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তাঁরা এসব যুক্তি-প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য কতিপয় নিয়ম কানুন বর্ণনা করলেন এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাবনার আকারে দেখা দিল। যেমন স্বয়ম্ভু-অণু; কাল-অণু; দেহাদির মধ্যবর্তী শূন্যতা; বস্তুর জন্য স্বভাব ও বুদ্ধিগ্রাহ্য মিশ্রণের অস্বীকৃতি; আপতিক বস্তুর দুটি কালে স্থায়ী হওয়ার অসম্ভাব্যতা; সৃষ্ট বস্তুর গুণ হিসেবেই দশার স্বীকৃতি যা বর্তমানও নয়, অবর্তমানও নয়; এরূপ অন্যান্য আরও বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উপর তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের বিশেষ ভিত্তি স্থাপিত হল।

এর পর শায়খ আবুল হাসান, কাজী আবু বকর ও উস্তাদ আবু ইসহাক এ মত পোষণ করলেন যে, এসব ধর্মীয় বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণাদি প্রতিবিম্বধর্মী অর্থাৎ এগুলোর অকৃতকার্যতায় প্রামাণ্য বিষয়ও অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। এজন্যই কাজী আবু বকর এ মত দেন যে, এ যুক্তিপ্রমাণগুলোও ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ; সুতরাং এগুলোর সমালোচনা ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনারই তুল্য; কেননা বিশ্বাস এসব যুক্তিপ্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

পাঠক, আপনি যদি যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তার সমগ্রটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাসের উপর আবর্তনশীল। এটি বস্তুজগতে এমন একটি স্বাভাবিক সার্বিক ধারণার প্রতিষ্ঠা করে, যা কাল্পনিক সার্বিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পাঁচটি সার্বিক ধারণায় বিভক্ত হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে গণ, বিভেদক,

www.amarboi.org

জাতি, বিশেষ ও সাধারণ আপতিক। কিন্তু এ সবাই কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে অগ্রাহ্য বলে গণ্য। সার্বিক ধারণা ও সত্তাগত ধারণাও তাঁদের কাছে একটি কাল্পনিক বিবেচনা মাত্র, বস্তুজগতে এমন কিছু নেই, যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। অথবা যারা দশার কথা বলেন, তাদের কাছে তা একটি দশা মাত্র। এর ফলে পাঁচটি সার্বিক ধারণা এবং তাদের উপর ভিত্তি করে রচিত সংজ্ঞা অগ্রাহ্য হয়। দশটি ধারণাও অগ্রাহ্য বলে গণ্য হয়। সত্তাগত গুণের ধারণা অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে প্রমাণ গ্রহণে সত্তাগত আবশ্যকীয় শর্তযুক্ত সব প্রস্তাবনা অগ্রাহ্য বলে পরিগণিত হয়। যুক্তি-প্রমাণের সেসব উৎসও অগ্রাহ্য হয়, যা বিতর্কগ্রন্থের সারবস্তু। এগুলো থেকেই সেই মধ্যবর্তী ধারণার উৎপত্তি যা অনুমানের দুটি প্রান্তকে একত্র করে থাকে। এ সামগ্রিক অগ্রাহ্যতার ফলে একমাত্র কাঠামোগত অনুমানই অবশিষ্ট থাকে এবং সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে সেই সংজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে, যা সংজ্ঞিত বিষয়ের সব অংশের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। বস্তুত এটি তদ্রূপ অবস্থা থেকে সাধারণ হবে না, যাতে তার মধ্যে অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং তা থেকে বিশেষও হবে না, যাতে তার মধ্যকার কিছু অংশ বাইরে থেকে যেতে পারে। সংজ্ঞার এ দুটি দিককেই ব্যাকরণবিদগণ 'সমন্বয়' ও 'প্রতিরোধ' এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ 'বিতাড়ন' 'ও' 'প্রতিফলন' নামে[২৫৮] ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এভাবে তাঁদের কাছে যুক্তিবিদ্যার সব স্তম্ভই ধসে পড়ে। সুতরাং আমরা যখন যুক্তিবিদ্যার ধারা অনুসারে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তখন কালামশাস্ত্রবিদদের প্রস্তাবনার অনেক কিছুই অগ্রাহ্য করতে হয়। এর ফলে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে পূর্বসূরিরা এ যুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের প্রতি এমন মারমুখী অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে একে অভিনব মত অথবা ধর্মদ্রোহিতা বলে গণ্য করেছেন।

কিন্তু ইমাম গাজ্জালী হতে আরম্ভ করে উত্তরসূরিগণ যুক্তি-প্রমাণের প্রতিবিম্বন ধর্মিতাকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁদের কাছে যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতার দ্বারা প্রামাণ্য বিষয় অগ্রাহ্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। তাঁর যুক্তিবিদ্‌দের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাস, স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব এবং বাস্তবে সার্বিক ধারণার অবস্থান সম্পর্কীয় মতামতকে শুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। এর ফলে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের কতিপয় যুক্তি-প্রমাণের বিরোধী হলেও যুক্তিবিদ্যা সাধারণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসাদির পরিপন্থী নয়। বরং তাঁরা এমন প্রমাণও উপস্থিত করেছেন, যার ফলে কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের রচিত অনেক প্রস্তাবনাই অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। যেমন স্বয়ম্ভু-অণু ও মধ্যবর্তী শূন্যতার অবাস্তবতা এবং আপতিক বস্তু ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা তাঁরা সপ্রমাণ করেছেন। তাঁরা কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াও অন্যবিধ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত যুক্তি-প্রমাণকে মনন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমানের দ্বারা শুদ্ধ করেছেন। এতে প্রথা অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটির কথা তাঁরা স্বীকার করেননি।

২৫৮. মূল শব্দগুলো যথাক্রমে 'জমা ও মানা' এবং 'তয়্‌দ ও আক্‌স'।

www.amarboi.org

এটাই ইমাম ইবনে খতিব ও গাজ্জালী এবং তাঁদের অনুসারীদের বর্তমানকালীন অভিমত। পাঠক, এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং শাস্ত্রবিদ্‌রা কোন্ ধারা অনুসারে, কোন্ উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন, তা সম্যকরূপে জেনে নিন। আল্লাহ্ যথার্থতার দিকে পথ প্রদর্শন এবং গমনে সহায়তা করে থাকেন।

www.amarboi.org

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[পদার্থবিদ্যা]

এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা গতি ও স্থিতির দিক থেকে দেহ সম্পর্কে আলোচনা করে। এটি আকাশীয় বস্তুপুঞ্জ ও মৌল উপাদান এবং তৎসৃষ্ট মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে। পৃথিবীতে সৃষ্ট ঝর্ণাধারা, ভূমিকম্প এবং আকাশে সৃষ্ট মেঘ, বাষ্প, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় ইত্যাদি সম্পর্কেও এটি বিচার করে দেখে। এর অন্য বিচারের বিষয় হল দেহের মধ্যে গতির আরম্ভ অর্থাৎ সেই প্রাণশক্তি, যা বিচিত্রভাবে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিরাজমান।

এ বিষয়ে এরিস্টটলের গ্রন্থাবলি মানুষের সামনে বিদ্যমান। দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের সাথে এগুলোও সম্রাট মামুনের শাসন আমলে অনূদিত হয়েছিল। এ ধারা অনুসরণ করেই মানুষ এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থাদি রচনা করেছে। এসব রচনার মধ্যে ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুশ্ শেফা' এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনায় সমৃদ্ধ। তিনি এতে দর্শনের সাতটি শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তারপর তিনি এর সংক্ষিপ্ত-সার বর্ণনা করে 'কিতাবুন্ নাজাত' ও 'কিতাবুল ইশারাত' রচনা করেছেন। সেখানে বলতে গেলে তিনি এরিস্টটলের বহু মতামতের বিরোধিতা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ইবনে রুশদ এরিস্টটলের গ্রন্থটি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সংক্ষিপ্ত-সার ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পরে বহু লোক এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছে; তবুও তাঁদের এ গ্রন্থগুলোই বর্তমানকালেও এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য।

পূর্বাঞ্চলবাসীরা ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুল ইশারাত'কেই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইমাম ইবনে খতিব উক্ত গ্রন্থটির একটি উত্তম ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন। আমেদীরও[২৫৯] অনুরূপ একটি ব্যাখ্যা বিদ্যমান। খাজা নামে পরিচিত নাসিরউদ্দিন তুসীও[২৬০] এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। ইনিও পূর্বাঞ্চলবাসী এবং উক্ত গ্রন্থের বহু বিষয়ে তিনি ইবনে খতিবের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। এর ফলে তাঁর চিন্তা ও আলোচনায় আরও বিস্তৃতি এসেছে। বস্তুত 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে তিনি মহাজ্ঞানী।'[২৬১] আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

---

২৫৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১৫ নং টিকা দ্র:।

২৬০. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৫৯৭-৬৭২ (১২৩১-১২৭৪ খ্রি:) হি:।

২৬১. কোরান; ১২, ৭৬

www.amarboi.org

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[চিকিৎসাশাস্ত্র]

পদার্থবিদ্যারই একটি শাখা চিকিৎসাশিল্প। এ শিল্পজ্ঞান রোগ ও আরোগ্যের ভিত্তিতে মানুষের দেহ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে। সুতরাং দেহের অধিকারীকে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ নিরাময় সম্পর্কে এ শাস্ত্র ওষুধ ও পথ্যের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে থাকে। অবশ্য এর পূর্বে সে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগাদি, সেগুলোর উৎপত্তির যথাস্থানীয় কারণ এবং রোগের যোগ্য ওষুধ নির্ণয় করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্র একদিকে ওষুধের মিশ্রণ ও শক্তির প্রতি এবং রোগের চিহ্নাদির মাধ্যমে এর অবস্থা ও ওষুধ গ্রহণের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রাখে। প্রথমে সে রোগীর অবয়ব, মলমূত্রাদি ও নাড়ী পরীক্ষা করে এবং এগুলোর মধ্যে স্বভাব-শক্তির যথারীতি প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করে। কেননা স্বাস্থ্য ও রোগ—উভয় অবস্থাতেই স্বভাবই পরিচালিকা শক্তি। চিকিৎসক কেবলমাত্র সেই শক্তিকে দেহের গঠন, ঋতু ও বয়স অনুসারে এর স্বাভাবিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে কতকাংশে অনুধাবন ও নিরীক্ষণ করে। যে জ্ঞান এ সব বিষয়কে একত্র করে তাকেই বলা হয় চিকিৎসাশাস্ত্র।

অনেক সময় একটি বিশেষ অঙ্গকে পৃথকভাবে আলোচনা করে এ সম্পর্কীয় জ্ঞানকেই একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যেমন—চক্ষু, তার রোগ শোকাদি এবং সুরমাদি প্রয়োগে আরোগ্য প্রক্রিয়ার বর্ণনা। অনুরূপভাবে উক্ত শাস্ত্রের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকারিতার জ্ঞানকে সংযুক্ত করা হয়। এর অর্থ প্রাণিদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে উপকারিতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বর্ণনা করা। যদিও এরূপ বর্ণনার সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই, তবুও চিকিৎসাবিদ্গণ একে উক্ত শাস্ত্রের অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

এ বিষয়ে গ্যালেনের একটি মহৎ গ্রন্থ বিদ্যমান, যা খুবই উপকারী। বস্তুত তিনিই এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় এবং তাঁর গ্রন্থটি পূর্বসূরিদের সময়েই অনূদিত হয়েছিল। বলা হয় তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং বলা হয় যে, তিনি নির্বাসিত অবস্থায় বাধ্য হয়ে চাপের মুখে সিসিলি দ্বীপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থাদিকেই পরবর্তী চিকিৎসাবিদ্গণ সকলেই অনুসরণ করেছেন।

ইসলামী জগতে এ শিল্পে এমন সব নেতৃস্থানীয় চিকিৎসাবিদ জন্মেছেন, যাঁরা নানা বিষয়ে পূর্বসূরিদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন—ইমাম রাযী,[২৬২] আল মজুসী,[২৬৩]

---

২৬২. মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া; ২৫১-৩১৩ (৮৬৫-৯২৫ খ্রি:) হি:।
২৬৩. আলী ইবনে আব্বাস খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী।

www.amarboi.org

ইবনে সিনা এবং আন্দালুসবাসীদের মধ্যেও অনেকে আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ইবনে জহুর।[২৬৪] এ শিল্পটি বর্তমানকালে মুসলিম অধ্যুষিত নগরগুলোতে তাদের জনবসতি হ্রাস পাওয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। বস্তুত এটি এমন একটি শিল্পজ্ঞান, যা একমাত্র নাগরিকত্ব ও বিলাস-ব্যসনের ফলেই প্রয়োজনীয় বলে অনুমিত হয়; যেমন এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ বর্ণনা করব।

বেদুইন জনগোষ্ঠিতেও এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যমান, সাধারণভাবে যার ভিত্তি তারা কতিপয় ব্যক্তির অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর স্থাপন করে থাকে। তারা এটি পুরুষানুক্রমে গোত্রের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের কাছ থেকে লাভ করে আসছে। অনেক সময় এ চিকিৎসার দ্বারা অনেকে সুস্থ হয়; কিন্তু কোন ক্রমেই এটি স্বাভাবিক পদ্ধতিজাত নয় এবং যথার্থ মেজাজ অনুযায়ীও নয়।

আরব বেদুইনদের কাছে এমন চিকিৎসা প্রচুর ছিল এবং তাদের মধ্যে বহু খ্যাতিমান চিকিৎসকও ছিল। যেমন হারেস ইবনে কালাদা[২৬৫] ও অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ। ধর্মীয় বিধানে যেসব চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাও এ প্রকৃতির। ওহীর দ্বারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। এগুলো একান্তই আরব বেদুইনদের অভ্যাসের বিষয়। নবী (সঃ)-এর অবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর যে উল্লেখ এসেছে, তা এ অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপার। এটি ওহীর দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন অবশ্য পালনীয় বিষয় নয়। কারণ নবী (সঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিক্ষা দেবার জন্য; চিকিৎসাশাস্ত্র ও অনুরূপ অন্যান্য অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করার জন্য নয়। খেজুরের ফলোৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা সুপরিজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে বেশি অবগত।"[২৬৬] সুতরাং বিশুদ্ধ হাদিসাদিতে এ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোন ক্রমেই শাস্ত্রীয় বিধান হিসেবে গণ্য করা যায় না। সেখানে এরূপ প্রমাণ করার কোন কিছু পাওয়াও যায় না। অবশ্য আল্লাহ্ চান তো এগুলোকে যদি কল্যাণের বাহক হিসেবে সত্য বিশ্বাসে প্রয়োগ করা যায়, তা হলে তার দ্বারা মহৎ উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকারেই তা মেজাজ অনুসারী চিকিৎসা নয়; বরং তা বিশ্বাস বচনের একান্ত প্রভাব মাত্র। যেমন মধু দ্বারা পেটের পীড়া নিরাময় ও অন্যান্য ব্যাপারে দেখা গেছে।[২৬৭] আল্লাহ্ যথার্থতার দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

---

২৬৪. আব্দুল মালীক ইবনে জুহর; মৃত্যু ৫৫৭ (১১৬২ খ্রি:) হি:।

২৬৫. কিংবদন্তীধন্য এ চিকিৎসকের জীবনকাল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হতে হযরত মাবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

২৬৬. এ ঘটনাটি মদিনার; খেজুরের ফলোৎপাদন বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য অ-ফলপ্রসূ হলে তিনি এ কথা বলেন।

২৬৭. অনুরূপভাবে মধু সম্পর্কে মন্তব্য বিদ্যমান। হাদিস গ্রন্থ দ্র.।

www.amarboi.org

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[কৃষিবিদ্যা]

এ শিল্পজ্ঞানটি পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। এটি সেচ, সার প্রয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের পরিচর্যা ও বৃদ্ধি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে এবং উদ্ভিজ্জস্থানের নবায়ন, মরসুমের যোগ্যতা ও যা কিছু উদ্ভিদের কল্যাণপূর্ণতা বিধান করে, সেসবই এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বসূরিগণ এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা উদ্ভিদের রোপণ ও বৃদ্ধি এবং তার বৈশিষ্ট্য ও সজীবতার সর্বব্যাপারে দৃষ্টিপাত করতেন। তাঁরা উদ্ভিদের এ সজীবতার যে দিকটিকে নক্ষত্র ও গ্রহাদির প্রভাবের অধীন বলে মনে করতেন, তার সবই যাদুবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে তাঁরা উপরিউক্ত বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন।

গ্রিকদের গ্রন্থাবলি হতে নবতী জ্ঞানীদের নামের সাথে জড়িত 'কিতাবুল ফলাহাতিন্ নাবতিয়া' (নবতী কৃষিবিদ্যার গ্রন্থ)[২৬৮] নামে একটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, যা এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের আধারস্বরূপ। মুসলমানরা যখন এ গ্রন্থের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দিল, তখন তারা দেখতে পেল যে, এর সাথে যাদুবিদ্যা সম্পর্কীয় যে বিষয় সংযুক্ত রয়েছে, তার পথ তাদের কাছে রুদ্ধ এবং তার প্রতি দৃষ্টি তাদের কাছে নিষিদ্ধ। সুতরাং তারা উক্ত গ্রন্থের উদ্ভিদ রোপণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার পরিচর্যা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখল। অন্য বিষয়টির সাথে সম্পর্কীয় যাবতীয় আলোচনা তারা পরিত্যাগ করল। ইবনে আওয়াম[২৬৯] এ প্রক্রিয়াতেই 'নবতী কৃষিগ্রন্থের' সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন এবং অন্য বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। পরে মাসলামা তাঁর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে উপরিউক্ত বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলো সংগৃহীত করেছেন; যেমন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা যাদুবিদ্যার উপর আলোচনাকালে এদের উল্লেখ করব।

কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে উত্তরসূরিদের প্রচুর রচনা বিদ্যমান। এতেও আলোচনা উদ্ভিদের রোপণ, পরিচর্যা তার অভাব ও বাধা-বিপত্তি দূরীকরণ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়কে অতিক্রম করেনি। এসব রচনা বর্তমানকালেও বিদ্যমান।

---

২৬৮. গ্রন্থটি আবুবকর মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওহশিয়ার নামের সাথে জড়িত।
২৬৯. ইয়াহিয়া ইবনে মুহম্মদ; দ্বাদশ শতাব্দীর (খ্রি:) প্রথমার্ধ।

www.amarboi.org

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[অধ্যাত্মবিদ্যা]

এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা একান্ত সত্তার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করে। প্রথমে সে দেহ ও আত্মা সম্পর্কীয় সাধারণ বিষয়, তথা—সত্তা, একত্ব, বহুত্ব, অবশ্যম্ভাবিতা, সম্ভাব্যতা এবং ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়। তারপর সে সৃষ্টির আদি সম্পর্কে দৃষ্টি দেয় এবং এ আদি পর্যায় একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এর পর তা হতে দৃষ্টি জগতের বিকাশ ও পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে। পরবর্তী পর্যায়ে দেহবিচ্যুত আত্মার অবস্থাবৈচিত্র্য ও তার প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিবেচনা করে থাকে।

এটি আধ্যাত্মবিদ্‌দের কাছে একটি মহান শাস্ত্র। তাঁদের ধারণা, এটি তাঁদেরকে অস্তিত্বের যথাযথ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করে এবং তাঁদের ধারণা অনুসারে এটাই সৌভাগ্যের যথার্থ স্বরূপ। অনতিবিলম্বে তাঁদের এ ধারণার প্রতিবাদ বর্ণিত হচ্ছে। তাঁদের বিন্যাস অনুসারে এ শাস্ত্র পদার্থবিদ্যার পরবর্তী পর্যায়। এজন্যই তাঁরা একে 'পদার্থের পরবর্তী' (অধি) বিদ্যা বলে অভিহিত করে থাকেন।

এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষকের গ্রন্থাবলি মানুষের সামনে বিদ্যমান। ইবনে সিনা তাঁর 'কিতাবুশ্ শেফা ও নাজাত' গ্রন্থদ্বয়ে এদের সংক্ষিপ্ত-সার সংগ্রহ করেছেন। আন্দালুসের দার্শনিকদের অন্যতম ইবনে রুশদও এর সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশ করেছেন। উত্তরসূরিরা যখন জাতির শাস্ত্রালোচনার ধারা প্রবর্তন করলেন এবং এ বিষয়েও তাঁরা সংগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন ইমাম গাজ্জালী তার মধ্যে যা অগ্রাহ্য করার, তা অগ্রাহ্য করলেন।

অতঃপর উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ আলোচনার সামঞ্জস্যের জন্য এলমে কালাম ও দর্শনের বিষয়াদি একত্রে মিশ্রিত করে ফেললেন। এর ফলে এলমে কালামের বিষয় ও আধ্যাত্মবিদ্যার বিষয় সমতুল্য মনে হতে লাগল এবং তাদের সমস্যাগুলো প্রায় এক হয়ে দাঁড়াল। ফলে উভয় শাস্ত্র এমনভাবে মিশ্রিত হল যে, তারা যেন একটি শাস্ত্র। তারপর তাঁরা পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যায় দার্শনিক বিন্যাস পরিবর্তন করে ফেললেন এবং সেগুলোকে মিশ্রিত করে একটি শাস্ত্রে পরিণত করলেন। তাঁরা প্রথমে সাধারণ বিষয়াদি হিসেবে এলমে কালামের বর্ণনা করে এর পর দেহসংক্রান্ত বিষয়াদি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় এবং এর পর আত্মা সংক্রান্ত বিষয়াদি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনা করলেন। এভাবে তাঁরা উক্ত শাস্ত্রের শেষ অবধি অনুসরণ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনে খাতিব তাঁর 'মবাহিছুল মশরেকিয়া' নামক গ্রন্থে এবং তাঁর পরবর্তী সব কালামশাস্ত্রীই তাঁদের রচনাবলিতে করেছেন।

www.amarboi.org

এভাবে এলমে কালাম দর্শনের বিষয়ের সাথে মিশে গেছে এবং দর্শনের আলোচ্য বিষয়ে তার গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেন তাদের আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাদি একই উদ্দেশ্য বহন করছে। ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, এ শাস্ত্র সঠিক। অথচ এলমে কালামে বর্ণিত সমস্যাদি একমাত্র ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে প্রবর্তিত বিশ্বাসের সমষ্টি। পূর্বসূরিগণ এগুলোকে কোন প্রকার বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ ও ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ এই যে, এগুলো অনুরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ বুদ্ধি-বিবেচনা, ধর্মীয় বিধান ও তার যুক্তি-তর্ক থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা যে এসব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তা এজন্য নয় যে, তার দ্বারা তাঁরা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ এরূপ প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে দর্শনের ব্যাপার। বরং এসব যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাঁরা পূর্বসূরিদের মতাদর্শকে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাঁদের বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের অন্বেষণ। অন্যদিকে এর দ্বারা তাঁরা সে সব অভিনব মতাদর্শকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন, যার অনুসারীরা ধারণা করে যে, এ ব্যাপারে তাদের উপলব্ধির ভিত্তি হল বুদ্ধিমত্তা। অবশ্য তাঁদের এ প্রচেষ্টাও ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রুতিনির্ভর প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা এবং পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বাস করার পরই অস্তিত্বে এসেছে। যুক্তি-প্রমাণের এ দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

কারণ ধর্মপ্রবর্তকের উপলব্ধির পরিধি মননশীল উপলব্ধির যুক্তি-প্রমাণ হতে ব্যাপকতর বিন্যাসে অবস্থিত। এটি সর্বদাই বুদ্ধির উপরে অবস্থান করে এবং তাকে পরিবেষ্টন করে থাকে। কেননা এটি সর্বদাই ঐশ্বরিক জ্যোতির দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং এটি কোনক্রমেই দুর্বল মননশীলতা ও পরিবেষ্টিত উপলব্ধির অধীনে আসতে পারে না। কাজেই ধর্মপ্রবর্তক যখন আমাদেরকে কোন একটি উপলব্ধির দিকে পথ প্রদর্শন করেন, তখন আমাদের উচিত তাকে আমাদের উপলব্ধির উপরে স্থান দেয়া এবং অনুরূপভাবেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আমরা মননশীল উপলব্ধির দ্বারা কখনই তাকে শুদ্ধ করতে অগ্রসর হব না; যদিও তা আমাদের মননশীলতার বিরোধী হয়। বরং তাকে আমরা বিশ্বাস ও জ্ঞান হিসেবেই আদেশ পালনে তৎপর হব। আমরা যদি এর কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হই, তা হলে তৎসম্পর্কে নীরব থাকব এবং তাকে ধর্মপ্রবর্তকের দিকে আরোপ করব ও আমাদের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকব।

ধর্মদ্রোহীরা পূর্বসূরিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করে যে সব যুক্তিগ্রাহ্য অভিনব মতামতের প্রচার করেছিল, কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা সেগুলোর প্রতিরোধকল্পেই এ সব যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাদের অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করতে অগ্রসর হলেন এবং এ কারণেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদির প্রয়োজন দেখা দিল; যাতে পূর্বসূরিদের মতাদর্শ তার সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যায় আলোচিত বিষয়াদির বিচার-বিবেচনা করে শুদ্ধ ও অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটি কখনই এলমে কালামের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের বিচার-বিতর্কের বিষয়ও এটি নয়।

www.amarboi.org

পাঠক, জেনে রাখুন, আমাদের এ আলোচনা এ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত, যাতে আপনি উক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ এ দুটি শাস্ত্র উত্তরসূরিদের কাছে তাদের গঠন ও রচনার দিক থেকে মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু সত্য এই যে, তাদের প্রত্যেকটিই সংশ্লিষ্ট অধিকারীর জন্য তাদের আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাদিসহ পৃথক। তাদের এ মিশ্রণ একমাত্র যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের দিক হতেই সম্ভব হয়েছে এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের এমন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে, যেন তাঁরা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি আদৌ তা নয়; বরং তা শুধু ধর্মদ্রোহীদের মতামতের প্রতিবাদ। যে সত্যকে ধরে নিয়ে তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েছেন, তা সকলের কাছে সুপরিজ্ঞাত।

অনুরূপভাবে উত্তরসূরিদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসী সুফীসাধক কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাঁদের দিব্যানুভূতি নিয়েও আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁরা উপরিউক্ত দুটি বিষয়ের সাথে তাঁদের বিষয়টি মিশ্রিত করে সব ব্যাপারটিকেই এক আলোচনার অন্তর্গত করেছেন। যেমন—নবুয়ত, একত্ব, অবতারত্ব, এককসত্তা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা। অথচ এ তিনটি বিষয়ে উপলব্ধির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারী ধারা থেকে সুফীসাধকদের উপলব্ধি বহুদূরে অবস্থিত। কারণ তাঁরা এ ব্যাপারে দিব্যানুভূতির কথা বলেন এবং কোন প্রকার প্রমাণ থেকে সর্বদা দূরে থাকেন। বস্তুত দিব্যানুভূতি শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তার অনুসারী উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে বিরাজমান। আমরা ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং পরেও আলোচনা করব। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ই একমাত্র যথার্থ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

www.amarboi.org

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[যাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এসব শাস্ত্র এমন কিছু যোগ্যতার কথা আলোচনা করে, যা দ্বারা মানুষের আত্মশক্তি মৌলিক উপাদানের জগতে বিশেষ প্রভাব প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়। এ প্রভাব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন কিছুর সহায়তা গ্রহণ না করলে, তাকে বলা হয় 'যাদু' এবং আকাশীয় বিষয়াদির সহায়তা গ্রহণ করলে, তাকে বলা হয় 'ইন্দ্রজাল'।

ধর্মীয় বিধানে যেহেতু এসব বিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল; কেননা এগুলোতে অনিষ্টকর বিষয় এবং আল্লাহ ছাড়া নক্ষত্র অথবা অন্যবিধ শক্তির প্রতি একাগ্র হওয়ার শর্ত ছিল, সেজন্য এ সম্পর্কীয় রচনাবলি মানুষের কাছে ছিল না বললেই চলে। শুধু হযরত মুসা (আঃ)-র পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিগুলোর গ্রন্থাদিতে যা কিছু পাওয়া যেত। যেমন—নবতী ও কেলাদীয়দের গ্রন্থাবলি। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী সব নবীই কোন প্রকার ধর্মীয় বিধান এবং তৎসম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেননি। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে উপদেশ, আল্লাহ্র একত্ব এবং বেহেশত-দোজখ সম্পর্কীয় বিবরণই লিপিবদ্ধ থাকত।

সুতরাং এসব বিদ্যা ব্যাবিলনের অধিবাসী সিরীয় ও কেলাদীয়দের মধ্যে এবং মিশরের কিবতী ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এসব বিষয়ে তাদের মধ্যে গ্রন্থাদি ও অন্যান্য নিদর্শনও ছিল। এ বিষয়ে তাদের গ্রন্থাদির অতি অল্পই আমাদের মধ্যে অনূদিত হয়েছে। যেমন ব্যাবিলনের ধারা অনুসারে ইবনে ওয়াহশিয়া রচিত 'আল ফালাহতুন্ নবতিয়া' গ্রন্থটি। মানুষ এ গ্রন্থ থেকে এ বিষয়টি গ্রহণ করে তাকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করেছে। এর পর বিষয়টি তারা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছে। যেমন—'সাত তারকার পুস্তিকাবলি' এবং নক্ষত্র, রাশিচক্র ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত 'তিমতিম হিন্দী' নামক গ্রন্থ।[২৭০]

পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলে এ জাতির নেতৃস্থানীয় যাদুকর জাবের ইবনে হাইয়ানের[২৭১] আবির্ভাব ঘটল। তিনি এবিষয়ে সব জাতির গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করে এ শিল্পটিকে আবিষ্কার করলেন এবং এর সারাংশ অন্বেষণ করে একে যথানিয়মে প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক রচনা বিদ্যমান। তিনি এ বিষয়ে ও 'সিমিয়া'[২৭২] শাস্ত্রে তাঁর আলোচনাকে দীর্ঘ করেছেন; কেননা শেষোক্তটি তারই অনুসারী। কারণ কোন একটি

---

২৭০. 'তুমতুম' 'তমতম' (রোজেনথাল)।

২৭১. কিমিয়া বা রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই ইতিহাসখ্যাত।

২৭২. মূল গ্রন্থে আমরা সিমিয়া পেয়েছি; কিন্তু শব্দটি কিমিয়া হলে অধিকতর মানানসই হত।

www.amarboi.org

আকৃতিকে অন্য কোন আকৃতিতে রূপান্তরিত করা একমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারাই সম্ভব, বাস্তব শিল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা নয়। সুতরাং তাও এক প্রকার যাদুবিদ্যা; যেমন আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

অতঃপর আন্দালুসের যাদুশাস্ত্রাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়াদির নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী মাসলামা ইবনে আহমদ মাজারিতী আবির্ভূত হলেন। উপরিউক্ত সব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার রচনা ও সংস্কার সাধন করলেন এবং 'গায়াতুল হাকিম' নামক তাঁর গ্রন্থে সবাইকে একত্র করে ফেললেন। তাঁর পরে আর কেউ উপরিউক্ত বিষয়ে কোন রচনা উপস্থিত করেননি।

পাঠক, এখানে আমরা আপনার সামনে যাদুর স্বরূপ উদঘাটনের জন্য একটি ভূমিকার অবতারণা করব। এটি এই যে, মানুষের আত্মাসমূহ যদিও জাতিগত দিক থেকে এক; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা বিভিন্ন। তাদের কয়েকটি প্রকার বিদ্যমান এবং প্রতিটি প্রকার সত্তাগত দিক থেকে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতিটি প্রকারের জন্য তার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তি ও জন্মগত চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নবী (আঃ)-দের আত্মাসমূহের জন্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা তাঁদেরকে মানবীয় আত্মশক্তি হতে ফেরেশতীয় আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করে, এবং রূপান্তরণে এ বিশেষ মুহূর্তটিতে তাঁরা যথার্থই ফেরেশতা হয়ে দাঁড়ান। এটাই ওহীর তাৎপর্য; যেমন যথাস্থানে তার আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটাই সেই অবস্থা, যাতে তাঁরা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ এবং পবিত্র ও মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রেরিত ফেরেশতাদের ভাষণের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এ অবস্থা থেকেই তাঁরা সৃষ্টিজগতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা লাভ করেন।

যাদুকরদের আত্মার মধ্যেও এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দ্বারা তারা সৃষ্টি জগতে প্রভাব বিস্তার এবং সেজন্য ব্যবহারের নিমিত্ত নক্ষত্রীয় আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের এ প্রভাব বিস্তার একান্ত আত্মিক শক্তি বা শয়তানী শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু নবীদের প্রভাবের মূলে ঐশ্বরিক সাহায্য এবং ঐশী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর যাদুকরদের অদৃশ্য সংবাদ অবগত হওয়ার প্রক্রিয়ায় শয়তানী শক্তির বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল। এভাবে আত্মশক্তির প্রতিটি প্রকারেই এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অপরের মধ্যে পাওয়া যায় না।

যাদুকরদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ আত্মশক্তি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত; এদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। এদের প্রথম পর্যায় হল মানসিক শক্তিতে প্রভাব বিস্তারকারী; এরা এ ব্যাপারে কোন কৌশল বা মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে না। এ পর্যায়টিকেই দার্শনিকগণ যাদু (সিহর) বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মশক্তি আকাশমণ্ডল, মৌলিক উপাদান অথবা সংখ্যার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মেজাজের সহায়তায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাঁরা একে বলেন ইন্দ্রজাল (তিলিসমাত)। মর্যাদার দিক হতে এটি পূর্বটি অপেক্ষা নিম্নমানের। তৃতীয় পর্যায়টি কল্পনাশক্তির মধ্যে তার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে চায় এবং এক্ষেত্রে সে বিচিত্র তৎপরতার দ্বারা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। সে এই কল্পনার মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত মূর্তি, আকৃতি ও দৃশ্য—যা তার ইচ্ছাশক্তি আনয়ন করতে সক্ষম,

www.amarboi.org

তা উপস্থিত করে। পরে সে এগুলোকে তার আত্মশক্তির প্রভাবে দর্শকদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে অবতরণ করায় এবং এর ফলে দর্শকরা এগুলোকে বাস্তবে অস্তিত্বশীল বলে দেখতে পায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে অনুরূপ কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেমন অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উদ্যান, নদ-নদী ও প্রাসাদ দেখিয়েছে; অথচ বাস্তবে সেখানে অনুরূপ কিছু ছিল না। একে দার্শনিকগণ 'শউযা' অথবা 'শবযা' অর্থাৎ ভোজবাজি বলে আখ্যায়িত করেন। এটাই এ পর্যায়গুলোর ব্যাখ্যা।

অতঃপর এ বৈশিষ্ট্য যাদুকরদের আত্মশক্তিতে সম্ভাবনার আকারে সুপ্ত থাকে; যেমন সমস্ত মানবিক শক্তির স্বাভাবিক অবস্থা। এটি একমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমেই বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত যাদুকরদের এ অনুশীলন আকাশমণ্ডল, নক্ষত্রাদি, উর্ধ্ব জগৎ, শয়তানী শক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার সম্মান, উপাসনা, বিজয়, আনুগত্যের মাধ্যমে একাগ্র হওয়ার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এজন্যই একে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি একাগ্রতা ও প্রণিপাত বলে চিহ্নিত করা হয় এবং বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি একাগ্রতা ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর। এ দিক হতেই যাদু মাত্রেই ধর্মদ্রোহিতা এবং এর উপাদান ও কার্যকারণের মধ্যে এ ধর্মদ্রোহিতা বিদ্যমান; যেমন পাঠক, আপনি ইতোপূর্বে লক্ষ করেছেন। সম্ভবত এজন্য ধর্মশাস্ত্রবিদ্গণ যাদুকরকে হত্যা করার ব্যাপারে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। কেননা এ হত্যার বিধান কি তার কার্যাবলির পূর্বেকার ধর্মদ্রোহিতার জন্য অথবা সে যে দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করেছে এবং সেজন্য সৃষ্টিজগতে যে অনাসৃষ্টি দেখা দিয়েছে, সেজন্য? অবশ্য তার কার্যের দ্বারা উক্ত সব কিছুই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যেহেতু যাদুশক্তির প্রথম দুটি পর্যায়ের জন্য একটি বাস্তব তাৎপর্য বিদ্যমান এবং তৃতীয় পর্যায়টির অনুরূপ বাস্তবতা বলে কিছু নেই, সেজন্য জ্ঞানীরা এ শক্তি সম্পর্কে মতভেদের সম্মুখীন হয়েছেন। বস্তুত এ যাদুশক্তির যথার্থই কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে, না এটা একান্তই কাল্পনিক বিষয়? যারা এর বাস্তব অস্তিত্বের কথা বলেন, তাদের দৃষ্টি প্রথম দুটি পর্যায়ের দিকে নিবদ্ধ এবং যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন, তারা এ শেষ তৃতীয় পর্যায়টির দিকে লক্ষ করে থাকেন। সুতরাং যথার্থ অর্থে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই; বরং এ পর্যায়গুলোর মিশ্রণের ফলেই এ পার্থক্য দেখা গেছে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

পাঠক, জেনে রাখুন, আমরা ইতোপূর্বে যে প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছি, তার জন্য জ্ঞানীদের মধ্যে যাদুর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন এ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'বরং শয়তানরাই ধর্মকে অস্বীকার করে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা কিছু ব্যাবিলনে দুজন ফেরেশতার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল; হারূত ও মারূত। তারা এ কথা না বলে কাউকেও শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষা মাত্র; সুতরাং ধর্ম ত্যাগ কর না। তারা তাদের উভয়ের কাছ থেকে সেসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত, যা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তা দিয়ে কারও কোন ক্ষতি করতে পারত

www.amarboi.org

না'।[২৭৩] বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে যাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে তাঁর এরূপ মনে হত যে, তিনি কোন কাজ করছেন; অথচ প্রকৃত অবস্থায় তিনি তা করছেন না। তাঁর উপর কৃত যাদু একটি চিরুনীর মধ্যে রেশমে পেচিয়ে একটি খেজুরপাতার খাপে পুরে 'সিরোয়ান' নামী একটি কূপে[২৭৪] প্রোথিত করে রাখা হয়েছিল তারপর পরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ 'মুআব্বাযাত' (আশ্রয় প্রার্থনা) নামীয় দুটি সূরায় এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : (আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি) 'গ্রন্থিতে ফুঁৎকার প্রদানকারিণীদের অকল্যাণ হতে।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর যেসব গ্রন্থির দ্বারা তাঁকে যাদু করা হয়েছিল, তার প্রতিটির উপর এটি পাঠ করতে না করতেই তা খুলে যেত।'

ব্যাবিলনের অধিবাসী, যারা নবতী, কেলাদীয় ও সিরীয়, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ছিল। এ সম্পর্কে কুরআন বক্তব্য রেখেছে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ব্যাবিলন ও মিশরে যাদুবিদ্যার বাজার খুবই তেজী ছিল। এ জন্য মুসার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তারা যে বিষয়ে দক্ষতা দাবি করত এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত, তার সমগোত্রীয় ছিল। মিশরের সাইদ অঞ্চলের মন্দিরাদির মধ্যে এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান, যা উক্ত যাদুবিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমরা স্বচক্ষে এমন এক যাদুকরের কার্যকলাপ দেখেছি, যে কাকেও যাদু করতে হলে তার মূর্তি নির্মাণ করত এবং তাতে ঐ ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান বৈশিষ্ট্যাদির বিপরীত যাদুকরের ঈপ্সিত ও সাধনযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্যের আরোপ করত। এসব বৈশিষ্ট্যের সংকেত ছিল সংযোজন ও বিয়োজন সম্পর্কীয় কতিপয় নাম ও গুণ। তারপর সে যাদুর জন্য নির্ধারিত ঐ ব্যক্তির যথার্থ বা প্রায় যথার্থ মূর্তির উপর তার বাণী প্রয়োগ করত এবং এ অশালীন ভাষা বারংবার উচ্চারণ করার ফলে তার মুখে জমে উঠা থুথু তার উপর নিক্ষেপ করত। এর সাথে সে পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বস্তুতে গিঁট দিত এবং এর দ্বারা সে তার যাদুর অবশ্যম্ভাবী প্রভাবকে সফল করার সু-ধারণা পোষণ করত। সে তার ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী জিনকে উদ্দেশ্য সফলের আহ্বান জানাত এবং এর মাধ্যমে তার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলত। বস্তুত এ মূর্তি নির্মাণ ও অশালীন ভাষার মধ্যে একটা অশুভ শক্তি বিদ্যমান, যা তার ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসত। এর ফলে তার এ প্রক্রিয়া থেকে একটি অশুভ শক্তি জাগ্রত হয়ে যাদুকৃত ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করত।

যাদুবিদ্যার চর্চাকারী এমন অনেক ব্যক্তির কার্যকলাপও দেখেছি, যারা কোন কাপড়ের টুকরা বা চামড়ার অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে তার মন্ত্র উচ্চারণ করেছে এবং ঐগুলো তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এরূপভাবে অনেকে চারণভূমিতে ছাগলের পেটের দিকে কর্তনের ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করেছে এবং পরিণামে পেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা শুনতে পেয়েছি যে, বর্তমানকালে হিন্দে এমন যাদুকরও আছে, যারা কোন মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুর

---

২৭৩. কোরান; ২, ১০২।
২৭৪. উক্ত কূপটি মদিনায় অবস্থিত।

www.amarboi.org

কোলে ঢলে পড়ে। অনেক সময় তার হৃদপিণ্ড খুঁজলে আর তা দেহের অভ্যন্তরে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ডালিমের প্রতি ইঙ্গিত করলে তার দানাগুলো উধাও হয়ে যায়। এরূপ সুদান ও তুরস্ক সম্পর্কে আমরা শুনেছি যে, সেখানে এমন যাদুকর আছে, যারা মেঘমালাকে যাদু করে নির্ধারিত স্থানে বৃষ্টি বর্ষাতে বাধ্য করে।

অনুরূপভাবে আমরা 'প্রণয় সংখ্যার' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। এগুলো হল—'রে-কাফ-রে-ফে-দাল্'; দুটি সংখ্যার একটি হল দুশ বিশ এবং অপরটি হল দুশ চুরাশি। এদের প্রণয় সংখ্যা হওয়ার অর্থ হল এই যে, এদের প্রতিটির অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এবং অনুরূপ অংশাদি একত্র করলে সঙ্গী অন্য সংখ্যাটির সমান হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই এগুলোকে 'প্রণয় সংখ্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রজালবিদ্যার অধিকারীরা বর্ণনা করেছে যে, প্রণয়ী যুগলের মধ্যে প্রীতিবর্ধন এবং উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাগুলোর জন্য প্রভাব বিদ্যমান। এ উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করতে হবে। এদের একটি শুক্রের উদয়কালে, যখন সে তার কক্ষে অথবা উন্নত অবস্থায় চন্দ্রের প্রতি প্রণয় ও সম্মতিসহ দৃষ্টিপাত করছে, তখন নির্মিত হবে এবং অপরটির জন্য প্রথমটির সপ্তম অবস্থান বেছে নিতে হবে। এদের একটি প্রতিমূর্তির উপর একটি সংখ্যা এবং অপরটির উপর অপর সংখ্যাটি থাকবে। এর মাধ্যমে তার অর্থাৎ প্রিয়তমের মিলনের আধিক্য কামনা করতে হবে। আমি জানি না, এ ক্ষেত্রে আধিক্য বলতে সংখ্যা না অংশের কথা বলা হয়েছে। যাহোক এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণয়ী যুগলের মধ্যে এমন বিরাট সম্প্রীতির সৃষ্টি হবে, যার জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। 'গায়াতুল হাকিম' গ্রন্থ রচয়িতা এবং অনুরূপ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। এর বাস্তব অভিজ্ঞতারও প্রমাণ আছে।

অনুরূপভাবে 'সিংহ মোহর'-এর কথাও উল্লেখ করা যায়; যাকে 'নুড়ি মোহর'ও বলা হয়। এটা একটি ধাতুনির্মিত অঙ্গুস্তানায় একটি সিংহের মূর্তি অঙ্কিত করা, যার লেজটি মাটির উপর ঝুলে থাকবে এবং সে নুড়িস্তূপে কামড় দিয়ে তাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলবে। এর সামনে থাকবে একটি সাপের মূর্তি, যা সিংহের সম্মুখস্থ পদদ্বয়কে বেষ্টন করে উর্ধ্বফণা অবস্থায় এমনভাবে থাকবে, যাতে তার মুখব্যাদন সিংহের মুখের সামনে অবস্থান করে। সিংহের পৃষ্ঠদেশে হামাগুড়ি দিচ্ছে, এমন একটি বৃশ্চিক মূর্তি আঁকতে হবে। এভাবে সমস্ত বিষয়টি আঁকার জন্য যাদুকরকে এমন একটি সময় বেছে নিতে হবে, যখন সূর্য সিংহে প্রথম অথবা তৃতীয় মুখে প্রবেশ করে। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, তখন সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই তাদের শুভ অবস্থায় এবং অকল্যাণ যোগ হতে দূরে থাকে। যখন এ দিনক্ষণ পাওয়া যাবে ও অঙ্কনকারী তার মধ্যে তার কার্য সমাধা করতে পারবে, তখন ঐ সময়ে যে এক মিসকাল বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ স্বর্ণের মধ্যে এ মোহর প্রস্তুত করে রাখবে। পরে একে গোলাপজলে বিগলিত জাফরানের মধ্যে ডুবিয়ে হলুদবর্ণ রেশমের একটি বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে সংরক্ষণ করবে।

মানুষের ধারণা এই যে, উক্ত মোহর ধারণকারী শাসকদেরকে সাহচর্য, সেবা ও তাদেরকে বশীভূত করার ব্যাপারে এমন এক ক্ষমতার অধিকারী হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনুরূপ শাসকগণও তা পরিধান করলে তাদের অধীনস্থদের উপর

www.amarboi.org

অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হন। এ প্রক্রিয়াটিও যাদুবিদ্যার অধিকারীরা 'গায়াতুল হাকিম' ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানে এর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণও তারা তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে সূর্যের বিশিষ্ট ষড়ভুজক্ষেত্রের[২৭৫] সাথে সামঞ্জস্য বিধানেরও ব্যাপার রয়েছে। তারা বর্ণনা করেছেন যে, এটি নির্মাণ করতে হবে এমন এক সময়ে, যখন সূর্য তার উন্নত অবস্থায় অকল্যাণের পরিধি হতে বিমুক্ত হয়ে বিরাজমান এবং চন্দ্রও রাজকীয় ভাগ্যোদয়ের এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে দশম কক্ষের অধিকারীর প্রণয় ও সম্মতিপূর্ণ দৃষ্টি উদীয়মানের প্রতি আরোপিত বলে গণ্য করা হয়। এ পর্যায়ে মহান যুক্তি-প্রমাণের সহায়তায় রাজকীয় জন্মাদি শুভ বলে পরিগণিত হয়। এর পর সুগন্ধীতে ডুবিয়ে তাকে হলুদবর্ণের একখণ্ড রেশমি বস্ত্রে তুলে রাখতে হবে। তাদের ধারণা, এভাবে নির্মিত অঙ্গুস্তানায় রাজকীয় সাহচর্য, সেবা ও সৌহার্দ্যের এক অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান। এমন বিষয়াদির উদাহরণ প্রচুর।

মাসলামা ইবনে আহমদ মাজরিতী প্রণীত 'গায়াত' গ্রন্থটি এ শিল্পজ্ঞানের একটি উত্তম সংগ্রহ; সেখানে এর সব বিষয় ও সমস্যা পরিপূর্ণ বিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে খতিব এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন, 'সের্রুমাক্তুম'। গ্রন্থটি পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান এবং সেখানকার অধিবাসীরাই তা ব্যবহার করছে; অবশ্য আমাদের তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমাদের ধারণা এই যে, ইমাম ইবনে খতিব এ বিষয়ের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নন। সম্ভব ব্যাপারটি এর বিপরীত কিছু। মাগরিব অঞ্চলে এমন যাদুবিদ্যার অধিকারী একশ্রেণীর লোককে বলা হয় 'কর্তনী'।[২৭৬] এদের কথাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এরা বস্ত্র বা চর্মখণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ছাগলের পেট কর্তনের ইঙ্গিত করলে তা কর্তিত হয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে পড়ে। বর্তমানকালে এদের এই 'কর্তনী' নাম হওয়ার কারণ এই যে, এরা যাদুবিদ্যার মধ্যে এ বিষয়টিকেই বেশি মাত্রায় ধারণ করে আছে। এরা ছাগলের মালিকদেরকে এর দ্বারা ভয় দেখায়, যাতে তারা অতিরিক্ত পশু থাকলে তা যাদুকরকে দিয়ে দেয়। অবশ্য যাদুকররা শাসকদের ভয়ে এ কাজটি একান্ত গোপনে করে থাকে।

আমি অনুরূপ একটি দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এবং তাদের এসব কার্যকলাপও লক্ষ করেছি। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তাদের জন্য নক্ষত্র ও জিনের আত্মিক শক্তিকে সহযোগী করার অধার্মিক প্রার্থনাদিসহ এক প্রকার বিশেষ সাধনা ও একাগ্রতার একটি প্রক্রিয়া আছে। এ বিষয়ে তাদের কাছে 'খিঞ্জিরিয়া'[২৭৭] নামে লিখিত একটি পুস্তিকাও বিদ্যমান এবং তারা তার পঠন-পাঠনে নিরত। তারা এমন সাধনা ও একাগ্রতার দ্বারা এসব কাজ সম্পাদন করার শক্তি অর্জন করে। অবশ্য তাদের এমন

২৭৫. সূর্যের বিশিষ্ট 'ছত্রিশ ক্ষেত্র' (রোজেনথাল)।
২৭৬. মূল 'বাআব'; 'বাআধীন'।
২৭৭. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

www.amarboi.org

যাদুশক্তির প্রভাব স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া আসবাবপত্র, পশু ও দাস-দাসীর উপর কার্যকরী হয়ে থাকে। তারা এ প্রভাবের ক্ষেত্রকে এ বলে ব্যাখ্যা করে যে, যা দেরহামের বিচরণ ক্ষেত্র, তাদের প্রভাব সেখানেই কার্যকরী হয়। অর্থাৎ এমন সমস্ত সম্পত্তি, যার ক্রয়-বিক্রয় ও অধিকার লাভ করা যায়। এরূপই তাদের ধারণা; আমি তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করায় তারা আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে। আর তাদের কার্যাবলি তাও প্রকাশ্য ও বর্তমান; আমরা তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে অবগত এবং কোন প্রকার দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ ছাড়াই আমরা এসব প্রত্যক্ষও করেছি।

পৃথিবীতে যাদুবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের অবস্থা ও প্রভাব এরূপ। অবশ্য দার্শনিকরা একে মানবাত্মার প্রভাবজাত বলে প্রতিষ্ঠিত করার পর যাদু ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং তাঁরা এটাও প্রমাণিত করেছেন যে, মানবাত্মার জন্য প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুত এ আত্মশক্তি তৎসংশ্লিষ্ট দেহের উপর অস্বাভাবিক ধারায় এবং দৈহিক কার্যকারণের পরিধির বাইরেও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। বরং বলা যায় যে, এসব প্রভাব আত্মশক্তির বিচিত্র অবস্থার ফসল। কখনও এটি আনন্দ ও সুখানুভূতিজাত উষ্ণতার ন্যায়; আবার কখনও এটি আত্মগত ধারণার আকারে—যেমন কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কোন প্রাচীরের প্রান্তদেশ অথবা ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে পদচারণাকারীর অবস্থাকে এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যায়। অনুরূপ অবস্থায় যদি তার মধ্যে পতনের কল্পনা বলবতী হয়, তাহলে সে অবশ্যই পতিত হবে। এজন্যই বহু লোককে দেখা যায় যে, তারা অনুশীলনের মাধ্যমে এ কাজটি এমনভাবে রপ্ত করে, যাতে তাদের মধ্যে হতে এ পতনের কল্পনা দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে, পাঠক আপনি দেখতে পান যে, তারা প্রাচীরের প্রান্তদেশ ও ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে; অথচ পড়ে যাবার কোন প্রকার ভীতি তাদের মধ্যে নেই।

এর দ্বারা এ কথায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ বিষয়টি মানবাত্মার প্রভাবের ফল এবং পতন সম্পর্কীয় তার ধারণা কল্পনারই ফসল। সুতরাং অনুরূপভাবে আত্মশক্তি যদি দেহজ স্বাভাবিক কার্যকারণের পরিধির বাইরেও দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়, তা হলে তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেহ ছাড়া অন্যত্রও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। কেননা তৎসংশ্লিষ্ট ঐ জাতীয় অন্যান্য দেহের উপর প্রভাব বিস্তারের ধারা একই। যেহেতু তার এ প্রভাব কোন বিশেষ দেহের প্রতিক্রিয়াজাত এবং এর পরিমণ্ডলে বিন্যস্ত নয়, সুতরাং এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মশক্তি সর্বপ্রকার দেহের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

অবশ্য তারা যে যাদু ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তা হল এই যে, যাদুকর কোন প্রকার সহায়কশক্তির মুখাপেক্ষী নয় এবং ঐন্দ্রজালিক নক্ষত্রের আত্মশক্তি, সংখ্যার রহস্যজ্ঞান, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং জাগতিক উপাদানে প্রভাবশীল আকাশীয় পরিমণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ করে থাকে। জ্যোতিষবিদ্‌রাও এ শেষোক্ত প্রভাবের কথা বলে থাকে। দার্শনিকরা আরও বলেন, যাদু হল আত্মশক্তির সাথে আত্মশক্তির ঐক্য এবং

www.amarboi.org

ইন্দ্রজাল হল দেহের সাথে আত্মশক্তির একত্ববোধ। তাঁদের কাছে এর অর্থ হল, আকাশীয় উন্নত প্রকৃতির সাথে নিম্ন প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন। উন্নত প্রকৃতি হল নক্ষত্রমণ্ডলীয় আত্মশক্তি। এ কারণে যাদুবিদ্যার অধিকারী সাধারণভাবে জ্যোতিষের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। দার্শনিকদের কাছে যাদুকর তার যাদুশক্তি অর্জন করে না; বরং তাঁদের ধারণা এই যে, এ বিশেষ ধরনের শক্তির প্রভাব তার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বর্তমান থাকে।

দার্শনিকদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, অলৌকিক ক্রিয়ার প্রভাব ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে এবং তা এ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য আল্লাহ্‌র শক্তির দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। অথচ যাদুকর তার কার্য-কলাপ নিজের দিক থেকে নিজ আত্মশক্তির দ্বারা সংঘটিত করে থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সে শয়তানী শক্তিগুলোর সাহায্যও গ্রহণ করে। সুতরাং এদের মধ্যকার পার্থক্য এদের বোধগম্যতা, স্বরূপ ও সত্তার মধ্যে বিধৃত। আমরা কেবল এদের বাহ্যিক নিদর্শনাদির দ্বারাই পার্থক্যের যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করে থাকি। এটি এই যে, যিনি কল্যাণের অধিকারী, কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, কল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গিত প্রাণ এবং যিনি তাঁর কার্যের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি উত্থাপন করেন, তেমন ব্যক্তিবর্গই আলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। কিন্তু যাদু একমাত্র অশুভ তৎপরতার অধিকারী ও অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। এর দ্বারা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও শত্রুর ক্ষতিসাধন এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ করে থাকে। এটি বস্তুত এমনসব ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়, যাদের আত্মশক্তি অশুভ প্রভাবের অধিকারী। এটাই অধ্যাত্মবিদ্ দার্শনিকদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য।

কখনও অনেক সুফীসাধক ও বিভূতির অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যেও জাগতিক ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা যায়। অবশ্য একে যাদু বলে গণ্য করা হয় না। কারণ এটি একমাত্র ঐশ্বরিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়। কেননা তাঁদের সাধনার দ্বারা ও আচার-অনুষ্ঠান নবুয়তের প্রভাবজাত এবং তার অনুসারী। তাঁরা তাঁদের দশা, বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি একাগ্র নিষ্ঠার কল্যাণে ঐশ্বরিক সহায়তার একটা বিরাট অংশ লাভ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কখনও অশুভ কাজে সমর্থ হলেও তা সম্পূর্ণ হয় না; কেননা তাদের অনুরূপ প্রভাব কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁরা ঐশী নির্দেশের অধীন এবং এজন্য তাঁরা অনুরূপ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং তারা যে বিষয় সম্পর্কে অনুমতিপ্রাপ্ত হননি, তা তাঁরা করতে পারেন না এবং এসব সত্ত্বেও কেউ অনুরূপ কার্য করলে, তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন। অনেক সময় এ কারণে তাঁর দশাও অন্তর্হিত হয়ে যায়। কাজেই অলৌকিক ক্রিয়া যেহেতু আল্লাহ্‌র সহায়তা ও ঐশ্বরিক শক্তি সহযোগিতার ফসল, সেজন্য এর সাথে যাদুপ্রক্রিয়ার কোন কিছুই বিরোধ উপস্থিত করতে পারে না।

www.amarboi.org

পাঠক, আপনি ফেরাউন কর্তৃক নিয়োজিত যাদুকরদের অবস্থা লক্ষ করুন। তারা হযরত মুসার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে তাদের রচিত সর্বপ্রকার ইন্দ্রজাল কী করে যষ্ঠির অলৌকিকক্রিয়ার গ্রাসে পরিণত হয়েছিল! তাদের সব যাদু বিধ্বস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে; যেন কখনও সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। অনুরূপভাবে নবী (সঃ)-এর উপর 'আশ্রয় প্রার্থনা'র দুটি সূরা অবতীর্ণ হলে তাতে এ বাক্যটি—'এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকার প্রদানকারিণীদের অকল্যাণ হতে' ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর তিনি যেসব গ্রন্থির দ্বারা যাদুকৃত হয়েছিলেন, তার প্রতিটির উপর এটি পাঠ করতে না করতেই খুলে গিয়েছিল। কাজেই যাদু আল্লাহ্‌র নাম এবং বিশ্বাসের আন্তরিকতার সাথে তার উচ্চারণ দ্বারা বিনষ্ট হয়।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'যরকশ কাবিয়ী'[২৭৮] নামে পারস্য সম্রাট খসরুর একটি পতাকা ছিল। তাতে আকাশমণ্ডলীয় ধারায় শত সংখ্যার একটি যাদুচক্র স্বর্ণসূত্রের দ্বারা বয়ন করা ছিল এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি রুস্তম নিহত হলে এবং পারস্য সৈন্যদল পরাজিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে উক্ত পতাকা ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়েছিল।

এ পতাকাটিতে ঐ যাদু প্রক্রিয়াই ছিল, যাকে ঐন্দ্রজালিক ও যাদুচক্রের প্রস্তুতকারীরা মনে করত যে, এটা সাথে থাকলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এরূপ একটি বিষয় কোন পতাকায় থাকলে অথবা তা সাথে বহন করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক সাহায্য এসে পৌঁছায় এবং নবী (সঃ)-এর সহচরদের বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাওয়ায়, উক্ত পতাকার অন্তর্গত প্রতিটি যাদুর গ্রন্থি খুলে পড়েছে, বিচলিত হয়েছে এবং তার সব তৎপরতা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অবশ্য ধর্মীয় বিধান এই যাদু, ইন্দ্রজাল ও ভোজবাজির মধ্যে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি করে না; বরং সবগুলোকে একই নিষিদ্ধ পর্যায়ে স্থাপন করে। কারণ ধর্মপ্রবর্তক আমাদের জন্য সেসব কর্মই বৈধ বলে নির্দেশ প্রদান করেন, যা দ্বারা আমরা আমাদের পারলৌকিক কল্যাণবাহী ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি অথবা যা দ্বারা আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের কল্যাণবাহী জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। যে কর্মধারা এ দুটির মধ্যে কোনটি সম্পর্কেই আমাদেরকে গুরুত্ব অনুধাবন করায় না; তার মধ্যে যদি ক্ষতি অথবা কোন প্রকার ক্ষতির কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা সেই ক্ষতির অনুপাতেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন যাদু-প্রক্রিয়া সংঘটনের মধ্যে আমরা এ ক্ষতি দেখতে পাই। ইন্দ্রজালও এর সাথে যুক্ত হয়; কেননা তাদের প্রভাবের পরিণাম একই। যেমন জ্যোতিষ তার প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ক্ষতির কারণ বিদ্যমান। কেননা এর ফলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি কার্যসম্পাদনের নির্ভরতার মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উক্ত কর্মধারা যদি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিকর কোন কিছু না হয়, তা

---

২৭৮. 'দয়ফ্‌শে কাবিয়াঁ' (রোজেনথাল)। অর্থ রাজকীয় পতাকা।

www.amarboi.org

হলেও তা পরিত্যাগ করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে প্রভূত সাহায্য করে থাকে। কারণ যে-কোন ব্যক্তির সুন্দর ইলম হল তার অনুপকারী সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। এ কারণেই বিধান যাদু, ইন্দ্রজাল ও ভোজবাজিকে একই পর্যায়ে ফেলেছে এবং তাদের মধ্যে ক্ষতির বিদ্যমানতার জন্যই সেগুলোকে দূষণীয় ও নিষিদ্ধ বলে বিবেচনা করেছে।

দার্শনিকগণ যে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ অলৌকিক ক্রিয়ার সাথে ভবিষ্যৎবাণীর সম্পর্ক নির্দেশ করে বলেছেন যে, এটা এমন এক বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা, যা সংঘটিত হয়ে সেই দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। তাঁরা বলেন, যাদুকর সর্বদাই এরূপ দাবি উত্থাপন হতে দূরে সরে থাকে এ কারণেই অনুরূপ কোন ঘটনা তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। মিথ্যা দাবির উপর অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিসম্মত নয়। কেননা অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সত্যের প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারটি বুদ্ধিগ্রাহ্যতার দ্বারা সিদ্ধ। কারণ উক্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সত্যতা প্রমাণ করা। সুতরাং তা যদি মিথ্যুকের দাবি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সত্যবাদী মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়াবে এবং এটা অসম্ভব। এ কারণেই সাধারণত মিথ্যুকের পক্ষে অলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

অবশ্য দার্শনিকদের কাছে এদুটির মধ্যকার পার্থক্যের কথা আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা হল উভয় দিকের মধ্যে পরম কল্যাণ ও পরম অকল্যাণের ব্যবধান। যাদুকরের দ্বারা কোন কল্যাণ অনুষ্ঠান সম্ভব নয় এবং যাদুও কোন প্রকার কল্যাণের কার্যকারণ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না। তেমনি অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারীর পক্ষে কোন প্রকার অকল্যাণ করা সম্ভব নয় এবং উক্ত ক্রিয়া কোন প্রকার অকল্যাণের কারণ সৃষ্টিতেও নিয়োজিত হয় না। বস্তুত এ দুটি যেন তাদের জন্মগত প্রকৃতির মধ্যেই পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান; তিনিই শক্তিমান ও পরাক্রান্ত; তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

এরূপ আত্মিক প্রভাবাদির সমগোত্রীয় হল 'নজর লাগা'। এটা অনুরূপ দৃষ্টির অধিকারীর আত্মিক প্রভাবের ফল। সে যখন কোন বস্তু বা অবস্থাকে সুন্দর দেখে এবং তার কাছে এর সৌন্দর্যকে অতিশয় মনে হয়, তখন তার এ সৌন্দর্যানুভূতি হতে তার মধ্যে এমন একটি হিংসার উদ্রেক হয়, যা উক্ত বস্তু বা বিষয়ের অধিকারীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে দেয় এবং এর ফলে তার বিনষ্টি ঘনিয়ে আসে। বস্তুত এ নজর লাগার বিষয়টি একটি সহজাত প্রকৃতি। এরও আত্মিক প্রভাবাদির মধ্যে পার্থক্য এই যে, এ নজরের ব্যাপারটি একটি সহজাত প্রবৃত্তি; এটি ব্যর্থ হয় না, অধিকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না এবং ইচ্ছা করলেও এটি অর্জন করতে পারে না। অবশ্য সব প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টি দিলে এমন অনেক প্রভাব পাওয়া যাবে, যা অনুরূপভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও উক্ত প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি প্রভাবকর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে সহজাত হল বিস্তারের সম্ভাবনা শক্তি; বিস্তার নয়। এজন্য তাঁরা বলেন, যাদু বা বিভূতির সাহায্যে হত্যাকারীকে হত্যা

www.amarboi.org

করা যাবে; কিন্তু বদনজরের দ্বারা হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। এরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে, সে এটি ইচ্ছা করে করেনি এবং তার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না অথবা সে এটা পরিত্যাগও করতে পারত না। বস্তুত এরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সে একান্তই বাধ্য। আল্লাহ্ই অদৃশ্য বিষয়ে উত্তম জ্ঞাতা এবং রহস্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্ণাদি-রহস্যশাস্ত্র]

এ শাস্ত্রকে বর্তমানকালে 'সিমিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। এর এ গঠনপ্রণালি ইন্দ্রজালবিদ্যা থেকে সুফীসাধকের মধ্যকার ক্ষমতা আরোপকারীদের দ্বারা পরিভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং একটি সাধারণ বিষয়কে বিশেষ অর্থে নিয়োজিত করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এ শাস্ত্রটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে দেখা দিয়েছে। সুফীসাধকদের মধ্যে গোঁড়ামির আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়ানুভূতির যবনিকাভেদের চেষ্টা, তাঁদের দ্বারা অস্বাভাবিক ঘটনাবলি সংঘটন ও মৌলিক উপাদানের জগতে ক্ষমতা আরোপ, নানাবিধ গ্রন্থ সংকলন ও পরিভাষার সৃষ্টি এবং একক সত্তা থেকে সমগ্র অস্তিত্বের বিকাশ ও বিন্যাস সম্পর্কে তাঁদের ধারণা জন্মের সময় এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

তাদের ধারণা এই যে, নামসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ আকাশমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্রের আত্মশক্তির মধ্যে রয়েছে এবং এসব নামের মধ্যে বর্ণাদির স্বভাব ও রহস্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তা বিন্যাসধারায় বিরাজিত এবং সৃষ্টিও তার প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে এ ধারা বহন করছে ও তার রহস্যলীলা প্রকাশ করছে। এ কারণেই এই বর্ণাদির রহস্যশাস্ত্রের জন্ম। এটি 'সিমিয়া'[২৭৯] শাস্ত্রেরই শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত এবং এর বিষয়বস্তু অবগতির অতীত ও এর সমস্যাদিও সংখ্যার দ্বারা সীমিত নয়। এ শাস্ত্রে আলবুনী,[২৮০] ইবনে আরবি ও অন্যান্য অনেকের, যারা উক্ত দুজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তাদের একাধিক রচনা বিদ্যমান। তাদের মতে এ শাস্ত্রের ফলশ্রুতি ও লাভ হল সৃষ্টিজগতে বিরাজমান রহস্যলীলাকে বেষ্টনকারী বর্ণমালা থেকে সৃষ্ট ঐশ্বরিক বাণী ও সুন্দর নামসমূহের দ্বারা বিদ্যানুভূতিসম্পন্ন আত্মার বস্তু জগতের উপর আরোপ করা।

তারপর তারা এ বর্ণাদির মধ্যে রক্ষিত ক্ষমতা আরোপের রহস্য নিয়ে মতানৈক্যে উপনীত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে একে বর্ণাদির মধ্যকার মেজাজের উপর নির্ভরশীল করেছেন এবং তারা মৌল উপাদানের ন্যায় এ বর্ণাদিকেও স্বভাব অনুসারে চারভাগে ভাগ করেছেন। মৌল পদার্থের স্বভাব অনুসারে প্রতিটি ভাগকে সেই স্বভাবের সাথে বিশিষ্ট করেছেন এবং ঐভাবে নির্দিষ্ট বর্ণাদির দ্বারা স্বভাব অনুযায়ী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং একটি কাল্পনিক বিভাগ

---

২৭৯. খুব সম্ভব 'কিমিয়া' শব্দের সাথে মিল রেখে উদ্ভাবিত।
২৮০. আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৬২২ (১২২৫ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

অনুযায়ী, যাকে তারা ভগ্নাংশকরণ বলে অভিহিত করেন, এসব বর্ণ মৌল পদার্থের ভিত্তিতে আগ্নেয়, বায়বীয়, জলীয় ও মৃন্ময় পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। এভাবে 'আলিফ' আগুনের জন্য, 'বে' বায়ুর জন্য, 'জিম' জলের জন্য এবং 'দাল' মৃত্তিকার জন্য নির্ধারিত। পুনরায় অনুরূপভাবে পদার্থ অনুসারে অবশিষ্ট বর্ণাদি পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আগ্নেয় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, সিন ও যাল; বায়বীর উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, দ্বোয়াত, তে ও স্বয়; জলীয় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—জিম, যে, কাফ, সোয়াদ, ক্বাফ, ছে ও গাইন এবং মৃন্ময় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—দাল, হ্বে, লাম, আইন, রে, খে ও শিন নির্ধারিত হয়েছে।

আগ্নেয় বর্ণগুলো শৈত্যজনিত রোগাদি দূর করার জন্য এবং যেখানে উত্তাপ সৃষ্টির আতিশয্যের প্রয়োজন সেখানে তাই ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবহার অনুভূতির দিক থেকে কিংবা নির্দেশের দিক থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন—আগ্রাসন, হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধাদির ক্ষেত্রে মঙ্গলগ্রহের শক্তিবৃদ্ধি করা। এভাবে জলীয় বর্ণগুলো উষ্ণতাজনিত জ্বর ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ দূর করা এবং যেখানে শৈত্যশক্তি বৃদ্ধি করা দরকার সেখানে সে উদ্দেশ্যে অনুভূতি ও নির্দেশের দিক থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন চন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি করা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়।

বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের মধ্যে অনেকে বর্ণের মধ্যস্থিত সংখ্যার দিক থেকে এদের ক্ষমতা আরোপের রহস্য রয়েছে বলে বিবেচনা করেন। কেননা 'আবজদ'[২৮১] হিসেবে ব্যবহৃত বর্ণমালা নির্ধারিত ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সুপরিচিত সংখ্যাসমূহকে বুঝিয়ে থাকে। তাদের মধ্যকার সংখ্যাগত এ সম্পর্ক প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের পরস্পরের সম্পর্কেরই দ্যোতক। যেমন 'বে', 'কাফ' ও 'রে'র মধ্যকার সম্পর্ক; এদের প্রত্যেকটিই তার পর্যায় অনুসারে দ্বিত্ব বোঝায়। 'বে' এককের পর্যায়ে দুইকে বোঝায়, 'কাফ' দশকের পর্যায়ে বিশকে বোঝায় এবং 'রে' শতকের পর্যায়ে দু'শকে বোঝায়। অনুরূপভাবে এ সম্পর্ক এবং 'দাল', 'মিম' ও 'তে'র মধ্যে তাদের সকলের চতুঃসংখ্যা বোঝানোর দিক থেকে সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই ও চার সংখ্যার মধ্যে গুণিতকের সম্পর্ক রয়েছে।

অন্যদিকে তারা শব্দাবলির জন্য যাদুচক্র বের করেছে, যেমন সংখ্যার জন্য যাদুচক্র বিদ্যমান। বর্ণের সংখ্যা ও আকৃতির সংখ্যার দিক থেকে প্রতিটি বর্ণপর্যায়ই একটি যাদুচক্রের সাথে বিশিষ্ট। এভাবে বর্ণ-রহস্য ও সংখ্যা-রহস্য উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের দরুন তাদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি মিশে গেছে। তারপর এসব বর্ণ ও পদার্থের মিশ্রণের মধ্যে অথবা বর্ণমালা ও সংখ্যাসমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা খুবই দুর্বোধ্য প্রকৃতির কঠিন বিষয়। কারণ এগুলো কোন প্রকার শাস্ত্ররীতি ও অনুমানসিদ্ধ ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যের ভিত্তি হল আস্বাদ ও দিব্যানুভূতি। আলবুনী বলেছেন, 'এ কথা মনে করো না যে, বর্ণাদির রহস্যজ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমান দ্বারা লভ্য কোন বিষয়; এটি একমাত্র পর্যবেক্ষণ ও ঐশী সহায়তায় লাভ হতে পারে।'

২৮১. প্রথম অধ্যায়ের ১৪২ নং টীকা দ্র.।

www.amarboi.org

এসব বর্ণ ও তা থেকে সৃষ্ট শব্দাবলি দ্বারা বস্তুজগতের উপর ক্ষমতা আরোপ এবং সৃষ্টবস্তু তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি তাদের অনেকের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়ায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যাকে অস্বীকার করা যায় না। কখনও এমন ধারণা পোষণ করা হয় যে, তাদের ক্ষমতা আরোপ ও ঐন্দ্রজালিকদের ক্ষমতা আরোপ একই পর্যায়ের; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কারণ ইন্দ্রজালের স্বরূপ ও তার প্রভাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছে, তা এই যে, এটি রৌদ্র উপাদানজনিত আত্মশক্তি বিশেষ। এটি আকাশমণ্ডলীয় রহস্য-শক্তি, সংখ্যার সম্পর্ক শক্তি এবং মানসিক শক্তির প্রভাব-আশ্রয়ে ইন্দ্রজালের আত্মাকে জাগ্রতকারী ধূপ-ধূনাদির আকর্ষণশক্তির সম্মিলিত মিশ্রণে এমন একটি রৌদ্রতেজ ও প্রভাবশীল ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা বিষয়টি সংঘটিত হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতি হল উন্নত প্রকৃতিসমূহকে নিম্ন প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করা। তাদের কাছে এটি বলতে গেলে, বায়বীয়, মৃন্ময়, জলীয় ও আগ্নেয় উপাদানসমূহের সম্মিলিত মণ্ড তুল্য। অনুরূপ মণ্ডজনিত মিশ্রণের দ্বারাই বাস্তব উপাদান তাদের নিজস্ব সত্তাসহ সংশ্লিষ্ট আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরূপ খনিজ পদার্থের সারবস্তু; তাও এমন এক মণ্ডের ন্যায়, যার মধ্যে পদার্থ নিজ শক্তি সঞ্চারিত করে পরিবর্তনের দ্বারা নিজমূর্তি পরিগ্রহ করে। এ জন্যই তাঁরা বলেন যে, কিমিয়াশাস্ত্রের বিষয় হল দেহের মধ্যে দেহের সঞ্চারণ; কেননা এসব দেহের সারবস্তু সমুদয়ই দেহবিশিষ্ট। তারা বলেন, ইন্দ্রজালের বিষয় হল দেহের মধ্যে আত্মশক্তির সংক্রমণ। কেননা এটি নিম্ন প্রকৃতির সাথে উন্নত প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন এবং এ নিম্ন প্রকৃতিই দেহ ও উন্নত প্রকৃতি আত্মশক্তির সমষ্টি।

ঐন্দ্রজালিক ও বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের ক্ষমতা আরোপের মধ্যকার পার্থক্যের বিশ্লেষণ এই যে, সর্বপ্রথম আপনাকে এ বিষয়টি জেনে নিতে হবে—বস্তুজগতের উপর ক্ষমতা আরোপের সমুদয় ব্যাপারটিই মানুষের আত্মশক্তি ও মানসিক শক্তির প্রভাবের ফসল। বস্তুত মানুষের আত্মশক্তি বস্তুজগতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সত্তাগতভাবেই তাদের উপর নির্দেশ প্রদানকারী। অবশ্য ঐন্দ্রজালিকদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি আকাশমণ্ডলীয় আত্মশক্তির অবতরণ এবং তার সাথে আকৃতি অথবা সংখ্যাগত সম্পর্কের সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে এমন একটি মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা বস্তুর উদ্দিষ্ট পরিবর্তন ও বৈপরীত্য সাধিত হয়; যেমন মণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত শক্তির দ্বারা অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আর বর্ণাদি রহস্যবাদীদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি হল সাধনার ফলে লব্ধ শক্তি ও ঐশী জ্যোতির প্রভাবজাত দিব্যানুভূতি এবং সর্বোপরি ঐশ্বরিক সহায়তার ফসল। এর প্রভাবেই বস্তুপুঞ্জ কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তার বশীভূত হয় এবং এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার আকাশমণ্ডলীয় শক্তি ও অন্য প্রভাবের প্রয়োজন হয় না। কেননা এর সহায়ক শক্তি ঐগুলোর চেয়ে উন্নততর।

ঐন্দ্রজালিকরা তাদের ক্ষমতা আরোপের ক্ষেত্রে আকাশমণ্ডলীয় শক্তির অবতারণে আত্মশক্তিকে সজ্জিত করার জন্য খুব অল্প সাধনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং এ প্রসঙ্গে তারা যা কিছু করে, অনুশীলন ও একাগ্রতার দিক থেকে তা খুবই সহজ। কিন্তু বর্ণাদি

www.amarboi.org

রহস্যবাদীদের সাধনা তদ্রূপ নয়। তাদের সাধনা বিরাট ও ব্যাপক এবং সৃষ্টজগতে ক্ষমতা আরোপের উদ্দেশ্যেও পরিচালিত নয়; কেননা এরূপ কিছু উক্ত সাধনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ। ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি একান্তই তাদের আকস্মিক লব্ধশক্তি—আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভূতিসমূহের অন্যতম। এ কারণে বর্ণাদি রহস্যবাদী যদি আল্লাহ্র রহস্যজ্ঞান ও অধ্যাত্মশক্তির স্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত হয়, যা তার পর্যবেক্ষণ ও দিব্যানুভূতির ফলশ্রুতি এবং সে একমাত্র শব্দ, বর্ণাদি ও বাক্যাবলির প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে নিজকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, তাহলে এরূপ ব্যক্তি এসব বিষয় দ্বারা ক্ষমতা আরোপকারী 'সিমিয়া'শাস্ত্রবিদ্ হিসেবে পরিচিত হবে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ও ঐন্দ্রজালিকের মধ্যকার ব্যবধানও ঘুচে যাবে। বরং ঐন্দ্রজালিক তখন তার চেয়ে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাঁর জন্য একটি শাস্ত্রীয় প্রকৃতির মূলনীতি ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি বিদ্যমান। কিন্তু বর্ণাদি রহস্যবাদীর জন্য তেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কারণ তার সাধনাগত নিষ্ঠার অভাবে সে যদি বাক্‌শক্তির স্বরূপ ও সম্পর্কগত রহস্য উদ্‌ঘাটনের দিব্যানুভূতি হারিয়ে ফেলে তাহলে তার জন্য পরিভাষাগত শাস্ত্রীয় পটভূমিতে এমন কোন প্রামাণ্য পদ্ধতি অবশিষ্ট থাকবে না, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে এবং এ দিক থেকে তার মর্যাদা আরও নিচে নেমে যাবে।

কখনও বর্ণাদি রহস্যবাদীরা শব্দ ও বাক্যাদির শক্তিকে নক্ষত্রীয় শক্তির সাথে মিশিয়ে ফেলে। এর ফলে তারা আল্লাহ্র নামসমূহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রহস্যচক্র, এমন কি যাবতীয় শব্দাবলি জপের সময় নির্ধারণ করে দেয়; যাতে এসব নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নক্ষত্র থেকে শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। যেমন আলবুনী তার গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন আনমত (নিয়মাবলি)। তাদের কাছে উপরোক্ত সম্পর্ক সেই রহস্যময় সত্তার[২৮২] দান এবং শব্দাবলির পরিপূর্ণ রহস্যশক্তি এক সংশোধ্যমান[২৮৩] জগতে বিরাজিত। একমাত্র এ সম্পর্কের আকর্ষণেই এ শক্তির বিস্তারিত অবস্থা বস্তুর স্বরূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তাদের কাছে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল পর্যবেক্ষণলব্ধ নির্দেশ। সুতরাং বর্ণাদি রহস্যবাদী যখন এ পর্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে এ সম্পর্কজ্ঞানকে অপরের শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে, তখন তার ও ঐন্দ্রজালিকের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না; বরং ঐন্দ্রজালিক এক্ষেত্রে তার চেয়ে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

অনুরূপভাবে কখনও ঐন্দ্রজালিক তার ক্রিয়া ও নক্ষত্রীয় ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা রচিত প্রার্থনার সাথে মিশ্রিত করে; কেননা উক্ত শব্দাবলি ও নক্ষত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য এ সম্পর্ক নির্ধারণ তাদের কাছে বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের পর্যবেক্ষণ অবস্থালব্ধ সম্পর্কের মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে তারা তাদের যাদুসংক্রান্ত মূলনীতির ধারাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এ ধারা অনুসারে তারা সমগ্র সৃষ্টজগতের জন্যই নক্ষত্রমালাকে বিভক্ত করে। এর ফলে নক্ষত্রমালা স্বয়ম্ভু, আপতিক, সত্তাগত, তাত্ত্বিক বস্তু এবং বর্ণ ও শব্দাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নির্ধারিত হয়।

---

২৮২. মূল 'আমাইয়া'।
২৮৩. মূল 'বরবখিয়া'।

www.amarboi.org

এভাবে প্রতিটি তারকাই একটি নির্দিষ্ট অংশের জন্য বিশিষ্ট এবং এ ধারা অনুসারে তারা কোরানের সূরা ও আয়াতগুলোকে বিভক্ত করে এমন কতিপয় ভিত্তি গড়ে তুলেছে, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অনস্বীকার্য। যেমন মাসলামা মাজরিতী তাঁর 'গায়াত' নামীয় গ্রন্থে করেছেন। আলবুনীর 'আনমাত' গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, তিনিও তাদের এ পথ অবলম্বন করেছেন। পাঠক, আপনি যদি তাঁর 'আনমাত' অনুসন্ধান করে দেখেন; সেখানে তিনি যেসব প্রার্থনাবাক্য ব্যবহার করেছেন, তা যদি বিবেচনা করেন; সপ্ত নক্ষত্রের কালানুসারে তাদের বিভক্তি-বিন্যাসকে যদি লক্ষ করেন এবং এর পর আপনি যদি 'গায়াত' গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত হন; সেখানে নক্ষত্রমণ্ডলীর যে 'আহ্বানবাক্য' বিদ্যমান, তা যদি বিবেচনা করে দেখেন অর্থাৎ সেখানে প্রতিটি নক্ষত্রের জন্যই নির্দিষ্ট প্রার্থনা আছে, যাকে তারা 'আহ্বানবাক্য' বলে অভিহিত করে ও যা ঐ নক্ষত্রের শক্তিকে আকর্ষণের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনই সেখানে দেখতে পাবেন। এ সমর্থন, হয় তাদের মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিংবা তাদের উদ্ভাবনের অভিনবত্ব ও সংশোধ্যমান জ্ঞানগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। অথচ 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।'[২৮৪] তদুপরি ধর্মীয় বিধান কোন শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতার জন্যই ওটাকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং যাদুবিদ্যার সত্যতা স্বীকার করেও সে ওটাকে নিষিদ্ধ করেছে। এজন্য আমরা যা জানি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।[২৮৫]

---

২৮৪. কোরান; ১৭, ৮৫।

২৮৫. এটির পর রোজেনথালে একটি সংযোজন বিদ্যমান। কোন কোন সংস্করণে এর অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের অনুসৃত মূল গ্রন্থে তা নেই। তবু সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিলাম।

এখানে বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য কিছু মন্তব্য উপস্থিত করছি।

বর্ণাদি-রহস্যবিদ্যাটি এর গঠনের দিক থেকে অবশ্যই যাদুবিদ্যার অন্তর্গত এবং তা এভাবে অর্জন করতে গেলে এমন কিছুসংখ্যক অনুশীলনের দ্বারস্থ হতে হয়, যা ধর্মীয় বিধান অনুসারে অসিদ্ধ নয়। এর বিবরণ এই যে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, দুই শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টিজগতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। তাদের মধ্যে নবী রসূলগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে এটি করে থাকেন এবং যাদুকরগণ তাদের সহজাত শক্তির মাধ্যমে অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত করে। সুফীসাধকরাও তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনুরূপ কার্যকলাপের অধিকারী হতে পারেন। এটি তাঁদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত সাধনার ফল। অবশ্য এটি তাঁরা কামনা করেন না; বরং স্বতোসিদ্ধভাবেই এটি দেখা দেয়। এটি যদি শক্তিমান সাধকদের মধ্যে দেখা দেয়, তাহলে তাঁরা একে অস্বীকার করতে চান, আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং এরূপ বিভূতিকে প্রলোভন বলে গণ্য করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা আবু ইয়াজিদ বিস্তামীর একটি 'ঘটনা'র কথা উল্লেখ করতে পারি। একদা বিকালে তিনি দজলার কূলে উপস্থিত হয়ে অতি দ্রুত তা পার হবার কথা চিন্তা করছিলেন; এমন সময় নদীর উভয় কূল একত্র মিলে গেল। আবু ইয়াজিদ এটি দর্শনে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে বলে উঠলেন, 'আমার আল্লাহ্ প্রীতির কোন অংশই আমি এ সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারি না।' অতঃপর তিনি খেয়া নৌকায় উঠে যথারীতি খেয়া মাঝিদের সাথে নদী পার হলেন।

যাদুর ক্ষমতা সহজাত হলেও এর সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। যাদুর অনেক শক্তি সহজাত না হলেও অর্জন করা সম্ভব হয়; কিন্তু এ অর্জিত শক্তি সর্বদাই সহজাত অপেক্ষা নিম্নমানের হয়ে থাকে। তবুও যাদুশক্তি সহজাত হোক, বা না হোক, এর জন্য সর্বক্ষেত্রেই অনুশীলনের প্রয়োজন। এরূপ অনুশীলনের পদ্ধতি সর্বজন পরিচিত। এর

www.amarboi.org

তাদের কাছে 'সিমিয়া'শাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল প্রশ্নের অন্তর্গত শব্দাবলির সাথে উত্তরে ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যকার বর্ণগত সামঞ্জস্য বিচার করে উত্তর বের করা। তারা একে সংঘটিতব্য বিষয়াদির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ঈপ্সিত ভিত্তি বলে মনে করে। বস্তুত এটি অনেকাংশে ধাঁধাঁ ও হেঁয়ালী জাতীয় প্রশ্নাদির সমতুল্য। এ বিষয়ে দোয়া ও অজিফার আকারে তাদের মধ্যে বিস্তর বক্তব্য বিদ্যমান। এর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল সবতী রচিত পৃথিবীর 'যায়েরজা'; ইতিপূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে।[২৮৬] আমরা এখানে উক্ত যায়েরজার চতুর্দিকে অঙ্কিত চক্র, তালিকা ইত্যাদিসহ এর ব্যবহার-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আমরা এর যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করব এবং বলব যে, তা অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপনের কোন বিষয় নয়। এর সমুদয় ব্যাপারটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের মধ্যে প্রক্রিয়াগত সামঞ্জস্য বিধানের ফল মাত্র।

যাবতীয় প্রকার ও প্রক্রিয়া মাসলামা মাজরিহী তাঁর 'গায়াত' গ্রন্থে, জাবির ইবনে হাইয়ান তাঁর পুস্তিকাসমূহে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যারা যাদুবিদ্যা অর্জন করতে ইচ্ছুক, তেমন বহু ব্যক্তির দ্বারা এসব রীতিনীতি ও যাদু প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে।

যাহোক, যাদুবিদ্যার প্রাচীন অনুসারীদের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা একান্তই ধর্মহীন। যেমন তাতে নক্ষত্রের প্রতি একাগ্রতা এবং তাদের আত্মশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য 'কিয়ামাত' নামীয় প্রার্থনা বিদ্যমান। তদুপরি তাতে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এগুলোও প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কারণ এসব নক্ষত্রের রাশিচক্র যে, জন্ম-পত্রিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে, অনুরূপ বিশ্বাস না করলে ঈপ্সিত ফললাভের বাসনা পোষণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুত এমন বহুলোক, যারা সৃষ্টিজগতে যাদুশক্তির দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক, তারা এ বিষয়েই অধিকতরভাবে ব্যাপৃত রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই তারা এমন একটি প্রক্রিয়ার অনুসরণ করেছে, যাতে ধর্মহীনতা বা এর অনুষ্ঠানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে তারা তাদের প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছে, যা ধর্মীয় বিধানসম্মত। তাদের এরূপ প্রক্রিয়ায় কোরান ও হাদিস হতে সংগৃহীত 'নামজপ' (জিকির) ও প্রার্থনা (সবুহাত) বিদ্যমান। তারা এগুলোর মধ্য হতে উপরোল্লিখিত পৃথিবীর সত্তা, গুণ ও প্রভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট সপ্ত নক্ষত্রের সক্রিয়তা অনুসারে বিভক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য যোগ্য বিষয় বেছে নিয়েছে। এগুলো প্রয়োগ করার জন্য দিনক্ষণও নির্দিষ্ট করেছে। বস্তুত তারা এ সমুদয় বিষয়টিকেই এমনভাবে ব্যবহার করেছে, যাতে এর দ্বারা যাদুবিদ্যার ধর্মদ্রোহিতা এবং এসব সম্পর্কিত কার্যকারণগুলোর উপর একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে তারা বাহ্যত; ধর্মীয় বিধানসিদ্ধ রীতি-নীতির ব্যবহারকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের এমন বিধানসিদ্ধ রীতিনীতি সত্ত্বেও তা যাদুবিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের প্রভাবের উপর বিশ্বাসের পরিধি হতে কোন প্রকারেই মুক্ত নয়।

এসব লোক সৃষ্টিজগতের উপর এমন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক, যা ধর্মপ্রবর্তক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নবীরা যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন, তাতে ঐশী সাহায্য বিদ্যমান ছিল। তাঁরই অনুমতিক্রমে তাঁরা এগুলো দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সাধু-দরবেশদের অলৌকিক বিভূতি সাধনালব্ধ বিশেষ জ্ঞান, দিব্যানুভূতি এবং তজ্জনিত ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিশেষ অনুমতির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা ঐশী অনুমতি ছাড়া অনুরূপ কিছু করতে কখনও উদ্যোগী হননি।

সুতরাং এসব দিক হতেই বর্ণাদি রহস্যবাদীদের বিশ্বাস প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্ততা বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি এটি পরিস্ফুট করেছি যে, এ রহস্যবিদ্যাটিও যাদুরই একটি প্রশাখাবিশেষ। আল্লাহ তাঁর দয়ায় সত্যের দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

২৮৬. প্রথম অধ্যায়ের ১৪৪ ও ১৪৫ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

ইতিপূর্বেও আমরা এ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছি। আমাদের কাছে এমন কোন বর্ণনাসূত্র নেই, যা দিয়ে আমরা এ সম্পর্কিত দীর্ঘ কবিতাটির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতে পারি। তবে আমাদের যতদূর মনে হয়, এর এই পাঠটি সাধারণভাবে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত। আল্লাহ্ তাঁর কৃপায় শক্তি দান করুন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।[২৮৭]

অকিঞ্চন সবতী তার প্রভুর প্রশংসা করেও
মানুষের কাছে প্রেরিত দিশারীর শান্তি কামনা করে বলছে,
মুহম্মদ রসূলরূপে আবির্ভূত; নবীদের তিনি মোহর এবং
সহচর ও পরবর্তী অনুগামীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।
দেখ, এই যে পৃথিবীর যায়েরজা, যা
তোমাদের গোত্রে দেখেছ এবং বুদ্ধিতেও এসেছে।
যে এর গঠন সম্যক, জানবে, সে নিজ দেহকেও জানবে
এবং সেই নির্দেশাবলি সম্যক্ উপলব্ধি করবে, যা উন্নত স্তরে পরিকল্পিত
যে সংযোগকে সম্যক জানবে, সে শক্তিকে উপলব্ধি করবে
এবং ধর্মভীরুতা ও প্রতিটি বিষয়ের জন্য তার ফলকে জানবে।
যে প্রক্রিয়াকে সম্যক জানবে, সে এর রহস্যকে সম্যক জানবে
এবং সে নিজেই বুঝতে পারবে ও তার অধিকার সিদ্ধ হবে।
তাকে দেখবে অধ্যাত্ম জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণকারীরূপে;
বস্তুত এটি এমন ব্যক্তির পর্যায়, যিনি তপজপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।
এই সেই রহস্যাবলি, তোমাদের তা গোপন রাখা উচিত;
তাকে চক্রাদির মধ্যে রক্ষা কর ও 'হে'-র দ্বারা সমতা বিধান কর।
'ত্বয়ের' জন্য আছে সিংহাসন, তাতেই আমাদের চিত্রাদি
পদ্যে ও গদ্যে; যা তুমি ছকসহকারে দেখতে পাবে।
চক্রাদির সম্পর্ক তাদের আকাশমণ্ডলের সম্পর্কের অনুরূপ
এবং সেখানে তুমি উন্নত পর্যায়াদির নক্ষত্র অঙ্কন কর।
তন্তুগুলোর জন্য সচেষ্ট হও ও তাদের বর্ণাদি লিপিবদ্ধ কর
এবং সীমান্তে শূন্যস্থানে তার অনুরূপ উষ্ণীষ বাঁধ।
তাদের 'জের'-এর আকৃতি বিন্যাস ও তাদের ঘরগুলো সমান কর
এবং তাদের 'হাম' বিশ্লেষণ কর ও তাদের আলোক উজ্জ্বল হোক।
প্রকৃতির জন্য জ্ঞানার্জন কর জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায়
এবং সঙ্গীতজ্ঞের জ্ঞান ও চারটি অনুরূপভাবে
সঙ্গীতের ন্যায় সমমান যুক্ত কর ও তার বর্ণাদির জ্ঞান
এবং যন্ত্রপাতির জ্ঞান; বিশ্লেষণ ও অর্জন কর।
তার চক্রগুলোকে সমান কর ও তার বর্ণাদির সঙ্গতি রক্ষা কর;
তার পৃথিবীকে মুক্ত রাখ ও অঞ্চলকে ছকবন্দী কর।
আমাদের আমীর, তিনি জানাতী সাম্রাজ্যের শেষ
অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর শাসন সেখানে মুক্ত হয়েছে।[২৮৮]
আন্দালুসের একটি অংশ ও তাদের হৃদের এক তনয়;

২৮৭. কবিতাটির পাঠভেদ বিদ্যমান। রোজেনথালের অনুবাদে এর আভাস পাওয়া যায়। আমরা সম্ভাব্য বোধগম্যতাকে সামনে রেখে মূলের অনুসরণ করেছি।

২৮৮. আমীর আল মোহেদ সম্রাট ইয়াকুব আল মনসুর (১২৮৪—৯৯ খ্রি:)।

www.amarboi.org

বনি নাসির এলো ও বিজয় তাদের অনুবর্তী হলো।[২৮৯]
রাজন্যবর্গ, অশ্বারোহী ও দর্শনের অধিকারীগণ,
যদি চাও তাদেরকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাদের অঞ্চল সজ্জিত।
একত্ববাদের মেহেদী, তিউনিসে তাদের রাজত্ব—
রাজন্যবর্গ, পূর্বাঞ্চলে রহস্য চক্রাদিতে অবতীর্ণ।
অঞ্চলে বিভক্ত কর ও নিখোঁজের অনুসন্ধানকারী হও;
রোমের জন্য যদি চাও, তাহলে নির্ভুলভাবে আকৃতি দাও।
আলফ্যান্সু ও বারসেলুনা, তাদের বর্ণ হল 'রে';
তাদের ফ্রান্স হল 'দাল'-এবং ত্বয়ের দ্বারা পূর্ণতা লাভ।
কানাওয়ার রাজন্যবর্গ, তাদের 'ক্বাফের' জন্য বালতির ন্যায়
এবং আমাদের বেদুইনগণ, দাসত্বের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত।
হিন্দ, হাবশী অঞ্চল, সিন্ধু, তারপর হারমিন—
পারস্যবাসী, তাতারী এবং তাদের পরবর্তী অন্যান্যরা।
তাদের কাইজার এসেছে[২৯০] ও তাদের ইয়াজদাগির্দ
'কাফে'র জন্য এবং তাদের কিবতীরা 'লামে'র দীর্ঘায়িত।
আব্বাস, তাদের সকলেই সম্ভ্রান্ত ও মহান—
কিন্তু তুর্কিরা এ কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করে ফেলেছে।
অতঃপর তুমি যদি রাজন্যবর্গের যথার্থ অবস্থা ও প্রত্যেককে জানতে চাও,
তা হলে ঘরগুলো মোহরাঙ্কিত কর; তারপর সম্পর্ক নির্ণয় কর।
বর্ণাদির রীতির নির্দেশে এবং তার জ্ঞান অনুসরণ করে—
তাদের প্রকৃতির জ্ঞান ও সমুদয়কে বাস্তবায়িত কর।
যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে, সে আমাদের জ্ঞানও জানবে;
সে সৃষ্টির রহস্য জানতে পেরে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।
তার জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে, তার প্রভুকে জানতে পারবে
এবং সেই ভবিষ্যদবাণীর জ্ঞান, যা 'হে' 'মীমের' দ্বারা বিভক্ত।
যখন এমন একটি নাম আসবে, ছন্দ যাকে ছিন্নভিন্ন করে,
তখন অবশ্যই শাসকের নির্দেশ থাকবে তাকে হত্যা করার।
তোমার সামনে বহু বর্ণ আসবে সেগুলোকে গুণের দ্বারা সমান কর
এবং সিবুয়াই-এর বর্ণগুলো তোমাকে মীমাংসার সন্ধান দিবে।
অনির্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, সম্মুখীন হও ও পরিবর্তন কর;
তোমার অমূল্য অনুশীলনের দ্বারা অংশগুলোকে পৃথকভাবে।
গ্রন্থি বন্ধনে ও ছিন্নকরণে জয়ীকে জানতে পারবে;
বুদ্ধির সক্রিয়তায় তার দুই গুণকে ক্ষণিক বর্ধিত কর।[২৯১]
কোন উদয় ক্ষণকে নির্বাচন কর ও তার পর্যায় অনুসারে সমান কর;
তার বর্গমূলদ্বয়কে উল্টে দাও এবং চক্রকে পরিবর্তন কর।
কোন ব্যক্তি তাকে জানতে পারবে ও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে;
তার বর্ণাদি দেয়া হবে এবং তারা পদ্যরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
যদি এটি শুভ হয়, তা হলে নক্ষত্রসমূহও শুভ হবে;

২৮৯. এখানে 'হুদ' ও বনি নাসিরের পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়।
২৯০. এখানে মূলে 'যাআ' স্থলে 'হা' পাঠান্তর আছে।
২৯১. এ দুটি পংক্তি রোজেনথালের অনুবাদে অনুপস্থিত।

www.amarboi.org

রাজন্য সম্পর্কেই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তার উন্নত নাম পাবে।
তাদের 'দালে'র অবস্থান যথাযোগ্য রহস্যজালে আবৃত;
অতঃপর আমাদের সম্পর্কের সঙ্গতি, যার মধ্যে যোগ্যস্থান পাবে।
তাদের 'জের'-এর তত্ত্বগুলো 'হে'র সাথে 'বাম'-এর সন্নিহিত
এবং তাদের দ্বিত্ব ত্রিত্বের স্বরূপ সমগ্রের মধ্যে প্রকাশিত।
আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করাও এবং ছকের দ্বারা পরিবর্তন কর;
আবজদের বর্ণাদি অঙ্কন কর এবং অবশিষ্ট রাখ অঙ্ক হিসেবে।
প্রচলিত ছন্দহীনতাকে গ্রহণ কর ও তার অনুরূপ কোন কিছুকে স্বীকৃতি দাও;
যা কবিতার ছন্দাদিতে দেখা যায়—সমগ্রতায় পূর্ণ হয়।
আমাদের ধর্মের ভিত্তি, আমাদের শাস্ত্রের মূলনীতি—
আমাদের ব্যাকরণের জ্ঞান; সংরক্ষণ ও অর্জন কর।
একটি তাঁবু, প্রবেশ করাও এবং সংযোগের উপর তার বর্গমূল বসাও;
তার পবিত্র নাম লও। শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ও একত্ব প্রকাশ কর।
প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য কাব্যপঙ্ক্তি রচনা কর এবং
সে উদ্দেশ্যে পদ্যের মাধ্যমে উন্নত জগতের রহস্য প্রকাশ কর।
তার সীমাবদ্ধতা দূর কর; অনুরূপভাবে তাদের গণনাও—
রহস্যোদ্‌ঘাটিকা জ্ঞান—তাতেই যোগ্য পথ খুঁজে পাবে।
কাব্যপঙ্ক্তিগুলো প্রকাশ পাবে ও বিশ গুণিতক হবে—
সহস্র থেকে স্বাভাবিকভাবে, হে ছকের অধিকারী!
তোমাকে এমন শিল্পকর্ম দেখাবে, যা গুণের দ্বারা পূর্ণ হয়;
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং উন্নত জগতের জ্ঞান লাভ হবে।
তাদের 'জের'-কে ছন্দোবদ্ধ কর; প্রশংসা কর গলিত রৌপ্যের
এবং তাকে 'জের'-এর চক্রাদিতে প্রতিষ্ঠিত করে অর্জন কর।
সংযোগাদির মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা দাও ও তার গণনার মূলনীতি—
তাদের বর্ণাদির রহস্যলীলা—তার ধারাবাহিকতা রক্ষা কর।

৪৩ কাফ আলিফ কাফ ওয়াও কাফ হে ওয়াও আলিফ হে আম লাহ্ রে লা সা কত্ব আলিফ লাম মিম নুন হে আইন ফে ওয়াও লাম মুনাফেরা (পলায়নপর)।[২৯২]

ওজনের সম্পর্ক, তার অবস্থা ও তার বিপরীতধর্মী পরিমাণ এবং বিচিত্র প্রকৃতি ও চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা কিমিয়াশিল্পের মিশ্রণজনিত সংশ্লিষ্ট অবস্থানের প্রতি সম্পর্কযুক্ত বিশিষ্ট পর্যায়গত শক্তি আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা।

হে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুসন্ধানকারী, জাবিরের[২৯৩] জ্ঞানসহ
এবং পরিমাণসমূহের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে জ্ঞাতা!
যদি তুমি চিকিৎসাশাস্ত্র জানতে চাও, তাহলে অবশ্যই
নিক্তির নিয়মাবলির সম্পর্ক জানতে হবে, যা উদ্দেশ্য সফলে অব্যর্থ।
তোমাদের আরোগ্য অবশ্যই ঘটবে ও মহৌষধটি যথার্থ
তোমাদের মিশ্রণের সৌকর্য বিশুদ্ধ আকারে প্রতিভাত হবে।

২৯২. এগুলো সংখ্যার বর্ণসংকেত বলে মনে হয়।
২৯৩. জাবির ইবনে হাইয়ান।

www.amarboi.org

আত্মিক চিকিৎসা

তুমি 'ইলাউশ'কে চাও ৫৬৫ হে ও তার তেল[২৯৪] সুসজ্জিত।
'বাহরাম,' 'বরজিস'-এর জন্য[২৯৫] এবং অন্য সাতটি পরিপূর্ণভাবে।
শৈত্যজনিত বেদনা দূর করার জন্য পরিশুদ্ধ কর—
অনুরূপভাবে এবং বিন্যস্ত কর যেখানে তা রূপান্তরিত হয়।

কদ মানঅ' ৩৫৫ ওয়াও হেহ্বে ৬ স্বহ্ব লহাই ওয়াও লমহ্ব আলিফ আ আলিফ ওয়াও হেহ্বে ওয়াই সকরহ্ লা লাম হ্বে মহ্হত মহ্হহ্ আইন আইন মি মর হ্বে হ্বে ২২৪২ লাম কাফ আ' আ'র।

রাজন্যবর্গ ও তাদের সন্তান-সন্ততির।

জন্মক্ষণ সম্পর্কীয় আলোক বিচ্ছুরণ।

আলোক বিচ্ছুরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান খুবই দুরূহ;
তার ধনুকের পার্শ্ব রাশিচক্রে প্রতিভাত।
কিন্তু হজ্জের স্থানে আমাদের ইমামের অবস্থান
প্রকাশিত হয়, যখন নক্ষত্রমণ্ডলীর অক্ষাংশ সমান্তরাল হয়।
'দালে'ই কেন্দ্রস্থল, তার দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের মাঝে
যে অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, উন্নত হয়; তারপর সম্মানিত।
চতুর্বর্গের সংঘটন স্থল, তার 'সিন' বিচ্যুতির নায়ক;
তাদের ষড়বর্গের জন্য অনুবর্তী গৃহের ত্রিবর্গ।
বর্ধিত করা হবে চতুর্বর্গের জন্য এবং এটাই তার অনুমান
নিশ্চিতভাবে ও তার বর্গমূল; আইনের সাথে সক্রিয়।
দুই চতুর্থাংশের দিকে লক্ষ রেখে তোমার আলোকের মিশ্রণ ঘটাও
'সোয়াদে' এবং গুণিত কর; তার চতুর্বর্গ প্রকাশিত হবে।

বিশিষ্ট হয়েছে স্বহ্ব স্বহ্ব আইন ৮ দআ' ওয়াই এখানে এ প্রক্রিয়াটি রাজন্যবর্গের জন্য এবং নিয়ম তার প্রক্রিয়ার জন্য অব্যর্থ। এটি অপেক্ষা অদ্ভুত কিছু পরিলক্ষিত হয়নি।

রাজন্যবর্গের স্থান: প্রথম স্থান ([illegible]), দ্বিতীয় স্থান ([illegible]), তৃতীয় স্থান ([illegible]), চতুর্থ স্থান ([illegible]), পঞ্চম স্থান ([illegible]) ষষ্ঠ স্থান ([illegible]) ও সপ্তম স্থান ([illegible]).[২৯৬]

সংযোগ ও বিয়োগ রেখা ([illegible])।

সংযোগ রেখা ([illegible])।

বিয়োগ রেখা ([illegible])

---

২৯৪. এখানে পাঠান্তর বিদ্যমান; অর্থ, মস্তিষ্ক।

২৯৫. পূর্ববর্তী ইলাউশা = হিলিয়াস = সূর্য; বাহরাম = মঙ্গল এবং বরজিস = বৃহস্পতি।

২৯৬. এ পৃষ্ঠার বন্ধনী মধ্যস্থিত বর্ণ সংকেতগুলোর সংখ্যামান উদ্ধারের চেষ্টা করে আমরা পরাস্ত হয়েছি। যতদূর মনে হয়, এগুলো 'আবজদ' (প্রথম অধ্যায়ের ১৪২ নং টীকা দ্র:) হিসাব, 'রুস্মুল গুবার' ও 'রুস্মুয্ যিমাম' সংখ্যামান একত্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে। শেষোক্ত দুটির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩১৭ ও ৩১৮ নং টীকা দ্র:। এভাবে বিচিত্র বর্ণ-সংকেত একত্র হওয়ার ফলে বিষয়টি দুর্বোধ্য উঠেছে। এজন্য আমরা অনুবাদের চেষ্টা না করে যথাযথ তুলে দিলাম। একমাত্র 'দ্বিতীয় স্থান'-এর পরবর্তী বন্ধনীযুক্ত সংকেতগুলো ডান দিক হতে এবং অন্যান্য সকল সংকেত বাম দিক হতে আরম্ভ হয়েছে।

www.amarboi.org

সকালের জন্য সূত্র ও[২৯৭] পরিপূর্ণ আকর্ষণের অনুসারী ([illegible])।

সংযোগ ও বিয়োগ ([illegible])।

সংযোগাদির ব্যাপারে আবশ্যকীয় পরিপূর্ণতা ([illegible])

আলোক সংস্থাপন ([illegible])।

প্রতিস্থাগত উত্তর প্রদানকারী কর্তন ([illegible])।

রাজন্যবর্গের নিকট হইতে প্রশ্ন সংস্থাপন ([illegible])।

সন্তুষ্টির স্থান— আলো ([illegible]); ঐশ্বর্যের স্থান ([illegible])।

আত্মিক প্রভাব ও ঐশী আনুগত্য

হে রহস্যের অনুসন্ধানী! তোমার প্রভুর প্রশংসার জন্য
তাঁর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে তুমি লক্ষ্যে অব্যর্থ হবে।
তোমার অনুগত হবে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিরা তাদের অন্তরসহ;
অনুরূপ তাদের নেতৃবৃন্দ এবং সূর্যের মধ্যে সক্রিয় হবে।
সাধারণ লোককে দেখবে তোমার প্রতি আকর্ষিত[২৯৮]—
যা বলবে সত্য এবং অন্যকে তারা ছেড়ে দিবে।
তোমার পথ হল এ প্রবাহ ও পথ, যা আমি
বলছি তোমরা ছাড়া অন্যকে এবং তোমাদের সাহায্য স্পষ্ট।
যদি চাও জগতে ধার্মিকতার সাথে জীবিত থাকবে
এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠ ধর্মমত অথবা নিজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।
যিন্নুন[২৯৯] ও জুনায়েদের[৩০০] ন্যায় একটি শিল্পের রহস্যসহ
এং বিস্তামের[৩০১] রহস্য আচ্ছাদনে আমি তোমাকে আবৃত দেখছি।
উন্নত জগৎ সম্পর্কে তুমি বক্তব্য প্রকাশ করবে—
অনুরূপ বলেছে হিন্দ এবং সুফীসাধকের দল।
রসূলুল্লাহের পথ সত্যের আলোকে উজ্জ্বল
অনুরূপ শিল্পকর্ম জিব্রাইল অবতীর্ণ করেননি।
তোমার তৎপরতা আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তোমার ধনুক উদয়কাল,
বৃহস্পতিবারে ও রবিবারে আরম্ভ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিবে।
অনুরূপ শুক্রবারেও পবিত্র নামগুলোর সাথে;
সোমবারে সুন্দর নামগুলো পরিপূর্ণ করবে।
তার 'ত্ব'য়ের মধ্যে রহস্য আছে; 'হে'র মধ্যেও যখন[৩০২]
আমি তোমাকে দেখি সমগ্রের তুলনায় বদ্ধপরিকর।
এদের অঙ্কনের জন্য একটি শুভক্ষণ তাদের শর্ত;
ধূপকাঠি ও 'মস্তকী'র সাহায্যে ধূম্রাদি উৎপন্ন করতে হবে।
এর উপর সূরা 'হাশরে'র শেষ দ্বারা প্রার্থনা জানাবে,
সূরা 'এখলাস' ও সূরা 'ফাতেহ্'[৩০৩] পাঠ করবে।

---

২৯৭. রোজেনথাল 'সূত্র'-এর স্থলে 'জের' শব্দ ব্যবহার করেছেন।
২৯৮. রোজেনথালে এর পরবর্তী তিনটি ছত্রের অনুবাদ নেই।
২৯৯. বিখ্যাত সুফীসাধক; মৃত্যু ২৪৬ (৮৪১ খ্রি:) হি:।
৩০০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৪ নং টীকা দ্র:।
৩০১. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২১০ নং টীকা দ্র:।
৩০২. রোজেনথালে এর পরবর্তী তিনটি ছত্রের অনুবাদ নেই।
৩০৩. তুল, কোরান, ১৫, ৮৭।

www.amarboi.org

(নক্ষত্রমালার আলোক সংযোগ) বলআ'নী লাহি লা স্ব গাইন লদ যআ' ক্বাফ স্বহ্বে মিম ফে ওয়াই ইয়া।

তোমার ডান হাতে থাকবে লোহা ও অঙ্গুরীয়;
সমুদয় তোমার মস্তিষ্কে; প্রার্থনায় অবশ্য নয়।
হাশরের আয়াত, তার দিকে তোমার অন্তরকে নিবিষ্ট কর;
সৃষ্টি জগৎ যখন নিদ্রাতুর তখন তা পাঠ ও আবৃত্তি কর।
সৃষ্টি জগতে এটাই রহস্য, এটি ছাড়া অন্য কিছু নেই;
এটাই মহান আয়াত; স্বরূপ জ্ঞান হও ও অর্জন কর।
এর যথাযোগ্য সাধনার দ্বারা তুমি 'কুতব' হয়ে দাঁড়াবে
এবং উন্নত জগতের সমুদয় রহস্য জানতে পারবে।
'সরী[৩০৪] এর দ্বারা গুহ্য সাধনা করতেন ও তাঁর পূর্বে মারুফ[৩০৫]
এবং হাল্লাজ[৩০৬] এর প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন।
এর দ্বারা শিবলি[৩০৭] সর্বদা কার্য সম্পাদন করতেন
যতক্ষণ না তিনি সাধকের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে গেলেন।
সুতরাং তুমি সাধনার দ্বারা সর্বপ্রকার কলুষ হতে অন্তর পবিত্র কর;
নামজপকে সঙ্গী কর, রোজা রাখ এবং নফল নামাজ পড়।
এ পন্থীদের রহস্যজ্ঞান একমাত্র বিচক্ষণ ছাড়া কারও লভ্য নয়,
যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের রহস্য আয়ত্ত করে যোগ্য হয়েছে।

প্রেম, আত্মসংযোগ, সাধনা, আনুগত্য, উপাসনা, সম্প্রীতি, আসক্তি, নাস্তির নাস্তি, একাগ্রতা, ধ্যান, বন্ধুত্ব, সখ্যত্য প্রভৃতির স্থান।

স্বাভাবিক প্রভাব

বরজিসের[৩০৮] জন্য প্রণয়ের একটি চক্র বিদ্যমান, যাকে তারা
টিন অথবা তামার মিশ্রণের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় করে।
বলা হয় যে, রৌপ্যের দ্বারা; বিশুদ্ধ, আমি তা দেখেছি;
তোমাকে তার রেখাগুলোর উন্নত পর্যায় উদীয়মান করবে।
এর মাধ্যমে চন্দ্র হতে বেশি কিরণ প্রাপ্তির চেষ্টা কর;
তোমাকে তার সূর্য নির্ভরতার সাথে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
তার দিবস ও ধূপধুনাদি; তাদের হিন্দের ধূপকাঠি
এবং সময় একটি ঘন্টার ও প্রার্থনা, যা উপকারী।
তার প্রার্থনা উদ্দেশ্যানুসারী; তা-ই ক্রিয়াশীল হবে।
এবং 'তাসিমান' হতে প্রার্থনাও তার জন্য সুস্পষ্ট হবে।
বলা হয়, তার গঠন সম্পর্কীয় বর্ণমালার প্রার্থনা;

---

৩০৪. সরী আস্ সকতী; মৃত্যু ২৫৩ (৮৫৭ খ্রি:) হি:।
৩০৫. মারূফ আল্‌করখী; মৃত্যু ২০/২০৪ (৮১৬/২০ খ্রি:) দ্র:।
৩০৬. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২১১ নং টীকা দ্র:।
৩০৭. আবু বকর আশ্‌শিবলী, মৃত্যু ৩৩৪/৩৫ (৯৪৫ খ্রি:) হি:।
৩০৮. বৃহস্পতি; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯৫ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

বায়ুর উত্তাপের দ্বারা অথবা যোগ্য উদ্দেশ্যাদির জন্য।
সুতরাং তুমি তার 'দাল' ও 'লামে'র দ্বারা বর্ণাদি অঙ্কিত কর;
এটাই চতুর্বর্গের চক্র, যা এভাবে অর্জিত হবে।
তার নির্দেশ যদি তোমার প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়,[৩০৯]
তাহলে 'দাল' আরম্ভের জন্য; 'ওয়াও' জয়নবকে বদ্ধ করতে।
তার 'বে'-কে ও তাদের 'বে'-কে সুন্দর কর, যখন
তোমার মনোঃপূত হবে এবং তাদের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক বাক্য।
তোমাদের গঠন হতে শর্তসহ আকৃতিসমূহ অঙ্কন কর;
অতিরিক্ত যোগ করলে যথাযোগ্য কর, যাতে তোমার ক্রিয়া অনুযায়ী হয়।
মরিয়মের কুঞ্জী; বস্তুত তাদের উভয়ের ক্রিয়া সমান;
'বাওরী'[৩১০] ও 'বিস্তামী' তার সূরার আবৃত্তিকারী।
তোমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ইচ্ছায় এবং তুমি লুপ্ত উদ্ধারকারী হও
'ওহশীর'[৩১১] যুক্তি-প্রমাণ, যা আগ্রাসনের জন্য আকর্ষিত।
তার ঘরগুলো সহস্র ও তার অতিরিক্ত দ্বারা পরিবর্তন কর;
তার অভ্যন্তরে রহস্য এবং সেই রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হও।

শেষ পর্যায়গুলোর জন্য পরিচ্ছেদ

তোমার জন্য অদৃশ্য; উন্নত জগৎ হতে একটি আকৃতি লাভ করবে।
একটি গৃহ তোমাকে পাবে; তার আচ্ছাদন অলংকৃত।
সৌন্দর্যে ইউসুফ তুল্য; এটি তারই সমতুল্য—
গদ্যে ও প্রাঞ্জলতায় অবতীর্ণ এক স্বরূপ।
তার হাতে দৈর্ঘ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্যদানকারী;
সে এমন একটি একতারা, যা বুলবুলের ন্যায় বর্ণনা করে।
বহালুল[৩১২] তার রূপের আসক্তিতে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে
এবং তার বিকাশকালে বিস্তামের জন্য লজ্জা এনেছে।
তার জন্য মরেছে ও তার প্রেম আকণ্ঠ পান করেছে
জুনায়েদ ও বসরী[৩১৩] এবং দেহ পরিত্যক্ত হয়েছে।
আল্লাহ্‌র প্রশংসায় তার সীমা সন্ধান করবে এবং যে ব্যক্তি
তার সুন্দর নামগুলোর দ্বারা কোন সম্পর্ক ছাড়াই তা চাইবে।
যে ব্যক্তি এ সুন্দরের অধিকারী, সে তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল
এবং সে সেই উন্নত প্রতিবেশের জুলফিদ্বয়ের লক্ষ্যভেদে সার্থক।
তোমাকে অদৃশ্যের সংবাদ দিবে, যদি তুমি যথার্থ সেবা কর;
তোমাকে অদ্ভুত বিষয়াদি দেখাবে; যে ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হবে।
এটাই সেই সাফল্য ও সৌন্দর্য, যা তুমি লাভ করবে;
এটি থেকেও আরও বেশি, তার ব্যাখ্যা পরে আসছে।

---

৩০৯. রোজেনথালে এর পরবর্তী ছত্রটির অনুবাদ নেই।

৩১০. 'একটি আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে'—রোজেনথাল।

৩১১. 'একটি অসত্য লোক'—রোজেনথাল; সম্ভবত ইবনে ওহাশিয়া; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬৮ নং টীকা দ্র:।

৩১২. সম্ভবত সুফীসাধকের একটি শ্রেণী।

৩১৩. প্রখ্যাত সুফীসাধক; তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১০ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

অন্তিম উপদেশ, উপসংহার, বিশ্বাস, ইসলাম, নিষিদ্ধতা ও যোগ্যতা

এই আমাদের কবিতা, নব্বই এর পঙ্ক্তি সংখ্যা;
তদতিরিক্ত যা, তা পরিচিতি, উপসংহার ও ছক।
আমি অদ্ভুত মনে করি এ পঙ্ক্তিগুলোকে, যাদের সংখ্যা নব্বই,
এরা এত পঙ্ক্তির জন্ম দিবে, যা সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য নয়।
যে ব্যক্তি তার রহস্য বুঝবে, সে নিজকে জানতে পারবে
এবং সে ব্যক্তি গঠনের সমতুল্য ব্যাখ্যাদিও বুঝতে পারবে।
নিষিদ্ধ ও বিধানসিদ্ধ আমাদের রহস্য প্রকাশ করার জন্য
মানুষের জন্য, যদিও বিশিষ্ট হোক ও যোগ্যতার অধিকারী হোক।
যদি তুমি এর যোগ্য লোক চাও, তাহলে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করাও;
ভ্রমণের দ্বারা বুদ্ধিমান কর এবং ধর্মের দ্বারা আশান্বিত কর।
সম্ভবত গোপন পরামর্শ করতেও তাদের রহস্য শুনতে পারবে
বিচ্ছিন্ন ও প্রকাশমান এবং উন্নত জগতে নেতৃস্থানীয় হবে।
আব্বাসের জন্য আমরা মহিমার কথা বলি ও তার গুপ্ত রহস্য;
সে সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ পাবে এবং তার অনুসারীরা উন্নত হবে।
রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মানুষের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন[৩১৪]
যে ব্যক্তি আরশের উপর নেতৃত্ব দিবে, সেই পরিপূর্ণতা লাভ করবে।
আত্মাগুলো তাদের প্রকাশ্য দেহাদির মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে;
তাদের হত্যার জন্য দীর্ঘ আঘাতের দ্বারা অগ্রসর হয়েছে।
সেই উন্নত জগতের মধ্যে আমাদের বিনাশও বিনাশ হবে
এবং যোগ্যতা অনুসারে অস্তিত্বের আচ্ছাদন পরিধান করবে।
কবিতাটি শেষ হল এবং আল্লাহ্ শান্তি বর্ষণ করলেন
রসূলদের মোহরের উপর, সেই উন্নত মহান শান্তি।
শান্তি দিলেন আরশের প্রভু, মহত্ত্ব ও উন্নতির অধিকারী;
সেই নেতাকে, যিনি সৃষ্টিজগতের নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন
মুহম্মদ পথ-প্রদর্শন, ত্রাণকর্তা ও আমাদের নেতা;
তাঁর সহচরবৃন্দ সম্ভ্রান্ত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

শব্দ,গণিত ([illegible]) সূর্য চন্দ্রের বিশুদ্ধ করণ ও নক্ষত্র সমূহের [illegible]

[illegible] প্রতি সময়ের জন্য ([illegible]) যদি সমুদয় তত্ত্ব পরিত্যাক্ত হয়–([illegible])

প্রথম শেষ স্থান ([illegible]) যায়েরজা'র বাক্যাবলী ৩১৫

পৃথিবীর যায়েরজা হতে প্রশ্নাদির উত্তর বের করার
প্রক্রিয়া, আল্লাহ্র কৃপায়, উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের
সাক্ষাৎ প্রাপ্তদের কাছ থেকে বর্ণিত হল।

স্তরভেদে একটি প্রশ্নের তিনশ ষাটটি উত্তর হতে পারে। তন্মধ্যস্থিত বর্ণগুলোর সাথে প্রশ্নের সংযোগ স্থাপনের ফলে তাদের বিভিন্নতার জন্য নির্দিষ্ট উদীয়মানতার দিক হতে একই প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর হয় এবং এ ক্ষেত্রে কবিতাটি[৩১৬] হতে বর্ণাদি বের করার প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

---

৩১৪. রোজেনথালে এর পরবর্তী ছত্রটির অনুবাদ নেই।
৩১৫. 'যায়েরজা শেষ হল'—রাজেনথাল।
৩১৬. এটি একটি কাব্য পঙ্ক্তি।

www.amarboi.org

(সতর্কতা) তন্তু ও ছকের বর্ণসমূহকে বিন্যাস করার তিনটি নীতি বিদ্যমান। আরবি বর্ণমালা, তারা তাদের আকৃতি অনুযায়ীই আরোপিত হয়। 'রুসমুল গুবার'[৩১৭] বর্ণমালা, সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কতকগুলো, চক্র চারটির বেশি না হলে এদের আকৃতিগত মান অনুসারে আরোপিত হয় এবং চক্রাদি চারের বেশি হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে দশকের ঘরে ও অনুরূপভাবে শতকের ঘরে প্রক্রিয়া অনুসারে স্থানান্তরিত হয়; যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করব। এ নীতিত্রয়ীর মধ্যে 'রুসমুয্ যিমাম'[৩১৮] বর্ণমালাও এরূপ। অবশ্য এ বর্ণমালা দ্বিতীয় পর্যায়ের এমন একটি সুযোগ দান করে, যাতে এক হাজারও দশের স্থানীয়। এগুলোর মান আরবি বর্ণমালার পাঁচের সাথে সম্পর্কীয়। সুতরাং ছকের ঘরে এ 'রুসম' হতে তিনটি বর্ণ এবং ঐ 'রুসম' হতে দুটি বর্ণ রাখা উচিত। এ কারণে তারা ছকের মধ্যে খালি ঘর রাখা সংক্ষিপ্ত করেছেন। তারপর যখন চক্রাদির নীতি চারের বেশি হয়, তখন ছকের দৈর্ঘ্যের সংখ্যায় হিসাব করা হয়ে থাকে এবং চারের বেশি না হলে শুধুমাত্র পূর্ণগুলোরই হিসাবের মধ্যে আনা হয়।

প্রশ্নকে প্রক্রিয়াবদ্ধ করার জন্য সাতটি নীতির প্রয়োজন হয়। তন্তুগুলোর বর্ণাদি গণনা ও বারবার করে বিয়োগ করার পর চক্রাদির সংরক্ষণ। এরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থায় আটটি চক্র এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছয়টি চক্র সর্বদা হয়ে থাকে। উদীয়মান, রাশিচক্রের ক্রিয়ামক ও বৃহৎমূল চক্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং এরা সর্বদাই এক। মূলচক্রের সাথে উদীয়মানের সম্পর্ক স্থাপিত হলে কী বের হয় এবং উদীয়মান ও চক্র দ্বারা রাশিচক্রের নিয়ামককে গুণ করলে কী বের হয়, তা লক্ষ রাখা। উদীয়মানের সাথে রাশিচক্র নিয়ামককে সম্পর্কযুক্ত করা; এর সমুদয় প্রক্রিয়াটি তিনটি চক্রকে চারটি চক্রে গুণ করার দ্বারা বের হয়ে আসবে এবং এর ফলে বারটি চক্র উৎপন্ন হবে। এ তিনটি চক্রের সম্পর্ক এই যে, এদের প্রতিটি চারটি হতে তৃতীয় উৎপাদনে সম্পন্ন এবং প্রতিটি উৎপাদনের প্রারম্ভ বিদ্যমান। তারপর এরা যে চারটি চক্রের সাথে গুণিত হবে, তারাও তৃতীয় উৎপাদনের ফসল। তারপর এরা ছয় দ্বারা দুয়ের সাথে গুণিত হবে; এজন্যই তার উৎপাদন দেখা দিবে এবং প্রক্রিয়ায় তা বের হয়ে আসবে। এ বারটি চক্রের অনুসারী ফলাফল বিদ্যমান; তারাও চক্রাদির মধ্যে অবস্থিত। বস্তুত তা একটি ফল অথবা বেশি ছয়টি মাত্র।

---

৩১৭. 'রুসুমুল গবুর' নিম্নপ্রকার :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

'গুবার' অর্থ ধূলিকণা; বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চলে আরবি সংখ্যার লিখন প্রণালীর সাথে কিছুটা সাযুজ্য আছে।

৩১৮. 'রুসমুয যিমাম' নিম্নপ্রকার :

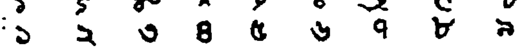

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০

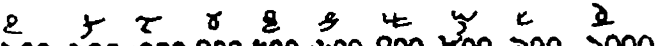

১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০

এগুলো সম্ভবত গ্রিক-কপটিক সংখ্যা লিখন প্রণালী হতে উদ্ভূত।

www.amarboi.org

এ সম্পর্কীয় বর্ণনার প্রথমে আমরা একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি, তা এই যে, 'এটি কি একটি প্রাচীন শাস্ত্র, না আধুনিক।'[৩১৯] এর উদীয়মানতা ধনুর প্রথম পর্যায়ে তন্তুগুলোর বর্ণাদির মধ্যে এবং তারপর প্রশ্নের বর্ণাদি। আমরা ধনুর শীর্ষস্থিত তন্তুর বর্ণাদি স্থাপন করি এবং তার অনুরূপ মিথুনের শীর্ষ। তার তৃতীয়টি কুম্ভের শীর্ষস্থিত তন্তু কেন্দ্রের সীমা পর্যন্ত বর্ধিত। আমরা এর সাথে প্রশ্নের বর্ণাদি সম্পর্কযুক্ত করি এবং তার সংখ্যাগুলো বিবেচনা করে দেখি। এর ফলে সংখ্যার সর্বাপেক্ষা কম মান অষ্টাশি এবং সর্বাপেক্ষা বেশি মান হয় ছিয়ানব্বই। এটাই বিশুদ্ধ চক্রের সামগ্রিক মান। এদিক থেকে আমাদের প্রশ্নের সংখ্যামান হল তিরানব্বই। এমন কি প্রশ্নের সংখ্যামান ছিয়ানব্বইয়ের বেশি হলে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। এর সমস্ত বার সংখ্যক চক্র বাদ দিয়ে তার ফল ও অবশিষ্ট সংরক্ষণ করা হয়। এদিক থেকে আমাদের প্রশ্নে সাত চক্র ও অবশিষ্ট হল নয়। একে বর্ণাদির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যতক্ষণ না উদীয়মানতা বার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেখানে পৌঁছালে তার গণনা ও চক্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না।

পুনরায় উদীয়মান যদি তৃতীয় মুখে চব্বিশ পর্যায়ের বেশি হয়, তাহলে তার সংখ্যাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর উদীয়মানের প্রতিষ্ঠা; তা এক। উদীয়মানের নিয়ামক; তা চার। বৃহৎ চক্র; তা এক। উদীয়মান ও চক্রের মধ্যস্থিত সমুদয়ের যোগফল; তা এ প্রশ্নে দুই। এ দুটি থেকে যা বের হয়, তাকে রাশিচক্রের নিয়ামকের সাথে গুণ করলে আট হয়। নিয়ামককে উদীয়মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলে হবে পাঁচ। এ সাতটি নীতি। ধনুর নিয়ামকের সাথে উদীয়মান ও বৃহৎচক্রের গুণের ফলে যা বের হয়ে আসবে, তা যদি বার সংখ্যা না হয়, তা হলে ছকের নিম্নদিক থেকে উপরের দিকে আটের পাশে তাকে প্রবেশ করাতে হবে। যদি তা বার সংখ্যার বেশি হয়, তাহলে চক্র বিয়োগ করে অবশিষ্ট আটের পাশে প্রবেশ করবে। সংখ্যার শেষ পর্যায়ে একটি চিহ্ন তার এবং উদীয়মান ও নিয়ামকের মধ্য থেকে বের হয়ে আসা পাঁচের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। উদীয়মান তখন ছকের উপরের দিকের বিস্তৃত সমতলে অবস্থান করবে। পরপর পাঁচটি চক্র গণনা করতে হবে এবং সংখ্যাটি এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে তা এ চারটির যে-কোন একটি বর্ণে উপনীত হয়। বর্ণগুলো হচ্ছে 'আলিফ', 'বে', 'জিম' অথবা 'যে'। আমাদের গৃহীত প্রক্রিয়ায় সংখ্যাটি আলিফে এসে উপনীত হবে এবং তিনটি চক্র পিছনে থাকবে। সুতরাং আমরা তিনের সাথে তিন গুণ করে নয় পাব এবং এটাই প্রথম চক্রের সংখ্যা।

এ সংখ্যাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুটি পাশের মধ্যবর্তী সমুদয়কে এক করতে হবে। এ দুটি পাশ লম্ব ও বিস্তৃত, ছকের সংখ্যা অনুসারে পূর্ণ ঘরগুলোর বিপরীতে আটের ঘরে হবে। এটি যদি ছকের খালি ঘরগুলোর কোনটিতে উপনীত হয়, তাহলে তাকে গণ্য না করে চক্রাদির মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। প্রথম চক্রে যে সংখ্যা রয়েছে, তা এখানে প্রবেশ করাতে হবে এবং এটি নয় সংখ্যা। ছকের সম্মুখভাগে তার সন্নিহিত যে ঘরটি রয়েছে, যাতে এরা উভয়ে একত্র হবে, তার সংখ্যামান আট। সেখান

৩১৯. এ প্রশ্নটিকেই 'যায়েরজা'র মাধ্যমে সাধন করে উত্তর পেতে চেষ্টা করা হয়েছে। উত্তর ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্র:।

www.amarboi.org

থেকে বাম দিকে অগ্রসর হয়ে তারপর 'লাম আলিফ' বর্ণে উপনীত হবে এবং কখনই সেখান থেকে যুগ্ম বর্ণ বের হবে না। এটি তখন 'তে' বর্ণ, সংখ্যামান চারশত—রুস্‌মুয্‌ যিমামের অন্তর্গত; সুতরাং তাকে 'উদ্দিষ্ট ঘর'[৩২০] হতে স্থানান্তরিত করার পর তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। এর সাথে নিয়ামকের চক্রে সংখ্যা যোগ করলে তের হবে। এ সংখ্যাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করাতে হবে এবং যার উপর এ সংখ্যাবিন্যাস পড়ে, তাতে থামতে হবে এবং তাতে উদ্দিষ্ট ঘর হতে চিহ্ন দিতে হবে।

পাঠক, এ নিয়ম থেকে জানতে পারবেন, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্ণগুলো কতবার আবর্তিত হয়ে থাকে। এটি এই যে, প্রথম চক্রের বর্ণগুলো একত্র করলে তার সংখ্যামান হবে নয়; এর রাশিচক্রের নিয়ামকের সংখ্যা চার যোগ করলে তের হবে। এ সংখ্যাকে তার সমপরিমাণের দ্বারা বর্ধিত করলে হবে ছাব্বিশ। তা থেকে বর্তমান প্রশ্নের উদীয়মান পর্যায়ের সংখ্যা এক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকবে পঁচিশ। এটাই হবে বর্ণসমূহের প্রথম বিন্যাসের ধারা। তারপর তেইশ দুবার, বাইশ দুবার এবং এভাবে বিয়োগ দিতে দিতে পদ্য পঙ্‌ক্তির শেষ এক সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কারও পক্ষে প্রথমেই এক বাদ দিয়ে চব্বিশের জন্য থমকে দাঁড়ালে চলবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় চক্রের বিষয়টি রাখতে হবে এবং প্রথম চক্রের বর্ণগুলোকে আটের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। এটি উদীয়মান ও চক্রের সাথে নিয়ামকের গুণফলের সাথে সতের হবে; অবশিষ্ট থাকবে পাঁচ। তারপর আটের পাশে তাকে এমনভাবে চড়াতে হবে, যাতে প্রথম চক্রে শেষ হয় এবং সেখানে চিহ্ন দিতে হবে। ছকের সামনে সতেরকে প্রবেশ করাতে হবে; তারপর পাঁচকে। খালিঘরগুলোকে ধরতে হবে না এবং চক্র হবে বিশ। এর ফলে আমরা 'ছে' বর্ণটি পাব; তা পাঁচশ। অবশ্য তা 'নুন'; কেননা আমাদের চক্রটি দশকের পর্যায়ে। সুতরাং পাঁচশ পঞ্চাশে গণ্য হবে; কারণ তার চক্রটি সতের। তা যদি সতের না হতো তাহলে শতকের পর্যায়ে হতো। কাজেই 'নুন'কে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তার প্রথম দিকে পাঁচকে প্রবেশ করাতে হবে।

এর পর দেখতে হবে সমতলের যে অংশটি তার বিপরীত, তাতে কী আছে; তা এক। এ একককে বিপরীত মুখে স্থাপন করলে তা পাঁচের উপর পড়বে। এর সাথে সমতলের একককে সম্পর্কযুক্ত করলে ছয় হবে। এখানে 'ওয়াও'কে প্রতিষ্ঠা করে তাকে চিহ্নিত করতে হবে উদ্দিষ্ট ঘরের সংখ্যা চারের দ্বারা। এর সাথে উদীয়মান ও চক্রকে নিয়ামকের দ্বারা গুণিত সংখ্যা আটের সম্পর্ক স্থাপন করলে বার হবে। এর সাথে দ্বিতীয় চক্রের অবশিষ্ট পাঁচ মিলালে সতের হবে এবং এর দ্বিতীয় চক্রের সংখ্যামান।

অতঃপর আমরা এ সতেরকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালাম এবং সংখ্যাটি একের উপর পড়ল। এখানে 'আলিফ'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তন্তুগুলোর বর্ণ থেকে দ্বিতীয় চক্রের মধ্য থেকে বহিষ্কৃত সংখ্যা অনুসারে তিনটি বর্ণকে বাদ দিতে হবে। এবার তৃতীয় চক্রকে রাখতে হবে এবং পাঁচকে আটের সাথে মিলালে তের হবে; অবশিষ্ট থাকবে এক। এ একের দ্বারা চক্রটিকে আটের পাশে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে তের প্রবেশ করাতে হবে। যার উপর সংখ্যাটি

৩২০. মূল শব্দটি 'বয়তুল কসীদ', এর অর্থ উদ্দিষ্ট কাব্য পঙ্‌ক্তিও হতে পারে।

www.amarboi.org

পড়বে, তা নিতে হবে এবং তা হলো 'ক্বাফ'; তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তেরকে তত্ত্বগুলোর বর্ণে প্রবেশ করিয়ে যা বের হয়, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তা হলো 'সিন'। উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার চিহ্ন প্রদান করতে হবে। তারপর চক্রের অবশিষ্টের সাথে বহিষ্কৃত সিনের নিকটবর্তী তেরকে প্রবেশ করাতে হবে; তা এক। এর পর সিনের সন্নিহিত তত্ত্বগুলোর বর্ণ থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা 'বে'; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে ও উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাতে চিহ্ন দিতে হবে। একেই বলা হয়—'হেলান চক্র' তার পরিমাপ বিশুদ্ধ।

এটি তেরকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বর্ধিত করা এবং সেই সাথে চক্রের অবশিষ্ট একককে সম্পর্কযুক্ত করা; এর ফলে সাতাশ হবে। এটাই 'বে' বর্ণ যা তত্ত্বগুলো থেকে উদ্দিষ্ট ঘরের মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছে। তেরকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে। এরপর সমতলের বিপরীতে যা আছে তার প্রতি লক্ষ করতে হবে এবং তাকে তার অনুরূপ দ্বারা বাড়াতে হবে। এর উপর তেরর অবশিষ্ট এক বাড়িয়ে দিতে হবে এবং এর ফল হবে 'জিম' বর্ণ। মোট সংখ্যা থেকে সাত। অনুরূপভাবে 'যে' বর্ণ; আমরা তাকে প্রতিষ্ঠা দিব এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে এর উপর চিহ্ন দিব। এর পরিমাপ হল সাতকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বাড়ানো এবং তার সাথে তেরর অবশিষ্ট একককে যোগ করা; এর ফলে সংখ্যা দাঁড়াবে পনের। এর উদ্দিষ্ট ঘরের পঞ্চদশ সংখ্যা। এটাই ত্রি-চক্রাদির শেষ পর্যায়।

এখানে চতুর্থ চক্রকে রাখতে হবে এবং পূর্ব চক্রের অবশিষ্ট মিলিয়ে এর সংখ্যা হলো নয়। এ ক্ষেত্রেও উদীয়মান ও চক্রের দ্বারা নিয়ামককে গুণ করতে হবে। এ চক্রই চতুশ্চক্রীয় প্রথম ঘরের শেষ প্রক্রিয়া। এর পর তত্ত্বগুলোর দুটি বর্ণকে গুণ করতে হবে এবং নয় সংখ্যাকে আটের পাশে ক্রমশ উপরের দিকে বসাতে হবে। উদিষ্ট ঘর থেকে শেষে গৃহীত বর্ণের চক্রে নয়কে প্রবেশ করাতে হবে। এর নবম হল 'রে' বর্ণ; একে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এর উপর চিহ্ন দিতে হবে। ছকের প্রারম্ভস্থানে নয়কে প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে তার বিপরীত সমতলে কী আছে; তা 'জিম'। এক সংখ্যাকে উল্টে দিলে তা হবে 'আলিফ' এবং তা উদ্দিষ্ট ঘর থেকে 'রে'র দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে। এ দ্বিতীয়ের সন্নিহিত সংখ্যাকে গণনা করলেও সেই 'আলিফ' দেখা দিবে এবং একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে। তা দ্বারা তত্ত্বগুলোর একটি বর্ণে গুণ করতে হবে এবং নয়কে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করলে আঠার হবে। এ সংখ্যাকে তত্ত্বগুলোর বর্ণাদিতে প্রবেশ করিয়ে 'বে'র কাছে থামতে হবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে আটচল্লিশের চিহ্ন দিতে হবে। তত্ত্বগুলোর বর্ণে আঠারকে প্রবেশ করিয়ে সিনের কাছে থামতে হবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দুই দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। এ দুইকে নয়ের সাথে সংযুক্ত করলে এগার হবে এবং এই এগারকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে তার বিপরীত সমতলে থাকবে আলিফ। একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে ছয়।

এখানে পঞ্চম চক্র রাখতে হবে; তার সংখ্যা মান সতের; অবশিষ্ট পাঁচ। এ পাঁচকে আটের পাশে চড়িয়ে তত্ত্বগুলোর দুটি বর্ণের সাথে গুণ করতে হবে এবং পাঁচকে তার

www.amarboi.org

অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বর্ধিত করতে হবে। এ সংখ্যাকে তার চক্রের সংখ্যা সতেরর সাথে যুক্ত করলে মোট সংখ্যা হবে সাতাশ। এ সংখ্যাকে তন্তুসমূহের বর্ণে প্রবেশ করাতে হবে এবং 'বে'র উপর পড়বে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে বত্রিশ। সতের থেকে সেই দুইকে বাদ দিতে হবে, যা বত্রিশের ভিত্তি; অবশিষ্ট থাকবে পনের। একে তন্তুসমূহের বর্ণে প্রবেশ করালে 'ক্বাফে' উপনীত হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে ছাব্বিশ। এ ছাব্বিশকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে 'রুসমুল গুবার'-এর দুইয়ে উপনীত হবে এবং এটাই 'বে' বর্ণ। একে প্রতিষ্ঠা করে এর উপর চিহ্ন দিতে হবে পঁয়তাল্লিশ।

একে তন্তুসমূহের দুটি বর্ণে গুণ করে ষষ্ঠ চক্র রাখতে হবে। এর সংখ্যা মান তের এবং এর অবশিষ্ট এক। এখানে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, পদ্যের চক্রমান পঁচিশ। কেননা চক্রগুলো হল পঁচিশ, সতের, পাঁচ, তের ও এক। সুতরাং পাঁচকে পাঁচের সাথে গুণ করলে পঁচিশ হবে; এটাই ঘরের পদ্যের চক্র। এ চক্রকে আটের পাশে একের দ্বারা স্থানান্তরিত করতে হবে। কিন্তু এটি উদ্দিষ্ট ঘরে তেরর দ্বারা প্রবেশ করবে না; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা এটি দ্বিতীয় বিন্যাসের দ্বারা উৎপন্ন দ্বিতীয়ের চক্র। বরং আমরা উদ্দিষ্ট ঘরের 'বে' বর্ণাদি থেকে বহিষ্কৃত চুয়ান্নের মধ্যে চারকে একের সাথে যুক্ত করব; এর ফলে পাঁচ হবে এবং পাঁচকে ওই চক্রের তেরর সাথে যুক্ত করলে আঠার হবে। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে এবং তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা আলিফ। তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে বার। তাকে তন্তুসমূহের দুটি বর্ণে গুণ করতে হবে।

এখানে প্রশ্নের বর্ণগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার মধ্য থেকে যা বের হবে, তাকে উদ্দিষ্ট ঘরের শেষের দিকে যোগ করতে হবে। প্রশ্নের বর্ণগুলো থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে; যাতে তা উদ্দিষ্ট ঘরের সংখ্যায় প্রবেশ করতে পারে। তারপর প্রশ্নের সমুদয় বর্ণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি বর্ণের ব্যাপারে এরূপ করতে হবে। এভাবে যা তার মধ্য থেকে বের হবে, তাকে উদ্দিষ্ট ঘরের শেষের দিকে যোগ করে চিহ্ন দিতে হবে। এর পর আলিফ বর্ণের উপর একক সংখ্যার যে চিহ্ন দেয়া হয়েছে, তাকে আঠারর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এর ফলে দুই পাওয়া যাবে এবং মোট সংখ্যা হবে বিশ। একে তন্তুসমূহের বর্ণের উপর প্রবেশ করালে 'রে' বর্ণের মধ্যে গিয়ে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাকে চিহ্নিত করতে হবে; ছিয়ানব্বই। এটাই তন্তুসমূহের বর্ণচক্রাদির শেষ সীমা।

তন্তুসমূহের দুটি বর্ণকে গুণ করে সপ্তম চক্র রাখতে হবে এবং এটি দুটি অভিনবত্বের দ্বিতীয় অভিনবত্ব। এ চক্রের সংখ্যামান হল নয়; এর সাথে এক যুক্ত করলে দ্বিতীয় উৎপাদনের জন্য দশ হবে। এই একককে পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ চক্রে যোগ করতে হবে; যদি তার সম্পর্ক অনুরূপ হয় অথবা তাকে মূল থেকে কমাতে হবে। ফলে মোট হবে পনের। একে আটানব্বইয়ের পাশে চড়াতে হবে এবং দশ দ্বারা ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে; ফলে তা পাঁচশতে গিয়ে থামবে। অবশ্য মূলত এটি পঞ্চাশ মাত্র; 'নুন'কে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করা হয়েছে। এটি ক্বাফ; একে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট

www.amarboi.org

ঘর থেকে তাকে চিহ্নি করতে হবে বায়ান্ন। এই বায়ান্ন থেকে দুইকে বাদ দিতে হবে এবং ওই চক্রের নয়ও বাদ পড়বে। অবশিষ্ট থাকবে একচল্লিশ। একে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে একের মধ্যে এসে থামবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। অনুরূপভাবে তাকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে এক পাওয়া যাবে। এটাই দ্বিতীয় উৎপাদনের পরিমাণ। এর উপর উদ্দিষ্টঘর থেকে দুটি চিহ্ন প্রদান করতে হবে; এর একটি শেষ পরিমাপগত আলিফের উপর এবং অন্যটি প্রথম আলিফের উপর। দ্বিতীয়টি চব্বিশ।

তন্তুসমূহের দুটি বর্ণকে গুণ করে এবার অষ্টম চক্র রাখতে হবে; এর সংখ্যামান সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। আটান্নর পাশে প্রবেশ করাতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে পাঁচ প্রবেশ করালে 'আইন'-এর সত্তরে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। ছকের মধ্যে পাঁচ প্রবেশ করাতে হবে এবং তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে। তা এক; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘর থেকে চিহ্ন দিতে হবে আটচল্লিশ। দ্বিতীয় ভিত্তির জন্য এ চল্লিশ থেকে এক বাদ দিতে হবে এবং তার সাথে চক্রের পাঁচ যোগ করতে হবে; মোট হবে বায়ান্ন। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে—'রুস্‌মু গুবার'-এর 'বো' বর্ণে এসে থামবে। এটি সংখ্যা বৃদ্ধির শতকের পর্যায়: এর ফলে দুইশ হবে। এটি 'রে' বর্ণ; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট থেকে চিহ্ন দিতে হবে চব্বিশ। সুতরাং বিষয়টি ছিয়ানব্বই থেকে প্রথম দিকে স্থানান্তরিত হবে; তা চব্বিশ। এ চব্বিশের সাথে চক্রের পাঁচ সংযুক্ত করতে হবে এবং তা থেকে এক বাদ দিলে মোট দাঁড়াবে আটাশ। এর অর্ধেককে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে আটের উপর এসে থামবে এবং দুইকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে।

এখানে নবম চক্র রাখতে হবে; তার সংখ্যা তের এবং অবশিষ্ট এক। আটের পাশে একে চড়াতে হবে। সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ স্থানের প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ষষ্ঠ চক্রের সম্পর্কের ন্যায় নয়; কারণ তা দ্বিতীয় উৎপাদনের ফসল এবং তা রাশিচক্রের চতুর্বর্গের তৃতীয়াংশের প্রথম ও ত্রিবর্গের চতুর্থটির ষষ্ঠাংশের শেষ। সুতরাং চক্রের তেরকে পূর্ব রাশিচক্রের ত্রিবর্গের চারের সাথে গুণ করতে হবে; ফল হবে বায়ান্ন। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে তা 'রুসমুল গুবারে'র দুই বর্ণে এসে থামবে এবং তা সংখ্যার দিক থেকে একক ও দশকের ঘর অতিক্রম করে যাওয়ায় একান্তই শতকিয়া। তাকে দুইশ 'রে' বর্ণে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে আটচল্লিশ। চক্রের তেরোর সাথে ভিত্তির এক সংযুক্ত করতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে এ চৌদ্দ প্রবেশ করালে আটে দাঁড়াবে। তাতে আটাশের চিহ্ন দিতে হবে। চৌদ্দ থেকে সাত বাদ দিলে সাত অবশিষ্ট থাকবে; তাকে তন্তুগুলোর দুটি বর্ণে গুণ করে সাতকে প্রবেশ করালে 'লাম' বর্ণের কাছে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘর থেকে তার উপর দিতে হবে।

এভাবে দশম চক্র রাখতে হবে এবং তার সংখ্যা নয়। এটি চতুর্থ ত্রিবর্গের আরম্ভ। এ নয়কে আটের পাশে চড়ালে শূন্য ঘর পাওয়া যাবে। সুতরাং নয়কে দ্বিতীয় বার চড়ালে আরম্ভের সপ্তম স্থানে হবে। নয়কে চারের সাথে গুণ করতে হবে; কেননা আমরা দুটি নয় সহ চড়তে চাই। অবশ্য একমাত্র দুইয়ের সাথেই তাকে গুণ করা হত। এ

www.amarboi.org

ছত্রিশকে ছকের মধ্যে প্রবেশ করালে তা 'কুস্মুয্ যিমাম'-এর চার এসে থামবে; তা দশকিয়া। আমরা চক্রাদির স্বল্পতার জন্য তাকে একক হিসেবে গ্রহণ করেছি। সুতরাং 'দাল' বর্ণ প্রতিষ্ঠা পাবে। ছত্রিশের সাথে ভিত্তির এক যুক্ত করলে উদ্দিষ্ট ঘরে তার সীমা নির্দিষ্ট হবে। তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। যদি অন্য কিছু ছাড়া নয়কে গুণের দিক থেকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা আটে এসে থামবে। এ আট থেকে চার বাদ দিলে চার অবশিষ্ট থাকবে; তাই লক্ষ্য বস্তু। যদি নয়ের দ্বিগুণ আঠারকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা 'যিমামে'র একে এসে থামবে; এটিও দশকিয়া। তা থেকে নয়ের দ্বিগুণ দুইকে বাদ দিলে তার অবশিষ্টের অর্ধেক আটই লক্ষ্যবস্তু। যদি ছকের প্রারম্ভে নয়ের তিন গুণ সাতাশকে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা যিমামের দশের উপর পড়বে। প্রক্রিয়া একই প্রকার। তারপর নয়কে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করাতে হবে এবং যা বের হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে; তা আলিফ। এর পর নয়কে সেই তিনের সাথে গুণ করতে হবে, যা বিগত নয়ের অঙ্গ এবং এক বাদ দিতে হবে। ছাব্বিশকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করিয়ে যা বের হয়, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে; তা 'রে' বর্ণে দুইশ। উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে ছিয়ানব্বই।

এখানে তত্ত্বগুলোর দুটি বর্ণ গুণ করে একাদশ চক্র রাখতে হবে। তার সংখ্যা সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। আটের পাশে পাঁচকে চড়াতে হবে এবং প্রথম চক্রে পদচারণা কালে যা বারংবার এসেছে, তাকে গণনা করতে হবে। ছকের প্রারম্ভে পাঁচকে প্রবেশ করালে শূন্য ঘরে এসে পৌঁছবে। তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা এক। এ এককে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে 'সিন' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চার। যদি ছকে থেমে পড়ার বিষয়টি কোন পূর্ণ ঘরে এসে পৌঁছত, তা হলে আমরা এককে তিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতাম। সতেরকে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করতে হবে এবং তা থেকে এক বাদ দিতে হবে।[৩২১] পুনরায় তার সাথে চার বাড়ালে মোট সাঁইত্রিশ হবে। একে তত্ত্বগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে ছয়ে এসে পৌঁছবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে। পাঁচকে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করতে হবে। তাকে ঘরে প্রবেশ করালে 'লামে'র কাছে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে বিশ এবং তত্ত্বগুলোর দুটি বর্ণের সাথে গুণ করতে হবে।

এখানে দ্বাদশ চক্র রাখতে হবে, তার সংখ্যা হবে তের এবং অবশিষ্ট হবে এক। আটের পাশে এ এককে চড়াতে হবে। এ চক্রই সর্বশেষ চক্র, দুটি অভিনবত্বের শেষ এবং ত্রিমাত্রিক চতুর্বর্গের ও চতুর্মাত্রিক ত্রিবর্গের শেষ পর্যায়। এ এক ছকের প্রারম্ভে যিমামের আশির উপর পড়বে। এটি আটের একক মাত্র; অথচ আমাদের কাছে একটি ছাড়া অন্য কোন চক্র নেই। সুতরাং তা যদি দ্বাদশ চতুর্বর্গের চার অথবা দ্বাদশ ত্রিবর্গের তিন অপেক্ষা বেশি হত, তা হলে অবশ্যই 'হে' হত; কিন্তু তা 'দাল' মাত্র। কাজেই তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চুয়াত্তর। তারপর তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সমতলে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ করতে হবে; তা পাঁচ। তার সাথে ভিত্তির জন্য তার অনুরূপ কিছু বর্ধিত করলে দাঁড়াবে দশ। 'ইয়া'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন

৩২১. এখানে রোজেনথালের অনুবাদের সাথে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান।

www.amarboi.org

দিতে হবে। তারপর লক্ষ করতে হবে তা কোন পর্যায়ে পড়ে। আমরা তাকে চতুর্থ পর্যায়ে পাচ্ছি এবং সাতকে তত্ত্বগুলোর বর্ণে প্রবেশ করাচ্ছি। এ প্রবেশস্থলকে বলা হয়, 'বর্ণীয় প্রজনন'; সুতরাং তা হবে 'ফে'। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সাতের সাথে চক্রের এক-কে সংযুক্ত করতে হবে; সর্বমোট হবে আট; তাকে তত্ত্বগুলোর মধ্যে প্রবেশ করালে 'সিন' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে আট। এ আটকে চক্রের দশের অতিরিক্ত তিনের সাথে গুণ করতে হবে। কেননা এটাই চক্রাদির চতুর্বর্গের সেই পর্যায়ে, যা ত্রিবর্গের দ্বারা শেষ হয়েছে। ফলে তা দাঁড়াবে চব্বিশ। তাকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়ে তা থেকে যা বের হয়, তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তা দুইশ ও তার চিহ্ন হল ছিয়ানব্বই। এটাই বর্ণাদির চক্রের দ্বিতীয় চক্রের শেষ সীমা।

তত্ত্বগুলোর দুটি বর্ণ গুণ করে এখানে প্রথম ফল রাখতে হবে। তার সংখ্যা নয় এবং এ সংখ্যাটি তত্ত্বগুলোর বর্ণকে চক্রাদিক্রমে বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, তার সাথে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; তাও নয়। এ নয়কে তত্ত্বগুলোর বর্ণের নব্বই সংখ্যার অতিরিক্ত তিনের সাথে গুণ করতে হবে এবং দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক তার সাথে যুক্ত করতে হবে; মোট হবে আটাশ। তাকে তত্ত্বগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'আলিফে' উপনীত হবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে ছিয়ান্নব্বই। যদি নব্বই সম্পর্কীয় বর্ণাদির চক্রের সংখ্যা সাতকে চারের সাথে গুণ করা হয়, যা নব্বইর অতিরিক্ত তিন ও দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট একের সমষ্টি, তা হলে সংখ্যামান এরূপ হবে। নয়কে আটের পাশে চড়াতে হবে এবং ছকের মধ্যে নয়কে প্রবেশ করাতে হবে; তা হলে যিমামের দুই হবে। নয়কে সমতলের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সাথে গুণ করতে হবে; তা তিন এবং তার সাথে বর্ণাদির তত্ত্বর সংখ্যা সাতকে যুক্ত করতে হবে। তা থেকে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক-কে বাদ দিলে মোট হবে তেত্রিশ। তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করালে পাঁচে পৌছবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে নয়কে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বাড়িয়ে ছকের প্রারম্ভে আঠারকে প্রবেশ করাতে হবে। সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা এক। তাকে তত্ত্বগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'মিম'-এ পৌছবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে।

তত্ত্বগুলোর দুই বর্ণকে গুণ করে দ্বিতীয় ফল স্থাপন করতে হবে। তার সংখ্যা সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। পাঁচকে আটের পাশে চড়াতে হবে এবং পাঁচ দ্বারা নব্বইর অতিরিক্ত তিনকে গুণ করলে পনের হবে। তার সাথে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক যুক্ত করলে নয় হবে এবং ষোলকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে 'তে' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চৌষট্টি। নব্বইয়ের অতিরিক্ত তিনকে পাঁচের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং তার সাথে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক বাড়ালে হবে নয়। তাকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে যিমামের ত্রিশ হবে। তারপর সমতলে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ করলে এক পাওয়া যাবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাকে চিহ্নিত করতে হবে। তা ঘর থেকেও নবম। ছকের প্রারম্ভে নয়কে প্রবেশ করালে তা তিনে পৌছবে; এটি দশকের পর্যায়। 'লাম'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে।

এখানে তৃতীয় ফলকে স্থাপন করতে হবে; তার সংখ্যা তের এবং অবশিষ্ট এক। আটের পাশে এককে স্থানান্তরিত করে তেরর সাথে নব্বইয়ের অতিরিক্ত তিন ও দ্বাদশ

www.amarboi.org

চক্রের অবশিষ্ট একককে সংযুক্ত করলে—সতের হবে এবং এর সাথে ফলের একককে যোগ করলে দাঁড়াবে আঠার। তাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'লাম' হবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।' এটাই প্রক্রিয়ার শেষ।

এই বিগত প্রশ্নের মধ্যে যে উদাহরণটি বিদ্যমান, তা দিয়ে আমরা জানতে চেয়েছি যে, এ 'জায়েরষা,' এটি শাস্ত্র হিসেবে অর্বাচীন, না প্রাচীন। উদীয়মান তখন ধনুকের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। আমরা তন্তুগুলোর বর্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এর পর প্রশ্নের বর্ণগুলোকে এবং এর পর নীতিমালাকে। এগুলো বর্ণাদির সংখ্যামান—তিরানব্বই; তার চক্রাদির সংখ্যা সাত; তার অবশিষ্ট নয়; উদীয়মান এক; ধনুকের নিয়ামক চার; বৃহৎচক্র এক; চক্রের সাথে উদীয়মানের পর্যায় দুই; চক্রের সাথে উদীয়মানকে নিয়ামকের দ্বারা গুণের ফল আট এবং নিয়ামককে উদীয়মানের সাথে সংযুক্তকরণ পাঁচ—উদ্দিষ্ট ঘর।

> একটি বিরাটাকার প্রশ্ন তোমার মধ্যে বহন করছ, অতএব সংরক্ষণ কর
> উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।[৩২২]

তন্তুগুলোর বর্ণ—স্বোয়াদ, ত্বয়, হে, রে, ছে, কাফ, হে, মিম, স্বোয়াদ, স্বোয়াদ, ওয়াও, নুন, বে, হে, সিন, আলিফ, নুন, লাম, মিম, নুন, স্বোয়াদ, আইন, ফে, স্বোয়াদ, ওয়াও, রে সিন, কাফ, লাম মিম, নুন, স্বোয়াদ, আইন, ফে, দ্বোয়াদ, ক্বাফ, রে, সিন, তে, ছে, খে, যাল, যয়, গাইন, শিন, ত্বয়, ইয়া, আইন, হে্ব, স্বোয়াদ, রে, ওয়াও, হে্ব, রে ওয়াও, হে্ব, লাম স্বোয়াদ, কাফ, লা, মিম, নুন, স্বোয়াদ, আলিফ, বে, জি, দাল, হে, ওয়াও, যে, হে্ব, ত্বয়, ইয়া।

প্রশ্নের বর্ণাদি—আলিফ, লা, যে, আলিফ, ইয়া, রে, জিম, তে, আইন, লাম, মিম, মিম, হে্ব, দাল, ছে, আলিফ, মিম, ক্বাফ, দাল, ইয়া, মিম। প্রথম-চক্র ৯; দ্বিতীয়-চক্র ১৭; অবশিষ্ট ৫; তৃতীয়-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; চতুর্থ-চক্র ৯; পঞ্চম-চক্র ১৭; অবশিষ্ট ৫; ষষ্ঠ-চক্র ১৩, অবশিষ্ট এক; সপ্তম-চক্র ৯; অষ্টম-চক্র ১৭, অবশিষ্ট ৫; নবম-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; দশম-চক্র ১৭; একাদশ-চক্র ১৭, অবশিষ্ট ৫; দ্বাদশ-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; প্রথম ফল ৯; দ্বিতীয় ফল ১৭, অবশিষ্ট ৫; তৃতীয় ফল ১৩, অবশিষ্ট ১।

হে, আইন, হে্ব হে্ব, ওয়াও, ৬, ৬, ফি, আলিফ, ইয়া, ৬

সিন ... ১	যে ... ১৫	কাফ ... ২৯
ওয়াও .. ২	তে ... ১৬	যোয়াদ ... ৩০
আলিফ ... ৩	ফে ... ১৭	বে ... ৩১
লাম ... ৪	স্বোয়াদ ... ১৮	ত্বয় ... ৩২
আইন ... ৫	নুন ... ১৯	হে ... ৩৩
যয় ... ৬	আলিফ ... ২০	আলিফ ... ৩৪
ইয়া ... ৭	যাল ... ২১	লাম ... ৩৫
মিম ... ৮	নুন ... ২২	জিম ... ৩৬
আলিফ ... ৯	গাইন ... ২৩	দাল ... ৩৭

৩২২. উক্ত কাব্যাংশটি প্রথম অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

www.amarboi.org

হে, আইন, হ্বে হ্বে, ওয়াও, ৬, ৬, ফি, আলিফ, ইয়া, ৬

লাম ... ১০	রে ... ২৪	মিম ... ৩৮
খে ... ১১	আলিফ ... ২৫	ছে ... ৩৯
লাম ... ১২	ইয়া ... ২৬	লাম ... ৪০
ক্বাফ ... ১৩	বে ... ২৭	আলিফ ... ৪১
হ্বে ... ১৪	শিন ... ২৮	

ফে, ওয়াও, যে, আলিফ, ওয়াও, মিন, রে, রে, আলিফ, আলিফ, মিম, আলিফ, বে, আলিফ, রে, ক্বাফ, আলিফ, আইন, আলিফ, রে, স্বোয়াদ, হ্বে, রে হ্বে, লাম, দাল, আলিফ, রে, সিন, আলিফ, লাম, দাল ইয়া, ওয়াও, সিন, রে, আলিফ, দাল, মিম, নুন আলিফ, লাম, লাম।

এদের চক্র পঁচিশ, এর পর তেইশ দুবার, এর পর একুশ দুবার এবং এভাবে পঙ্‌ক্তির শেষ পর্যন্ত এক সংখ্যায় শেষ হবে। সমস্ত বর্ণকে স্থানান্তরিত করতে হবে। আল্লাহ্‌ই উত্তম জ্ঞাতা। নুন, ফে, রে, ওয়াও হ্বে, রে, ওয়াও, হ্বে, আলিফ, লাম, ওয়াও, দাল, সিন, আলিফ, দাল, রে, রে, সিন, রে, হে, আলিফ, লাম, দাল, রে ইয়া, সিন, ওয়াও, আলিফ, নুন, সিন, দাল, রে ওয়াও, আলিফ, বে, লাম-আলিফ, আলিফ, মিম, রে, রে, ওয়াও, আলিফ, আলিফ, লাম, আইন, লাম, লাম।

পৃথিবীর 'জায়েরযা' হতে উত্তরাদি বের করার পদ্য সংক্রান্ত আলোচনার এটাই শেষ। মানুষ যায়ের যা ছাড়া অন্য প্রকার বহু পন্থা অনুসরণ করে, যা দিয়ে তারা পদ্যরূপ ছাড়াই প্রশ্নাদির উত্তর বের করে থাকে। তাদের কাছে 'জায়েরযা' থেকে পদ্যরূপে প্রশ্নের উত্তর বের করার রহস্য হল মালিক ইবনে ওয়াহিব রচিত কাব্যপঙ্‌ক্তি—'একটি বিরাটাকার প্রশ্ন' ইত্যাদির সাথে একে মিশ্রিত করা; এ জন্যই উত্তর তার অন্ত্যমিলে বের হয়ে থাকে। অবশ্য অন্যান্য পন্থায় পদ্যহীন রূপেই উত্তর বের করার জন্য ব্যবহৃত কিছু পন্থা, যা বিশেষজ্ঞগণের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণাদির সামঞ্জস্য বিধানের দিক থেকে গুহ্য তথ্যাদি জানার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ।

পাঠক জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সুপথের দিশা দিন, এসব বর্ণই প্রত্যেক সমস্যায় প্রশ্নাদির ভিত্তি এবং তা থেকে উত্তর বের করার জন্য এগুলোকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এ বর্ণগুলোর সংখ্যা, পাঠক, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তেতাল্লিশ। আল্লাহই অদৃশ্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবান। আলিফ, ওয়াও, লাম, আলিফ, আইন, য়য়, সিন, আলিফ, লাম, মিম, খে, ইয়া, দাল লাম, যে, ক্বাফ, তে, আলিফ, রে যাল, সোয়া, ফে, নুন, গাইন, শিন, আলিফ, কাফ, কাফ, ইয়া, বে, মিম, দোয়াদ, বে, হ্বে, ত্বয়, লাম, জিম, হে, দাল, নুন লাম, ছে, আলিফ।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। তাতে তাঁরা প্রতিটি যুগ্মবর্ণকে দুটি বর্ণ হিসেবে ধরেছেন এবং তার নাম রেখেছেন 'কুতুব' (ধ্রুব)। তাঁরা বলেন,

একটি বিরাটাকার প্রশ্ন তোমার মধ্যে বহন করছে, অতএব সংরক্ষণ কর
উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।

www.amarboi.org

পাঠক, আপনি যদি প্রশ্নের ফলাফল বের করতে চান, তা হলে বারংবার আগত বর্ণাদির আধিক্যকে বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। তারপর ভিত্তি থেকে; যা প্রতিটি বর্ণের জন্য কুতব, তার সাথে তুলনীয় প্রশ্নের বর্ণাদি থেকে একটি বর্ণকে বাদ দিন এবং অবশিষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করুন। এর পর এ দুই অবশিষ্টকে একটি পঙ্ক্তিতে উক্ত ভিত্তির অবশিষ্টকে প্রথমে এবং প্রশ্নের অবশিষ্টকে পরে রেখে মিশ্রিত করুন। এভাবে যতক্ষণ না উভয় অবশিষ্ট একসঙ্গে অথবা একটি অন্যটির পূর্বে শেষ হয়ে যায়। তারপর অবশিষ্টগুলোকেও এরূপ পর্যায়ক্রমে রাখুন। এক্ষেত্রে যদি মিশ্রণের পর বহিষ্কৃত বর্ণাদির সংখ্যা বাদ দিবার পূর্বে ভিত্তির বর্ণ সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা হলে প্রক্রিয়াটি শুদ্ধ। এ অবস্থায় তার সাথে পাঁচটি নুনযুক্ত করতে হবে, যাতে তার দ্বারা সঙ্গীতের পরিমাপসমূহ সুসামঞ্জস্য হতে পারে এবং বর্ণের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে আটচল্লিশ বর্ণ হয়। এ বর্ণগুলোর দ্বারা চতুষ্কোণ ছক এমনভাবে পূর্ণ করুন, যাতে প্রথম পঙ্ক্তিতে যা আছে, তা শেষে এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে যা আছে, তা প্রথমে হয়। অবশিষ্টগুলোকেও তাদের অবস্থা অনুসারে স্থানান্তরিত করুন। এভাবে করতে থাকুন যতক্ষণ না ছকের পূর্ণতা সাধিত হয়। প্রথম পঙ্ক্তি তার স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করবে এবং গতি অনুসারে বর্ণাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে। এর পর প্রতিটি বর্ণের তত্ত্বকে চতুষ্কোণের বিভাগ অনুসারে তার জন্য প্রাপ্ত বৃহৎ অংশে বের করুন এবং তত্ত্বকে তার বর্ণের বিপরীতে রাখুন। তারপর আপনাকে ছকের বর্ণাদির উপাদানগত সম্পর্ক জানতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ছক থেকে বর্ণাদির বাস্তব শক্তি, আত্মিক পরিমাপ, জৈবিক স্বভাব ও মৌলিক ভিত্তি জেনে নিতে হবে। তার আকৃতি নিম্নরূপ :

৪৩৯[৩২৩]

আলিফ	শক্তি	পরিমাপ	স্বভাব	ভিত্তি			
বে	৪,২০,৫০০	১,৯০০,১০০০	৭,৮০	৬০,৩০০	ওয়াও	পরিমাপ	মূলভিত্তি
জিম	৫,২০,২০০	৭,৩০,৪০০	৯,৭০,৮০০	৩,১০০			
দাল	৫,৯০,৭০০	২,৪০	৪০০,৮০,২০০	৬,৮০,৯০০			
হে	৪,৯০	৯,১০	৭,২০	৬,৮০,৯০০			
স্নো			২,১০,১০০	৫,৪০		তুম্র	শক্তি
যে			৮,৯০	৪,৫০০	স্বভাব		
				৫,২০	জল		কাফ

১০০০,১০০,১০,১ ২০০,২০২,২ ৩০,৩ ৩০০,৪০৪ ৪০০,৫০,৫ ৫০০,৬০,৬ ৭০,৭ ৬০০,৮০৮ ৭০০,৯০৯ ৮০০ ৯০০

৩২৩. এ সংখ্যাটি রোজেনথালে নেই এবং এ ছকটি দুভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। আমরা মূলের অনুসরণ করলাম।

www.amarboi.org

অতঃপর আপনি প্রতিটি বর্ণের তন্ত্রকে 'খ-কীলক' চতুষ্টয়ের ভিত্তির সাথে গুণ করার পর যা হয়, তা গ্রহণ করুন এবং যা কীলকের সন্নিহিত, তা বর্জন করুন। অনুরূপভাবে 'পতনশীল'[৩২৪] বর্ণগুলোকেও বর্জন করতে হবে। কেননা তাদের সম্পর্ক অস্থির। এভাবে যা বের হবে, তাই 'বিস্তারমান'এর প্রথম পর্যায়। এর পর আপনি উপাদানের সমুদয়কে গ্রহণ করুন এবং তার মধ্য থেকে উৎপন্নাদির ভিত্তিকে বর্জন করুন। এর ফলে সম্ভাব্যতার সহায়তা আপতনের পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টিজগতের ভিত্তি অবশিষ্ট থাকবে। আপনি তার উপর তখন বস্তুনিচয়ের কতক সারভাগকে স্থাপন করুন। এটাই সহায়তার উপাদান। আত্মার মধ্যম দিগন্ত প্রকাশ পাবে এবং আপনি তার মধ্য থেকে—উপাদানের সমুদয় থেকে বিস্তারমানের প্রথম পর্যায়কে বর্জন করলে মধ্যস্থতার জগৎ অবশিষ্ট থাকবে। এটি সম্ভাব্য সরল জগতের সাথে বিশিষ্ট, মিশ্র জগতের সাথে নয়। তারপর মধ্যস্থতার জগতকে আত্মার মধ্যম দিগন্তের সাথে গুণ করবেন, ফলে সর্বোচ্চ দিগন্ত বের হয়ে আসবে। আপনি তার উপর বিস্তারমানের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন। তারপর আপনি চতুর্থ থেকে মৌলিক সহায়ক উপাদানের প্রথমটি বিচ্যুত করবেন, ফলে বিস্তারমানের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর আপনি সর্বদা উপাদান চতুষ্টয়ের সমুদয় অংশকে বিস্তারমানের চতুর্থ পর্যায়ে গুণ করবেন, প্রথম বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টিতে গুণ করলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ, তৃতীয়টি তৃতীয়টিতে গুণ করলে তৃতীয় বিস্তারিত জগৎ এবং চতুর্থটি চতুর্থটিতে গুণ করলে চতুর্থ বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। এর পর আপনি সব বিস্তারিত জগৎকে একত্র করবেন এবং সার্বিক জগৎ থেকে তাকে বিচ্যুত করবেন, ফলে সারবস্তুর জগৎসমূহ অবশিষ্ট থাকবে। আপনি তাকে সর্বোচ্চ দিগন্তে ভাগ করে দিবেন, প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে; অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে মধ্যম দিগন্তে ভাগ করলে দ্বিতীয় অংশ বের হবে এবং তদতিরিক্ত ভগ্নাংশ যা, তাই তৃতীয়। এর চতুর্থটি চতুর্থীর মধ্যে নির্দিষ্ট। আপনি যদি চতুর্থী থেকে বেশি কিছু কামনা করেন, তা হলে আপনাকে বর্ণাদির পরে বিস্তারিত জগৎ, বিস্তারমানের পর্যায় ও দিগন্তাদির আধিক্য ঘটাতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন। অনুরূপভাবে বিস্তারমানের প্রথম পর্যায়ে যদি সারবস্তুর জগতকে বিভক্ত করা হয়, তা হলে মিশ্র জগতের প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে। এভাবে সম্ভাব্য জগতের সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। পাঠক, বুঝে নিন ও চিন্তা করুন। আল্লাহ্ই পথ-প্রদর্শক ও যথার্থ সাহায্যকারী।

উত্তর বের করার যেসব প্রক্রিয়া তারা অবলম্বন করেন, তার মধ্যে এটিও একটি। তাদের অনেক বিশেষজ্ঞই এটি বর্ণনা করেছেন। পাঠক, জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তাঁর আত্মিক শক্তির দ্বারা আমাদেরকে ও আপনাকে সাহায্য করুন। বর্ণাদির এ শাস্ত্র অতিশয় মহান; এ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এমন অনেক বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, যা জগতে প্রচলিত অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। এর প্রক্রিয়ার জন্য কতকগুলো অবশ্য পালনীয় শর্ত আছে। এটি দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনও সৃষ্টির রহস্য ও প্রকৃতির তত্ত্ব ভেদ

৩২৪. মূল 'সাওয়াকেত', সাতটি বর্ণ, যা সূরা ফাতেহায় ব্যবহৃত হয়নি : 'ছে', 'জিম', 'খে', 'যে', 'শিন', 'দ্বয়' এবং 'ফে'।

www.amarboi.org

করতে সমর্থ হন। এভাবে তিনি দর্শনের দুটি ফল সম্পর্কে অর্থাৎ এলমে 'সিমিয়া' ও তার সহোদরা এলমে 'কিমিয়া'[৩২৫] সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। বস্তুত এর মাধ্যমে তার সামনে অজ্ঞাত বিষয়াদির যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং তিনি অন্তরের গোপনতম রহস্যাদি সম্পর্কেও অবগতি লাভ করেন। আমি মাগরিব অঞ্চলে তাদের একটি দলকে দেখেছি, যারা অনুরূপ সংযোগ স্থাপনে অভ্যস্ত। তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্র কৃপায় অদ্ভুত কার্যকলাপ, অস্বাভাবিক ঘটনাবলি এবং বস্তুজগতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন।

পাঠক, জেনে রাখুন, প্রতিটি গৌরবের ভিত্তিমূল হল অধ্যবসায় এবং প্রতিটি কল্যাণের উপযোগী যোগ্যতা ধৈর্যের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন অনভিজ্ঞতা ও অস্থিরতা নৈরাশ্যের কারণ হয়। সুতরাং বলছি, পাঠক, আপনি যদি 'আলফাবিতাস' অর্থাৎ 'আবজদ' বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের পঙ্ক্তি, যা বর্ণাদি রহস্যবিদ্যার প্রথম দ্বার, তার শেষ সংখ্যাটি পর্যন্ত জানতে চান, তা হলে প্রতিটি বর্ণের সংখ্যামান অবশ্যই লক্ষ করতে হবে। সংখ্যার সাথে বর্ণের সম্পর্কের এ পর্যায়টি বস্তুত তার দৈহিক শক্তির অন্তর্গত। তারপর আপনি এ সংখ্যাকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা গুণ করুন, আপনার সামনে তার আত্মিক শক্তি বের হয়ে আসবে। এটাই তার তত্ত্ব। কিন্তু এ প্রক্রিয়া শুধু নোক্তাবিহীন বর্ণগুলোর মধ্যেই সম্পূর্ণ হতে পারে, নোক্তাযুক্তগুলোর মধ্যে নয়। কেননা বর্ণমালার মধ্যে নোক্তাযুক্ত বর্ণগুলোর অর্থগত বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যা পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, উর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ কুর্সীতে প্রতিটি বর্ণের আকৃতির অনুরূপ আকৃতি বিদ্যমান। এর মধ্যে গতিশীল গতিহীন, উর্ধ্ব, অধঃ প্রভৃতিও রয়েছে। এগুলো অনুরূপভাবেই 'জায়েরযা'র নির্দিষ্ট ছকগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আরও জেনে রাখুন, বর্ণাদির শক্তি তিন প্রকারের। প্রথম প্রকার, শক্তির দিক থেকে স্বল্পতম; তা বর্ণে লিপিবদ্ধ করার পর প্রকাশ পায়। বর্ণের এ নির্দিষ্ট আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করাই তাকে আত্মিক জগতের জন্য বিশিষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ বর্ণটি যখন আত্মিক শক্তি ও একাগ্র ইচ্ছার সাথে প্রকাশ পায়, তখন তা দৈহিক জগতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারটি মনন প্রক্রিয়ার শক্তির অন্তর্গত। এটি আত্মিক শক্তিকে পরিচালিত করার দ্বারা উৎসারিত হয়। এটি উর্ধ্ব আত্মিক জগতে শক্তিরূপে বিরাজিত এবং দৈহিক জগতে উক্ত শক্তির একটি আকৃতিগত রূপ বিদ্যমান। তৃতীয়টি গোপন শক্তির একাগ্রতা অর্থাৎ আত্মশক্তির দ্বারা তার সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলা। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে তার একটি চিত্র আত্মার মধ্যে অবস্থান করে এবং উচ্চারণের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজমান হয়।

এসব বর্ণের প্রকৃতিও বর্ণাদির জন্য সৃষ্ট প্রকৃতির ন্যায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এগুলো উষ্ণতা ও শুষ্কতা; উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, শীতলতা ও শুষ্কতা, শীতলতা ও আর্দ্রতা। এটাই ইয়ামেনী সংখ্যার রহস্য। উষ্ণতা বায়ু ও আগুনের একত্র সম্মিলন; এ দুটি (আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, শিন, যাল, জিম, যে, কাফ, সিন, ক্বাপ, ছে, যয়)। শীতলতা বায়ু ও জলের একত্র সম্মিলন; (বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, সোয়াদ, তে, দোয়াদ, দাল হ্বে, লাম,

৩২৫. মূলে 'সহোদরা' পর্যন্ত আছে; এলমে কিমিয়ার উল্লেখ নেই।

www.amarboi.org

আইন, রে, খে, গাইন) শুষ্কতা আগুন ও মৃত্তিকার একত্র সম্মিলন; (আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, শিন, যাল, বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, সোয়াদ, তে, দোয়াদ)। এগুলোই বর্ণাদির প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য; তাদের কতকাংশ অপর কতকাংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। এগুলোকে উর্ধ্ব ও অধঃ জগৎ তাদের প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ পৃথক চারটি প্রকৃতির কার্য-কারণসহ প্রবেশ করে।

পাঠক, আপনি যখন কোন সমস্যা থেকে অজ্ঞাত বিষয় জানতে উদ্যোগী হবেন; তখন প্রশ্নকর্তা অথবা তার প্রশ্নের উদীয়মান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন এবং তার তন্তু চতুষ্টয়ের অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমের সংখ্যামান সুষম বিন্যাসে বের করুন। আপনাকে শক্তি ও তন্তুগুলোর সংখ্যাও বের করতে হবে; যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করছি। তারপর আপনাকে তা যোগ, তার সম্পর্ক স্থির এবং তার উত্তর বের করতে হবে। এভাবে আপনার উদ্দেশ্য প্রকাশ্য শব্দে অথবা অর্থে প্রকাশ পাবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রেই আপনি অগ্রসর হবেন।

তার বর্ণনা হল; পাঠক, আপনি যদি প্রশ্নকর্তার নাম ও প্রয়োজনসহ উদীয়মানের বর্ণাদির শক্তি বের করতে চান, তা হলে বৃহৎ 'আবজদ' হিসেব অনুসারে তাদের সংখ্যামান একত্র করুন। ফলে উদীয়মান হবে মেষ, তার চতুর্থটি হবে কর্কট, তার সপ্তমটি হবে তুলা এবং তার দশমটি হবে মকর। এ শেষোক্তটিই এসব কীলকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারপর প্রতিটি রাশি থেকে সংজ্ঞার বর্ণ দুটি বর্জন করুন এবং প্রতিটি রাশি তার চক্রান্তগত নিরূপিত মূলদ সংখ্যাসমূহের কোনটির সাথে বিশিষ্ট হচ্ছে, তার প্রতি লক্ষ রাখুন। সমগ্র করণী-নিরসন সম্পর্কসমূহে ভগ্নাংশ সংশ্লিষ্ট রাশিগুলোকে পরিত্যাগ করুন এবং প্রতিটি বর্ণের নিচে তার সাথে যা বিশিষ্ট, তা স্থাপন করুন। এর পর চারটি উপাদানের বর্ণসমূহের সংখ্যা এবং তাদের সাথে বিশিষ্ট বিষয়াদি প্রথমটির ন্যায় স্থাপিত হবে। এ সমুদয় বিষয়টি বর্ণানুক্রমে অঙ্কিত করুন এবং একটি মিশ্রিত রেখার আকারে খ-কীলক, শক্তি ও নিদর্শনসমূহ বিন্যস্ত করুন। ভগ্নাংশে পরিণত করুন এবং বিচিত্র পরিমাপ বের করার জন্য যা গুণ করার, তা গুণ করুন। যোগ করুন এবং তা দিয়ে উত্তর বের করুন। এর ফলে অন্তর্গত রহস্য তার উত্তর আপনার সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে।

এর উদাহরণ; ধরে নিন যে, উদীয়মান মেষ; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আপনি 'হ্বে, মিম, লাম' বর্ণত্রয় অংকিত করুণ। 'হ্বে' সংখ্যামান আট; তাতে অর্ধেক, চতুর্থাংশ ও অষ্টমাংশ বিদ্যমান; তারা যথাক্রমে দাল, বে, আলিফ। মিমের সংখ্যামান চল্লিশ; তাতে অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দশমাংশ এবং সংক্ষিপ্ত করতে চাইলে দশমাংশের অর্ধেক বিদ্যমান। এরা যথাক্রমে মিম, কাফ, ইয়া, হে, দাল ও বে। লামের সংখ্যামান ত্রিশ; তাতে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ ও দশমাংশ বিদ্যমান। এরা যথাক্রমে কাফ, ইয়া, ওয়াও, হে ও জিম। এভাবে প্রশ্নের মধ্যে আগত প্রতিটি বর্ণ ও নামকে সংখ্যামানের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। অবশ্য তন্তু বের করার জন্য প্রতিটি বর্ণের বর্গফলকে তাতে প্রাপ্য বৃহত্তম অংশের দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে। এর উদাহরণ; দাল বর্ণের সংখ্যামান চার; তার বর্গফল ষোল; তাকে তাতে প্রাপ্য বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ

www.amarboi.org

দুই দ্বারা ভাগ করুন। দালের তত্ত্ব সংখ্যা আট বের হয়ে আসবে। তারপর আপনি প্রতিটি তত্ত্বকে তার বর্ণের বিপরীতে স্থাপন করবেন। এর পর উপাদানগত সম্পর্কগুলো বের করবেন; যেমন ইতিপূর্বে করণী-নিরসনের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য ছকান্তর্গত সংশ্লিষ্ট ঘরের ও বর্ণাদির প্রকৃতি থেকে সংখ্যামান বের করার একটি উপকারী নিয়ম বিদ্যমান; যেমন শায়খ তার পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের জন্য তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বর্ণ পদ্ধতির দ্বারা (অন্তরের) গোপন রহস্য সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ

এর বর্ণনা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগী সম্পর্কে তার রোগ, তার কারণ ও আরোগ্যের যোগ্য ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করে, তা হলে আপনি উক্ত জিজ্ঞাসুকে অজ্ঞাত কারণ সম্পর্কে তার ইচ্ছামত কতিপয় বস্তুর নাম দিতে বলবেন। যাতে এ নামকে আপনি আপনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তারপর এ নামসহ উদীয়মান, উপাদান, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, দিন ও ঘন্টার নামের সংখ্যামান বের করবেন। অবশ্য আপনি যদি এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে চান, তা হলেই এরূপ করতে হবে; নয়তো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে নামটি বলবে, তার উপরই আপনি সীমাবদ্ধ থাকবেন এবং আমাদের পরবর্তী বর্ণনা অনুসারে তাকে ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি; জিজ্ঞাসু ব্যক্তি 'ফরস' (অশ্ব)-এর নাম বলল। আপনি উক্ত শব্দের বর্ণত্রয়ীর সংখ্যামান বের করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। বিশদ করলে এই দাঁড়ায়; 'ফে'র সংখ্যামান আশি, তার অংশ মিম, কাফ, ইয়া, হে্ব বে; 'রে'-র সংখ্যামান দুইশ, তার অংশ ক্বাফ, নুন, কাফ, ইয়া এবং 'সিন'-এর সংখ্যামান ষাট, তার অংশ মিম, লাম, কাফ। 'ওয়াও' এর জন্য পূর্ণতাজ্ঞাপক সংখ্যা, তা দাল, জিম ও বে এবং 'সিন' ও তদ্রূপ, তা মিম, লাম ও কাফ। তারপর আপনি যখন নামসমূহের বর্ণাদিকে বিন্যস্ত করবেন এবং দেখতে পাবেন যে, দুটি উপাদানই সমান, তখন বেশি বর্ণবিশিষ্ট উপাদানকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিন। এর পর উদ্দিষ্ট বস্তুর নামের উপাদান সম্পর্কীয় বর্ণাদির সংখ্যাকে কোন প্রকার বিন্যাস ছাড়াই তার বর্ণের সাথে একত্র করুন এবং বেশি ও শক্তিমানকে প্রাধান্য দিন।

উপাদানের শক্তি বের করার বর্ণনা[৩২৬]

এখানে মৃত্তিকাই প্রাধান্য পাবে এবং এর প্রকৃতি হল শীতলতা ও শুষ্কতা হল কাল পিত্তের প্রকৃতি। সুতরাং আপনি রোগীর নিদানকাল পিত্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এর পর আপনি যখন সংখ্যামান সম্পর্কীয় বর্ণগুলো দ্বারা নিকটতম নির্দেশের ভিত্তিতে একটি বক্তব্য প্রস্তুত করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে, ব্যথার স্থানটি কণ্ঠে রয়েছে এবং তার

৩২৬. রোজেনথালের অনুবাদে এ শিরোনামের পরেই নিম্নলিখিত ছকটি বিন্যস্ত হয়েছে—

অগ্নি ——→	মৃত্তিকা ——→	বায়ু ——→	জল
	ওয়াও	জিম	
হ হ হ	ই ই ই ই	ক ক ক ক	হ্বা
ম ম	ন	ক্ব	ল

www.amarboi.org

যোগ্য ওষুধ হল পিচকারী ও পানীয়ের মধ্যে লেবুর শরবত। 'ফরস' নামের বর্ণাদির সংখ্যামানের শক্তি থেকে এটি বের হয়েছে এবং এটি একটি সংক্ষিপ্ত নিকটতম উদাহরণ।

অবশ্য ব্যক্তিবাচক নামসমূহের উপাদানগত শক্তি বের করতে হলে; যেমন 'মুহম্মদ' নামটি নেয়া হল, এ ক্ষেত্রে আপনি তার বর্ণগুলো বিশ্লিষ্ট করে অঙ্কিত করবেন। তারপর আপনি চারটি উপাদানের নামগুলোকে কক্ষ অনুসারে স্থাপন করবেন; এর ফলে প্রতিটি উপাদানের বর্ণ ও সংখ্যা আপনার সামনে বের হয়ে আসবে। এর উদাহরণ :

	আগ্নেয়		মৃন্ময়		বায়বীয়		জলীয়[৩২৭]
	আ আ আ		ব ব ব		জ জ জ জ জ জ		দ দ দ দ দ দ
	হ হ হ		ও ও ও		য য য য য য		হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব
তিন প্রকার	ত্ব ত্ব ত্ব ম ম ম ফ ফ ফ	তিন প্রকার	ই ই ই ন ন ন ঘ ঘ ঘ	ছয় প্রকার	ক ক ক ক ক ক স্ব স্ব স্ব স্ব স্ব স্ব ক্ ক্ ক্ ক্ ক্ ক্	ছয় প্রকার	ল ল ল ল ল ল আ' আ' আ' আ' আ' আ' র র র র র র
	স স স		ত ত ত		ছ ছ ছ ছ ছ ছ		খ খ খ খ খ খ
	য় য় য়		ম ম ম		গ গ গ গ গ গ		শ শ শ শ শ শ

উল্লিখিত নামের এসব উপাদানের মধ্যে আপনি জলীয় উপাদানকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দেখতে পাবেন। কারণ তার বর্ণের সংখ্যা বিশ; এজন্য উল্লিখিত নামের অন্যান্য উপাদানের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এভাবে সব নাম সম্পর্কে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এ সময় তাদের তত্ত্বর সাথে অথবা 'জায়েরযা'স্থিত উদীয়মানের সাথে সম্পর্কিত তত্ত্বর সাথে অথবা মালেক ইবনে ওয়াহিবের সঙ্গে সম্পর্কিত কাব্যপঙ্ক্তির তত্ত্বর সাথে যোগ করতে হবে। উক্ত কাব্যপঙ্ক্তিটি প্রশ্নাদির মিশ্রণের জন্য পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ :

'সওয়ালুন্ আ'যিমুল্ খুল্কে হুফ্‌তা ফাস্‌নুন্ ইযান—গারায়েবু শক্কিন্ দ্বরত্বাহুজ্‌জেদ্দু মাজ্জালা।'[৩২৮]

অজ্ঞাত বিষয়াদি জানার এটি একটি বিখ্যাত তত্ত্ব। এর উপরই ইবনে রাকাকাম[৩২৯] ও তাঁর অনুসারীরা নির্ভর করতেন। এটি প্রথাগত উদাহরণের জন্য একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। উক্ত তত্ত্বর প্রক্রিয়াগত বর্ণনা এই যে, প্রশ্নের শব্দাবলির সাথে ভগ্নাংশ কৌশল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে অঙ্কিত করতে হবে। এ তত্ত্ব অর্থাৎ কাব্যপঙ্ক্তির বর্ণসংখ্যা তেতাল্লিশ। কেননা প্রতিটি সংযুক্ত বর্ণই দুটি বর্ণ। তারপর মিশ্রণের সময় ও মূলে যেসব বর্ণ বারংবার আসবে, তা পরিত্যাগ করতে হবে। প্রশ্নের প্রতিটি উদ্বৃত্ত বর্ণের সমতুল্য বর্ণ বিদ্যমান। উক্ত দুটি উদ্বৃত্তকে বর্ণের কতকাংশের সাথে

৩২৭. এ পুরো ছকটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই। 'তিন প্রকার', 'ছয় প্রকারে' সহ এটির কিয়দংশ মাত্র এখানে বিন্যস্ত হয়েছে।

৩২৮. এটির অর্থ প্রথম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্র:।

৩২৯. ইনি সম্ভবত গণিতবিদ্ মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (মৃত্যু; ৭১৫ হি:, ১৩১৫ খ্রি.)

www.amarboi.org

অপর কতকাংশ মিশিয়ে একটি রেখায় স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হবে 'ধ্রুব'-এর উদ্বৃত্ত ও দ্বিতীয়টি হবে প্রশ্নের উদ্বৃত্ত; এভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত শেষ হবে এবং সংখ্যা দাঁড়াবে তেতাল্লিশ। এর সাথে পাঁচটি নুন যোগ করতে হবে, যাতে সংখ্যাটি আটচল্লিশ হয়। এতে সংখ্যাটি 'গীতিমাত্রা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তারপর উদ্বৃত্তকে তার বিন্যাস অনুসারে স্থাপন করতে হবে। এতে যদি বহিষ্কৃত বর্ণাদি মিশ্রণের পর পরিত্যাগ পূর্ববর্তী মূল বর্ণের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ ছককে এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে, যাতে প্রথম পঙ্ক্তির শেষে যা আছে, তা দ্বিতীয় পঙ্ক্তির শেষে থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর থেকে হবে যতক্ষণ না প্রথম পঙ্ক্তি স্বরূপে ফিরে আসবে এবং গতি অনুসারে অত্র অঞ্চলের বর্ণাদি পরস্পরকে অনুসরণ করবে। এর পর পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের তত্ত্ব বের করবেন এবং তাকে তার বর্ণের বিপরীত দিকে স্থাপন করবেন। তারপর ছকস্থিত বর্ণাদির উপাদানগত সম্পর্ক এমনভাবে বের করবেন, যাতে তৎসংশ্লিষ্ট ছক থেকে তাদের স্বাভাবিক শক্তি, আত্মিক মাত্রা, জৈবিক প্রবৃত্তি ও মৌলিক ভিত্তি জানতে পারেন।

উপাদানগত সম্পর্ক বের করার বর্ণনা এই যে, ছকের প্রথম বর্ণটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; তার স্বভাব কী এবং তাতে অবতীর্ণ কাব্যপঙ্ক্তিটিরই বা স্বভাব কী? যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, উত্তম; অন্যথায় দুটি বর্ণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করুন। ছকের সব বর্ণ সম্বন্ধেই এ নিয়ম প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। যিনি এর নিয়মাবলি জ্ঞাত আছেন, যেমন গীতিচক্রাদির মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তার পক্ষে এ প্রক্রিয়ার সত্যতা পরীক্ষা করা খুবই সহজ ব্যাপার। এর পর, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, খ-কীলক চতুষ্টয়ের ভিত্তির সাথে গুণ করার পর প্রতিটি বর্ণের তত্ত্বকে গ্রহণ করুন এবং কীলকে সন্নিহিত যা কিছু, তা বর্জন করুন। অনুরূপভাবে 'পতনশীল'গুলোকেও; কেননা তাদের সম্বন্ধ অস্থির। এভাবে যা আপনার সামনে বের হয়ে আসবে, তা হল 'বিক্ষেপণ'-এর প্রথমে পর্যায়। তারপর আপনি উপাদানের সমষ্টি গ্রহণ করুন এবং তা থেকে জাতসমূহের ভিত্তি পরিত্যাগ করুন। ফলে সম্ভাবনার মুহূর্তগুলোর মধ্যে আরোপিত হওয়ার পর সৃষ্টিজগতের ভিত্তি অবশিষ্ট থাকবে। এর পর তাতে কতিপয় বস্তুসার স্থাপন করুন; এগুলো সহায়ক উপাদান এবং এর ফলে মধ্যম আত্মিক দিগন্ত প্রকাশ পাবে। উপাদান সমষ্টি থেকে 'বিক্ষেপণ'-এর প্রথম পর্যায় নিযুক্ত করলে মধ্যম জগৎ অবশিষ্ট থাকবে। এটি সরল বস্তুজগতের সাথে বিশিষ্ট; মিশ্রের সাথে নয়। এর পর আপনি মধ্যম জগৎকে মধ্যম আত্মিক দিগন্তের সাথে গুণ করবেন; সর্বোচ্চ দিগন্ত বের হয়ে আসবে। তাতে বিক্ষেপণের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন এবং পরে চতুর্থ থেকে প্রথম মৌলিক সহায়ক উপাদান বিযুক্ত করুন; বিক্ষেপণের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর সর্বদা আপনি চারটি উপাদানের অংশগত সমষ্টি বিক্ষেপণের চতুর্থ পর্যায়ের সাথে গুণ করবেন; ফলে প্রথম বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় দ্বিতীয়ের মধ্যে গুণিত হলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। তাতে বিক্ষেপণের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন এবং পরে চতুর্থ থেকে প্রথম মৌলিক সহায়ক উপাদান বিযুক্ত করুন; বিক্ষেপণের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর সর্বদা আপনি চারটি উপাদানের অংশগত সমষ্টি

www.amarboi.org

বিক্ষেপণের চতুর্থ পর্যায়ের সাথে গুণ করবেন; ফলে প্রথম বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় দ্বিতীয়ের মধ্যে ঘৃণিত হলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ। বিস্তারিত জগতগুলো একত্র করুন এবং তাকে নিখিল জগৎ থেকে বিযুক্ত করুন। ফলে সরল জগতগুলো অবশিষ্ট থাকবে; তাকে সর্বোচ্চ দিগন্তে ভাগ করে দিন; প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে; এখান থেকে প্রতিক্রিয়াটিকে ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ণতা দিতে হবে। এর জন্য ইবনে ওহশিয়া, আলবুনী ও অন্যান্যদের গ্রন্থাদিতে আলোচনা বিদ্যমান।

ঐশী বিজ্ঞান সম্পর্কীয় এ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে এহেন প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ও দার্শনিক নিয়মাবলির মাধ্যমে প্রচলিত রয়েছে। বস্তুত এরই উপর ভিত্তি করেই বর্ণাদির জায়েরযা, ঐশী কলাকৌশল ও দার্শনিক যাদুক্রিয়াসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩০] আল্লাহ্ অনুপ্রেরণা দাতা, তাঁরই সহায়তা প্রার্থিত এবং তারই উপর নির্ভর করা বাঞ্ছিত। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা।

---

৩৩০. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নের অনুচ্ছেদটি বিদ্যমান :
'জেনে রাখুন যে, এসব বিষয় একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়; যাতে প্রশ্নের মধ্যস্থিত সম্ভাবনা অনুসারে একটি সংবাদ বের হয়ে আসে। এর মাধ্যমে তাঁরা অতীন্দ্রিয় কোন সংবাদ পরিবেশন করেন না। বস্তুত এটি এক ধরনের বুদ্ধি খেলা; যেমন আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা-রহস্যবিদ্যারও অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমন আমরা এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

www.amarboi.org

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রসায়নশাস্ত্র]

এ শাস্ত্র এমন উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, যা দিয়ে শিল্পকৌশলের মাধ্যমে স্বর্ণ-রৌপ্য উৎপাদন সম্পূর্ণ হয় এবং এটি উক্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রক্রিয়াও বিশ্লেষণ করে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত শাস্ত্রবিদ্‌রা সম্ভাব্য সব বস্তুতেই, ওগুলোর মিশ্রণ ও শক্তি জেনে নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন; যাতে তাঁরা উক্ত উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদানের সন্ধান লাভ করতে পারেন। এমন কি তাঁরা খনিজ পদার্থ ছাড়াও প্রাণীর উপজাত অস্থি, পালক, ডিম ও মলমূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করে থাকেন।

অতঃপর রসায়নশাস্ত্র সেসব প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, যা দিয়ে উক্ত উপাদান তার সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যেমন ঊর্ধ্বপাতন, পাতন, তরলের উত্তাপে ঘনীভবন, কঠিনের মুষল ও পেষকের মাধ্যমে চূর্ণীভবন এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়া, যা দিয়ে বস্তু তার প্রাকৃতিক অংশসমূহে দ্রবীভূত হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, এসব কলা-কৌশলের দ্বারা এমন একটি স্বাভাবিক উপাদান বহিষ্কৃত হয়, যাকে উক্ত শাস্ত্রে 'একসির' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে যেগুলোর সক্রিয়ভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, যেমন সিসা, টিন ও তামা; সেগুলোর সাথে উক্ত 'একসির'কে মিশিয়ে আগুনে উত্তপ্ত করলে তা খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শাস্ত্রবিদ্‌রা তাঁদের পরিভাষায় রহস্যের স্পর্শ এনে উক্ত একসিরকে 'আত্মা' বলে এবং যে বস্তুর সাথে তা মিশ্রিত হয়, তাকে 'দেহ' বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এসব পরিভাষা এবং যে কলা-কৌশলযোগ্য বস্তুকে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিবর্তিত করে, তাদের ব্যাখ্যাই রসায়নশাস্ত্র।

প্রাচীন ও নবীন উভয় কালেই এ বিষয় নিয়ে শাস্ত্রবিদ্‌গণ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। অনেক সময় এর আলোচনা অযোগ্য ব্যক্তিদের সাথেও সম্পর্কিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাদের নেতৃস্থানীয় হলেন জাবের ইবনে হাইয়ান; এমনকি তারা রসায়নশাস্ত্রকে তাঁর সাথে বিশিষ্ট করে তাকে 'জাবেরের শাস্ত্র' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর সত্তরটি পুস্তিকা বিদ্যমান এবং এর সবগুলোই দুর্বোধ্যপ্রায়। শাস্ত্রবিদ্‌রা ধারণা করেন যে, এসব পুস্তিকার সামগ্রিক জ্ঞান আয়ত্তকরণ ছাড়া কারও পক্ষে তার দ্বার অর্গলমুক্ত করা সম্ভব নয়। আতুগরাই[৩৩১] এ বিষয়ে পূর্বাঞ্চলীয় উত্তরসূরি বিজ্ঞানীদের মধ্যে খ্যাতিমান। তাঁর উক্ত শাস্ত্রে সংকলন এবং যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে

৩৩১. হাসান ইবনে আলী; ৪৫৩—৫১৫ (১০৬১-১১২১ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

সব শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সাথে বিতর্কমূলক গ্রন্থাদি রয়েছে। আন্দালুসের বিজ্ঞানী মাসলামা আল মজরিতীও এ বিষয়ে লিখিয়াছেন; তার গ্রন্থের নাম 'রূতবাতুল হাকিম'। তিনি একে তাঁর যাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় অন্য গ্রন্থ 'গায়তুল হাকিমে'-এর সহচর হিসেবে স্থাপন করেছেন। তাঁর ধারণা, এ দুটি শিল্পজ্ঞান হচ্ছে দর্শনের ফলাফল ও জ্ঞানের ফসল; যে ব্যক্তি এ দুটি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, সে জ্ঞান-দর্শনের ফলাফল লাভে অসমর্থ।

বস্তুত মজরিতীর গ্রন্থের আলোচনা এবং অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্‌দের গ্রন্থাদির আলোচনা সমুদয়ই দুর্বোধ্য রহস্যতুল্য; এ সম্পর্কীয় পরিভাষা সম্বন্ধে যার জ্ঞানের গভীরতা নেই, তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা তাদের এমন রহস্য ও দুর্বোধ্যতার প্রতি ধাবমান হওয়ার কারণ বর্ণনা করব। এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় শাস্ত্রবিদ্ আল মুগায়রিবীর[৩৩২] একটি বাক্যিক আলোচনা বিদ্যমান, যা নোকতাবিশিষ্ট বর্ণাদির অন্ত্যমিলে রচিত এবং কাব্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। এর বিষয়বস্তুও সার্বিকভাবে হেঁয়ালী ও ধাঁধার ন্যায় রহস্যমণ্ডিত এবং বোধগম্যতার অতীত। কখনও এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) গ্রন্থ রচনার কথা উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ তাঁর ন্যায় উন্নত ধীশক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে উক্ত শাস্ত্রবিদ্‌দের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করার ধারণা পোষণ করা যায় না। কখনও শাস্ত্রবিদ্‌রা এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মত ও ধ্যান ধারণাকে মারোয়ান ইবনে হকমের সৎপুত্র খালেদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়ার[৩৩৩] সাথে সংযুক্ত করেন। কিন্তু এটি একান্ত সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত যে, খালেদ বেদুইন জীবনচক্রের অনুসারী এবং বেদুইন জীবনবোধের নিকটবর্তী। বস্তুত বেদুইন জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে কী করে জটিল উপাদান ও তাদের মিশ্রণের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এমন একটি বিরল শিল্পকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব? তদুপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণাকারীদের গ্রন্থাদি তখনও প্রকাশিত ও অনূদিত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে বিচিত্র শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ খালেদ ইবনে ইয়াজিদ নামে কারও সাথে উপরোক্ত খালেদের নামের সাদৃশ্য ঘটে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা হতে পারে।

পাঠক, এখানে উপরোক্ত শিল্পকর্ম সম্পর্কীয় আবু সামাহ্‌র উদ্দেশ্যে রচিত আবু বকর ইবনে বিশরুনের[৩৩৪] একটি পুস্তিকা আপনার জন্য উদ্ধৃত করছি। তাঁর উভয়ে মাসলামার শিষ্য। উক্ত পুস্তিকার আলোচনায় যদি আপনি যথাযথভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তা হলে উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের ধারা অনুভব করতে পারবেন। ইবনে বিশরুন তাঁর পুস্তিকার প্রারম্ভে উদ্দেশ্যের সাথে অসলগ্ন কিছু বক্তব্যের পর বলেছেন, 'এ মহান শিল্পকর্মের ভূমিকাস্বরূপ যে আলোচনা বিদ্যমান, তা পূর্বসূরিগণ ও দার্শনিকবৃন্দ সকলেই পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। এ আলোচনা খনিজ পদার্থের উদ্ভব, প্রস্তর ও মণিমুক্তার সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্থান ও ভূমিসংস্থানের প্রকৃতি সম্পর্কীয়

৩৩২. এ অধ্যায়ে পুনরায় উল্লেখিত।
৩৩৩. মৃত্যুকাল ৮৪—৯০ (৭০৩—৭০৯ খ্রি:) হি: বলে অনুমিত।
৩৩৪. ইবনে বিশরুনের সময়ও খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দের মধ্যে বলে ধরা হয়।

www.amarboi.org

জ্ঞান। এ বিষয়টি অতি পরিচিত বলিয়াই এর আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে যা খুবই প্রয়োজনীয়, তাই এখানে বর্ণনা করব। সুতরাং তার পরিচয় দান আরম্ভ করছি।"

শাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন, এ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনকারীদের জন্য প্রথমেই তিনটি বিষয় জেনে নেয়া প্রয়োজন। এর প্রথমটি হল, এটি সম্ভব কিনা; দ্বিতীয়টি কিসের দ্বারা সম্ভব এবং তৃতীয়টি কিসের দ্বারা কীভাবে সম্ভব। বিদ্যার্থী যখন এ তিনটি বিষয় জানতে পারে এবং সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তখন তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় ও উক্ত শাস্ত্রের চরম জ্ঞান লাভ করতে সমর্ত হয়। এ শাস্ত্রের সম্ভাব্যতা ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রমাণের জন্য, পাঠক, ইতিপূর্বে আপনার কাছে 'একসির' সম্পর্কে যা বলেছি, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। অবশ্য কিসের দ্বারা এটি সম্ভব হয়, সেই সম্পর্কে তারা ঐ প্রস্তর সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বুঝিয়ে থাকেন, যা দিয়ে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনার দিক থেকে প্রতিটি বস্তুতেই এ প্রক্রিয়ার শক্তি বিদ্যমান; কেননা তা চারটি প্রকৃতিগত উপাদানের অন্তর্গত এবং তাদের দ্বারাই আরম্ভে গঠিত হয় ও অন্তে তাদের মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হয়; তবুও এগুলোর মধ্যে এমন বস্তুও রয়েছে, যাতে শুধু সম্ভাবনাই বিদ্যমান, বাস্তবতা নয়। এর বর্ণনা এই যে এদের মধ্যে অনেকগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব এবং অনেকগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যেগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভবপর, সেগুলোকেই প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত করা হয় এবং তার মধ্য দিয়ে এগুলো সম্ভাবনা থেকে বাস্তব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে যেগুলোর অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়, সেগুলোকে প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার দ্বারা সাধিত করা হয় না; কেননা তারা শুধু সম্ভাবনারই আধার। তাদের মধ্যকার উপাদানগত প্রকৃতিগুলো পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় এ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে উপাদানের অন্তর্গত বৃহৎ শক্তির ক্ষুদ্র শক্তির উপর প্রাধান্যের কথা বলাই বাহুল্য।

অতএব, পাঠক, আল্লাহ্ আপনাকে শক্তি দিন, আপনার জন্য সেসব বিশ্লেষণযোগ্য প্রস্তরের সুষম অবস্থা জেনে নেয়া অত্যাবশ্যকীয়, যেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। আপনি তাদের জাতি, শক্তি, ক্রিয়া এবং তাদের মধ্যে সাধ্য দ্রবীভবন, ঘনীভবন বিশোধন, উত্তাপন, বিশোষণ ও রূপান্তর সম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্ব জেনে নিবেন। কেউ যদি উক্ত শিল্পের স্তম্ভস্বরূপ এসব নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, তা হলে তার পক্ষে কখনই এ বিষয়ে সফলকাম ও কল্যাণের বাহক হওয়া সম্ভব নয়।

পাঠক, আপনার এটা জেনে নেয়াও প্রয়োজনীয় যে, উপরোক্ত বিষয়ে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করা সম্ভব অথবা এককভাবে তাই তার জন্য যথেষ্ট। প্রারম্ভে তা কি এককভাবে ছিল, না তার সাথে অন্যেরও অংশীদারিত্ব ছিল; তারপর সাধিত হওয়ার কালে একক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রস্তররূপে আখ্যায়িত হয়েছে। আপনার জন্য তার ক্রিয়ার স্বরূপ, তার মাত্রা ও কালের পরিমাণ এবং তার মধ্যে আত্মার বিন্যাস ও জৈবিক শক্তির অনুপ্রবেশ জেনে নিতে হবে। আগুন কি সংশ্লেষণের পর তার বিশ্লেষণে সমর্থ? যদি সমর্থ না হয়, তা হলেই বা তার কারণ কী এবং কোন কারণটি এটাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে? এটা এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; পাঠক, এটা হৃদয়ঙ্গম করুন।

www.amarboi.org

জেনে রাখুন যে, দার্শনিকরা সকলেই জৈবিক শক্তির প্রশংসা করেছেন এবং ধারণা করেছেন যে, এ শক্তিই দেহের পরিচালক, উত্তেজক, প্রতিরোধক ও তাতে ক্রিয়াশীল শক্তি। এর কারণ এই যে, এ জৈবিক শক্তি দেহকে পরিত্যাগ করলে তা মৃত ও শীতল হয়ে যায়। তখন আর সে গতিমান ও অপরের কবল থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারে না; কেননা তখন তাতে জীবন নেই, আলোক নেই।

আমরা এই দেহ ও জৈবিক শক্তির কথা এ জন্যই বর্ণনা করেছি যে, এসব গুণ মানুষের সেই দেহের সাথে তুলনীয়, যা প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন আহার্যের দ্বারা গঠিত এবং যার স্থায়িত্ব ও পরিপূর্ণতা সজীব জ্যোতির্ময় জৈবিক শক্তির দ্বারা সাধিত হয়। এ শক্তির দ্বারাই দেহ এমন বৃহৎ ও পরস্পরবিরোধী কর্মাদি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, যা এ সজীব শক্তির অধিকার ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ তার প্রকৃতিগত উপাদানসমূহের বিন্যাস বিরোধের জন্যই প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। যদি তার প্রাকৃতিক উপাদান সুষম অবস্থায় বিরাজ করত, তা হলে কখনও সে আপতন ও বিরোধের কবলে পড়ত না এবং জৈবিক শক্তিও তার দেহ থেকে বের হতে পারত না; ফলে সে চিরজীবী চিরস্থায়ী হয়ে উঠত। পবিত্র তিনি, সব বস্তুর পরিচালক—তিনিই উন্নত।

জেনে রাখুন, প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ, যা দিয়ে এ ক্রিয়া উদ্ভূত হয়; প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে এমন একটি অবস্থা বিরাজ করে, যা তাকে পরিচালনা ও আকর্ষণ করে এক অত্যাবশ্যকীয় পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। তারা একবার এ অবস্থায় আপতিত হলে তাদের পক্ষে আর গঠন-পূর্ব উপাদানসমূহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়; যেমন আমরা ইতিপূর্বে মানুষের ব্যাপারে বলেছি। কেননা এখন এ স্বনির্ভর প্রাকৃতিক উপাদান পরস্পরের সাথে গ্রথিত হয়ে একই বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এটাকে এর শক্তি ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জৈবিক শক্তির সাথে এবং তার গঠন ও রোধের ক্ষেত্রে দেহের সাথে তুলনা করা যায়। অথচ ইতিপূর্বে তারা উপাদান হিসেবে পৃথক পৃথক সত্তায় অস্তিত্ববান ছিল। বস্তুত এ প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের কার্যকারিতা কী বিস্ময়কর! এদের দুর্বলতমটিও বস্তুর বিশ্লেষণ, গঠন ও পরিপূর্ণতায় শক্তিমান হয়ে ওঠে। এ জন্যই আমরা শক্তিমান ও দুর্বলের কথা বলেছি একমাত্র এদের প্রথম গঠনেই বিরোধের জন্য পরিবর্তন ও অস্তিত্বহীনতা দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় গঠনে ঐক্যের জন্যই অনুরূপ কিছু হয় না।

পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, এ প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ ও বিভাজনের মধ্যেই সজীবতা ও স্থায়িত্ব এবং গঠনের মধ্যেই মৃত্যু ও অনস্তিত্ব। এ বক্তব্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থ বিদ্যমান; কেননা দার্শনিক তাঁর সজীবতা ও স্থায়িত্বের বক্তব্যের দ্বারা তার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আগমনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ তা যতক্ষণ তার প্রথম গঠনে অবস্থান করে ততক্ষণ তা নিঃসন্দেহে অস্তিত্বহীন; তারপর তা দ্বিতীয় গঠনে সংগঠিত হলে অনস্তিত্ব দূরীভূত হয়। এ দ্বিতীয় সংগঠন একমাত্র বিশ্লেষণ ও বিভাজনের পরেই সম্ভব হয়। এ জন্য এ প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ ও বিভাজন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং তা যখন দ্রবণযোগ্য দেহে স্থায়ী হয়, তার আকৃতিহীনতার জন্যই তাতে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে; কেননা তা দেহের মধ্যে আকৃতিহীন জৈবিক শক্তির সাথে তুলনীয়। এর কারণ এই যে, তার কোনো ভার নেই। পাঠক, আল্লাহ্ চান ত, আপনি অচিরেই তা দেখতে পাবেন।

www.amarboi.org

আপনার জন্য এটা জেনে নেয়া অত্যাবশ্যকীয় যে, সূক্ষ্মের সাথে সূক্ষ্মের মিশ্রণ স্থূলের সাথে স্থূলের মিশ্রণ অপেক্ষা সহজতর। এ বক্তব্যের দ্বারা আমরা সূক্ষ্মদেহী ও স্থূলদেহী আকৃতির সাদৃশ্য বোঝাতে চেয়েছি; কেননা সব বস্তুই তাদের আকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। আমরা এর বর্ণনা এ জন্যই উত্থাপন করেছি, যাতে আপনি জেনে নিতে পারেন যে, স্থূল বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তুর প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহজ। কখনও এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, বস্তুসার অপেক্ষা প্রস্তরাদি আগুনের তাপে অধিককাল স্থায়ী হয় ও বেশি শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন আপনি দেখতে পাবেন গন্ধক, পারদ ইত্যাদি সারবস্তু অপেক্ষা সোনা, রুপা ও তামা আগুন-তাপে বেশি স্থিতিশীল। আমরা বলব, আকৃতিবিশিষ্ট সব বস্তুই এককালে নিজ সত্তায় সারোৎসার রূপে অস্তিত্ববান ছিল। তারপর প্রাকৃতিক উত্তাপের স্পর্শ তাদেরকে স্থূল সংসক্ত বস্তুর আকৃতিতে রূপান্তরিত করেছে। বস্তুত তাদের স্থূলত্ব ও সংসক্তির জন্যই আগুন তাদেরকে বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। এর পর আগুনের উত্তাপ অত্যধিক হওয়ায় উক্ত বস্তুনিচয় তাদের প্রাথমিক সৃষ্টি প্রক্রিয়াজাত অবস্থার ন্যায় সারবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলত এসব সূক্ষ্ম বস্তুসার আগুনের তাপের সংস্পর্শে এলে বিচলিত হয় এবং তাদের স্থিতি বিপর্যয় ঘটে থাকে। সুতরাং, পাঠক, আপনাকে অবশ্যই এ বিষয়টি জেনে নিতে হবে যে, কিসে বস্তুগুলোকে তাদের এ অবস্থায় এবং কিসে বস্তুসারগুলোতে তাদের এ অবস্থায় রূপান্তরিত করেছে। বলতে গেলে এটা আপনার জানার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এসব বস্তুসারের বিচলিত হবার কারণ তাদের দাহ্যতা ও সূক্ষ্মতা এবং তাদের আর্দ্রতার আধিক্যের জন্যই তারা দগ্ধ হয়। কেননা আগুন যখন তাদের এ আর্দ্রতার সন্ধান পায়, তখন তাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে; যেহেতু তাদের এ আর্দ্রতাও বায়বীয় গুণসম্পন্ন ও আগুনের আকৃতি গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য আগুন তাদের অনস্তিত্ব পর্যন্ত তাদের মধ্যে স্বীয় খাদ্য গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আকৃতিপ্রাপ্ত অনেক বস্তুই তাদের সংশক্তি ও স্থূলত্বের স্বল্পতার জন্য আগুনের সংস্পর্শে এসে বিচলিত হয়। কিন্তু এসব বস্তু যে দগ্ধ হয় না, তার কারণ এগুলো আগুনের সংস্পর্শে স্থিতিশীল মৃত্তিকা ও জলীয় উপাদানের দ্বারা গঠিত। বস্তু সৃষ্টির দীর্ঘ, কোমল ও মিশ্রণধর্মী পচনক্রিয়ায় তাদের সূক্ষ্ম অংশ তাদের স্থূল অংশের সাথে এক হয়ে গেছে। কারণ প্রতিটি বস্তু আগুনের তাপে এ জন্যই অস্তিত্বহীন হয় যে, তার সূক্ষ্ম অংশ তার স্থূল অংশের সাথে একত্রিত হয়নি এবং তার কতকাংশ অপর কতকাংশে দ্রবীভবন ও অভিযোজন ছাড়াই সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং তাদের এ সন্নিবেশ ও সংযুক্তি সহাবস্থান মাত্র, মিশ্রণ নয়। এ কারণেই তাদের পৃথকীকরণ সহজ হয়েছে। যেমন জল ও তেল এবং তাদের সমতুল্য অন্যান্য পদার্থ। এসব বিষয় বর্ণনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে তার দ্বারা আপনি প্রাকৃতিক উপাদানের গঠন ও তাদের বিরোধের উপর প্রমাণ গ্রহণ করতে পারেন। বস্তুত এ ব্যাপারে আপনি যখন সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন, তখন বলতে গেলে আপনি উক্ত শাস্ত্রে আপনার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারবেন।

পাঠক, আপনার এটা জানা প্রয়োজন যে, এ শিল্পের উপাদান হিসেবে যেসব মিশ্রণ বিদ্যমান, তারা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ, একই স্বয়ম্ভর বস্তু থেকে বিশ্লেষিত এবং একই নিয়ম

www.amarboi.org

ও একই প্রচেষ্টার দ্বারা তারা একত্রিত। এ প্রক্রিয়ায় কোনো অংশবিশেষে বা সমগ্রের মধ্যে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ নেই। যেমন দার্শনিক বলেছেন, আপনি যদি প্রাকৃতিক উপাদানের সাধনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে তাতে কোনো বহিরাগতের অনুপ্রবেশ না ঘটান, তা হলে নিশ্চিত বলা যায়, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে তার যোগ্য ও স্থায়ী জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। কেননা উপাদান এক এবং তাতে বহিরাগতের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, সে বিচ্যুত হয় ও ভ্রান্তিতে পতিত হয়।

জেনে রাখুন, এ উপাদানে যদি তার সমজাত কোনো বস্তু যথারীতি দ্রবীভূত হয়; এমন কি তা সূক্ষ্মতা ও তরলতার দিক থেকে তার আকৃতি গ্রহণ করে; তা হলে তা উক্ত উপাদানে পরিব্যপ্ত হয়ে তার বিচরণস্থল পর্যন্ত তার সাথে বিচরণ করে। কেননা বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল ও অমসৃণ থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরিব্যাপ্ত ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না এবং বস্তুর দ্রবীভবনও সারবস্তু ছাড়া সম্ভব নয়। পাঠক, এটা বুঝে নিন; আল্লাহ্ আপনাকে এ বক্তব্য বুঝতে পথ প্রদর্শন করুন।

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আপনাকে পথ দেখান; অবশ্যই এ দ্রবীভবন কোনো প্রাণী-দেহে অনুষ্ঠিত হলে তা এমন একটি সত্য, যার বিনাশ নেই, হ্রাস নেই। তাই সেই শক্তি, যা প্রাকৃতিক উপাদানকে রূপান্তরিত করে, তাকে ধারণ করে এবং তার জন্য অদ্ভুত বর্ণ ও পুষ্প প্রকাশ করে। কিন্তু দ্রবণশীল প্রতিটি বস্তুই এমন নয় যে, এর বিপরীত তা সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়; কেননা তা জীবনের বিরোধী। বস্তুত তার দ্রবীভবন সঙ্গতি অনুসারেই হয় এবং এমন এক পর্যায়ে হয় যাতে তাকে আগুনের দহন ক্রিয়া থেকে প্রতিরোধ করতে পারে ও তার স্থূলত্ব দূরীভূত হয়ে যায়। প্রাকৃতিক উপাদানগুলো তাদের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার দিক থেকে সম্ভাব্য পরিবর্তন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং কোন বস্তু যখন তার দ্রবীভবণ ও বিশোধনের চরমে উপনীত হয়, তখন তাতে এমন একটি শক্তির উদ্ভব ঘটে, যা ধারণ করে, মগ্ন করে, পরিবর্তন করে ও পরিক্রমণ করে। যে-কোনো প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি সততার চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয়, তা হলে তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

জেনে নিন, প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে তাপ শীতল বস্তুকে শুষ্ক করে ও তার আর্দ্রতাকে ব্যাহত করে এবং তার মধ্যে উষ্ণ আর্দ্রতাকে প্রকাশ করে ও শুষ্কতাকে ব্যাহত করে। এ ক্ষেত্রে শীতলতা ও উষ্ণতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তারা উভয়ে সক্রিয় এবং আর্দ্রতা ও শুষ্কতা নিষ্ক্রিয়। তারা পরস্পর নিজ সহচরের প্রতি এ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই বস্তুর জন্ম দেয় ও তার সম্ভাবনার সূত্রপাত ঘটায়। যদিও এ বিষয়ে উষ্ণতা শীতলতার চেয়ে বেশি সক্রিয়। কারণ শীতলতার পক্ষে কোনো বস্তু চলমান ও গতিমান করা সম্ভব নয় এবং একমাত্র উষ্ণতাই গতির কারণ। সম্ভাবনার এ কারণ অর্থাৎ উষ্ণতা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন কোনো বস্তুই কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। যেমন এ উষ্ণতা কোনো বস্তুতে অত্যধিক হলে সেখানে যদি শীতলতা না থাকে, তা হলে তা তাকে জ্বালিয়ে দেয় ও বিনাশ করে। এ কারণে এসব প্রক্রিয়ায় শীতলের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যাতে তার দ্বারা বিরোধী শক্তিকে তার

www.amarboi.org

বিরোধী শক্তির উপর জাগ্রত করা যায় এবং বস্তুকে আগুনের দহনক্রিয়া থেকে রক্ষা করা যায়। দার্শনিকরা সর্বাপেক্ষা বেশি এ প্রদাহী আগুনের সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। তাঁরা প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রশ্বাসবায়ুকে পরিষ্কৃত করতে, তাদের মধ্যকার আবর্জনা ও আর্দ্রতা বহিষ্কৃত করতে এবং তাদের মধ্য থেকে ক্ষতিকর ও মলিন বিষয়াদিকে দূরীভূত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব বিষয়ে তাঁদের মত ও প্রচেষ্টা স্থিরীকৃত হয়েছে। কেননা তাঁদের এ সম্পর্কীয় প্রক্রিয়া, আগুন থেকেই তার আরম্ভ এবং পরিণামে আগুনেই তার প্রত্যাবর্তন। এ জন্যই তাঁরা বলেছেন, তোমরা এ প্রদাহী আগুন থেকে সাবধান থেক। এটা দ্বারা তাঁরা তার মধ্যকার ক্ষতিকর উপাদানকে দূর করার কথা বুঝিয়েছেন। অন্যথায় বস্তুর উপর দুটি ক্ষতিকর উপাদান একত্র হয় এবং অতিসত্বর তার বিনাশ সাধন করে। এরূপ প্রতি বস্তুই একমাত্র তার প্রাকৃতিক উপাদানের বিরোধ ও সংঘাতেই বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সে দুটি বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করে; সুতরাং এ অবস্থায় সে যদি সহায়ক ও শক্তিদাতা কোনো কিছুর সাহচর্য না পায়, তা হলে ক্ষতিকর উপাদান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

জেনে রাখুন, দার্শনিকদের সকলেই বস্তুসারের বস্তুর মধ্যে বারবার প্রত্যাবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা তা এভাবে বেশি সংসক্তি ও শক্তির সাহায্যে অগ্নির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে। কারণ তা এ আগুন অর্থাৎ উপাদানগত উত্তাপের সাহচর্যে মিলনক্ষণেই ক্রিয়াশীল হয়। পাঠক, তাকে সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন।

এখন আমরা দার্শনিকদের বর্ণনা অনুসারে সেই প্রস্তর সম্পর্কে কথা বলব, যা দিয়ে এ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে থাকে। তাঁরা এ ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা তা প্রাণীতে বিদ্যমান; অনেকে উদ্ভিদে তার অবস্থিতি ধারণা করেন; অনেকে বলেন তা খনিজ পদার্থেই রয়েছে, আবার অনেকে উপরোক্ত সব কিছুর মধ্যেই তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। এসব মতামত সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও তাদের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন আমাদের নেই; কারণ তাতে আলোচনা বেশি দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, এ প্রক্রিয়া সম্ভাবনার দিক থেকে প্রতিটি বস্তুতেই উপস্থিত; কেননা প্রাকৃতিক উপাদান সব বস্তুতেই বিদ্যমান। সুতরাং তাও এরূপ।

এখানে আমাদের একান্ত ইচ্ছা, পাঠক যাতে জানতে পারেন যে, কিসের দ্বারা প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা অর্জিত হয়ে থাকে। আমরা আল হার্রানীর[৩৩৫] সেই বক্তব্য প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, যাতে তিনি বলেছেন, রঞ্জন সর্বতোভাবে দুই প্রকার; এক প্রকার হল বস্তুর রঞ্জন, যেমন সাদা কাপড়ে ব্যবহৃত জাফরান, যা তাতে অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং বিন্যাসের দিক থেকে তা শিথিল ও বিলীয়মান হয়ে থাকে। অন্য প্রকার রঞ্জনটি একটি স্বয়ম্ভর বস্তুর নিজস্ব উপাদানকে অন্য বস্তুর বর্ণ উপাদানের পরিবর্তিত করা। যেমন বৃক্ষের মৃত্তিকাকে তার নিজস্ব উপাদানের এবং প্রাণীর বৃক্ষকে নিজস্ব উপাদানে পরিণত করা; যার ফলে মৃত্তিকা বৃক্ষে ও বৃক্ষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা একমাত্র

৩৩৫. ইনি সম্ভবত সলিম; সিরিয়ার হার্রানের রসায়নশাস্ত্রবিদ্।

www.amarboi.org

সজীব আত্মা ও সক্রিয় উত্তাপের ফলেই সম্ভব হয়। বস্তুত এটাই বস্তুসত্তার জন্ম দেয় ও বস্তুসারের পরিবর্তন করে। অবস্থা যখন এই, তখন এ কথা বলতে পারি যে, উক্ত প্রক্রিয়া হয় প্রাণী নয়তো উদ্ভিদের মধ্যে সক্রিয় হবে। এ মন্তব্যের প্রমাণ এই যে, এ উভয়টি আহার্যের সাথে অভ্যস্ত; তার দ্বারাই এদের স্থিতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি। অবশ্য প্রাণীর মধ্যে শক্তি ও সূক্ষ্মতার যে গুণ বিদ্যমান, তা উদ্ভিদের মধ্যে নেই। এ কারণেই দার্শনিকদের অনুসন্ধান তাতে অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রাণী তিনটি অবস্থান্তরের শেষ ও চরম পর্যায়। এর বর্ণনা এই যে, খনিজপদার্থ বৃক্ষে রূপান্তরিত ও বৃক্ষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু প্রাণী তার চেয়ে সূক্ষ্মতর কোনো রূপে পরিবর্তিত হয় না বরং বিপরীতভাবে তা পুনরায় স্থূলত্বে ফিরে যায়। তদুপরি এ প্রাণিদেহ ছাড়া এ পৃথিবীতে আত্মা অন্য কারও সাথে সংযুক্ত হয় না; অথচ এ আত্মাই হল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু। প্রাণীতে এ আত্মার অবস্থান তার রূপ পরিগ্রহ করেই হয়ে থাকে। উদ্ভিদের মধ্যে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তা অতি সামান্য এবং তাতে স্থূলতা ও অমসৃণতা বিদ্যমান। এ সত্ত্বেও তা নিজের স্থূলতা ও উদ্ভিদের বস্তুগত স্থূলত্বের জন্য তাতে মগ্ন ও সুপ্ত রয়েছে। এ স্থূলত্ব ও তার আত্মার স্থূলত্বের জন্যই তা গতিশীল হতে পারে না। বস্তুত গতিশীল আত্মা এ সুপ্ত আত্মা থেকে বহুগুণ বেশি সূক্ষ্ম। কারণ গতিশীল আত্মা খাবার খায়, বিচরণ করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু সুপ্ত আত্মা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। সজীব আত্মার দিক থেকে তুলনা করলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য মৃত্তিকা ও জলের চলমানতার সাথে তুলনীয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবস্থাও অনুরূপ। সুতরাং প্রাণীর মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি সবচেয়ে উন্নত, অগ্রগণ্য, সহজ ও সুলভ। কাজেই যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এটা জানার পর যা সহজ, তাতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা এবং যাতে দুরূহতার ভীতি আছে, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

জেনে রাখুন, দার্শনিকদের কাছে প্রাণী কিছু ভাগে বিভক্ত; তার মধ্যে 'জননী' হিসেবে প্রাকৃতিক ও উপাদান এবং 'জাতক' হিসেবে আধুনিক সৃষ্টি বিদ্যমান। এটা সর্বপরিচিত ও সহজবোধ্য ব্যাপার। এ জন্যই মৌল উপাদান ও সৃষ্টবস্তুকে দার্শনিকরা সজীব ও নির্জীব হিসেবে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা প্রতিটি গতিশীল সক্রিয় বস্তুকে সজীব এবং প্রতি স্থবির নিষ্ক্রিয় বস্তুকে নির্জীব বলে নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁরা দ্রবণশীল বস্তু ও খনিজ পদার্থ তথা, সর্ববস্তুতে এ বিভাজন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। ফলে যে বস্তু অগ্নিতে দ্রবীভূত হয়, উদ্বায়ী হয় ও প্রজ্জ্বলিত হয়; তা সজীব এবং এর বিপরীত যা কিছু, সেসব নির্জীব বলে গণ্য হয়েছে। এ দিক থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলো চারটি প্রাকৃতিক উপাদানে বিশ্লেষিত হয়, তাদেরকে সজীব এবং যেগুলো অনুরূপভাবে বিশ্লেষিত হয় না, তাদেরকে নির্জীব বলে বিভক্ত করেছেন।

অতঃপর দার্শনিকগণ সব সজীব বিভাগ অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কিন্তু দর্শনীয়ভাবে চারটি উপাদানের বিভাগে বিভক্ত হয়ে বিশ্লেষিত হতে পারে, আলোচ্য শিল্পের জন্য এমন কোনো বস্তু তাঁরা খুঁজে পান না। প্রাণীর মধ্যেও একমাত্র সেই প্রস্তর ছাড়া অন্য কিছু লাভ করেননি। সুতরাং তারা তার গণ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে জেনেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং তাকে প্রক্রিয়াজাত করেছেন। ফলে তার দ্বারা তাঁদের

www.amarboi.org

ঈপ্সিত ফল লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিদের মধ্যেও অনেক সময় অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়; বিশেষ করে বিচিত্র উপাদান একত্র করে মিশ্রণ ও এর পর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা হয়ে থাকে। উদ্ভিদের মধ্যে বলতে গেলে এমন উপাদান বিদ্যমান, যা এসব বিভাগের অনেকগুলোতেই বিশ্লেষিত হয়; যেমন 'আশনান'।[৩৩৬] খনিজ পদার্থে বস্তু, বস্তুসার ও প্রশ্বাস রয়েছে। এদেরকে মিশ্রণের মাধ্যমে সাধন করলে এমন উপাদান বের হয়ে আসে, যাতে প্রভাবক্ষমতা বিদ্যমান। আমরা এদের প্রতিটিই সাধন করে দেখেছি।

এদের মধ্যে প্রাণীই সাধন প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা উন্নত ও অগ্রগণ্য এবং তুলনামূলকভাবে সহজ ও সুলভ। সুতরাং পাঠক, আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান সেই প্রস্তরটির স্বরূপ কী এবং কী রূপে তা অস্তিত্বে এসেছে। আমরা বর্ণনা করেছি যে, প্রাণী জাতকসমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান; কাজেই তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। যেমন মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ। মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ সূক্ষ্মতর এজন্য যে, তা মৃত্তিকার স্বচ্ছ স্বয়ম্ভর উপাদান ও সূক্ষ্মবস্তুর দ্বারা গঠিত; সুতরাং তার ক্ষেত্রে এ সূক্ষ্মতা ও তারল্য অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে প্রস্তরও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার ক্ষেত্রে তুলনীয়। সামগ্রিকভাবে প্রাণীর মধ্যে এ প্রস্তর ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই, যা চারটি উপাদানে বিশ্লেষিত হতে পারে। পাঠক, এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন। কারণ তা একান্ত অকাট মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া অন্য সকলেরই বোধগম্য বিষয়। আমরা ইতিপূর্বে এ প্রস্তরের স্বরূপ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত ও অবগত করেছি; এখন আমরা তার সাধন প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করব, যাতে আমরা আমাদের উপর ন্যায়পরায়ণতার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, তা পূর্ণ হয়। অবশ্য—যদি পবিত্র আল্লাহ্ স্বেচ্ছায় আমাদের এ ইচ্ছার পূর্ণতা কামনা করেন।

আল্লাহ্র কৃপায় এর সাধন প্রক্রিয়া নিম্ন প্রকার : এ মহান প্রস্তরটিকে গ্রহণ করুন: অতঃপর তাকে কুম্ভাণ্ড ও পাতন পাত্রে স্থাপন করুন। তার চারটি উপাদান অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা ও জলে তাকে বিশ্লেষণ করুন। এগুলোই বস্তু, বস্তুসার, জৈবিক সত্তা ও রঞ্জন। তারপর আপনি যখন মৃত্তিকা থেকে জলকেও অগ্নি থেকে বায়ুকে বিচ্যুত করবেন, তখন প্রতিটিকে পৃথকভাবে স্ব স্ব পাত্রে উন্নীত করুন এবং পতিত দ্রব্যাদিকে পাত্রের তলদেশে গ্রহণ করুন। এটাই তলানি; একে তীব্র আগুনতাপে শোধন করুন; যাতে উত্তাপে তার মালিন্য দূরীভূত হয় এবং তার স্থূলতা ও অমসৃণতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাকে স্বীয় শুভ্রতার বিধৃত করুন এবং তার মধ্য থেকে সুপ্ত আর্দ্রতার আবিলতাকে উদ্বায়িত করুন। এ পর্যায়ে তা এমন একটি শুভ্র তরল পদার্থে পরিণত হবে, যার মধ্যে অস্বচ্ছতা, মালিন্য ও অসদ্ভাব নেই। তারপর আপনি প্রাথমিকভাবে তা থেকে উত্থিত উপাদানগুলোকে লক্ষ করুন এবং ঐগুলোকেও মালিন্য ও অসদ্ভাব থেকে পরিষ্কার করুন। বারবার এগুলোকে ধৌত করুন ও ঊর্ধ্বপাতিত করুন; যাতে এগুলো সূক্ষ্ম, তরল ও পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। আপনি যখন এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, আল্লাহ্ আপনাকে সফলতার দ্বারা সজ্জিত করবেন।

৩৩৬. লবণাক্ত উদ্ভিদ বিশেষ; বিরেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.amarboi.org

এর পর আপনি সেই বিন্যাসকে অনুসরণ করুন, যার উপর প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। এর বিবরণ এই যে, উক্ত বিন্যাসকে একমাত্র যোজন ও পচনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। যোজন বলতে স্থূলের সাথে সূক্ষ্মের মিশ্রণ এবং পচন বলতে বিশোধন ও বিচূর্ণন বুঝিয়ে থাকে। এগুলো এমনভাবে করতে হবে, যাতে তারা একে অন্যের সাথে মিশে একবস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং এক্ষেত্রে জলীয় মিশ্রণের ন্যায় তাতে যেন কোনো প্রকার অসম্ভব ও অপচয়ের নিদর্শন না থাকে। এ পর্যায়ে স্থূলটি সূক্ষ্মটির ধারণশক্তি অর্জন করবে এবং বস্তুসার অগ্নির সম্মুখিন থেকে শক্তি পাবে ও তাতে স্থিতিশীল হতে পারবে। অনুরূপভাবে তদস্থ জৈবিক সত্তাও বস্তুর মধ্যে মগ্ন হতে ও তাতে বিস্তৃত থেকে শক্তি অর্জন করবে। একমাত্র বিন্যাসের পরেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কেননা দ্রবীভূত বস্তু যখন তার সর্বাংশে মিশ্রক আত্মার সাথে যুক্ত হবে, তখন তার আকৃতি গ্রহণের জন্য তার একাংশ অপরাংশের সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একবস্তু হয়ে দাঁড়াবে। এর ফলে বস্তুসার বা আত্মার জন্য সংস্কার, বিকার, স্থায়িত্ব[৩৩৭] ও স্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং বস্তু বা দেহের জন্য মিশ্রণের স্থান হিসেবে যা আপতিত হতে পারে, তার জন্যও তা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে জৈবিক সত্তাও যখন তাদের সাথে মিশ্রিত হয় ও সাধন প্রক্রিয়ার বলে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন তার সর্বাংশ অপর দুটির অর্থাৎ বস্তুসার ও বস্তুর সর্বাংশের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। এ পর্যায়ে তারা উভয়ে এমন নিবিড় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, যাতে কোনো প্রকার অসদ্ভাব নেই এবং তারা যেন এমন একটি সামগ্রিক অংশ, যার সব প্রাকৃতিক উপাদান অটুট ও সর্বাংশ অখণ্ড হয়ে বিদ্যমান। তারপর এ মিশ্র উপাদানটি যখন দ্রবীভূত বস্তুর সাথে মিলিত হয় এবং তাতে অগ্নির উত্তাপ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্যকার আর্দ্রতা প্রকাশ পেয়ে উপরে ভেসে ওঠে ও দ্রবীভূত বস্তুতে গলে যায়। আর্দ্রতার ধর্মই হল দাহ্যতা ও অগ্নির সাথে সংযোগ। সুতরাং অগ্নি যখন তার সাথে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়, তখন জলীয় উপাদানের মিশ্রক জৈবকি সত্তার সাথে তার একাত্মতা তাকে বাধা দেয়। কারণ অগ্নি বিশুদ্ধ তেল ছাড়া তার সাথে একাত্ম হতে পারে না। অনুরূপভাবে জলীয় উপাদানেরও ধর্ম হল আগুন থেকে পলায়ন। সুতরাং তাতে আগুনের উত্তাপ প্রবল হয়ে তাকে উদ্বায়ী করে তুলতে চাইলে তার অন্তর্গত মিশ্রক শুষ্ক বস্তু তাকে ব্যাহত করে এবং উদ্বায়ী হতে বাধা দেয়। ফলে বস্তু জলীয় উপাদান ধারণের কারণ হয়; জলীয় উপাদান তেলের স্থিতির কারণ হয়; তেল রঞ্জনের স্থায়িত্ব বিধান করে এবং রঞ্জন তেলের আত্মপ্রকাশের কারণ ও আলোহীন নির্জীব অস্বচ্ছ বস্তুসমূহে তৈলতার আত্মপ্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এটাই যথার্থ বস্তু এবং এভাবেই উক্ত প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

এটাই সেই পরিষ্কার বস্তুরূপ, যা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসু হয়েছি। দার্শনিকগণ একে 'ডিম' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্যই এর দ্বারা তাঁরা 'মুরগির ডিম' বোঝাতে চাননি। জেনে রাখুন, দার্শনিকগণ একে অহেতুক এরূপ নামকরণ করেননি; বরং তাঁরা এর মধ্যদিয়ে একটি রূপকের সৃষ্টি করেছেন। আমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, হে বিজ্ঞ দার্শনিক! আপনি আমাকে দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রাণিজ মিশ্রবস্তুকে

৩৩৭. বিষয়ানুকারে শব্দটি 'অস্থিতি' বা 'ফানা' হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

ডিম নামকরণের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন। এটা কি তাঁদের ইচ্ছার ফসল, না বিশেষ কোনো বিষয়ের জন্য তাঁরা এমন রূপকের দ্বারস্থ হয়ে তাকে ডিম বলে অভিহিত করেছেন? তিনি বললেন, মিশ্রবস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য ও নৈকট্যের জন্যই এরূপ করেছেন। তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর; অচিরেই তোমার কাছে এর তাৎপর্য প্রকাশিত হয়ে উঠবে। আমি তাঁর সামনে চিন্তা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলাম না। তিনি যখন আমার চিন্তা ও তার মধ্যে আমার নিমগ্নতা দেখলেন, তখন আমার বাহু স্পর্শ করে তাতে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! এটা তাদের মধ্যকার প্রাকৃতিক উপাদানের মিশ্রণ ও সংগঠনকালে বর্ণ পরিমাণগত সাদৃশ্যের জন্যই হয়েছে। তাঁর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যকার অন্ধকার বিদীর্ণ হল, আমার হৃদয়ের আলোক জ্বলে উঠল এবং আমি তা উপলব্ধি করার শক্তি লাভ করলাম। আমি এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গৃহের পথ ধরলাম। পরে আমি এ বিষয়ে একটি জ্যামিতিক ছক নির্মাণ করেছি, যা দিয়ে মাসলামার বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ প্রদান করা সম্ভব। আমি বর্তমানে গ্রন্থে আপনার জন্য তা উদ্ধৃত করছি।

এর উদাহরণ এই যে, মিশ্র বস্তুটি যখন সমাপ্ত ও পূর্ণ হয়, তখন তার মধ্যকার বায়বীয় প্রকৃতি ডিমের মধ্যকার বায়বীয় প্রকৃতির অনুরূপ এবং তুলনীয়ভাবে মিশ্র বস্তুটির আগ্নেয় উপাদান ডিমটির আগ্নেয় উপাদানের অনুরূপ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অন্য দুটি প্রাকৃতিক উপাদান মাটি ও পানি সম্পর্কে বলা যায়। সুতরাং আমরা বলব, অনুরূপভাবে সমপরিমিত দুটি বস্তুই একে অপরের রূপক হতে পারে। তার উদাহরণ এই যে, ডিমের সমতলের জন্য 'হে, যে, ওয়াও, হে্ব' নির্দিষ্ট করুন। আমরা যখন এরূপ করার ইচ্ছা করব, তখন আমরা মিশ্র বস্তুটির স্বল্পতম প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ শুষ্কতা গ্রহণ করব। আমরা এর সাথে সমপরিমাণের আর্দ্রতার উপাদান মিশ্রিত করব; ফলে শুষ্কতার প্রকৃতি আর্দ্রতার প্রকৃতিকে শোষণ করে তার শক্তিকে ধারণ করবে। এ বক্তব্যে কিছুটা রহস্য আছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু পাঠক এটা আপনার অগোচরে থাকবে না। তারপর আপনি এর সাথে অনুরূপ সব কিছু বস্তুসার অর্থাৎ জলীয় উপাদান থেকে মিশ্রিত করুন; ফলে সবকিছু মিলিয়ে ছয়টি দৃষ্টান্ত হবে। এর পর প্রক্রিয়াজাতকরণান্তে সমুদয়ের সাথে অনুরূপভাবে বায়বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জৈবিক সত্তা মিশ্রিত করুন। এর তিনটি অংশ। ফলে সব মিলে সম্ভাবনার দিক থেকে শুষ্কতার নয়টি দৃষ্টান্ত হবে। যে মিশ্র বস্তুটির প্রকৃতি তার সমতলকে বেষ্টনকারী, তার দুই পাশে নিচে দুটি প্রকৃতিকে স্থাপন করুন। এ ক্ষেত্রে প্রথম দুটি সমতল বেষ্টনকারীর পাশে জলীয় প্রকৃতি ও বায়বীয় প্রকৃতি স্থাপন করবেন। এ দুটি, 'আলিফ, হে্ব, দাল-এর পাশ ও 'আলিফ, বে, জিম, দাল[৩৩৮]-এর সমতল। অনুরূপভাবে ডিমের সমতল বেষ্টনকারী দুটি পাশ, যারা জলীয় ও বায়বীয়, এগুলোই 'হে, যে, ওয়াও, হে্ব'-এর পার্শ্বদ্বয়। সুতরাং আমি বলব, 'আবজাদের' সমতল 'হযওহে্ব'র সমতলের অনুরূপ বায়বীয় প্রকৃতি, যাকে জৈবিক সত্তা বলে অভিহিত করা হয়, তার সাথে তুলনীয়। অনুরূপভাবেই মিশ্র বস্তুটির সমতলের 'বে, জে'। বস্তুত দার্শনিকগণ কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুর নামের দ্বারা তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যের জন্যই অভিহিত করেছেন।

---

৩৩৮. রোজেনথালের অনুবাদে এটা 'আলিফ-জিম-দাল' এবং পরবর্তীটি 'আলিফ-বে-দাল'।

www.amarboi.org

যেসব শব্দ সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তার মধ্যে একটি হল 'পবিত্র ভূমি'; এটা ঊর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ প্রাকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংগঠিত হয়। তামা একটি পদার্থ, যার মালিন্য দূরীভূত করে তাকে বিচূর্ণিত করার ফলে অণুতে পরিণত হয়েছে। তারপর হীরাকসের দ্বারা রক্তিম করার ফলে তা তাম্রাভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ম্যাগনেশিয়া' তাঁদের কাছে এমন একটি প্রস্তর যাতে বস্তুসার জমাট বেঁধে আছে। তাকে সেই ঊর্ধ্বস্থ প্রাকৃতিক উপাদান প্রকাশ করেছে, যাতে বস্তুসার সুপ্ত থাকে এবং সে কারণে তা অগ্নি সংঘাতের সম্মুখিন হতে পারে। 'নীললোহিত' এমন একটি লাল রং, যা অস্থিতিশীল এবং প্রাকৃতিক উত্তাপই তার জনয়িত্রী। সীসা এমন একটি প্রস্তর যাতে তিনটি বিচিত্রধর্মী শক্তি একত্র হয়েছে; এরা পরস্পর গণ ও গঠনের দিক থেকে এক। এদের একটি বস্তুসারীয়, প্রজ্জ্বল ও স্বচ্ছ এবং এটাই সক্রিয়। দ্বিতীয়টি সত্তাগত। এটি গতিশীল ও অনুভূতিশীল। অবশ্য এটা পূর্বটি অপেক্ষা স্থূল এবং এর কেন্দ্রস্থল পূর্বটির কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা ভিন্ন। তৃতীয়টি একটি মৃন্ময় শক্তি, নিরেট ও সংকোচক এবং এর ভারের জন্য ভূ-কেন্দ্রের দিকে বিপরীতগামী। এ শক্তিই বস্তুসারীয় জৈবিক সত্তাগত সমুদয় শক্তির ধারক এবং তাদেরকে বেষ্টনকারী। এছাড়া অবশিষ্ট যা কিছু, সমুদয়ই মূর্খ সাধারণের বিভ্রান্তির জন্য কৃৎ-কৌশলগত অভিনব সৃষ্টি। যে ব্যক্তি তার প্রস্তাবনাসমূহ জ্ঞাত আছে, তার পক্ষেই অনন্য নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব।

এটাই সেই সামগ্রিক বক্তব্য, যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। আমি তার ব্যাখ্যাসহ তোমার কাছে প্রেরণ করলাম। আশা করি আল্লাহ্‌র কৃপায় তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। ইতি।

ইবনে বিশরুনের আলোচনা এ স্থানে শেষ হল। ইনি আন্দালুসের 'কিমিয়া' ও 'সিমিয়া' শাস্ত্রের এবং যাদুবিদ্যার তৃতীয় শতাব্দী ও পরবর্তীকালের নেতৃস্থানীয় দিক্‌পাল মাসলামা আল মজরিতীর অগ্রগণ্য শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম।

পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন যে, আলোচ্য শিল্প সম্পর্কে তাদের যাবতীয় আলোচনাই কীভাবে এমন কিছু ইঙ্গিত ও রহস্যময়তায় পর্যবসিত হয়েছে, যা প্রকাশ হয়েও হতে চায় না এবং জানা যায় না। এটাই প্রমাণ করে যে, বিষয়টি প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত নয়। কিমিয়া সম্পর্কে যে তথ্যটি আমাদের বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যকীয় এবং যার সত্যতা বাস্তব ঘটনার দ্বারা সমর্থিত, তা এই যে, এটা সূক্ষ্ম আত্মশক্তির প্রভাব জাতীয় ও বস্তুজগতে এর তৎপরতা সম্পর্কীয় বিষয়। আত্মশক্তি শুভ হলে এটা কখনও বিভূতির আকারে দেখা দেয়; আবার অশুভ ও দুষ্ট হলে এটাই যাদু হয়ে দাঁড়ায়। বিভূতির ব্যাপারটি তো একান্তই প্রকাশমান; কিন্তু যাদুর ব্যাপারটি এজন্য যে, যাদুকররা, যেমন যথাস্থানে তার তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে, তাদের যাদুশক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করতে পারে। এ সত্ত্বেও তাদের কাছে এমন কিছু বস্তুগত উপাদান থাকে, যাতে তাদের যাদুক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন মৃত্তিকার উপাদান অথবা বৃক্ষ ও উদ্ভিদের উপাদান থেকে কিছুসংখ্যক প্রাণীর সৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে তারা এক্ষেত্রে ভিন্নতর বস্তু উপাদান ব্যবহার করে থাকে। যেমন ফেরাউনের যাদুকররা দড়ি ও লাঠির দ্বারা যাদু সৃষ্টি করেছিল। যেমন সুদান, দক্ষিণ সীমার হিন্দু ও উত্তর সীমার

www.amarboi.org

তুর্কি যাদুকরদের সম্পর্কে বর্ণিত হয় যে, তারা শূন্যে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য বিষয় সংঘটনে যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে থাকে।

যেহেতু এ শিল্পটিও স্বর্ণের জন্য বিশিষ্ট উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর উপাদান থেকে এটা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল, সুতরাং একেও যাদু জাতীয় ব্যাপার বলে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কে আলোচনাকারীরা দার্শনিকদের মধ্যে বিজ্ঞতার অধিকারী। যেমন—জাবের, মাসলামা এবং তাঁদের পূর্বসূরি অন্যান্য জাতির দার্শনিকবৃন্দ; তাঁরাও অনুরূপ পথের পথিক। এ কারণেই তাঁদের আলোচনা রহস্যময়তায় পর্যবসিত হয়েছে। এর দ্বারা তারা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক যাদুবিদ্যা ও এর বিচিত্র প্রকার সম্পর্কে প্রদত্ত অস্বীকৃতি থেকে আলোচ্যশাস্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছেন মাত্র। এ শাস্ত্র অন্যের অধিকারে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কার্পণ্য থেকে এটা হয়নি; যেমন যারা এই বিষয়ে যথার্থ বিশ্লেষণের দ্বারস্থ হননি, তারা অনুরূপ মতপ্রকাশ করে থাকেন। পাঠক, লক্ষ করুন, কীভাবে মাসলামা তাঁর এ শাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থের নাম 'রুতবাতুল হাকিম' এবং যাদুবিদ্যা ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় গ্রন্থের নাম 'গায়াতুল হাকিম' রেখেছেন। এদ্বারা তিনি গায়াতের বিষয়ে সাধারণত ও রুতবাতের বিষয়ের বিশিষ্টতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ 'গায়াত' (গন্তব্য) 'রুতবাত' (পর্যায়) হতে উন্নততর। সুতরাং বলা যায় যে, রুতবাতের আলোচ্যাদি গায়াতের অংশ বিশেষ এবং আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্যের দিক থেকে শেষোক্তটি পূর্বোক্তটিকে নিজ সীমায় বেষ্টন করে আছে। এ দুটি গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য থেকেও আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আমরা সেই সব ব্যক্তির ভ্রান্তির অপনোদন করব, যারা এ বিষয় সম্পর্কীয় উপলব্ধিকে প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত বলে ধারণা পোষণ করেন। বস্তুত 'আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা ও সর্বপ্রজ্ঞাতা'।[৩৩৯]

৩৩৯. কোরান; ৬৬, ৩।

www.amarboi.org

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[দর্শনের অসারত্ব ও দর্শন শাস্ত্রানুসারীদের বিকৃতি]

অত্র ও তার পরবর্তী পরিচ্ছদ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসব শাস্ত্র সভ্যতায় আকস্মিকভাবে আগত এবং নগর জীবনে বেশি অনুশীলিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে এদের ক্ষতিকর প্রভাব অত্যধিক। এ জন্যই এদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং এদের সভ্যতায় বিশ্বাসীদের যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

এর বর্ণনা এই যে, মানবজাতির অন্তর্গত একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণা পোষণ করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত সমুদয় বস্তুজগৎ, তাদের স্বরূপ, অবস্থা, কারণ ও কারণসহ অনুসন্ধিৎসু চিন্তা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হতে পারে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার বিশুদ্ধি এ চিন্তার দ্বারাই লভ্য, শ্রুতির দ্বারা নয়; কেননা এগুলোও বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধির অংশবিশেষ। এসব ব্যক্তিকে 'ফালাসফা' বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি 'ফিলসফ'-এর বহুবচন এবং গ্রিক ভাষায় এর অর্থ 'জ্ঞানপ্রেমিক'। সুতরাং তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন এবং যথাশক্তি উক্ত উদ্দেশ্য সম্পূরণে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন, যা দ্বারা বুদ্ধি তার অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সমর্থ হয় এবং তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'যুক্তিবিদ্যা'।

এর ফলশ্রুতি এই যে, যে অনুসন্ধিৎসা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করার কাজে সহায়তা করে, তা একমাত্র স্মৃতিরক্ষিত বস্তুজগতের ব্যষ্টি থেকে গৃহীত তাৎপর্যাদির মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়। ফলে তন্মধ্য থেকে প্রথমে এমন কিছু আকৃতির সার সংগৃহীত হয়, যা সমগ্র ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন সীলমোহর পঙ্ক ও মোমের উপর অঙ্কিত এর সমুদয় ছাপ সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। অনুভূত বিষয়াদি থেকে এ সংগৃহীত সারাংশকে 'প্রাথমিক বোধ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তারপর এসব সার্বিক তাৎপর্য যদি অন্য তাৎপর্যের সাথে মিশ্রিত থাকে, তাহলে তা থেকেও সারাংশ গৃহীত হয় এবং ইতোপূর্বে তা স্মৃতিতেও অনুরূপ পৃথকীকৃত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে মিশ্রিত অন্য তাৎপর্যাদি থেকে তাকে পুনরায় পৃথক করা হয়। এর পর দ্বিতীয়বার অনুরূপভাবে অন্যবিধ মিশ্রণ থেকে এর সারাংশ গৃহীত হয়। এভাবে তৃতীয় বার এবং ক্রমান্বয়ে যতক্ষণ না উক্ত সারাংশ এমন সার্বিক সরল তাৎপর্যে পরিণত হয়, যা সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। এর পর এটি থেকে আর সারাংশ গৃহীত হয় না; এটাই সর্বোচ্চ গণ।

www.amarboi.org

এসব সারাংশের সবই অনুভূতির অতীত বিষয় এবং জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের সংযুক্তিকে 'দ্বিতীয় বোধ' বলে অভিহিত করা হয়। মননশক্তি যখন এসব সারাংশীয় বোধে অনুসন্ধান চালায় ও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের কল্পনা দাবি করে, তখন স্মৃতির জন্য তার কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের সংযুক্তি ও কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের বিযুক্তিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে; যাতে এর দ্বারা অর্জিত বস্তুর কল্পনা যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং একমাত্র বিশুদ্ধ প্রমাণের দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে অনুরূপ বিচার ও সংযুক্তির নামই 'সত্যতা'; তা পরিণামে দার্শনিকদের কাছে কল্পনা অপেক্ষা অগ্রগণ্য এবং কল্পনা প্রারম্ভে ও শিক্ষায়ই শুধু অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ তাঁদের কাছে উপলব্ধিগত অনুসন্ধিৎসার চরম পর্যায় হল পরিপূর্ণ কল্পনা এবং সত্যতা তার মাধ্যম মাত্র। পাঠক, আপনি যুক্তিবিদদের গ্রন্থাদিতে কল্পনার অগ্রগামিতা ও তার উপর সত্যতার নির্ভরশীলতার যে বক্তব্য শুনতে পান, তা একমাত্র বোধ অর্থে; পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থে নয়। এটাই তাঁদের গুরু এরিস্টটলের মত।

অতঃপর তাঁরা ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত সমুদয় বস্তুজগতের উপলব্ধির সৌভাগ্য এ অনুসন্ধিৎসা ও প্রমাণাদির দ্বারা লব্ধ হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধির মাধ্যম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফসল হল তাই, যার উপর তাঁরা তাদের অনুসন্ধিৎসার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রথমে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নিম্ন পর্যায়ে বস্তু বিদ্যমান। এর পর তাঁদের উপলব্ধি কিছুটা উন্নত হলে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, প্রাণীর মধ্যে যেহেতু অনুভূতি ও গতি রয়েছে, সুতরাং জৈবিক সত্তার অস্তিত্ব আছে। এর পর তাঁরা জৈবিক সত্তার শক্তি হতে বুদ্ধির সাম্রাজ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এখানে তাঁদের উপলব্ধি স্থিতিশীল হওয়ায় তাঁরা আকাশীয় উন্নত বস্তু সম্পর্কে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁদের কাছে আকাশীয় বস্তুপুঞ্জেরও মানুষের অনুরূপ জৈবিক সত্তা ও বুদ্ধি থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এর পর তাঁরা এ ধারণাকে একাদিক্রমে সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করেছেন এবং উক্ত সংখ্যা দশ। নয়টি বিস্তারিত ও তাদের স্বরূপ বহুধাবিশিষ্ট এবং একটি প্রথম ও একক; তা হল দশম।

তাঁরা ধারণা করেন যে, অনুরূপ সিদ্ধান্তসহ জৈবিক সত্তার বিশুদ্ধি ও তার চরিত্রে সৎগুণের আরোপ সম্পন্ন করে বস্তুজগতের উপলব্ধিগত সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব। কর্তব্যকর্মের সৎ ও অসৎ নির্দেশ করার জন্য যদি কোনো ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ না হয়, তবুও মানুষের পক্ষে তার বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার কল্যাণে এবং সৎকর্মের প্রতি আকর্ষণ ও অসৎকর্মের প্রতি বিকর্ষণ সম্পর্কীয় তার সহজাত প্রবৃত্তির গুণে অনুরূপ সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। যখন কোনো জৈবিক সত্তায় এ গুণ অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন সে এক অপূর্ব আনন্দ ও আস্বাদে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কীয় মূর্খতাই চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের নামান্তর। এটাই তাঁদের কাছে পারলৌকিক সম্ভোগ ও দুর্ভোগের তাৎপর্য। এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্যের বিভ্রান্তিকর বিস্তার সবার কাছে সুপরিচিত।

www.amarboi.org

এসব মতবাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যিনি তার সমস্যাগুলোকে সংগৃহীত করেছেন, তার জ্ঞানের ধারাকে সংকলিত করেছেন এবং তার প্রমাণাদিকে সারিবদ্ধ করেছেন, তিনি বর্তমানকালে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসী এরিস্টটল। ম্যাসিডোনিয়া রোম সাম্রাজ্যের একটি নগর। এরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য, আলেকজান্ডারের শিক্ষক এবং সাধারণভাবে দার্শনিকরা তাঁকে 'প্রথম শিক্ষক' বলে অভিহিত করেন। এটা দ্বারা তাঁরা যুক্তিশিল্পের শিক্ষকই বুঝিয়ে থাকেন; কারণ তাঁর পূর্বে এ শিল্পটি এমন সুসংস্কৃত ছিল না। তিনিই প্রথমে পদ্ধতিগুলো বিন্যস্ত, তার সমস্যাগুলো সুসংবদ্ধ এবং তার বিস্তারকে সুসম্পন্ন করেন। তিনি যথাসম্ভব এ শিল্পকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছেন; এতদ্‌সত্ত্বেও দার্শনিকদের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যদি তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যাত্মবিদ্যার দায়িত্ব বহন করতেন, তা হলে কতই না ভালো হত!

অতঃপর ইসলামী জগতে তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন এবং সামান্য ব্যতিক্রমসহ এরিস্টটলের মতকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এর বর্ণনা এই যে, ঐসব পূর্বসূরি দার্শনিকের গ্রন্থাদি যখন আব্বাসী সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনূদিত হল, তখন ইসলামী জগতের অনেকেই এসব বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানের জগতে আল্লাহ্ যাদেরকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছেন, তাঁরা তাদের মতামত গ্রহণ করলেন এবং তা নিয়ে বিতর্কে অগ্রসর হন ও বিস্তারিত সমস্যাবলিতে মতানৈক্যের অধীন হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন সাইফুদ্দৌলার শাসন-আমলে চতুর্থ শতাব্দীর দার্শনিক আবু নসর আল ফারাবী এবং ইস্পাহানের বনি বূয়ার নেজামূল মুলকের শাসন-আমলে পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক আবু আলী ইবনে সিনা।[৩৪০]

জেনে রাখুন, তাঁরা এভাবে যে মতবাদের অনুসারী হয়েছেন, তা তার সমুদয় প্রকার প্রকৃতিসহ-ই অসার। অবশ্যই সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তাঁরা যেভাবে প্রথম বোধের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে যেভাবে উন্নয়নের মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবী সত্তায় উপনীত হয়েছে, তা এর অতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পর্যায় সম্পর্কে উপলব্ধির অক্ষমতা ছাড়া অন্যকিছুই নয়। সৃষ্টিজগৎ এই বিন্যাস অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত—"তিনি এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পর্কে তোমরা অবগত নও"। শুধুমাত্র বোধের প্রতিষ্ঠা ও তাছাড়া অন্য সমুদয় সম্পর্কে তাদের উদাসীনতার ক্ষেত্রে তাঁরা পদার্থবিদদের সাথে-ই তুলনীয়। তাঁরাও বিশেষভাবে বস্তুকেই প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রুতি ও বোধের দায়িত্ব এড়িয়ে যান। ফলে তাঁরা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশলে বস্তুর অতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে সৃষ্টিজগতের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত দার্শনিকদের যুক্তি-প্রমাণ, যাকে তাঁরা যুক্তিবিদ্যার পরিমাপ ও পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করেন, তাও উদ্দেশ্য সম্পাদনে অক্ষম ও অসম্পূর্ণ। এদের মধ্যে যাকে তাঁরা বস্তুজগতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে পদার্থবিদ্যা নামে অভিহিত করেছেন, এর অক্ষমতার কারণ এই যে, তাঁদের ধারণা অনুসারে সংজ্ঞা ও অনুমানের ভিত্তিতে প্রকাশিত স্মৃতিমূলক এসব ফলাফল ও বহির্জগতের বাস্তবতার মধ্যকার সামঞ্জস্য একান্তই অবিশ্বস্ত। কারণ এসব

৩৪০. রোজেনথালের অনুবাদে নেজামূল মুলকের উল্লেখ নেই।

www.amarboi.org

সিদ্ধান্ত স্মৃতিমূলক, সার্বিক ও সাধারণ এবং প্রকাশ বস্তুজগৎ উপাদানের দিক থেকে ব্যষ্টির দ্বারা বিশিষ্ট। সম্ভবত তার উপাদানের মধ্যেই এমন কিছু বিদ্যমান, যা এ স্মৃতিমূলক সার্বিকতাকে প্রকাশ্য বিশিষ্টতার সাথে সুসামঞ্জস্য হতে বাধা দেয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বাস্তব অনুভূতিই কিছুটা ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ; এসব যুক্তি-প্রমাণ নয়। কাজেই সেখানে তাঁদের দাবি অনুসারে সেই বিশ্বাসের অবকাশ কোথায়?

কখনও স্মৃতিশক্তি কাল্পনিক আকৃতির দ্বারা প্রাথমিক বোধকে ব্যষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে তৎপর হয়। কিন্তু তার এ তৎপরতা দ্বিতীয় বোধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়; কেননা তা পৃথকীকরণের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের। যা হোক, এ প্রথম পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুভূতির সমগোত্রীয়। কারণ প্রথম বোধ বহির্জগতের দ্বারা পূর্ণভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় সামঞ্জস্যের দিক থেকে তার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা তাদের এ-সম্পর্কীয় দাবি মেনে নিতে পারি। অবশ্য এ প্রসঙ্গেও আমাদের জন্য এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ত্যাগ করা উচিত। কেননা যে-কোনো মুসলমানের জন্য তার অনুপকারী বিষয় পরিত্যাগের যে বিধান রয়েছে তার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ পদার্থবিদ্যার সমস্যাসমূহ আমাদের ধর্মীয় বিধানে ও জীবন আচরণে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু নয়; সুতরাং তা ত্যাগ করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

অবশ্য তাঁদের আলোচনার যে অংশটি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিদ্যমান, যাকে আত্মাজগৎ বলা যায় এবং যাকে তাঁরা ঐশীবিদ্যা ও পদার্থের পরবর্তী বিদ্যা নামে অভিহিত করেছেন, তার স্বরূপ মূলতই অজ্ঞাত। তাতে উপনীত হবার কোনো সংযোগ নেই এবং তার কোনো বাস্তব প্রমাণও নেই। কারণ প্রকাশ ও বিশিষ্ট বস্তুজগৎ থেকে বোধশক্তিকে পৃথক করার কাজ কেবলমাত্র আমাদের উপলব্ধিজাত পরিধিতেই সম্ভব হতে পারে। আত্মাজগতের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না; সুতরাং আমাদের পক্ষে সেখান থেকে সার গ্রহণ করে ভিন্ন কোনো প্রকৃতি পৃথক করা সম্ভব নয়। বস্তুত উক্ত জগৎ ও আমাদের মধ্যে একটি যবনিকা বিদ্যমান। ফলে সেখান থেকে আমরা কোনো বাস্তব প্রমাণই গ্রহণ করতে পারি না এবং সাধারণভাবে তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের উপলব্ধি কোনো কাজেই লাগে না। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষের জীবাত্মা ও তার উপলব্ধির মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি। বিশেষ করে সেই স্বপ্নের মধ্যে যা প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ আবেগের ফসল হিসেবে বিদ্যমান। এছাড়া যা কিছু তার স্বরূপ ও গুণ হিসেবে রয়েছে, সেসবই গৃহ্যতত্ত্ব; তাকে আয়ত্তে আনার কোনো পথ উন্মুক্ত নেই।

দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন 'যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তার উপর কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না। কারণ বাস্তব প্রমাণের প্রাথমিক শর্তই হল প্রামাণ্যের সত্তাগত অস্তিত্ব।' তাঁদের শিক্ষাগুরু প্লেটো বলেছেন, 'অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় কোনো প্রকার বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায় না। তাতে একমাত্র 'যথোপযুক্ত' ও 'যথার্থ' বলা যেতে পারে।' অর্থাৎ একটি ধারণামাত্র। কাজেই আমরা যখন এরূপ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর শুধুই একটি ধারণা

www.amarboi.org

লাভ করতে সমর্থ হই, তখন আমাদের জন্য সেই প্রথম ধারণাই কি যথেষ্ট নয়? ফলত এসব জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে আমাদের কী লাভ? অথচ আমাদের এবংপ্রকার কষ্ট স্বীকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুজগৎ সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হওয়া এবং তাঁদের কাছেও মানুষের মননশীলতার এটাই একমাত্র লক্ষ্য।

তাদের সেই বক্তব্য—বস্তুজগৎকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার সৌভাগ্য এসব যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে; বস্তুত একটি অলীক অবাঞ্ছিত বক্তব্য মাত্র। তার ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ দুটির অংশের দ্বারা গঠিত; এর একটি দৈহিক এবং অপরটি তার সাথে মিশ্রিত আত্মিক। এদের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক উপলব্ধি বিদ্যমান; যদিও তাদের মধ্যে উলব্ধিকারী একক। তা তাদের আত্মিক অংশ; যে কখনও আত্মিক উপলব্ধির দ্বারা আবার কখনও দৈহিক উপলব্ধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে-কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই নিজ সত্তাকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে দৈহিক উপলব্ধির জন্য তাকে ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের ন্যায় দৈহিক যন্ত্র-মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়।

প্রতিটি উপলব্ধিকারীই তার উপলব্ধির আনন্দ উপভোগ করে থাকে। পাঠক, এক্ষেত্রে শিশুর মাধ্যমবিশিষ্ট প্রাথমিক উপলব্ধির বিষয়টি বিবেচনা করুন। সে কীভাবেই না আলোক দর্শনে ও শব্দ শ্রবণে উল্লসিত হয়ে থাকে। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জৈবিক সত্তা নিজস্বরূপে মাধ্যমহীন যে উপলব্ধি লাভ করে, তাতে এরূপ আনন্দ ও আস্বাদের মাত্রা সমধিক। অনুরূপভাবে জীবাত্মা যখন মাধ্যমহীন স্বরূপগত উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়, তখন তার জন্য যে পরিমাণ উল্লাস ও আস্বাদ লাভ ঘটে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত এ উপলব্ধি কোনো প্রকার অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না। এটা একমাত্র ইন্দ্রিয় যবনিকার উত্তোলন এবং দৈহিক উপলব্ধির মাধ্যমগুলোর সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মাধ্যমেই ঘটে থাকে।

সুফিসাধকরা এ উল্লাস লাভের জন্যই জৈবিক সত্তায় অনুরূপ উপলব্ধির আবির্ভাবের নিমিত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা সাধনার দ্বারা দৈহিক শক্তি ও তার উপলব্ধিসমূহকে মৃতবৎ করে তোলেন; এমন কি মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকেও রহিত করেন। যাতে দৈহিক বাধাবিপত্তি অপসারিত হওয়ার ফলে জৈবিক সত্তা তার স্বরূপগত উপলব্ধি লাভ করতে পারে। এর ফলে তাঁদের জন্য যে আনন্দ ও আস্বাদ লাভ ঘটে, তা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য নয়। এরূপ আনন্দ লাভের ধারণাও দার্শনিকদের কাছে তার উপলব্ধির বিশুদ্ধতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু এসত্ত্বেও এর অস্তিত্ব তাঁদের উদ্দেশ্যের সাথে যথার্থভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অতএব তাঁদের বক্তব্য—বাস্তব প্রমাণ ও মননশীল যুক্তি অনুরূপ উপলব্ধি ও তৎসংশ্লিষ্ট আনন্দের জন্ম দিতে পারে; পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, তা একান্তই ভিত্তিহীন। কারণ বাস্তব প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের সবই দৈহিক উপলব্ধিজাত এবং তাদের সংগঠনের মস্তিষ্কে কল্পনা, মনন ও স্মৃতি ক্রিয়াশীল। অথচ আমরা বলি যে, অনুরূপ উপলব্ধি লাভ করতে হলে প্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা হল এসব মস্তিষ্কশক্তির অপসারণ; কেননা এরা ঐ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংঘাত সৃষ্টিকারী এবং তার উদ্দেশ্যে

www.amarboi.org

বিরূপতা প্রকাশকারী। পাঠক, আপনি তাঁদের মধ্যকার দক্ষ ব্যক্তিকেও 'কিতাবুশ্ শেফা', 'ইশারাত' ও 'নাজাত' এবং এরিস্টটল ও অন্যদের রচনাবলির সংক্ষিপ্ত-সার রচয়িতা ইবনে রুশদের গ্রন্থে আত্মনিয়োগ করে দেখবেন। তাঁরা এসব গ্রন্থের পৃষ্ঠা মন্থন করছেন, তাদের যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ়তা অনুধাবন করছেন এবং তা দিয়ে তাদের মধ্যে অনুরূপ সৌভাগ্যের অংশ অনুসন্ধান করে ফিরছেন; অথচ তাঁরা বুঝতেও পারছেন না যে, এতদ্বারা তাঁরা কেবল তার পথে বাধাই সৃষ্টি করছেন! তাঁদের একমাত্র নির্ভরতা এরিস্টটল, ফারাবী ও ইবনে সিনা থেকে বর্ণিত সেই বক্তব্য, যাতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সক্রিয় মননশীলতা অর্জন করতে পেরেছে এবং তার সাথে তার জীবনের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার জন্য অবশ্য সেই সৌভাগ্যের প্রাপ্তিলাভ ঘটেছে।'

তাঁদের কাছে সক্রিয় মননশীলতা বলতে আত্মজগতের পর্যায়ক্রমের সেই প্রথম পর্যায়কে বোঝায়, যার উপর থেকে ইন্দ্রিয় যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে এবং এ সক্রিয় মননশীলতার সাথে সংযোগকে তাঁর জ্ঞানজ উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। অথচ, পাঠক, আপনি ইতিমধ্যে তার অমরতা লক্ষ করেছেন। এরিস্টটল ও তাঁর অনুসারীগণ এ সংযোগ ও উপলব্ধির দ্বারা জৈবিক সত্তার সেই স্বরূপগত মাধ্যমহীন উপলব্ধিকেই বুঝিয়েছেন এবং তা ইন্দ্রিয় যবনিকার উন্মোচন ছাড়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে তাঁদের বক্তব্য—'এ উপলব্ধিজাত আনন্দ সেই প্রতিশ্রুত সৌভাগ্যের নামান্তর মাত্র'; তাও অনুরূপভাবেই অসার। কেননা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য থেকে আমাদের সামনে এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, জৈবিক সত্তার জন্য ইন্দ্রিয়ের অতীত ভিন্ন এক উপলব্ধি বিদ্যমান, যা কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই অর্জিত হয় এবং তার এরূপ উপলব্ধির দ্বারা সে তীব্র আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এ বক্তব্য কোনো প্রকারেই এটা বোঝায় না যে, তা-ই পারলৌকিক সৌভাগ্যের নামান্তর এবং অবশ্য লভ্য। বরং তা এ সৌভাগ্যের বিচিত্র আস্বাদের একটি অংশ মাত্র।

অতঃপর তাদের বক্তব্য—'বস্তুজগৎকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার মধ্যেই সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে; তা এমন একটি অসার বাক্য, যা একত্ববাদের ভিত্তি প্রসঙ্গে আমাদের পূর্ব বর্ণিত স্বকপোলকল্পনা ও বিভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কেননা বস্তুজগৎ প্রতিটি উপলব্ধিকারীর কাছে তার উপলব্ধি-মাধ্যমের অনুপাতে সীমাবদ্ধ; আমরা ইতিপূর্বেই এর বিকৃতির কথা বর্ণনা করেছ। বস্তুত বস্তুজগৎ অনুরূপভাবে বেষ্টিত হওয়ার চেয়ে বিস্তৃততর অথবা দৈহিক ও আত্মিক যে-কোনো দিক থেকে তার যথাযথ অনুধাবন সম্ভবপর নয়। তাদের মত ও পথের আলোচনায় সামগ্রিকভাবে আমাদের যা লভ্য হয়েছে, তা এই যে, উক্ত আত্মিক অংশ যখন দৈহিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সে তার স্বরূপগত এক বিশেষ ধরনের উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু তার সেই উপলব্ধির ক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তাধীন এ বস্তুজগৎ মাত্র। তা কিছুতেই এমন ব্যাপক কোনো উপলব্ধি নয়, যা সমগ্র অস্তিত্বকে বেষ্টন করতে পারে। কারণ তা বেষ্টনীর অতীত। যা হোক, সে তার এরূপ উপলব্ধির সাহায্যেই তীব্র আনন্দ উপভোগ করে; যেমন শিশু তার ক্রমবর্ধমান প্রাথমিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়জাল উপলব্ধির দ্বারা আনন্দ লাভ করে থাকে। সুতরাং এর পর কে সমগ্র বস্তুজগতের

www.amarboi.org

উপলব্ধির কথা বলতে পারে; কিংবা সেই সৌভাগ্যলাভের ধারণা দিতে পারে যার প্রতিশ্রুতি আমরা ধর্মীয় বিধানে পেয়েছি যদি আমরা তার কর্তব্য পালন না করি! 'আক্ষেপ! আক্ষেপ!! সেই বিষয়ের জন্য যা দিয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।'

তাঁদের সেই বক্তব্য—'মানুষ সচ্চরিত্রের অনুশীলন ও অসচ্চরিত্র থেকে বিরত থেকে নিজের জীবাত্মার সংশোধন ও সংমার্জনে স্বাধীন; তা এমন একটি বিষয় যার ভিত্তি হল এই যে, তার স্বরূপগত উপলব্ধিজাত আনন্দই তার প্রতি প্রতিশ্রুত সৌভাগ্যের নামান্তর। কারণ অসচ্চরিত্র জৈবিক সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ; কেননা সে দৈহিক শক্তির রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকে।'

আমরা বর্ণনা করেছি যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিদর্শন এ দৈহিক ও আত্মিক উপলব্ধির অতীত একটি বিষয়। দার্শনিকরা যে সংমার্জনার মাধ্যমে তার সাথে সংযুক্তির কথা বলেছেন, এর উপকারিতা শুধু আত্মিক উপলব্ধিজাত আনন্দ প্রসারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বস্তুত তাকেই অনুমান ও পদ্ধতিগত ধারণার অধীন বলা যায়। কিন্তু তার অতীত যে সৌভাগ্যের কথা ধর্মপ্রবর্তক প্রতিশ্রুতি হিসেবে আমাদেরকে বলেছেন এবং যা কেবলমাত্র তৎপ্রদত্ত আদেশ পালন ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই লাভ করা যায়, তা এমন একটি বিষয়, যা কোনো উপলব্ধিকারীর উপলব্ধিই বেষ্টন করতে পারে না। এ কারণেই তাঁদের নেতৃস্থানীয় দার্শনিক আবু আলী ইবনে সিনা তাঁর 'আল মবদা ওয়াল মা-আদ' নামক গ্রন্থে সতর্ক করে দিয়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হল : আত্মিক পুনরুত্থান ও তার অবস্থাসমূহ এমন কিছু বিষয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ ও অনুমানের দ্বারা অনুধাবন করা যায়। কারণ তা সংরক্ষিত প্রাকৃতিক ধারা ও ঐক্যবদ্ধ ধারণায় বিধৃত রয়েছে। সুতরাং তার উপর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের অবকাশ বিদ্যমান; কিন্তু দৈহিক পুনরুত্থান ও তার অবস্থাসমূহের অনুধাবন বাস্তব প্রমাণের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তার ধারা ঐক্যবদ্ধ নয়। বরং তার ব্যাপারে মোহাম্মদী সত্যধর্মবিধান আমাদের সামনে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছে। সুতরাং আমাদের উচিত তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তার অবস্থাসমূহ জানার জন্য তার দ্বারস্থ হওয়া।

অতএব এই শাস্ত্র, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, তা কীভাবে তাদের অতি আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ করতে অক্ষম। তদুপরি তাতে ধর্মীয় বিধান ও তার বহিরঙ্গের বিরোধিতার উপাদান বিদ্যমান। ফলত এই শাস্ত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে একটিমাত্র উপকারিতাই বিদ্যমান; তা হল যুক্তিপ্রমাণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করা, যাতে বাস্তব প্রমাণের ক্ষেত্রে উত্তম যোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা অর্জিত হতে পারে। এ হল দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুমান পরম্পরার শৃঙ্খলা ও বিন্যাস; যাতে তাঁরা তাঁদের যুক্তিবিদ্যার শর্তাদিরূপে এবং পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছেন। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে পদার্থবিদ্যা, শিক্ষণীয় গণিতাদি এবং তার পরবর্তী শাস্ত্রাদির জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন ও গঠনের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় শর্তসাপেক্ষ বাস্তব প্রমাণের প্রয়োগজনিত পরিচিতির দ্বারা বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতার একটি যোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়। কারণ উক্ত শাস্ত্রটি যদিও তাদের উদ্দেশ্য সম্পূরণ করতে

www.amarboi.org

অপারগ, তবু আমাদের জ্ঞানানুসারে তা বিতর্ক-বিচারের শুদ্ধতম পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

সুতরাং পাঠক, আপনি যেমন জানতে পারলেন, এটাই এ শাস্ত্র পাঠের ফলশ্রুতি এবং এর সাথে শাস্ত্রবিদ্‌দের বিচিত্র মত ও পথ, তাদের ক্ষতিকারক ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রকেই তার অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে অবহিত হতে হবে। যে-কোনো ব্যক্তি তার সৃষ্টিশক্তিকে ধর্মীয় বিধান, কোরানের ভাষ্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইত্যাদির যথাযথ অবহিতির দ্বারা উজ্জ্বল করে যেন তাতে দৃষ্টিপাত করে। ধর্মীয় জ্ঞানহীন অবস্থায় কারও পক্ষে উক্ত শাস্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়া উচিত নয়; অন্যথায় তার অপকারিতা থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। আল্লাহ্‌ই সঠিক পথের সাহায্যদাতা এবং সত্যের দিকে তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। 'আমরা কিছুতেই সত্যের পথ অনুসরণ করতে পারতাম না, যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করতেন।[৩৪১]

৩৪১. কোরান; ৭, ৪৩।

www.amarboi.org

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যোতিষশিল্পের অসারতা, তার উপলব্ধির দুর্বলতা এবং তার উদ্দেশ্যের বিকৃতি]

এই শিল্পের অনুসারীরা ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁরা বস্তুজগতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। এরূপ জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নক্ষত্রের শক্তি ও সৃজ্যমান বস্তুর উপর তাদের প্রভাব তাঁদেরকে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করে। এর ফলে আকাশমণ্ডল ও নক্ষত্রাদির গঠনপ্রকৃতি সামগ্রিকভাবে সংঘটিতব্য সার্বিক ও আংশিক বিষয়ের প্রতিটির উপর প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে।

জ্যোতিষীদের মধ্যে পূর্বসূরিগণ এ মত প্রকাশ করতেন যে, নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবের বিষয়টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটা এমন একটি বিষয়, যা যথাযথ অর্জন করতে হলে মানবজাতির সমুদয় জীবনকালও যথেষ্ট নয়। কারণ অভিজ্ঞতা একমাত্র বারংবার সংঘটনের দ্বারা অর্জিত হয় এবং এরূপ পরম্পরা অনুসরণ করেই জ্ঞান বা ধারণা লাভ করে। নক্ষত্রাদির আবর্তনের মধ্যে এমনও আছে, যার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তাদের বারংবার আবর্তনের জন্য এমন দীর্ঘ সময় ও কাল পরিধির দরকার, যা জাগতিক জীবনকালের দৈর্ঘ্য দিয়ে পূরণ হবার নয়। অনেক সময় তাঁদের মধ্যকার দুর্বলচেতাগণ এ মত প্রকাশ করে যে, নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবের জ্ঞান প্রত্যাদেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এটা একান্তই অসার কল্পনা, আমাদের জন্য এর অসারতা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নেই; তাদের নিজেদের বক্তব্যই এজন্য যথেষ্ট।

পাঠক, তবুও এ প্রসঙ্গে আপনার জ্ঞাতব্য সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, নবীগণ (আঃ) শিল্পাদি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। তদুপরি তাঁরা অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ না হলে কখনও আগ্রহ দেখাতেন না। সুতরাং তারা কীভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ শিল্প গড়ে ওঠা এবং নবী অনুসারীদের মধ্যে অনুরূপ চরিত্র দেখা দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে।

অবশ্য টলেমী ও উত্তরসূরিদের মধ্যকার তাঁর অনুসারীদের মত এই যে অনুরূপভাবে নক্ষত্রাদির প্রমাণ উপস্থাপন একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার; তা বস্তুজগতের উপর নক্ষত্রাদির বিশেষ প্রভাব থেকে সংঘটিত হয়। টলেমী বলেন, কারণ বস্তুজগতে চন্দ্র-সূর্যের ক্রিয়া ও প্রভাব একটি প্রকাশ্য ব্যাপার; কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। যেমন—সূর্য, ঋতু পরিবর্তন, তার বৈশিষ্ট্য গঠন এবং ফল-মূল ও

www.amarboi.org

শস্যাদির পক্কতা সাধন, ইত্যাকার ব্যাপারে সক্রিয়তা দেখিয়ে থাকে। যেমন চন্দ্রের ক্রিয়া আর্দ্রতা সৃষ্টি, জলীয় উপাদান বৃদ্ধি দূষিত আবর্জনাদির পচন ও শস্য-কুষ্মাণ্ডাদির ফলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে যুক্ত হয়।

অতঃপর টলেমী বলেন, এ দুটি ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের সামনে দুটি পথ বিদ্যমান। এদের একটি হল এ প্রসঙ্গে শিল্পবিশারদের কাছ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া। অবশ্য এতে আত্মার তৃপ্তি ঘটে না। অন্য পথটি হল সংযোগ সাধন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিটি নক্ষত্রকে সেই মহা-জ্যোতিষ্কের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অনুমান করা, যার শক্তি ও প্রভাবের সমুদয় ব্যাপারই আমরা প্রকাশ্যভাবে জানতে পেরেছি। সুতরাং আমরা লক্ষ করতে পারি যে, তার নৈকট্য লাভে নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় কিনা। যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে তার সাথে নক্ষত্রাদির সামঞ্জস্য প্রমাণিত হবে। অন্যদিকে যদি অনুরূপ নৈকট্যের ফলে শক্তি ও প্রভাব হ্রাস পায়, তাহলে তাদের প্রকৃতির বিরোধিতাই প্রতিপন্ন হবে। এর পর আমরা যখন নক্ষত্রাদির ব্যষ্টিগত শক্তিকে জানতে পারব, তখন আমাদের পক্ষে তাদের সমষ্টিগত শক্তিকেও জানা সম্ভব হবে। এটা তাদেরকে তাদের ত্রয়ী, চতুরঙ্গী ও অন্যবিধ গঠিত প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যেতে পারে। তদুপরি এ জ্ঞান মহা-জ্যোতিষ্কের সাথে রাশিচক্রের প্রাকৃতিক উপাদান থেকেও আহৃত হতে পারে।

যখন আমরা সামগ্রিকভাবে নক্ষত্রাদির শক্তি জানতে পারি, তখন দেখি যে, তারা বায়ুতে প্রভাবশীল এবং এ ব্যাপারটি একান্তই প্রকাশ্য। এর ফলে বায়ুতে যে মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, তা তার অধীনস্থ সৃজ্যমান বস্তুপুঞ্জেও সংক্রমিত হয়ে থাকে। তার দ্বারাই বীর্য ও বীজের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তজ্জাত দেহে যেমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তেমনি তৎসংশ্লিষ্ট জীবাত্মা তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ ও অন্যান্য গুণাবলি অর্জন করে থাকে এবং উক্ত দেহ ও জীবাত্মাকে অনুসরণকারী অবস্থাসমূহও এসে উপস্থিত হয়। কারণ বীর্য ও বীজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তা তজ্জাত ও তজ্জনিত বস্তুতে সংক্রমিত হয়।

টলেমী বলেন, এতদসত্ত্বেও তা ধারণামাত্র; তাতে বিশ্বাসের কোনো অবকাশ নেই এবং তা ঐশী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভাগ্যের ব্যাপারও নয়। তা একমাত্র সৃজ্যমান বস্তুর সামগ্রিক কার্য-কারণের অংশবিশেষ হতে পারে। অথচ ঐশী সিদ্ধান্ত সব বস্তুর পূর্ববর্তী। টলেমী ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য এটার সংক্ষিপ্ত-সার। এটা তাঁর 'চতুর্বর্গ' ও অন্যান্য গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকেই এ শিল্পের উপলব্ধিগত দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এটা এ যে, এই শিল্প সম্পর্কে কোনো প্রকার সম্ভাব্য জ্ঞান অথবা ধারণা তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব, যখন তা তার সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কার্যকারণ তথা কারক, গ্রাহক, আকার ও উদ্দেশ্যসহ জ্ঞাত হবে; যেমন যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বর্ণনা অনুসারে নক্ষত্রাদির শক্তি কারকমাত্র এবং বস্তুর একাংশ তার গ্রাহক। তদুপরি নক্ষত্রাদির এ শক্তি সামগ্রিক কারকতার অধিকারী নয়; বরং বস্তুর উপাদানে তার সাথে অন্য শক্তিও কারকরূপে বিদ্যমান। যেমন পিতার জন্য জন্মদানের শক্তি, বীর্যের

www.amarboi.org

মধ্যকার বৈশিষ্ট্যের শক্তি এবং প্রতিটি প্রজাতিকে পরস্পর পৃথক করার বিশেষ শক্তি। এছাড়াও অন্যান্য শক্তি বিদ্যমান।

বস্তুত নক্ষত্রাদির শক্তি যখন পূর্ণতা লাভ করে এবং তার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, তখনও একমাত্র এটাই জানা যায় যে, তা সম্ভাব্য বস্তুর সামগ্রিক কার্য-কারণের একটি অংশ। তারপর এ নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবজনিত জ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার শর্ত আরোপ করা হয় এবং বলতে গেলে তখনই সম্ভাব্য বস্তু সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়া মূলত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মননের শক্তি মাত্র; তা সম্ভাব্য বস্তুর কার্যকারণও নয় এবং শিল্পের ভিত্তিও নয়। সুতরাং এ সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার অভাব ঘটলে তার ধারণা সৃষ্টির পর্যায়ে সন্দেহের নিম্নস্তরে নেমে আসে। তদুপরি এরূপ ধারণা সৃষ্টি তখনই সম্ভব, যখন কোনো প্রকার বিপত্তি ছাড়া নক্ষত্রাদির শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জিত হয়। অথচ এটা এক আয়াসসাধ্য ব্যাপার; এর জন্য নক্ষত্রাদির গতিশীল অবস্থায় তাদের আবর্তনের সংখ্যা জানতে হয়। এবং এর মাধ্যমে তাদের গঠনপ্রকৃতিও জানতে হয়। কারণ প্রতিটি নক্ষত্রের বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে প্রমাণের একান্ত অভাব।

অতএব সূর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে টলেমী পাঁচটি গ্রহের শক্তির প্রতিষ্ঠাদানের যে উপলব্ধিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন, তা একান্তই দুর্বল। কারণ সূর্যের শক্তি সমুদয় নাক্ষত্রিক শক্তির উপর প্রভাবশীল ও আধিপত্য বিস্তারকারী। সুতরাং তাঁর বক্তব্যানুসারে তাদের সাহচর্যে সূর্যের শক্তিমত্তার হ্রাস-বৃদ্ধি জানার সম্ভাবনা খুবই অল্প। বস্তুত এসব বিষয়ই বস্তুজগতে সংঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে উক্ত শিল্পের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, তার সমালোচনার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি নিম্নজগতের উপর নক্ষত্রাদির প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটিও প্রমাণসিদ্ধ নয়। পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে একত্ববাদের অধ্যায়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো কর্তা নেই। এ প্রসঙ্গে কালামশাস্ত্রবিদগণ যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তার বর্ণনা প্রদানও নিষ্প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেছেন, কার্যের সাথে কারণের সংযোগের বিষয়টি অজ্ঞাত পর্যায়ের এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুদ্ধি এ ব্যাপারে প্রভাব সম্পর্কীয় যে মত প্রকাশ করে থাকে, তাও সন্দেহমুক্ত নয়। সম্ভবত এ কার্যকারণ সংযুক্তি সুপরিচিত প্রভাব প্রক্রিয়ার অতীত কোনো বিষয়। ঐশী মহিমাই এদুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী; যেমন উর্ধ্ব ও নিম্নের সমুদয় সম্ভাবনার মধ্যেই তা সংযোগস্থাপন করে থাকে। বিশেষত ধর্মীয় বিধানসমূহ সংঘটিতব্য বিষয়কেই মহান আল্লাহ্র মহিমার সাথে সংযুক্ত করে এবং অন্যসব শক্তি থেকেই তার মুক্তির কথা বলে।

নবুয়তও নক্ষত্রাদির শক্তিমত্তা ও প্রভাবকে স্বীকার করে না। ধর্মীয় বিধানের বক্তব্য এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করছে। যেমন হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'কারও মৃত্যু বা জন্মের জন্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না।'[৩৪২] তিনি অন্যত্র বলেছেন, (আল্লাহ্ বলেন,) 'আমার বান্দাদের অনেকেই আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং অনেকেই আমাকে অস্বীকারকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বলেছে—আল্লাহ্র দয়ায় ও কৃপায় আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে,

৩৪২. বোখারী (১ম খণ্ড)।

www.amarboi.org

তারা আমার প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং নক্ষত্রাদিকে অস্বীকার করেছে। আবার যারা বলেছে—অমুক নক্ষত্র সংযোগে আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং নক্ষত্রাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'[৩৪৩] হাদীসটি শুদ্ধ।

পাঠক, ধর্মীয় বিধানের দিক থেকে এ শিল্পের অসারত্বের বিষয়টি আপনার সামনে পরিস্ফুট হয়েছে। এর সঙ্গে উপলব্ধিগত দুর্বলতাকে যোগ করলে বুদ্ধির কাছেও এটা দুর্বল। তদুপরি এর ফলে মানব সভ্যতায় যে অপকারিতার সঞ্চার হয়, তাও যোগ করতে হবে। এর ফলে সাধারণের ধ্যান-ধারণায় বিকৃতি দেখা দেয়। কারণ কখনও হঠাৎ উক্ত শিল্পজাত সিদ্ধান্ত আকস্মিকতার জন্য সত্য হয়ে দেখা দিলে কোনো প্রকার বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই অজ্ঞলোকেরা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার সমস্ত বিধি-বিধানকেই অকট্য সত্য বলে ভাবতে থাকে। অথচ আদৌ তা নয়। এর ফলে তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে এড়িয়ে অন্যের প্রতি তার সংগঠনের ক্ষমতা আরোপ করে। এ ছাড়াও এ শিল্পচর্চার ফলে অধিকাংশ সময় সাম্রাজ্যে দুর্যোগের প্রত্যাশা দেখা দেয় এবং এ প্রত্যাশা সাম্রাজ্যের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষাকারী শত্রুদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আমরা এমন বহু ঘটনা দেখেছি। সুতরাং ধর্ম ও সাম্রাজ্য উভয়ের ক্ষেত্রে এ শিল্প যে পরিমাণ অপকার সাধন করে, তার প্রতি লক্ষ রেখে সমগ্র মানব সমাজেই তা নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এর ফলে এ শিল্পটির স্বাভাবিক অস্তিত্ব এবং মানুষের নিজস্ব উপলব্ধি ও জ্ঞান অনুসারে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি হবে না। কারণ ভালো ও মন্দ এমন দুটি প্রাকৃতিক বিষয়, যা পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান; তাদের উৎখাত সম্ভব নয়। একমাত্র তাদের অর্জনের ব্যাপারেই দায়িত্বজ্ঞানে পরিচয় দাবি করা হয়। সুতরাং এটা সুনির্দিষ্ট যে, কার্যকারণসহ কল্যাণকে অর্জন করতে হবে এবং অকল্যাণ ও অপকারকে তাদের কার্যকারণসহ বিদূরিত করতে হবে। যে ব্যক্তি এ শিল্প-সম্পদকে জানেন এবং তাদের অপকারিতা সম্বন্ধে বুঝেন, তাঁর উপর এ দায়িত্ব অবশ্য বর্তাচ্ছে।

এ বক্তব্য থেকে এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও এ শিল্পজ্ঞানটি অস্তিত্বের দিক থেকে যথার্থ, তবুও মুসলমানদের মধ্যে কারো পক্ষে তার চর্চা ও তার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব নয়। বরং যদি কোনো ব্যক্তি তাতে অনুসন্ধিৎসু হয় এবং তার সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণা পোষণ করে, তাহলে বলতে হবে প্রকৃত প্রস্তাবে সে একান্তই অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। কারণ ধর্মীয় বিধান উক্ত শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাকে নিষিদ্ধ করার ফলে সমাজজীবনে তার চর্চা ও তার শিক্ষার জন্য একত্রে বসা ও আলোচনাচক্রের বিষয়টি বিলীন হয়ে গেছে। এখনও যারা তার প্রতি আসক্তি পোষণ করছে, তাদের সংখ্যা একান্তই স্বল্প, বরং স্বল্প থেকে স্বল্পতর। তারা শুধু তার গ্রন্থাদি ও লিখিত আলোচনা নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের ভগ্নগৃহের কোণে সময় কাটায়। তাদের এমন নির্জন পাঠও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি প্রহরার অতীত নয়। অথচ জ্যোতিষশিল্প একটি জটিল বিষয়। এর শাখা-প্রশাখা অনেক এবং অনেকস্থানেই দুর্বোধ্যতার দ্বারা আবৃত। সুতরাং এমতাবস্থায় তার যোগ্যতা অর্জন কি করে সম্ভবপর?

৩৪৩. বোখারী (১ম খণ্ড)।

www.amarboi.org

এখানে আমরা ফেকাহ্‌শাস্ত্রকে দেখতে পাই; তার উপকারিতা ধর্ম ও সংসার উভয়কে বেষ্টন করে আছে; তার শিক্ষাও কুরআন ও হাদীসের ধারায় খুবই সহজ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ তার অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত। তবুও তার বিচার-বিবেচনা ও সংগ্রহকরণ, তার দীর্ঘকালীন পঠন-পাঠন এবং তার বৈচিত্র্য ও বহুবিধ আলোচনাচক্রে যোগদান করে তাতে যুগ ও পুরুষানুক্রমে একজনের পর একজন মাত্র দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সুতরাং যে শাস্ত্র ধর্মীয় বিধানে পরিত্যক্ত, যার সামনে নিষিদ্ধতা ও বাধার প্রাচীর দণ্ডায়মান, যা সাধারণ মানুষের কাছে গুপ্ত, যার উৎসমূল অত্যন্ত জটিল এবং যার মৌলিক ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখাকে অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করার পরও অতিরিক্ত সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির যোগ্যতা বাড়াতে হয়; তার শিক্ষালাভের সুযোগ কীভাবে ঘটতে পারে! কীভাবেই বা এসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা অর্জন ও তাতে দক্ষতা লাভ হতে পারে! যারা অনুরূপ দক্ষতার দাবি করেন, পরিণামে তাদের সেই দাবি অসার বলে গণ্য হয়। কারণ এর যোগ্য কোনো প্রমাণ তারা উপস্থিত করতে পারেন না। আর পারার কোনো কথাও নয়; মুসলমানদের মধ্যে এ শাস্ত্রের বিরলত্ব এবং তার ধারক ও বাহকদের স্বল্পতাই এর প্রমাণ বহন করে। পাঠক, এসব বিষয় বিবেচনা করুন, তা হলেই আমাদের উপরোক্ত মতামতের বিশুদ্ধতা আপনার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ অদৃশ্য বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী; তিনি তাঁর অদৃশ্য রহস্য কাউকেও অবগত হতে দেন না।[৩৪৪]

আমাদের সমসাময়িক সহচরদের অনেকেই অনুরূপ তাৎপর্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সম্রাট আবুল হাসানের সৈন্যদলকে আরব বেদুইনরা পরাজিত করে কায়রোয়ানে অবরুদ্ধ করে ফেললে[৩৪৫] বন্ধু ও শত্রু উভয় শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থা লক্ষ করে তিউনিসের কবিদের অন্যতম আবুল কাসেম আর্‌রুহী বলেছেন :

আমি সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি;
জীবনের সুখ শান্তি সবই অপগত।
এ তিউনিসে প্রভাত ও সন্ধ্যা যাপন করছি
এবং এ প্রভাত ও সন্ধ্যা সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।
এখানে ভীতি, ক্ষুধা ও মৃত্যুর তাণ্ডব—
গোলযোগ ও মহামারীর দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।
মানুষ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত—
বিদ্রোহ কি কখনও সুফল জন্ম দিয়েছে!
আহমদের অনুসারীরা আলীর জন্য ভাবছে,
তার ধ্বংস ও বিনাশ সাধিত হয়েছে।
অন্যেরা বলছে, সে অচিরেই আসবে
তোমাদের কাছে মৃদুমন্দ বায়ুর সঙ্গী হয়ে।
আল্লাহ্ এদের ও তাদের উপরে থেকে
তাঁর ইচ্ছামত নিজ বান্দাদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

৩৪৪. কোরান; ৭২, ২৬।
৩৪৫. এ ঘটনাটি ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

www.amarboi.org

হে, পলায়নপর ধাবমান নক্ষত্র পর্যবেক্ষণকারী!
এসব আকাশীর শক্তি কী করছে?
তোমরা আমাদেরকে দূরে সরিয়ে ভাবছিলে
অবশ্যই তোমরা আজ সত্য হয়ে দেখা দিবে।
কিন্তু বৃহস্পতিবারের পর বৃহস্পতিবার গেছে
এবং শনিবার ও বুধবারও এসেছে।
মাসার্ধ, তার দ্বিতীয় দশমাংশ এবং
তৃতীয় দশমাংশকেও সমাপ্তি টেনে নিয়েছে।
আমরা মিথ্যার জঘন্যতা ছাড়া অন্য কিছু দেখি নি;
এটা কি নির্বুদ্ধিতা, না ব্যাপক ষড়যন্ত্র?
আমরা আল্লাহ্রই এবং এটাই জেনেছি যে,
ভাগ্য কখনও প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।
আমি আল্লাহ্কেই আমার উপাস্য মেনে সন্তুষ্ট;
তোমাদের জন্য চন্দ্র ও সূর্যই যথেষ্ট।
এসব ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র—
এরা দাস-দাসী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।
তারা ভাগ্যের অধীন; কারও ভাগ্য নির্ধারক নয়;
এ পৃথিবীতে কোনো কিছু নির্ধারণ করার শক্তি তাদের নেই।
বুদ্ধি বিপথগামী তার প্রাচীনত্বের মধ্যে,
যার অবস্থা পাপ ও বিনষ্টির অধীন।
সে বস্তুজগতে একটি প্রকৃতিকে বিচারক করেছে,
তাকে জল ও বায়ু জন্ম দিয়ে থাকে।
সে কি মিষ্টতার বিপরীতে তিক্ততাকে দেখে নি;
এ উভয়কেই তো জল ও মৃত্তিকা খাদ্য দিয়েছে।
আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক; আমি জানি না।
স্বয়ম্ভর অণুই বা কী, শূন্যতাই বা কী!
আমি সেই উপাদানকেও জানি না, যে চীৎকার করে বলে,
'আমি কোন আকার ছাড়া থাকতে পারি না।'
আমি অস্তিত্বও জানি না; অনস্তিত্বও জানি না;
প্রতিষ্ঠাতাও জানি না; বিনষ্টিও জানি না।
আমি উপার্জন কাকে বলে, তাও জানি না; অবশ্য
ক্রয়-বিক্রয় থেকে যে উপার্জন হয়, তা জানি।
আমার অনুসৃত মত ও আচরিত ধর্ম তা-ই,
যখন সব মানুষ পুণ্যাত্মারূপে বিরাজমান ছিল।
তখন ব্যাখ্যা ছিল না, মূলনীতিও ছিল না,
এ বাক্বিতণ্ডাও ছিল না, আর দ্বিধা-সন্দেহও ছিল না।
পূর্বসূরিগণ যা অনুসরণ করেছেন, আমরা সেই পদাঙ্ক অনুসরণকারী;
আহা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কতই না উত্তম!
তাঁরা তা-ই ছিলেন, যা সকলেই অবগত আছে;
তাঁদের সময়ে এরূপ হট্টগোল ছিল না।
হে, এ যুগের আশায়েরাগণ! আমাকে
এ শীত, এ গ্রীষ্ম বোধশক্তি দান করেছে।

www.amarboi.org

আমি মন্দের প্রতিদানে মন্দই দিয়ে থাকি
এবং ভালোর প্রতিদান ভালো বলেই জানি।
আমি যদিও বা সম্পূর্ণ অনুগত নই,
তবুও আমি অবাধ্য নই; কাজেই আমার আশা আছে।
আমি এক মহান স্রষ্টার আজ্ঞাবহ,
আকাশ ও পৃথিবী যার আজ্ঞা পালন করছে।
এটা তোমাদের সহায়তার গুণে নয়; বরং
এক মহান নির্দেশ ও নির্ধারণই তাদেরকে পরিচালিত করে।
আশআরীকে যদি তাদের সম্পর্কে বলা হত,
বর্তমানকালে যারা তাঁর মতের অনুসরণ করে;
তাহলে তিনি বলতেন, তাদেরকে বলে দাও, আমি
তারা যা কিছু বলে, সে সম্পর্কে দায়িত্বমুক্ত।

www.amarboi.org

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[কিমিয়াশাস্ত্রের ফলাফলের অস্বীকৃতি, তার অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা এবং তার চর্চার ফলে সংঘটমান বিকার-বিকৃতি]

পাঠক, জেনে রাখুন, জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকাংশকেই এক দারুণ লোভ এসব শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করে। তারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, জীবিকা অর্জনের বিচিত্র কৌশল ও পন্থার এটাও একটি এবং এটার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ। এর ফলে তারা অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট, অমানুষিক পরিশ্রম এবং শাসকবর্গের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে থাকেন। তদুপরি তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেন, তার অতিরিক্ত ক্ষতি তাদেরকে সহ্য করতে হয় এবং পরিণামে নৈরাশ্যের কবলে পড়ে অতিশয় যাতনা ভোগ করেন। অথচ তাদের ধারণা এই যে তারা একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। একমাত্র এ ধারণাই তাদেরকে অনুরূপ লোভের বশবর্তী করে যে, খনিজ পদার্থ বিশ্লেষিত হয় এবং তাদের মধ্যকার মিশ্রিত উপাদানের জন্য একে অন্যে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এর ফলে তারা নানাবিধ রৌপ্যকে স্বর্ণে এবং তাম্র ও টিনকে রৌপ্যে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাদের ধারণা, এটা প্রকৃতির সম্ভাব্য বস্তুপুঞ্জের অন্যতম। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রক্রিয়াগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কারণ এ প্রসঙ্গে প্রচেষ্টা ও তার আকার-প্রকার নিয়ে তাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য রয়েছে। তদুপরি এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য উপাদান নিয়েও তাদের মতানৈক্যের অন্ত নেই। তারা এটাকে 'মহান প্রস্তর' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এটা কি মলমূত্র, রক্ত, কেশ, ডিম্ব অথবা এরূপ বা ঐরূপ অন্য কোনো কিছু?

তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার স্বরূপ হল উপাদান নির্দিষ্ট করার পর তাকে একটি নিরেট ও মসৃণ প্রস্তরের উপর রেখে মুষল দ্বারা চূর্ণ করতে হবে এবং এরূপ চূর্ণীকরণের পর্যায়ে জল দ্বারা আর্দ্রতা বাড়াতে হবে। তারপর তার সাথে উদ্দেশ্য অনুসারে বিভিন্ন জড়িবটী ও ঔষধি মিশালে তার মধ্যে এমন একটি শক্তি উৎপন্ন হবে, যা উদ্দিষ্ট খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এর পর এ মিশ্রণকে জল দ্বারা আর্দ্র করে রৌদ্রে শুকাতে হবে, আগুনে জ্বাল দিতে হবে, উর্ধ্বপাতন করতে হবে অথবা বিশুদ্ধ করে ফেলতে হবে; যাতে তার মধ্যকার জলীয় ও মৃন্ময় উপাদান দূরীভূত হয়ে যায়। যখন তা এমন সব প্রক্রিয়াগত প্রচেষ্টার সাথে মিলবে এবং শিল্পের পদ্ধতি অনুসারে করণীয় সব কিছু পূর্ণ হবে, তখন তার দ্বারা যে মৃন্ময় অথবা জলীয় উপাদান অর্জিত হবে, তাকে তারা—

www.amarboi.org

'একসির' বলে অভিহিত করেন। তাদের ধারণা এ একসিরকে আগুনে উত্তপ্ত রৌপ্যের মধ্যে ঢাললে তা স্বর্ণে পরিণত হবে অথবা অগ্নিতে উত্তপ্ত তাম্রের উপর নিক্ষেপ করলে রৌপ্যে পরিণত হবে। এভাবে তা প্রক্রিয়াগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বাস্তবায়িত হবে।

তাদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ 'একসির'টি মৌলিক উপাদানের দ্বারা গঠিত এক মিশ্র বস্তু। অনুরূপ বিশেষ ঔষধি ও প্রচেষ্টার ফলে তাতে এমন একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক মিশ্রণের উদ্ভব ঘটে, যা তাকে উক্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রূপান্তরিত করে, তার মিশ্রণ ও আকৃতির পরিবর্তন সাধন করে এবং তাতে অর্জিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার শক্তি ও অবস্থাকে জাগিয়ে দেয়। যেমন রুটি তৈরির জন্য ব্যবহৃত খামির; তা গোলা ময়দাকে তার স্বরূপে পরিবর্তন করে তার মধ্যকার শিথিলতা ও স্ফীতাবস্থাকে প্রকট করে তোলে। যাতে পাকস্থলীতে তার পরিপাক সুসাধ্য হয় এবং অতিদ্রুত খাদ্যে পরিণত হতে পারে। এরূপই স্বর্ণ ও রৌপ্যের একসির তার মধ্যে খনিজ পদার্থের যে উপাদান বিদ্যমান, তাই অন্য ধাতব পদার্থকে তাদের দিকে আকর্ষণ করে এবং তাদের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে।

মোটামুটিভাবে এটাই তাদের ধারণার নির্গলিতার্থ। পাঠক, আপনি তাদেরকে এ প্রক্রিয়া সাধনে নিরত দেখতে পাবেন। তারা এর মাধ্যমে তাদের খাদ্য ও জীবিকা অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করছে। তারা তাদের পূর্ববর্তী শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাদি থেকে এর নিয়ম-পদ্ধতি লিখে নিচ্ছে এবং তা নিজেদের মধ্যে প্রচার করছে। তারা এগুলোর দুর্বোধ্যতা দূর করতে এবং রহস্য উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হচ্ছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো হেঁয়ালীর অনুরূপ। যেমন জাবের ইবনে হাইয়্যানের রচিত সত্তরটি পুস্তিকা, মাসলামা আল মজরিতীর গ্রন্থ 'রুতবাতুল হাকিম', আতুগরাই, আল মুগায়রিবী রচিত একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনা। কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও তার এগুলোর উপর আধিপত্য লাভ করতে পারছে না।

এ প্রসঙ্গে আমি একদিন আন্দালুসের উস্তাদশ্রেষ্ঠ আমাদের শিক্ষাগুরু আবুল বরাকাত আত্তালফিফিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং এ বিষয়ে কতিপয় রচনার সন্ধানও তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় এগুলো পরীক্ষা করে দেখার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বলেছেন, আমি এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারি যে, এ উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারী একমাত্র নৈরাশ্য নিয়েই তার ঘরে ফিরবে।

তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা একমাত্র জালিয়াতির মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে। কখনও এটা প্রকাশ্যে হয়; যেমন রৌপ্যকে স্বর্ণের আবরণে ও তাম্রকে রৌপ্যের আবরণে আচ্ছাদিত করা অথবা তাদেরকে এক, দুই ও তিন ভাগ পরিমাণ মিশিয়ে কোনো একটিতে রূপান্তরিত করা। আবার কখনও এটা গোপনে হয়; যেমন শিল্প-প্রক্রিয়ায় একটিকে অন্যটির অনুরূপ করে সজ্জিত করা। যেমন পারদের উর্ধ্বপাতনের দ্বারা তাম্রকে শুভ্রকোমল করে তোলা। ফলে তা এমন একটি খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত হবে, যা রৌপ্যের অনুরূপ। একমাত্র ধাতববিশারদ ছাড়া অন্যের পক্ষে তার স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। কাজেই এরূপ জালিয়াতরা তাদের জালিয়াতির দ্বারা এমন

www.amarboi.org

মুদ্রা প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়, যার উপর শাসকবর্গের সীলমোহর প্রয়োগ করে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে চালু করে এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ মুদ্রা বলে ধোকা দেয়। বস্তুত এরা পেশার দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট এবং পরিণামের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি। কারণ এরা মানুষের সম্পদ অপহরণের সাথে তাদের এ পেশাকে ঘুলিয়ে ফেলেছে। কেননা এ জালিয়াতরা রূপা বলতে তামা ও সোনা বলতে একমাত্র রূপা দিয়ে তার পরিবর্তে খাঁটি ধাতব মুদ্রা গ্রহণ করে। ফলে এরা শুধু চোর নয়, চোর থেকেও মন্দতর।

বর্তমানকালে মাগরিবে এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বারবার বিদ্যার্থী; তারা এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নির্বোধ লোকদের বাসস্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রান্তরের মসজিদগুলোতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে এরূপ ভাণ করে যে, তাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য তৈরির শিল্পজ্ঞান রয়েছে। বস্তুত মানুষ এ দুটি ধাতব পদার্থ সম্পর্কে লালসার অধীন এবং তা লাভ করার জন্য তাদের সম্পদ বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। ফলে এসব বিদ্যার্থী এর দ্বারা তাদের জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হয়। তারপর তারা ঐসব ব্যক্তির সন্নিধানে থেকে ভীতি ও প্রহরার মধ্যে কাজ চালিয়ে যায়। পরিণামে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে তারা অপমানিত হয়। তখন পুনরায় নতুন স্থানের সন্ধানে তারা বের হয়ে পড়ে এবং সংসারলোভীদের মধ্যে সম্পদ লাভের যে লালসা বিদ্যমান, তার সাহায্যে তাদের প্রতারণার জাল নতুনভাবে বিস্তার করে। এভাবেই তারা সর্বদা জীবিকা অন্বেষণ করে থাকে।

এ শ্রেণীর লোকদের সাথে আলোচনা করার কিছুই নেই। কারণ তারা মূর্খতা, অন্যায্যতা ও চৌর্যবৃত্তির চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এদের এ রোগ দূর করার একমাত্র পন্থা হল প্রশাসনিক কঠোরতা এবং যথাস্থান থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা ও তাদের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ অনুসারে তাদের হাত কেটে ফেলা। কারণ এদের এরূপ তৎপরতায় সেই মুদ্রামানের বিকৃতি ঘটে, যা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এ মুদ্রা সর্বসাধারণ মানুষের সম্পদের ভিত্তি। শাসকের উপর তার বিশুদ্ধতা রক্ষা, তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার বিকৃতিসাধকদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করার দায়িত্ব রয়েছে।

অবশ্য যারা এ শাস্ত্রকে চর্চার জন্য গ্রহণ করেছেন ও অনুরূপ জালিয়াতির সাথে যাদের কোনো সংস্রব নেই; বরং যারা এটা থেকে দূরে সরে থেকে মুসলমানদের সম্পদ ও মুদ্রা বিনষ্ট করা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রেখেছেন এবং যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের সংগৃহীত 'একসির' ও ঔষধির দ্বারা রৌপ্যকে স্বর্ণে ও তাম্র, সীসা, টিন ইত্যাদিকে রৌপ্যে পরিণত করা; তাদের সাথে আমাদের একমাত্র আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হল তাদের এ সম্পর্কীয় উপলব্ধির উৎস নিয়ে। কারণ তাদের অনুরূপ তৎপরতা সত্ত্বেও আমরা জানি যে, এ শাস্ত্রবিদদের কারো জন্য তার উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং কামনা সিদ্ধ হয়নি। তাদের জীবন একমাত্র এ প্রচেষ্টা, মুষল ও মুদগর ব্যবহার, উর্ধ্বপাতন, উত্তাপন এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জড়িবটী সংগ্রহ ও তাদের আলোচনাতে কেটেছে। তারা এ প্রসঙ্গে অপরের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করেন; এমন অনেক ব্যক্তির কথা যাদের জীবনে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে এবং যাদের অনুরূপ কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে। এসব কথা শুনে তারা তৃপ্ত

www.amarboi.org

হন এবং আরও বেশি করে তাতে মনোনিবেশ করেন। এ ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না; এটা যেন বিচিত্র কাহিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হতবুদ্ধি মানুষের অবস্থা। তাদেরকে এসব বিষয়ের যথার্থতা সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণের কথা বললে তারা অস্বীকার করে এবং বিনা দ্বিধায় বলে, আমরা দেখিনি, শুনেছি মাত্র। প্রত্যেক যুগ ও পুরুষানুক্রমে এটাই তাদের অবস্থা!

পাঠক, জেনে রাখুন, এ শিল্পের চর্চা পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের অনেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত উদ্ধৃত করব এবং তারপর তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার যথার্থতা সম্পর্কে যা প্রকাশ পাবে, তা অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। সুতরাং আমরা বলি যে, দার্শনিকদের কাছে এ শিল্পের আলোচনার ভিত্তি হল সাতটি ঘাতসহ ধাতব পদার্থের অবস্থা; এরা স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, টিন, তাম্র, লৌহ ও 'খারসিন'। এরা কি এদের বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন ও এদের বিশিষ্ট উপাদানসহ স্বয়ম্ভর অথবা এরা একটি ধাতবগোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও এদের অবস্থা বৈগুণ্যের জন্য বৈচিত্র্যের অধিকারী? এ প্রসঙ্গে আবু নসর ফারাবী ও তাঁর অনুসারী আন্দালুসীয় দার্শনিকরা যে মত গ্রহণ করেছেন, তা হল এই যে, এরা একই ধাতব প্রজাতির অধীন এবং একমাত্র অবস্থা বৈগুণ্যেই এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে আর্দ্রতা, শুষ্কতা, কোমলতা, কাঠিন্য এবং পীত, শুভ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণের বৈচিত্র্য। মূলত একই প্রজাতির প্রকারভেদ মাত্র। অন্যদিকে ইবনে সিনা ও তার অনুসারী পূর্বাঞ্চলীয় দার্শনিকরা এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা হল এই যে, এরা এদের বৈশিষ্ট্যসহ-ই বিভিন্ন এবং বিচিত্র প্রজাতি মাত্র। এদের প্রতিটি স্বয়ম্ভর ও নিজ নিজ তাৎপর্যসহ অস্তিত্ববান এবং এদের প্রতিটির জন্যই অন্যান্য প্রজাতির ন্যায় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ফারাবী তার নিজস্ব মত, সামগ্রিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করেই এদের একটির অপরটিতে রূপান্তরিত হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। কেননা এদের গঠনগত উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব এবং শিল্প-কৌশলের মাধ্যমে অনুরূপ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এদিক থেকেই কিমিয়াশাস্ত্র তাঁর কাছে সম্ভাব্য বাস্তবতা ও সহজ উৎসের অধিকারী। অন্যদিকে ইবনে সিনা তাঁর নিজস্ব মত, এদের প্রজাতিগত বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে এ শিল্পের সম্ভাব্যতা অস্বীকার এবং তার অস্তিত্ব অসম্ভব বলে মনে করেছেন। কারণ কোনো প্রকার শিল্পকৌশলের দ্বারা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তা একমাত্র বস্তুপুঞ্জের স্রষ্টার দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে; অর্থাৎ তার নির্ধারণকারী সেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্। তদুপরি এসব বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যের দিক থেকে ধারণার ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়। সুতরাং কোনো প্রকার শিল্পের দ্বারা তাদের পরিবর্তন কী করে সম্ভব হতে পারে?

তুগরাই, এ শিল্পের একজন নেতৃস্থানীয় দার্শনিক। তিনি ইবনে সিনার উপরোক্ত বক্তব্যের ভ্রান্তি প্রমাণ করে বলেছেন, শিল্প-কৌশলের এ প্রচেষ্টার দ্বারা এদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ও তার অভিনবত্ব উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা শুধুমাত্র বস্তুকে তার বৈশিষ্ট্য গ্রহণে প্রস্তুত করা। বস্তুত এ বৈশিষ্ট্য বস্তুর স্রষ্টা ও উদ্ভাবকের কাছ থেকে অনুরূপ প্রস্তুতির পরই

www.amarboi.org

অস্তিত্বে আসে। যেমন দেহকে মসৃণ ও চাকচিক্যমণ্ডিত করার পর তা থেকে আলোক বিকীর্ণ হয়। এজন্যই সে সম্পর্কীয় ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।

তুগরাই বলেছেন, আমরা কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ছাড়াই কতিপয় প্রাণীর জন্মের কথা জানতে পেরেছি। যেমন মাটি ও আবর্জনা থেকে বৃশ্চিক এবং চুল থেকে সাপের জন্ম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কৃষিবিশারদরা যেমন বর্ণনা করেছেন যে, মধুমক্ষিকা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে গোবৎসাদি থেকে এর জন্ম সম্ভব হয়। যেমন বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর শৃঙ্গ থেকে খাগড়ার উদ্ভব এবং অনুরূপ শৃঙ্গাদি রোপণের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে তাতে মধুপূর্ণ করলে তা ইক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমাদের জন্য অনুরূপভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বাধা কোথায়![৩৪৬] সেখানে বস্তুসত্তাকে গ্রহণ করে কৌশলের মাধ্যমে তাতে অবস্থিত প্রাথমিক যোগ্যতাতেই স্বর্ণ-রৌপ্যের আকৃতি ধারণের দিকে পরিচালিত করতে হবে। তারপর ঔষধি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সে তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে।

তুগরাই-এর বক্তব্যের মর্মার্থমূলক উদ্ধৃতির এখানেই ইতি। তিনি ইবনে সিনার প্রতিবাদে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের জন্য এ শিল্পচর্চাকারীদের প্রতিবাদ করার উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার দ্বারা শুধু তুগরাই বা ইবনে সিনা নয়; বরং এ শিল্পের অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতাসহ সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার মতামতই অসার বলে প্রতিপন্ন হবে।

তা এই যে, তাদের কৌশলের নির্গলিতার্থ হল তারা প্রাথমিক যোগ্যতাসহ একটি বস্তুসত্তা সম্পর্কে অবগত হবার পর তাকে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং তার উপর সমুদয় প্রচেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ করে তাকে খনিজ ধাতব পদার্থের সৃজনধারার অনুসারী করেন; ফলে তা স্বর্ণ বা রৌপ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে খনিতে ধাতু সৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন মাত্র। কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্তার শক্তি বৃদ্ধিতে ক্রিয়া স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বর্ণখনিতে স্বর্ণের জন্ম হতে একটি বৃহৎ সূর্যাবর্তন তথা এক সহস্র আশি বছরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং কৌশলের মধ্য দিয়ে যদি শক্তি বৃদ্ধি ও অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, তাহলে আমাদের পূর্ব বক্তব্য অনুসারে উক্ত সময়ের পরিমাণ অবশ্যই কমে আসবে। অথবা শাস্ত্রবিদরা তাদের কৌশলের মাধ্যমে বস্তুসত্তার জন্য এমন একটি মিশ্র আকৃতির জন্ম দিবেন যা তাকে খামিরের ন্যায় সম্ভাবনাময় করে তুলবে। ফলে তার অন্তর্নিহীত শক্তিই কৌশলগত বস্তুর মধ্যে রূপান্তরকরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এটাই পূর্ববর্ণিত 'একসির'।

পাঠক, জেনে রাখুন, প্রতিটি উপাদানগত সৃজ্যমান বস্তুর মধ্যে তারতম্যানুসারে চারটি মৌল উপাদানের একত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ তারা যদি সমপরিমাণে অবস্থান করে, তাহলে মিশ্রণ কখনও সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে যে-কোন একটি অংশের সমগ্রের উপর প্রভাবশীল হতে হবে। অন্যদিকে প্রতিটি মিশ্রিত সৃজ্যমান বস্তুর

৩৪৬. রোজেনথালে স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে খনিজ পদার্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

মধ্যে স্বাভাবিক উত্তাপ থাকা অত্যাবশ্যকীয়; বস্তুত তা-ই উক্ত বস্তুর সম্ভাবনার কর্মী ও তার আকৃতির রক্ষী। তারপর সময়ের মধ্যে সৃজ্যমান প্রতিটি বস্তুর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ক্রম থাকা প্রয়োজনীয় এবং সময় পরিধিতে তা এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে অতিক্রম করবে ও এভাবে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হবে। পাঠক, মানুষের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ক্রমের দিকে লক্ষ করুন। তা বীর্য, জমাট রক্ত, মাসংপিণ্ড, আকৃতি, ভ্রূণ, নবজাত, দুগ্ধপোষ্য ইত্যাদি হয়ে কীভাবে চরম সীমায় পৌঁছে? এর প্রতিটি পর্যায়ের অংশগত তারতম্য তাদের পরিমাণ ও অবস্থার দিক থেকে বিচিত্র। অন্যথায় এর প্রথম ও শেষ পর্যায়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকত না। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক উত্তাপও এর পর্যায়ানুক্রমে বিভিন্নতার অধিকারী। তারপর, পাঠক, আপনি স্বর্ণের ব্যাপারে তার খনিজ জীবনে এক সহস্র আশি বছর ধরে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এবং যেসব অবস্থাগত পরিবর্তনের অধীন হয়, তার প্রতি লক্ষ করুন। সুতরাং একজন কিমিয়াশাস্ত্রবিদের জন্যও তার খনিজ সৃজন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁর প্রচেষ্টা ও কৌশলের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণতার দিকে আকর্ষণ করতে হবে।

শিল্পকর্মের একটি চিরকালীন শর্ত হল তার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধন করা হবে, তার ধারণা করা। দার্শনিকদের মধ্যে এ প্রবাদটি অত্যন্ত সুপ্রচলিত যে, 'ক্রিয়ায় প্রারম্ভ চিন্তার শেষ এবং চিন্তার শেষ ক্রিয়ার প্রারম্ভ।' সুতরাং স্বর্ণের জন্যও তার প্রতিটি পর্যায়ের বিচিত্র অবস্থা ও বিভিন্ন অনুপাতের কথা ধারণা করে নিতে হবে এবং এ সঙ্গে তার স্বাভাবিক উত্তাপের পরিবর্তন ও পর্যায়গত সময়ের পরিধিও জেনে নেওয়া দরকার। এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার স্থানে কী পরিমাণ অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করলে তা গুণে ও ক্রিয়ায় খনির প্রকৃতিদত্ত শক্তির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে অথবা তার মধ্যকার কিছু উপাদানে এমন একটি মিশ্রিত আকৃতির সৃষ্টি হবে; যেমন রুটির জন্য খামিরের মধ্যে হয়ে থাকে। তা-ই এ সৃজ্যমান বস্তুর মধ্যে তার শক্তি ও পরিমাণ অনুসারে ক্রিয়াশীল হবে। এটা এমন সব ব্যাপারকে একমাত্র একটি ব্যাপক জ্ঞানই আয়ত্তে আনতে পারে এবং বাস্তবিকপক্ষে মানবিক জ্ঞানের পরিধি তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম। সুতরাং যারা এ শিল্প-কৌশলের দ্বারা স্বর্ণ উৎপাদনের দাবি করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবি শিল্প-কৌশলের দ্বারা হতে মানুষ উৎপাদনের দাবির সমতুল্য। যদি আমরা মেনে নিই যে, কোনো ব্যক্তি এ জন্মপ্রক্রিয়ার সমুদয় অংশ, অনুপাত, পর্যায়, জরায়ুতে ভ্রূণের সৃষ্টিধারা ইত্যাদি এমন ব্যাপকভাবে জানতে সমর্থ হয়েছে যে, তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনি, তাহলে আমরা তার জন্য এরূপ মানুষ সৃষ্টির কথাও মেনে নিতে পারি। কিন্তু কোথায় এরূপ ব্যাপক জ্ঞান!

আমরা এখানে উপরোক্ত প্রমাণের একটি সংক্ষিপ্ত-সার উপস্থিত করতে চাই, যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়। আমরা বলব, কিমিয়াশাস্ত্রের ফলশ্রুতি ও তার প্রতিক্রিয়াগত কৌশলের মাধ্যমে দার্শনিকগণ যে বিষয়টি দাবি করেছেন, তা হল এই যে, ধাতব পদার্থের প্রকৃতিদত্ত গঠন প্রক্রিয়াকে শিল্প-কৌশলের দ্বারা অনুসরণ করা এবং তাকে প্রকৃতির সমতুল্য করে তোলা। যাতে তা দিয়ে ধাতব পদার্থ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় অথবা শক্তি, ক্রিয়া ও আকৃতিসহ এমন একটি মিশ্রণের আবির্ভাব ঘটে, যা বস্তুর মধ্যে

www.amarboi.org

ক্রিয়াশীল হয়ে তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্প-কৌশলের এ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই ধাতব প্রকৃতির বিচিত্র অবস্থার অনুসরণ করতে হবে, যাতে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও সমতুল্য হওয়ার বিষয়টি সম্ভব হয়। অথবা এমন কোনো বস্তু উপাদান, যা সক্রিয় শক্তি বহন করছে। এসব কিছুর জন্য যে পর্যায়ক্রমিক ও বিস্তারিত ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তার অবস্থা বৈচিত্র্য সীমাহীন। মানুষের জ্ঞান তাকে সামগ্রিকতায় আয়ত্ত করতে একান্তই অক্ষম। তা মানুষ, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ সৃষ্টিরই সমতুল্য।

এটাই এ প্রমাণের নির্গলিতার্থ এবং আমার জ্ঞানমতে একান্তই অকাট্য। এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতা, তা বৈশিষ্ট্যের জন্য নয় যেমন, পাঠক, আপনি দেখতে পেয়েছেন; এমন কি প্রকৃতির জন্যও নয়। তা একমাত্র ব্যাপক জ্ঞানের অভাব ও সে সম্পর্কীয় মানুষের অক্ষমতার জন্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে সিনা যা বর্ণনা করেছেন, তা এ প্রমাণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতার অন্য একটি কারণ তার উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর বর্ণনা এই যে, স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিচক্ষণ কৌশল ও তাদের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তারা মানুষের উপার্জনের স্থির লক্ষ্য এবং তাদের সম্পদের নিদর্শন হতে পেরেছে। সুতরাং এগুলো যদি শিল্প-কৌশলের দ্বারা সুলভ হয়ে ওঠে, তাহলে এ সম্পর্কীয় আল্লাহ্‌র বিচক্ষণ নীতি অসার বলে প্রতিপন্ন হবে এবং তাদের প্রাচুর্যের ফলে কেউ কোনো কিছুর বিনিময়ে উক্ত দুটি ধাতব পদার্থ সঞ্চয় করতে চাইবে না। তার অসম্ভাব্যতার আরও একটি কারণ রয়েছে। এটা এই যে, প্রকৃতি কখনই তার ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিকটতম পন্থা ত্যাগ করে জটিল ও দূরতম পন্থা গ্রহণ করে না। সুতরাং তাদের ধারণা অনুসারে এ শিল্প-কৌশলের পন্থাই যদি বিশুদ্ধ, খনিজ প্রাকৃতির প্রক্রিয়া অপেক্ষা নিকটতর এবং সময়ের দিক থেকে স্বল্পতর হত, তাহলে প্রকৃতি তা ত্যাগ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের সৃষ্টি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পন্থা অনুসরণ করত না।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে তুগরাই বিভিন্ন একক বস্তুসত্তা থেকে প্রকৃতির প্রচেষ্টাগত উদ্ভাবনের যে উদাহরণ দিয়েছেন; যেমন—বৃশ্চিক, মধুমক্ষিকা, সর্প ইত্যাদির সৃষ্টি; তা তাঁর ধারা ও অভিজ্ঞতার পরিধি অনুসারে হয়ত সত্য হতে পারে; কিন্তু কিমিয়াশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তার চর্চাকারীদের মধ্যে কেউ একথা বলেননি যে, তিনি অনুরূপ কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, কিংবা তার পথের সন্ধান পেয়েছেন। বরং তার চর্চাকারীরা এ পর্যন্ত কানা উটনীর ন্যায় শুধু হাতড়িয়ে ফিরছেন। কেবল কিছুসংখ্যক মিথ্যা কাহিনীই তাদের প্রাপ্য হয়েছে। যদি এ বিষয়টি তাদের মধ্যে একজনের বেলাতেও সত্য হত, তা হলে তার সন্তান-সন্ততি, শিষ্যবর্গ ও সঙ্গীরা তা অবশ্যই সংরক্ষণ করত এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তা প্রসার লাভ করত। ফলে তার পরে অন্যান্যদের ক্রিয়া-পদ্ধতির বিশুদ্ধতা সেই প্রাপ্তির দায়িত্ব বহন করত এবং কালক্রমে তা আমাদের কাছে অথবা অন্যদের কাছে এসে উপনীত হত।

তাদের সেই বক্তব্য, একসির বলতে গেলে খামিরেরই সমতুল্য; তা এমন একটি মিশ্র উপাদান, যা তার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যকে স্বরূপে বাস্তবায়িত করে। পাঠক, জেনে রাখুন, খামির যে গোলা ময়দাকে পরিবর্তিত করে পরিপাকের জন্য প্রস্তুত করে, তা

www.amarboi.org

মূলত বিকৃতিসাধন মাত্র এবং বিকৃতি যে-কোনো বস্তুর জন্য অতিসহজ ব্যাপার; সামান্য ক্রিয়া ও প্রকৃতির চাপে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। অথচ একসির প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল ধাতুকে তার উন্নত ও শ্রেষ্ঠরূপে পরিবর্তিত করা। বস্তুত তা সৃষ্টি ও সংশোধন এবং সৃষ্টি সর্বদাই ধ্বংস অপেক্ষা কঠিন। সুতরাং একসিরকে খামিরের সাথে অনুমান করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে যথার্থ বক্তব্য হল এই যে, জাবের ইবনে হাইয়্যান, মাসলামা আল মজরিতী ও তাঁদের ন্যায় অন্যান্য দার্শনিক, যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের ধারণা অনুসারে যদি এ শাস্ত্রের অস্তিত্ব শুদ্ধ হয় তা হলেও তা প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত নয় এবং কোনো প্রকার শিল্প-কৌশল দ্বারা তা সম্পন্ন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তাদের আলোচনাও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ধারা অনুসারী নয়; বরং তারা যাদু ও অস্বাভাবিক ব্যাপার সম্পর্কীয় ধারা অনুসরণ করেই এর আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। এটা তাই, যা হাল্লাজ ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মাসলামা তাঁর 'গায়াত' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনাই উপস্থিত করেছেন। তাঁর 'রুতবাতুল হাকিম' গ্রন্থের আলোচনাও এ ধারাবাহী। জাবের তাঁর পুস্তিকাগুলোতেও এ ধারারই অনুসরণ করেছেন। তাদের এরূপ আলোচনা সকলের কাছেই সুপরিচিত; সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

মোটামুটিভাবে এ বিষয়টি তাদের কাছে সেসব সার্বিক বস্তুসত্তার অন্তর্গত, যা শিল্পকর্মের আওতার বাইরে অবস্থান করে। এ কারণেই অনুরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন এক দিনে বা এক মাসে কোনো বৃক্ষ ও প্রাণী সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি স্বর্ণের উপাদান থেকেও এক দিনে বা এক মাসে স্বর্ণ তৈরি করা সম্ভব নয়। বস্তুত তাদের প্রাকৃতিক গঠনপ্রক্রিয়া একমাত্র এমন কিছুর দ্বারাই পরিবর্তন করা সম্ভব, যা প্রকৃতির ও শিল্পের কৃৎ-কৌশল বহির্ভূত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিমিয়াশাস্ত্রকে শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণ করে, সে তার সম্পদ ও শক্তি বিনাশ করে মাত্র। এজন্যই এরূপ শিল্প প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তার দ্বারা যদি অভীষ্ট লাভ ঘটেও, তা হলেও তা প্রকৃতি ও শিল্প প্রক্রিয়ার বহির্ভূত কোনো কারণেই ঘটবে। যেমন—জলের উপর হাঁটা, বায়ুতে ভাসমান হওয়া, নিরেট বস্তুতে প্রবেশ করা এবং অনুরূপ অন্যান্য ঘটনা, যা স্বভাবের বিরোধী হয়ে পুণ্যাত্মাদের বিভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়। অথবা যেমন পাখি সৃষ্টি ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় নবীদের অলৌকিক ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তুমি যখন মৃত্তিকা থেকে আমার নির্দেশে একটি পাখির মূর্তি প্রস্তুত করলে; তারপর তাতে ফুৎকার দিলে, তখন তা আমার নির্দেশেই পাখি হয়ে উঠল'।[৩৪৭] এমন কাজ সহজ হওয়ার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় তা এমন যোগ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করা হয়, যিনি অপরকে সেই ক্ষমতা দান করেন এবং এই অপর ব্যক্তি তা ধার হিসেবে ভোগ করে থাকেন। আবার অনেক সময় এমন যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, যিনি দান করার ক্ষমতা রাখেন না; ফলে তা অন্যের হাতে কখনও সম্পূর্ণ হয় না।

---

৩৪৭. কোরান; ৩, ৪৯; ৫, ১১০।

www.amarboi.org

এ দিক থেকে দেখতে গেলে এ শাস্ত্রের প্রক্রিয়াটি যাদুর পর্যায়ে পড়ে। বস্তুত ইতিপূর্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, তা একমাত্র আত্মিক প্রভাব ও স্বভাব বহির্ভূত প্রক্রিয়ার দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া, বিভূতি অথবা যাদুর আকারে সংঘটিত থাকে। এজন্য এ সম্পর্কে দার্শনিকদের সকলের আলোচনাই এমন রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে, একমাত্র যাদুবিদ্যার উপর যার ব্যাপক দখল আছে এবং যিনি বস্তুজগতের উপর আত্মিক প্রভাবের বিষয়টি ভালো করে জানেন, তার পক্ষেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। অস্বাভাবিক ঘটনাবলির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই; কারও পক্ষেই তাকে অর্জন করার ইচ্ছা স্বাভাবিক নয়। বস্তুত 'আল্লাহ্, তাদের সব ক্রিয়া-কর্মকে বেষ্টন করে আছেন।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি এ শিল্পকর্ম অনুসন্ধান ও তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলে, যেমন আমরা পূর্বেও বলেছি, স্বাভাবিক উপায়ে জীবিকা অর্জনের অক্ষমতা এবং কৃষি, ব্যবসায় ও শিল্পের ন্যায় স্বাভাবিক পন্থা ত্যাগ করে ভিন্ন পন্থায় জীবিকার অন্বেষণ করা। সুতরাং এই রূপে অক্ষম ব্যক্তিরাই জীবিকার জন্য এ কঠিন পথে পদচারণা করে এবং কিমিয়া ও অন্যবিধ উপায়ে হঠাৎ অগাধ সম্পদের অধিকারী হবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। মানব সমাজে নিঃস্বরাই অধিকাংশ হারে এ বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে। মানুষ এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলে; এমন কি এ সম্পর্কে তাদের অস্বীকৃতি ও অসম্ভাব্যতার ধারণা থেকে শাস্ত্রবিদ দার্শনিকদেরকেও রেহাই দেয় না। এরই ফলে দেখা যায়, এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে মত পোষণকারী ইবনে সিনা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী এবং ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। অপর দিকে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মত প্রকাশকারী ফারাবী ছিলেন সেই সম্পদহীন লোকদের একজন, যারা কোনো প্রকারেই জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে ও তার কার্যকারণ অনুসন্ধানে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বস্তুত যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, এ মন্তব্য তাদের উপর সম্পদ লালসার প্রকাশ্য দোষারোপ মাত্র। 'আল্লাহ্ই খাদ্যদাতা— পরম ক্ষমতার অধিকারী।'[৩৪৮] তিনি ছাড়া অন্য প্রতিপালক নেই।

৩৪৮. কোরান; ৫১, ৫৮।

www.amarboi.org

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির আধিক্য জ্ঞানার্জনের পথে বাধাস্বরূপ][৩৪৯]

পাঠক, জেনে রাখুন, জ্ঞানার্জন ও তার উদ্দেশ্য অবগতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিষয় হল, অত্যধিক গ্রন্থ, শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিভাষার বৈচিত্র্য ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিভিন্নতা এবং তারপর শিক্ষার্থী ও শিষ্যকে সেসব উপস্থাপনে বাধ্য করা। বস্তুত অনুরূপ কিছু করার পরই তার জ্ঞানার্জনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীকে এসব অথবা তার অধিকাংশ বিষয় স্মরণ রাখতে হয় এবং তাদের বিচিত্র পন্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে যদি সে একটিমাত্র বিষয় নিয়েও সাধনা করে, তবুও, যে পরিমাণ গ্রন্থ উক্ত বিষয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা শেষ করতে তার জীবনকালও যথেষ্ট নয়। সুতরাং তার মধ্যে ত্রুটি দেখা দিতে বাধ্য এবং তার পক্ষে দক্ষতা অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমরা এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ মালেকী মজহাবের ফেকাহ্শাস্ত্রের উল্লেখ করতে পারি। এ সম্পর্কে বহুল পরিমাণ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে : যেমন—উক্ত ফেকাহ্শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি; ইবনে ইউনুস, লুখামী ও ইবনে বশিরের গ্রন্থসমূহ; বিচিত্র টীকা, প্রস্তাবনা, বর্ণনা ও 'উতবিয়া' সম্পর্কীয় 'তাহসীল' গ্রন্থাদি এবং অনুরূপভাবে ইবনে হাজেবের গ্রন্থ ও সে সম্পর্কে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ। তারপর এদের মধ্যকার কায়রোয়ানী মতকে কার্ডোভায়ী, বাগদাদী ও মিশরীয় মত থেকে পৃথক করার প্রয়োজন রয়েছে এবং অনুরূপভাবে তাঁদের মত থেকে উত্তরসূরিদের মত পৃথক করা দরকার হয়। এভাবে বিষয় আয়ত্ত করার পরই শিক্ষার্থীর ধর্মীয় বিধান দানের মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে থাকে। অথচ বলতে গেলে এ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই একটি বিষয়ের পৌনঃপুনিক উল্লেখ মাত্র এবং তাদের তাৎপর্য এক। শিক্ষার্থীকে তাদের সম্পূর্ণ বিষয় উপস্থাপন ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ে বাধ্য করা হয়। এমন করে এই একটি বিষয়েই তাদের জীবন কেটে যায়।

যদি শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে মজহাবের সমস্যাদি শিক্ষার ব্যাপারের সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে বিষয়টি বহুল পরিমাণে স্বল্প, শিক্ষার দিক থেকে সহজ এবং উৎসের দিক থেকে নিকটবর্তী হত। কিন্তু তা এমন একটি রোগ, প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের জন্য তা দূর করা সম্ভব নয়। ফলে তা একটি স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যার স্থানান্তর ও পরিবর্তন করা যায় না।

---

৩৪৯. রোজেনথালে এ পরিচ্ছেদটি পরে এবং পরবর্তীটি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে আরবি ভাষাতত্ত্বের কথাও দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। এতে সিবুয়াইর গ্রন্থ ও তার উপর লিখিত অন্যান্য পুস্তকাবলি; বসরী, কুফী, বাগদাদী আন্দালুসী ও তার পরবর্তী অন্যান্যদের মতামত; পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মতামতের পার্থক্য; যেমন— ইবনে হাজেব, ইবনে মালেক এবং তাদের প্রসঙ্গে লিখিত অন্যান্য সব বিষয় রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে এসবের পাণ্ডিত্য দাবি করা হয়। ফলে এগুলো আয়ত্ত করতেই তাদের জীবনকাল অতিবাহিত হয়। তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকের পক্ষেই তাদের চরম সীমায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। এরূপ একটি বিরল সার্থকতার নিদর্শন বর্তমানে মাগরিবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আরবি ভাষা-শিল্প সম্পর্কে এ রচনাটি ভাষাবিদদের অন্যতম মিশরবাসী ইবনে হিশামের। তাঁর আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি উক্ত শিল্পের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। বস্তুত অনুরূপ দক্ষতা সিবুয়াই, ইবনে জিন্নী ও তাঁদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারেন নি। উক্ত রচনায় তাঁর ব্যাপক দক্ষতা, এ শিল্পের মূলনীতি সম্পর্কীয় জ্ঞান, তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয় ধারণা এবং তাদের ব্যবহার প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, বিষয় গৌরব শুধু পূর্বসূরিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষভাবে আমাদের পূর্ব কথিত বিচিত্র মজহাব, বিভিন্ন মত ও প্রচুর গ্রন্থ সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়েছে। বরং এটা 'আল্লাহ্‌র দয়া, তিনি যাকে ইচ্ছা অর্পণ করেন।'[৩৫০]

অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। কিন্তু যা প্রকাশ্য বাস্তব, তা এই যে, যদি কোনো শিক্ষার্থী তার সম্পূর্ণ জীবনও উৎসর্গ করে, তবুও তার পক্ষে আরবি ভাষা সম্পর্কীয় সব বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অথচ এ ভাষাজ্ঞান বলতে গেলে তার জ্ঞানার্জনের মাধ্যমও একটি সহায়ক শক্তিমাত্র। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে সে কী করে জ্ঞানার্জনের ফলাফল করবে? অবশ্য 'আল্লাহ্, যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।'[৩৫১]

---

৩৫০. কোরান; ৫, ৫৪; ৫৭, ২১; ৬৪, ৪।
৩৫১. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[গ্রন্থ রচনার জন্য নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্যাবলি এবং তদতিরিক্ত পরিহার্য বিষয়সমূহ]

জেনে রাখুন, মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হল মানুষের জীবাত্মা। আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধির যে শক্তি অর্পণ করছেন, তা-ই এ জীবাত্মায় চিন্তাশক্তির জন্ম দেয় এবং তা বিচিত্র তাৎপর্যের ধারণার মধ্য দিয়েই প্রথমে উদ্ভূত হয়। তারপর এ ধারণাই বহিরাগত স্বরূপকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অথবা দূরীভূত করে দ্বিতীয় স্তরে উক্ত চিন্তাকে প্রসারিত করে। এ সম্প্রসারণ কোনো প্রকার মাধ্যম অথবা মাধ্যম ছাড়াই চলতে থাকে, যতক্ষণ না চিন্তাশক্তি অনুরূপ গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আপন উদ্দেশে উপনীত হয়।

এভাবে হৃদয়ের মধ্যে যখন একটি জ্ঞানের আকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তখন তা অবশ্যই অপরের কাছে বর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ বর্ণনা কখনও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আবার কখনও মতামত বিনিময়ের জন্য প্রকাশিত হয় এবং এভাবেই চিন্তাশক্তি তার বিশুদ্ধতা অর্জন করে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

এ বর্ণনা একমাত্র কথনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। এ কথন সে মিশ্রবাক্যের সমষ্টি, যাকে আল্লাহ্ জিহ্বার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের মিশ্রণে সৃষ্টি করে থাকেন। বস্তুত এসব বাক্য আলজিহ্বা ও জিহ্বার আঘাতে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র ধ্বনির স্বরূপমাত্র এবং এর মাধ্যমেই কথোপকথনকারীরা পরস্পরের কাছে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। মনোভাব প্রকাশের এটাই প্রথম পর্যায়; যদিও এর বৃহৎ ও মহৎ দান হল জ্ঞান-বিজ্ঞান। কারণ এ পর্যায়টিই সাধারণভাবে অন্তরে বিন্যস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাকে ধারণ করে থাকে।

বর্ণনার এ প্রথম পর্যায়ের পরে মনোভাব প্রকাশের একটি দ্বিতীয় পর্যায় রয়েছে। যে সব ব্যক্তি সশরীরে অনুপস্থিত, দূরে কোথাও চলে গেছে, যারা এখনও আসেনি অথবা সমসাময়িকতা ও সাক্ষাৎ দর্শন যাদের সাথে হয়নি; এ পর্যায়টি তাদের জন্যই নির্ধারিত এবং তার বর্ণনাও লিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ লিপির বিষয়টি হাত দিয়ে সংঘটিত এমন এক অঙ্কনপ্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার রেখা ও আকৃতি প্রচলন অনুসারে বর্ণ, শব্দ নির্বিশেষে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে এরূপ বর্ণনা মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কথোপকথনের সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই দ্বিতীয় পর্যায়ে এটা একক বলে এটাকে 'বর্ণনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এটা মানুষের অন্তর্জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-তাত্ত্বিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। বস্তুত এ লিপির মাধ্যমেই শাস্ত্রবিশারদরা তাঁদের অন্তরে সঞ্চিত

www.amarboi.org

ভাবরাশিকে অনাগত অদৃশ্য মানব সমাজের কল্যাণের জন্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় গচ্ছিত রাখেন। তাঁরাই আমাদের কাছে গ্রন্থকার নামে পরিচিত।

গ্রন্থ রচনার এ ধারা মানব সমাজের সর্বত্র বহুল পরিমাণে বিরাজিত। কাল ও পুরুষানুক্রমে তা আবর্তিত হয়েছে এবং ধর্ম, সম্প্রদায়, সাম্রাজ্য ও জাতির বিচিত্র সংবাদ বহন করে তার মতাদর্শও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রাদির মধ্যে এরূপ মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কারণ তা একটি মাত্র ধারাতেই বিন্যস্ত। মানুষের চিন্তাশক্তি বস্তুজগতের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে দৈহিক, আত্মিক, আকাশীয়, উপাদানগত, বিমূর্ত ও প্রমূর্ত তথা সর্বপ্রকারে একই ধারার অনুসারী। এ কারণেই এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায় না। ধর্মের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের একমাত্র কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং অনুরূপভাবে সংবাদে বহিরঙ্গের দিক থেকে ইতিহাসেও মতদ্বৈধতা দেখা দেয়।

অতঃপর মানব সমাজের প্রচলন অনুসারে রেখা ও অঙ্কনের দিক থেকে লিপি বিভিন্ন প্রকারের। এটাকে 'কলম' ও 'খত' বলা হয়। এদের মধ্যে একটি হিমিয়ারী লিপি; তাকে 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করা হয়। এটা প্রাচীন ইয়ামেনবাসী ও হিমিয়ারদের লিখন প্রণালি; এর সাথে পরবর্তী আরব মুজারী লিপির বিরোধ বিদ্যমান। যেমন তাদের ভাষার মধ্যেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে। অথচ এদের সবগুলোই আরবীয়। শুধু বর্ণনা ও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে এ আরবদের সাথে তাদের কোনো মিল নেই। তাদের উভয়ের বর্ণনা ধারা থেকে গৃহীত পৃথক পৃথক সাধারণ নীতিমালা বিদ্যমান। যারা বর্ণনার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, তারা এ বিষয়ে অনেক সময় ভুল করে থাকেন।

এসব লিপির মধ্যে অন্য একটি হল সিরিয়ান লিপি। এটা নবতী ও কেলদানীয়দের লিখন প্রণালি। অনেক সময় অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এ ধারণা প্রকাশ করে যে, এটিই স্বাভাবিক লিপি; কেননা তারা প্রাচীনতম জাতি বিধায় তাদের লিপিও প্রাচীন। অবশ্য এ প্রকার ধারণার কোনো ভিত্তি নেই; সাধারণের মত মাত্র। কারণ সর্বপ্রকার নির্বাচিত কর্মপ্রণালিই স্বভাবের বহির্ভূত। একমাত্র তার প্রাচীনত্ব ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতাই তাকে একটি সুদৃঢ় অভ্যাসে পরিণত করে এবং তদ্দর্শনে অনেকেই তাকে স্বাভাবিক বলে ভাবতে থাকে। যেমন বহু নির্বোধ প্রকৃতির লোক আরবি ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, আরবরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ ও কথা বলতে শিখেছে। এরও কোনো ভিত্তি নেই।[৩৫২]

অন্য একটি লিপির নাম হিব্রু লিপি। এটা বনি ইসরাইলের বনি আবের ইবনে শালেহ ও অন্যান্যদের লিখন প্রণালি। অন্য একটির নাম ল্যাটিন লিপি। এটা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ল্যাটিনিদের লিখনধারা। তাদের জন্য একটি বিশিষ্ট ভাষাও বিদ্যমান।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির জন্যই তাদের প্রচলিত ধারা অনুসারে একটি লিপি বর্তমান; তাদের মধ্যেই তাদের বিশিষ্টতা এবং তাও তাদের সাথে বিশিষ্ট। যেমন—

৩৫২. অনুরূপ বর্ণনার জন্য পরে দ্র:।

www.amarboi.org

তুর্কি, ফিরিঙ্গী, হিন্দী ও অন্যান্যরা। অবশ্য প্রথম উল্লেখিত তিনটি লিপিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তার মধ্যে সিরিয়ান লিপি তার প্রাচীনত্বের জন্য, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং আরবি হিব্রু যথাক্রমে তাদের মাধ্যমে কুরআন ও তৌরাত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। এ অবতরণে উক্ত লিপিদ্বয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে; যেন তারা উক্ত ভাষাদ্বয়েরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এ কারণেই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি সর্বাগ্রে সংঘটিত হয় এবং তাদের বর্ণনার ধারাটি সুসংবদ্ধ আকারে স্থাপন করার জন্য নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করা হয়। যাতে উক্ত ভাষাগত নিয়মাদির মাধ্যমে ঐশী বাণীর মধ্যকার অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধান জেনে নেয়া সম্ভব হয়।

অন্যদিকে ল্যাটিনিরা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাই উক্ত ল্যাটিন ভাষা-ভাষী। তারা খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করলেন; যেহেতু উক্ত ধর্মমতের সমুদয় তৌরাত থেকে গৃহীত, যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে তার বর্ণনা গেছে; সুতরাং তারা উক্ত তৌরাত এবং ইসরাইলি নবীদের অন্যান্য গ্রন্থ তাদের ভাষায় অনুবাদ করে; যাতে ধর্মীয় বিধানাদি তারা সহজেই বুঝে নিতে পারে। এর ফলে তাদের ভাষা ও লিপি সম্পর্কে তারা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অন্যান্য লিপি সম্পর্কে অনুরূপ কোনো উদ্যোগ আয়োজন নেই; তারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের প্রচলন অনুসারে বিদ্যমান মাত্র।

অতঃপর মানব সমাজ গ্রন্থ রচনার জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে এবং তদতিরিক্ত যা কিছু, সব পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদের মতে উক্ত উদ্দেশ্য সাতটি।

এদের প্রথমটি হল, আলোচ্য বিষয়, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ভাগ এবং সমস্যাদি যথাযথ অনুসরণসহ কোন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটান। অথবা এমন কিছু সংখ্যক সমস্যা ও আলোচনার সৃষ্টি করা, যা কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তির মনকে আপ্লুত করে এবং তা তিনি অন্য কারো কাছে প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। ফলে তাঁরা এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের আলোচনাকে লিপির মাধ্যমে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ন্যস্ত করেন; যাতে পরবর্তীগণ উক্ত আলোচনার দ্বারা উপকৃত হন। যেমন ফেকাহ্ শাস্ত্রের নীতিমালার ব্যাপারে দেখা গিয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইমাম শাফেয়ী শব্দগত শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা করে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেছিলেন। পরে হানাফীরা এসে প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুমানকে আবিষ্কার করে তার সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পরবর্তী সমাজ বর্তমানকাল পর্যন্তও তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি হল, কেউ পূর্ববর্তীদের আলোচনা ও গ্রন্থাদি পাঠ করার পর দেখতে পেলেন যে, তা অনেকাংশে দুর্বোধ্য এবং আল্লাহ্ তার মধ্যে বুঝতে পারার যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরের জন্য তা বিশদ করতে মনস্থ করলেন; যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের এ আলোচ্য বিষয় সহজ হয়ে ধরা দেয় ও তাদের উপকারে আসে। শ্রুতিনির্ভর ও মননশীল সব ব্যাপারেই বিশদীকরণের অনুরূপ উদ্যোগ প্রচলিত এবং এটা একটি উত্তম অধ্যায়।

তৃতীয়টি হল, পরবর্তীদের মধ্যে কেউ পূর্ববর্তীদের আলোচনায় কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পেলেন এবং যেহেতু এ পূর্ববর্তীগণ বিষয় গৌরব ও দূর-দূরান্ত

www.amarboi.org

পরিব্যাপ্ত সুখ্যাতির অধিকারী; সুতরাং তিনি অনুরূপ ভ্রান্তি সম্পর্কে স্বীয় ধারণাকে এমন অকাট্য প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করলেন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তারপর তিনি উক্ত ধারণাকে পরবর্তী সমাজের জন্য রেখে যেতে ইচ্ছুক হলেন। কারণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের রচনা সর্বত্র ও সর্বকালে পরিব্যাপ্ত হওয়া এবং তাঁর সর্বব্যাপী খ্যাতির জন্য তাঁর বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ফলেই এরূপ ভ্রান্তি অপনোদন ও তার উৎসাদন কোনো প্রকারেই অজুহাত সৃষ্টির মাধ্যমে পরিত্যাগ করা যায় না। কাজেই তিনি তা রচনার মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য রেখে গেলেন।

চতুর্থটি হল, এমন একটি শাস্ত্র, যার আলোচ্য বিষয় অনুসারে কিছু সমস্যা অথবা পরিচ্ছেদ তাতে নেই; যার কাছে উক্ত শাস্ত্রের এ ত্রুটিটি ধরা পড়ল, তিনি তা পূরণ করে তাকে সম্পূর্ণতা দান করতে ইচ্ছুক হলেন। যাতে উক্ত শাস্ত্রটি তার সব সমস্যা ও পরিচ্ছেদসহ একটি সম্পূর্ণ শাস্ত্র হয়ে ওঠে এবং তাতে যেন কোনো প্রকার ত্রুটির কোনো অবকাশ না থাকে।

পঞ্চমটি হল, কোনো বিশেষ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহ প্রয়োজনানুরূপ বিন্যস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নি। সুতরাং এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি তার বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত ও সুসংস্কৃত করতে উদ্যোগী হলেন এবং প্রতিটি সমস্যাকে তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে স্থাপন করলেন। যেমন ইবনে কাসেম থেকে 'সুহনুন' কর্তৃক বর্ণিত 'মুদাব্বানা' গ্রন্থ এবং ইমাম মালেকের সহচরদের কাছ থেকে 'আল উতবী' কর্তৃক বর্ণিত 'উতবিয়া' গ্রন্থ-সম্পর্কে ঘটেছে। এদের ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কীয় বহুবিধ সমস্যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ভিন্ন অন্য অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবু যায়েদ উক্ত 'মুদাব্বানা' গ্রন্থের পূর্বোক্তরূপ সংস্কার সাধন করেছেন; কিন্তু 'উতবিয়া' অসংস্কৃত অবস্থাতেই রয়েছে। এজন্যই আমরা এর প্রতিটি অধ্যায়েই অন্য অধ্যায়ের সমস্যাবলি দেখতে পাই। ফলে মানুষ মুদাব্বানার দ্বারাই নিজেদের কাজ চালিয়ে থাকে। এর মূলে ইবনে আবু যায়েদ ও তার পরবর্তী 'বারাদেয়ী'র অবদান বিদ্যমান।

ষষ্ঠটি হল, কোন বিশেষ শাস্ত্রের সমস্যাবলি বিভিন্ন অধ্যায়ে অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সমস্যাবলিকে অনুরূপভাবে একত্র করলেন। ফলে তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিন্যস্ত হয়ে মানুষের মননশীল বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। আব্দুল কাহের জুরজানী[৩৫৩] ও আবু ইউসুফ সাক্কাকী[৩৫৪] উভয়ে এ শাস্ত্রের সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে ব্যাকরণের গ্রন্থে দেখতে পান এবং ইতিপূর্বে জাহেয তাঁর 'বয়ান ও তিবিয়ান' গ্রন্থে এর অনেক সমস্যা একত্র করেছিলেন; ফলে মানুষ এ শাস্ত্রটি সম্পর্কে উৎসুক হয়ে অন্যান্য শাস্ত্র থেকে একে পৃথক করে নিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে অলঙ্কারশাস্ত্রে মূলনীতি স্থিরীকৃত হওয়ায় পরবর্তীগণ তাকে আয়ত্ত করেছেন এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী অপেক্ষা তার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

---

৩৫৩. আব্দুল কাহের ইবনে আবদুর রহমান (একাদশ শতাব্দী খ্রি:)।
৩৫৪. ইউসুফ ইবনে আবু বকর; ৫৫৫-৬২৬ (১১৬০-১২২৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

সপ্তমটি হল, বিচিত্র বিষয়ের উৎসস্বরূপ কোনো গ্রন্থে বর্ণনা এমন দীর্ঘ ও বাগ্‌বহুল হওয়া, যাতে তার সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে উক্ত বর্ণনার পুনরুক্তিগুলোকে পরিহার করে তাকে সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বদাই লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রথম রচয়িতার বিষয়বস্তু অযথা পরিত্যক্ত হয়ে তার উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

এগুলোই সেই সব উদ্দেশ্য, গ্রন্থ রচনায় যার উপর নির্ভর করতে হয় এবং যার প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এছাড়া যা কিছু সবই নিষ্প্রয়োজনীয় এবং সেই সাধুতা থেকে বিচ্যুতি, বুদ্ধিমানরা সর্বদাই যার অবলম্বন করে থাকেন। যেমন পূর্ববর্তী কোনো রচয়িতার গ্রন্থ কিছুটা রদবদল তথা শব্দাদির পরিবর্তন, বিষয়াদির অগ্রপশ্চাৎ সাধন, প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ, অপ্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশ, বিশুদ্ধির পরিবর্তে ভ্রান্তির সংযোগ অথবা বাহুল্য বিষয়ের অবতারণার দ্বারা নিজের নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা। এরূপ আচরণ একমাত্র মূর্খতা ও নির্লজ্জতারই পরিচয় বহন করে। এজন্যই এরিস্টটল গ্রন্থ রচনার এসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছেন, ‘এছাড়া যা কিছু হয় বাহুল্য, নয়ত লালসা মাত্র।’ তিনি এর দ্বারা পূর্বোক্ত মূর্খতা ও নির্লজ্জতাই বুঝাতে চেয়েছেন। আমরা এমন কার্য থেকে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হচ্ছি, যাতে বুদ্ধিমত্তার কোনো পরিচয় নেই। আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় বিষয়ের প্রতিটি পথ প্রদর্শন করেন।[৩৫৫]

৩৫৫. কোরান; ১৭, ৯।

www.amarboi.org

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শাস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকের আধিক্য শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে]

পরবর্তীকালের অনেক গ্রন্থকারই শাস্ত্রাদির বিষয় বর্ণনার ধারা ও বৈচিত্র্যকে সংক্ষিপ্তকরণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তারা তদসংশ্লিষ্ট সব বিষয়কে জানার আগ্রহেই তাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। এসব সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্যা ও প্রমাণাদির সার উপস্থিত করে এবং বর্ণনার শব্দবাহুল্য বর্জন করে অর্থের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এ কারণে অনুরূপ রচনা প্রাঞ্জলতা হারিয়ে অনেকাংশে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় তারা মূল গ্রন্থাদির বিস্তারিত বর্ণনা; যেমন কোরানের ভাষ্য যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রে বিদ্যমান; তাকে স্মৃতিতে সংরক্ষণের সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত করেন। যেমন ইবনে হাজেব ফেকাহ্শাস্ত্রেও অসুলে ফেকাহ্শাস্ত্রে, ইবনে মালেক আরবি ভাষাতত্ত্বে, খোনজী যুক্তিবিদ্যায় এবং তাদের সমতুল্য অন্যান্যরা করেছেন।

এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিকৃতির সৃষ্টি করে এবং জ্ঞানার্জনের পথে বাধা জন্মায়। কারণ এরূপ প্রচেষ্টা শিক্ষার চরম পরিণতিকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে; ফলে তারা তা যথাসময়ে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে সময় পায় না। বস্তুত শিক্ষাদানের এ ধারা একান্তই অকল্যাণকর; অচিরেই এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

এরূপ বিভ্রান্তিসহ এতে শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দাবলির তাৎপর্য অনুসন্ধান, তাদের ব্যাপক অর্থ গৌরব উদ্ধার এবং তাদের মধ্য থেকে সমস্যাদির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। কারণ এগুলো সহজবোধ্য বিষয় নয়। এজন্যই আমরা সংক্ষিপ্তকরণে ব্যবহৃত শব্দাবলিতে কঠিন ও দুর্বোধ্য রূপে দেখতে পাই এবং তাদের মর্মোদ্ধারে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে হয়। অথচ এ সত্ত্বেও এসব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপাঠে যে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তা যদি যথাযথ ও কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ব্যতিরেকেও অর্জিত হয়ে থাকে, তবুও এটা বিস্তারিত দীর্ঘ বর্ণনা পাঠে অর্জিত যোগ্যতা অপেক্ষা ন্যূন হয়ে থাকে। কারণ বিস্তারিত বিষয়ে বারংবার উল্লেখ ও বিশদীকরণের যে ধারা বর্তমান, তা পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। সুতরাং এরূপ পৌনঃপুনিক উল্লেখের সংক্ষিপ্ত যোগ্যতার মধ্যেও সংক্ষেপের রেশ টেনে আনে এবং বলতে গেলে আলোচ্য সংক্ষিপ্ত-সারগুলোর অবস্থা তথৈবচ। অথচ এমন সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের তার কণ্ঠস্থ করাকে সহজ করে তোলা; কিন্তু পরিণামে তা

www.amarboi.org

এমন এক কাঠিন্যের জন্ম দিয়েছে, যা তাদেরকে কল্যাণকর যোগ্যতা ও তার অধিকার লাভে বাধার সৃষ্টি করে। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথে নিয়ে যান, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান ও সর্বজ্ঞ।'

www.amarboi.org

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং তার কল্যাণকর পদ্ধতি]

জেনে রাখুন, শিক্ষাদান পদ্ধতি তখনই শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে যখন তা ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। প্রথমে তাদের সামনে প্রতিটি অধ্যায়ের মূলনীতি সম্পর্কীয় বিষয় উপস্থিত করতে হবে, তাদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে যথাসম্ভব সংক্ষেপের দারস্থ হতে হবে এবং এ প্রসঙ্গে তাদের বুদ্ধির শক্তি ও উপস্থাপিত বিষয় গ্রহণের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে তারা বিষয়ের শেষ পর্যন্ত পৌছবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের যোগ্যতা অর্জিত হবে। অবশ্য অনুরূপ যোগ্যতা আংশিক ও দুর্বল। এমন যোগ্যতার দ্বারা তারা কেবলমাত্র বিষয়ের পরিচয় ও তার সমস্যাদির জ্ঞানলাভ করতে পারে।

এর পর দ্বিতীয়বারের মতো উক্ত বিষয়কে তাদের সামনে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে পূর্ববর্তী পর্যায়ে অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে তাকে স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও বিশদীকরণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে; যাতে তা সংক্ষিপ্তির পরিধি ত্যাগ করে পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করে এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিচিত্র মতামত ও তার কারণও এখানে উল্লেখ করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিষয়টির শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে এবং এ সম্পর্কীয় যোগ্যতা ও বিশুদ্ধ আকার ধারণ করবে।

এভাবে পুনরায় উক্ত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। এ পর্যায়ে, যেহেতু তাদের এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, সুতরাং উক্ত বিষয়ের সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা দুর্বোধ্যতা ও কাঠিন্যকে বিশদ করে তার সমস্ত অর্গল খুলে দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা এমন এক অবস্থায় উক্ত বিষয় অধ্যয়ন থেকে অব্যাহতি লাভ করবে, যখন তাদের এর উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা জন্মেছে।

এটাই সেই কল্যাণকর শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠক, আপনি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, তা তিনটি পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকের জন্য এটার চেয়ে কম সময়ে, দক্ষতা অর্জিত হতে পারে; কিন্তু তাও তাদের সহজাত যোগ্যতা ও সহজগম্যতার কল্যাণেই হয়ে থাকে।

আমাদের এ সমসাময়িক যুগে আমরা এমন বহু শিক্ষককে দেখেছি, যারা শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার উপকারিতা সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না। তারা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়েই কোনো বিষয়ের দুর্বোধ্য সমস্যাবলি উপস্থিত করেন এবং তাদেরকে তা কণ্ঠস্থ করে সমাধান করতে বলেন। তারা এরূপ শিক্ষা পদ্ধতিকে

www.amarboi.org

অনুশীলনের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বলে ভাবেন এবং তাতে সতর্কতাসহকারে সংরক্ষণ করে চলার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। ফলে তারা প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়বস্তু উপস্থিত করে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। কারণ যে-কোনো বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে জন্মে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে থাকে। তখন তাদের সামনে সহজ পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি উপস্থিত করতে হয়। তারপর ক্রমশ ধীরে ধীরে তাদের যোগ্যতা বাড়তে থাকে এবং বিষয়ের বিচিত্র সমস্যার মিশ্রণ ও পৌনঃপুনিক উল্লেখ, সহজ পরিচিতির চেয়ে সামগ্রিক পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার অবকাশ ইত্যাদির দ্বারা তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর পর তারা যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে বিষয় সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এর বিপরীতে চরম পর্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় যদি প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে তারা বুঝতে ও যথাযথ সংরক্ষণ করতে অসমর্থ হয় এবং এ সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি তাদের বুদ্ধিমত্তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকেই কঠিন মনে করতে থাকে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে আলস্য ও বিরূপতা এসে তাদের ঔদাসীন্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। অথচ এ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই শিক্ষা পদ্ধতির অবিমৃষ্যকারিতার ফসল।

সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত তার অধীনস্থ শিক্ষার্থীরা যে গ্রন্থ পাঠে নিয়োজিত তা যেন তাদের বোধগম্য হয়, সে বিষয়ে তাদের সামর্থ্য ও গ্রহণশক্তি অনুসারে ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক অথবা শেষ পর্যায়ে, যেখানেই শিক্ষার্থীরা অবস্থান করুক না কেন, তাদের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। শিক্ষক কখনও একটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে অন্য গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মিশ্রণ ঘটাবেন না; যদি না, বিষয়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অধিগত হয়, তার উদ্দেশ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং এ সম্পর্কে এমন একটি যোগ্যতা অর্জিত হয়, যা ভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। কারণ শিক্ষার্থী যদি যে-কোনো একটি শাস্ত্র সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়, তাহলে অবশিষ্ট শাস্ত্রাদি গ্রহণ করার একটি যোগ্যতাও তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং তদতিরিক্ত ও তদোর্ধ অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধানের একটি সহজ আনন্দ তার মধ্যে জন্ম লাভ করে। পরিশেষে এভাবে সে জ্ঞানের চরম পর্যায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি বিষয়টি তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়; তাহলে তার দেহে আলস্য ও তার চিন্তায় শৈথিল্য এসে তাকে নিরাশ করে তোলে এবং সে শাস্ত্র ও শিক্ষাগ্রহণ, সবই ত্যাগ করে। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।'[৩৫৬]

অনুরূপভাবে হে শিক্ষক, আপনার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি বিষয় ও একটি গ্রন্থের শিক্ষণীয় পাঠগুলোকে তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈঠকাদির অবকাশকে দীর্ঘায়িত করবেন না। কারণ এতে তার বিষয়টি ভুলে যাওয়া এবং তার

৩৫৬. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

একাংশ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তার পক্ষে উক্ত বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। যখন কোনো বিষয়ের প্রাথমিক দিকগুলো তার অন্তিম দিকগুলোর সাথে একত্রে উপস্থিত থাকে, তখন সে-সম্পর্কীয় যোগ্যতা বেশি সহজ, সুসংবদ্ধ ও প্রগাঢ় হয়ে দেখা দেয়। কারণ যোগ্যতা একমাত্র ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ও পৌনঃপুনিক বিকাশের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই যখন ক্রিয়ার বিস্মৃতি ঘটে, তখন তা দিয়ে সৃজ্যমান যোগ্যতার মধ্যে বিস্মৃতি দেখা দেয়। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তারই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারছিলে না।'[৩৫৭]

শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে উত্তম মত ও অবশ্যপালনীয় পথ হল শিক্ষার্থীর উপর দুটি শাস্ত্রকে একত্রে মিশ্রিত না করা। এর ফলে তার পক্ষে একটি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ এর ফলে তার হৃদয় দু'দিকে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি ছেড়ে অন্যটিতে মনোযোগ দানের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিশেষে তার কাছে দুটিই সমান কঠিন ও দুর্বোধ্য ঠেকে এবং দুটি সম্পর্কেই তাকে নিরাশ হতে হয়। যখন চিন্তাশক্তি অন্য সব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একান্ত একটি বিষয় নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন তার পক্ষে তাতে দক্ষতা অর্জন সর্বাপেক্ষা অবধারিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান; তিনি যথার্থতার সহায়তাকারী।

মানুষের চিন্তাশক্তি

জেনে নাও, হে শিক্ষার্থী, আমি তোমাকে এমন একটি উপকারী বার্তা উপঢৌকন দিচ্ছি, যদি তুমি তা শিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ কর এবং শিল্পকৌশল হিসেবে ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একটি বৃহৎ ভাণ্ডার ও মহৎ পুঁজি লাভ করবে। এখানে আমি তা বোঝার জন্য তোমার সামনে একটি প্রস্তাবনা পেশ করছি এবং তা এই—

মানুষের চিন্তাশক্তি তার একটি বিশিষ্ট স্বভাব। আল্লাহ্ তাঁর অন্যান্য অভিনব বস্তুর ন্যায় এটাকেও সৃষ্টি করেছেন। এটা জীবাত্মার গতিজাত একটি আবেগ, যা মস্তিষ্কের মাধ্যমে গহ্বরে ক্রিয়াশীল হয়। কখনও এ শক্তি মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করার উৎস হিসেবে দেখা দেয়। আবার কখনও এটা অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হয়ে উদ্দিষ্ট অর্জনের দিকে পরিচালিত হবার উৎসরূপে পর্যবসিত হয়। আবার কখনও এটা এটার দুটি দিককে ধারণা করে তাদের অস্তি ও নাস্তির মধ্যে ঘুরতে থাকে; তখন চিন্তার এ স্তরটি যদি একক হয়, তাহলে চক্ষের পলকে সেই মাধ্যমকে খুঁজে পায়, যা উভয় দিকের মিলন ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু তা যদি বিচিত্র হয়, তাহলে অন্য মাধ্যমটির অনুসন্ধান করে এবং এভাবে সে তার উদ্দিষ্ট লাভ করে। এটা মানুষের সেই চিন্তাশক্তির স্বরূপ, যা দিয়ে সে সমস্ত প্রাণিজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

অতঃপর যুক্তিশিল্পও এ স্বাভাবিক মননশীল চিন্তাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাত্র এবং তা এ শিল্পকে এ কারণেই পরিচিত করে, যাতে এর সাহায্যে চিন্তার ক্ষেত্রে যথার্থতাকে ভ্রান্তি থেকে পৃথক করে জেনে নিতে পারে। কেননা যদিও এ চিন্তাশক্তি স্বরূপের দিক থেকে যথার্থ; তবুও তার উভয় দিককে তাদের আকৃতি বহির্ভূত অন্যের

৩৫৭. কোরান; ২, ২৩৯।

www.amarboi.org

উপর ধারণা করার সময় এবং ফলাফলের জন্য তার প্রতিজ্ঞাগুলোকে নির্দিষ্ট আকারে সুশৃঙ্খল ও বিন্যস্ত করার কালে গোলযোগের দরুন খুব অল্প পরিমাণে হলেও ভুলভ্রান্তির অধীন হতে পারে। সুতরাং অনুরূপ কোনো বিকৃতি দেখা দিলে যুক্তিবিদ্যা তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্যোগে সাহায্য করে। কাজেই যুক্তিবিদ্যা এমন এক শিল্পগত বিষয়, যা স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির সাথে সমতালে অগ্রসর হয়ে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপে বিন্যস্ত হয়ে যায়। এর শিল্পগত বিষয় হবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। এ কারণেই, পাঠক, আপনি জগতের বহু বিখ্যাত চিন্তাবিদকে দেখতে পাবেন, যারা যুক্তিবিদ্যার সাহায্য ছাড়াই তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন; বিশেষ করে তাঁদের আন্তরিকতা ও মহান আল্লাহ্ কৃপা প্রার্থনা তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বস্তুত সাহায্যের ক্ষেত্রে এর মূল্য সর্বাধিক। এর ফলে তাঁরা স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে শুদ্ধরূপে ক্রিয়াশীল করতে পারছেন এবং তাও তাদেরকে সেই মধ্যপন্থা ও উদ্দিষ্টের জ্ঞানার্জনে সফলকাম করেছে, যে জন্য আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

অতঃপর এ শিল্পগত বিষয় অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার চেয়ে নিম্নমানের শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট অন্য একটি বিষয় রয়েছে, তার জন্যও একটি ভিন্ন প্রস্তাবনা প্রয়োজন। তা হল শব্দাবলির পরিচয় এবং স্মৃতিসঞ্চিত অর্থাদির উপর তাদের প্রয়োগ জ্ঞান; যা লিপিতে রেখার সাহায্যে ও ভাষণে জিহ্বার সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে। সুতরাং হে শিক্ষার্থী, তোমাকে অবশ্যই এসব যবনিকা উত্তোলন করে সেই চিন্তাশক্তির মধ্যে পৌঁছতে হবে যা তোমার উদ্দিষ্টের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

প্রথমে দেখতে হবে লিপির রেখাগুলোর কথিত শব্দাবলিকে প্রকাশ করে কিনা এবং এটা এ বিষয়ের ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এর পর দেখতে হবে কথিত শব্দাবলি উদ্দিষ্ট অর্থাদির উপর প্রযোজ্য হয় কিনা। এর পর যুক্তিবিদ্যায় সুপরিচিত গঠনের মধ্যে প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্থসমূহকে বিন্যস্ত করার নিয়মাবলি অনুসন্ধান করতে হবে। তারপর এসব বিমূর্ত অর্থকে চিন্তার মধ্যে মিশ্রিত করতে হবে, যাতে তা দিয়ে আল্লাহ্র কৃপা ও বদান্যতার প্রার্থী হয়ে স্বাভাবিক চিন্তার মাধ্যমে উদ্দিষ্টকে স্বীকার করা যায়। অবশ্য প্রত্যেকেই এ পর্যায়ক্রম শীঘ্র অতিক্রম করতে পারে না এবং সহজে এসব শিক্ষাসংক্রান্ত যবনিকা উত্তোলন করতে সক্ষম হয় না; বরং অনেক সময় স্মৃতিশক্তি আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে শব্দাবলির যবনিকার সামনে থমকে দাঁড়ায় অথবা যুক্তি-প্রমাণের মিশ্রণে বাকবিতণ্ডা ও দ্বিধা-সন্দেহের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উদ্দিষ্ট অর্জনে বিরত থাকে। বস্তুত এ আবর্ত থেকে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া খুব কম লোকই মুক্তিলাভ করতে পারে।

যদি তোমার জন্য অনুরূপ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; যদি তোমার বোধগম্যতায় কোনো সন্দেহ দেখা দেয় অথবা তোমার স্মৃতিশক্তি দ্বিধায় বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; তাহলে তা ত্যাগ কর, শব্দাবলির এ যবনিকা ও দ্বিধা-সন্দেহে এ বাধা দূরে নিক্ষেপ কর এবং এ শিল্পগত বিষয়ানুসারিতা পরিত্যাগ করে তোমার সেই স্বাভাবিক চিন্তার অঙ্গনে ফিরে যাও, যা তোমার সহজাত শক্তি। তাতেই তোমার দৃষ্টিকে, তোমার বুদ্ধিকে নিষ্কলুষভাবে বিচরণ করে তোমার উদ্দিষ্ট লাভ করতে দাও। এ ক্ষেত্রে তুমি

www.amarboi.org

তোমার পদদ্বয়কে সেই স্থানে স্থাপন কর, যেখানে তোমার পূর্ববর্তী মহান চিন্তাবিদগণ স্থাপন করেছিলেন। তুমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিজয় কামনা কর; সেই বিজয়, যা তিনি তার কৃপায় পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সেই শিক্ষাদান করেছিলেন, যা তারা অর্জন করতে পারেন নি।

যখন তুমি এরূপ করতে সমর্থ হবে, তখন তোমার উপর আল্লাহ্‌র সেই বিজয়ের আলোক বিচ্ছুরিত হবে, যা তোমার উদ্দিষ্ট লাভে সহায়তা করবে এবং তোমার মধ্যে সেই মধ্যম পন্থার গুণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, যাকে আল্লাহ্ এ স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির লক্ষ্যরূপ নির্ধারিত করেছেন ও তোমাকে তার সহজাত করে সৃষ্টি করেছেন; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ সময়ে তুমি সেই শক্তিকে যুক্তি-প্রমাণের গঠন ও আকৃতিতে ফিরিয়ে আন, তাকে তাদের মধ্যে নিয়োগ কর এবং শৈল্পিক নিয়মাবলির মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রতিপন্ন কর। তারপর তাকে শব্দাবলির আবরণ পরাও এবং বাণী ও ভাব বিনিময়ের জগতে তার প্রকাশ ঘটাও—সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত।

অবশ্য তুমি যদি শব্দাবলির বিপত্তি, শিল্পগত প্রমাণে বাধাপ্রাপ্তি এবং তদন্তগত বিভ্রান্তি থেকে বিশুদ্ধিকে পৃথক করার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাহত হও, তাহলে যেহেতু এগুলো শিল্পগত প্রচলিত বিষয় ও তাদের বিভিন্ন দিক প্রচলন ও পরিভাষা অনুসারে সমান ও সমতুল্য হয়; সেজন্য তুমি তাদের মধ্যে সত্যপক্ষ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না। কারণ সত্যপক্ষ একমাত্র স্বভাবানুসারী হলে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এ দ্বিধা-সন্দেহের দৌরাত্ম্য চলতেই থাকবে। উদ্দিষ্টের উপর আবরণ আরও প্রলম্বিত হবে এবং অনুসন্ধানীকে তার অনুসন্ধান থেকে বিরত করবে। এটাই অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও উত্তরসূরিদের অবস্থা। বিশেষ করে পূর্বে যাদের ভাষা আরবি ছিল না এবং তা তাদের মানস প্রক্রিয়াকে ব্যাহত তুলছে। অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রমাণ প্রয়োগে যার আসক্তি তাকে পক্ষপাতী করে ফেলেছে এবং তার বিশ্বাস জন্মেছে যে, সত্যোপলব্ধির এটাই স্বাভাবিক পন্থা। যে ব্যক্তি অনিবার্যভাবে যুক্তি-প্রমাণের দ্বিধা-সন্দেহে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বস্তুত সত্যোপলব্ধির একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা হল সেই স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির, যার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। যখন সমস্ত জল্পনা-কল্পনা থেকে তাকে মুক্ত করে চিন্তাবিদ তাকে মহান আল্লাহ্‌র করুণার প্রার্থী করে তুলবে, তখনই তা সম্ভব। বস্তুত যুক্তিবিদ্যাও এ চিন্তারই পরিচয়বাহী, এজন্য সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়। হে শিক্ষার্থী, এটাকে বিবেচনা কর এবং যখনই কোনো সমস্যা হৃদয়ঙ্গমে বিপত্তি অনুভব কর, মহান আল্লাহ্‌র কৃপা প্রার্থনা করো; তোমার উপর তাঁর আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে সত্যের দিকে পথ দেখাবে। আল্লাহ্‌ই তাঁর কৃপার দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে।

www.amarboi.org

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[সহায়ক শাস্ত্রাদিতে চিন্তার দীর্ঘ অবকাশ এবং তার সমস্যাগুলোতে প্রসারতা নেই]

জেনে রাখুন, মানব সমাজে সুপরিচিত সর্ববিধ শাস্ত্রাদি দু'ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে একভাগ হল স্বরূপত উদ্দিষ্ট; যেমন—তফসীর, হাদীস, ফেকাহ, এলমে কালাম ধরনের ধর্মীয় শাস্ত্রাদি এবং পদার্থবিদ্যা ও আধ্যাত্মবিদ্যা জাতীয় দর্শন শাস্ত্রাদি। অন্য ভাগটি হল উপরের শাস্ত্রসমূহের জন্য সহায়ক ও মাধ্যম স্বরূপ; যেমন ধর্মীয় শাস্ত্রাদির জন্য আরবি ভাষাতত্ত্ব, অঙ্ক ইত্যাদি এবং দর্শনের জন্য যুক্তিবিদ্যা। এ শেষেরটি অনেক সময় পরবর্তী শাস্ত্রকারদের ধারা অনুসারে এলমে কালাম ও অসুলে ফেকাহ্‌র জন্যও সহায়করূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেসব শাস্ত্র উদ্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাদের ব্যাপারে আলোচনার বিস্তৃতি, সমস্যাদির ব্যাপকতা ও যুক্তি-প্রমাণের বিশ্লেষণে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এতে উক্ত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নকারীর জন্য যোগ্যতা অর্জন ও উদ্দিষ্ট তাৎপর্যাদি অনুধাবনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা সঞ্চারিত হবে। কিন্তু যেসব বিদ্যা অন্যের জন্য সহায়ক মাত্র; যেমন—আরবি ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি; তাদের ব্যাপারে এ সহায়ক রূপের প্রয়োজনীয়তার অতিরিক্ত কোনো প্রকার দৃষ্টিপাতের আবশ্যকতা নেই। তাতে আলোচনার বিস্তৃতি ও সমস্যাদির ব্যাপকতা সৃষ্টিরও অবকাশ নেই। কারণ এর ফলে এগুলো তাদের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যাবে এবং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্যের সহায়ক হওয়া; অন্য কিছু নয়। কাজেই যখনই এগুলো সীমা অতিক্রম করে তখনই অনুরূপ উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায় এবং তাদের সম্পর্কে আত্মনিয়োগ তখন বাহুল্য বলে গণ্য হয়। তদুপরি এসব সহায়ক বিদ্যার আলোচনার দৈর্ঘ্য ও শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন একান্ত দুঃসাধ্য করে তোলে। অনেক সময় সহায়কের এ বিস্তার যথার্থ উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে সব কিছুকে আয়ত্তে আনতে জীবন কেটে যায়। এজন্যই এসব সহায়ক বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করা জীবনের ব্যর্থতা ও অনুপকারীর অনুসন্ধানে পর্যবসিত হয়।

এ ব্যাপারটিই পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ আরবি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, এমন কি অসুলে ফেকাহ্‌র ক্ষেত্রেও ঘটিয়েছেন। তাঁরা এগুলোতে আলোচনার পরিধি বর্ণনা ও প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন এবং সমস্যাগুলোর শাখা-প্রশাখা এত বেশি পরিমাণে বাড়িয়েছেন যে, তার ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাসমূহ তাদের সহায়ক স্বরূপ

www.amarboi.org

থেকে বের হয়ে নিজেরাই উদ্দিষ্ট স্বরূপে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় এরূপ উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ফলেই তাদের মধ্যে এমন অনেক যুক্তি ও সমস্যা আলোচিত হয়, মূল শাস্ত্রাদির জন্য যার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই; ফলে এগুলো বাহুল্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। তদুপরি এগুলো সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ আয়োজন এসব সহায়ক ও মধ্যম শ্রেণীর শাস্ত্রাদি অপেক্ষা মূল উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদির জন্য বেশি হয়ে থাকে। অথচ তারা যখন এসব সহায়ক আয়ত্ত করতে জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়, তখন উদ্দিষ্ট লাভের অবকাশ কোথায়?

সুতরাং শিক্ষকদের উপর অবশ্য পালনীয়রূপে এ দায়িত্ব বর্তায় যে তাঁরা যেন সহায়ক শাস্ত্রাদির ব্যাপারে আলোচনা ব্যাপক না করেন, তাদের সমস্যাদির বেশি তুলে না ধরেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে এগুলো চর্চার উদ্দেশ্য ও তাদের সীমারেখা সম্পর্কে সতর্ক করতে দ্বিধা না করেন। এর পর যদি কারো ইচ্ছাশক্তি অনুরূপ আতিশয্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সে নিজে যদি তাতে মনোনিবেশ নিজের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে, তাহলে সে স্বেচ্ছায় যে-কোনো বন্ধুর অথবা সরল পথে বিচরণ করতে পারে। বস্তুত প্রত্যেকেই তার দৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সম্পূরণ করতে তৎপর হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[শৈশবকালীন শিক্ষা এবং মুসলিম অধ্যুষিত নগরসমূহে তার পদ্ধতিগত বিভিন্নতা]

জেনে রাখুন, বালক-বালিকাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইসলামী ঐতিহ্য। মুসলমানগণ এ বিষয়টি গ্রহণ করেছে এবং তাদের নগরগুলোতে এর প্রচলন ঘটিয়েছে। কারণ এ দ্বারা মনের মধ্যে ঈমাম ও শাস্ত্রীয় ধ্যান-ধারণার দৃঢ়তা জন্মে এবং কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী এ ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। এর ফলে কুরআন, শিক্ষার সেই ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে, যার উপর পরবর্তীকালে অর্জিত যোগ্যতার সৌধ গড়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, শৈশবকালীন শিক্ষা বেশি দৃঢ় হয় এবং তার পরবর্তী শিক্ষার জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কেননা অন্তের প্রথমে অনুপ্রবিষ্ট বিষয়ই যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিস্বরূপ এবং এ ভিত্তির দৃঢ়তা ও তার প্রক্রিয়া অনুসারেই সৌধের অবস্থা বিকশিত হয়ে থাকে।

শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে পদ্ধতিগত বিভিন্নতা বিদ্যমান। কুরআনের শিক্ষায় যে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তার দিকে লক্ষ রেখেই এ বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। মাগরিববাসীদের মধ্যে শিশুদের কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত রীতিই প্রচলিত। তাঁরা মাদ্রাসাসমূহে কেবলমাত্র কুরআনের লিপি-জ্ঞান, তার সমস্যাবলি এবং এ ব্যাপারে কুরআন বিশারদগণের মতানৈক্যই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এটা ছাড়া তাঁদের শিক্ষাদানের বৈঠকে কুরআনের সাথে হাদীস, ফেকাহ্, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদির মিশ্রণ ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটান না, যতক্ষণ না শিক্ষার্থী কুরআনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে অথবা তা ত্যাগ করে। তার ত্যাগ করার অর্থ সাধারণভাবে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্রব ত্যাগ করাই বুঝিয়ে থাকে।

এটাই মাগরিবের শহরাঞ্চলের অধিবাসী, তাদের অনুসারী গ্রামাঞ্চলের বারবারগণ এবং সাধারণভাবে সমগ্র মাগরিবের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা সম্পর্কীয় মতাদর্শ। বালক-বালিকারা সাবালকত্বের সীমা পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের জন্য এ শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। এমন কি বয়স্করাও যখন জীবনের একটি বিশেষ সময় কাটিয়ে কুরআন শিক্ষা করতে আসে, তখনও এ রীতি অবলম্বন করা হয়। এ কারণেই তারা কুরআনের লিপিজ্ঞান ও তা কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে অন্য সব অপেক্ষা দক্ষ।

আন্দালুসের অধিবাসীরা কুরআনের শিক্ষা ও লিপিজ্ঞানের ব্যাপারে সাধারণ পন্থাই অবলম্বন করে। তাদের এ মতাদর্শেই সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুসৃত হয়ে থাকে। অবশ্য

www.amarboi.org

কুরআন যেহেতু শিক্ষার ভিত্তি, তার উৎস এবং ধর্ম ও শাস্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল, সেজন্য তাকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে; কিন্তু এ বলে তারা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং শৈশবকালীন শিক্ষাতেও সাধারণভাবে কাব্য বর্ণনা ও গদ্য রচনা মিশ্রিত করে থাকে এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান, উচ্চারণ বিধি ও হস্তলিপির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে।

কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আন্দালুসবাসীদের প্রচেষ্টা এর বেশি অগ্রসর হয় না; বরং তাদের প্রচেষ্টা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা লিপিশিক্ষার মধ্যেই বেশি নিয়োজিত থাকে। এর মধ্য দিয়েই বালকগণ বয়ঃসীমা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে এবং ইতিমধ্যে তারা সামান্য আরবি ভাষাতত্ত্ব, কাব্য ও তাদের পর্যালোচনার শক্তি অর্জন করে। তারা লিপিজ্ঞান ও লিখন পদ্ধতিতেও দক্ষ হয়ে ওঠে এবং মোটামুটিভাবে জ্ঞানজগতের বিভিন্ন দিকের সাথে তাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ধারা প্রচলিত রয়েছে, তবুও তারা এ পর্যায়ে এসে তদঞ্চলের নিয়মানুসারে শিক্ষার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। সুতরাং পরিণামে তারা ঐ প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা যা অর্জন করেছে, তাই লাভ করে থাকে। বস্তুত যাকে মহান আল্লাহ্ পথ দেখান, তার জন্য এটাই যথেষ্ট এবং এতে সেই পরিমাণ যোগ্যতাও অর্জিত হয়, যা দিয়ে শিক্ষক পাওয়া গেলে তারা বেশি জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে।

আফ্রিকিয়াবাসীরা তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যাপারে কোরানের সাথে সাধারণত হাদীস মিশ্রিত করে থাকে। এ সঙ্গে তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের নিয়মাবলি ও তাদের সমস্যাদির সামান্য অংশও শিক্ষা দেয়। তবুও কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা, তার জন্য বালক-বালিকাদেরকে বেশি মনোযোগী করা এবং তার বিভিন্ন বর্ণনা ও পাঠের জ্ঞান অন্য সব বিষয় অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। তাদের লিপি শিক্ষার প্রচেষ্টা এরই অনুগামী। মোটামুটিভাবে কুরআন সম্বন্ধীয় তাদের শিক্ষাধারা আন্দালুসবাসীদের শিক্ষাধারার নিকটবর্তী। কারণ এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষা পদ্ধতি আন্দালুসী উস্তাদদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব উস্তাদ সেখানে খ্রিস্টান আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর পূর্ব আন্দালুসে চলে আসেন এবং অনেকে তিউনিসেও স্থায়ী আবাস স্থাপন করেন। তাঁদের কাছ থেকে আফ্রিকিয়া অঞ্চলের বালক-বালিকারা পরবর্তীকালে শিক্ষা লাভ করেছে।

আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, পূর্বাঞ্চলবাসীরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। তবে তাদের প্রচেষ্টা কিসে বেশি নিয়োজিত, তা আমি জানি না। আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, যৌবনকালেই তারা কুরআন, বিভিন্ন শাস্ত্রাদি ও তাদের নিয়মাবলির শিক্ষালাভ করে এবং এর সঙ্গে তারা লিপি শিক্ষাকে একত্র করে না। বরং লিপি শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষক রয়েছে; যেমন সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের জন্য শিক্ষক থাকেন। তারা এটাকে বালক-বালিকার লিখন প্রণালীর সাথে একত্র করেন না। কারণ তারা তক্তির উপর যে লিপির চর্চা করে তা ত্রুটিপূর্ণ বিধায় উন্নত হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ লিপিবিদ্যা শিক্ষা করতে উদ্যোগী হয়, সে তারপর তার শক্তি অনুসারে তার চর্চা করতে পারে এবং লিপি শিল্পবিদদের কাছ থেকে তা লিখে নিতে পারে।

www.amarboi.org

আফ্রিকিয়া ও মাগরিববাসীরা কুরআনের উপর অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে মোটামুটিভাবে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা অর্জনে পশ্চাদপদ থাকে। কারণ কুরআন পাঠে সাধারণভাবে ভাষাজ্ঞান জন্মায় না। কেননা মানুষ কোনোক্রমেই তার সমতুল্য ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। ফলে তারা উক্ত ভাষার বাগধারা ব্যবহার ও তার বর্ণনাশৈলী অনুকরণ থেকে সরে থাকে। অথচ এ সঙ্গে তারা কুরআন ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাশৈলীর সাথেও পরিচিত হতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবি ভাষায় যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং তার বর্ণনায় স্থবিরত্ব ও তার বাকপটুতায় শৈথিল্য জন্মায়।

অবশ্য এ ব্যাপারে অনেক সময় আফ্রিকিয়াবাসীরা মাগরিববাসীদের চেয়ে কতকাংশে সচ্ছলতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, তারা কুরআনের শিক্ষার সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের নিয়মাবলির বর্ণনা মিশ্রিত করে থাকে। এর ফলে তারা কিছুটা বাকপটুতা ও তুলনীয় বিষয় অনুসরণের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে; তবুও তাদের যোগ্যতা রচনাশৈলীর দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ তাদের সঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকাংশের বর্ণনায় রচনাশৈলীর অভাব; যেমন অচিরেই সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে তার বর্ণনা আসছে।

এক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীরা, তাদের বিচিত্র বিষয়, কাব্য-বর্ণনা, গদ্য রচনা ও জীবনের প্রথম থেকেই আরবি ভাষার সাথে বিদ্যাচর্চার ফলে যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে বেশি আরবি ভাষাবিদ হয়ে ওঠে। এ সঙ্গে তারা অন্যান্য শাস্ত্রাদির ব্যাপারে তেমন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে না। কারণ তারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করে; অথচ এ দুটিই শাস্ত্রাদির ভিত্তি ও উৎসস্থল। এ কারণে তারা হয় লিপিবিশারদ ও উত্তম সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে; নয়ত একান্তই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। বস্তুত শৈশবকালীন শিক্ষার অনুপাতেই অনুরূপ বৈচিত্র্য দেখা দেয়।

কাজী আবু বকর ইবনে আল আরাবী তাঁর 'রেহ্লাত' নামীয় গ্রন্থে শিক্ষার ব্যাপারে একটি বিরল প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে পূর্বতন বিষয়াদির উল্লেখ করে নতুন কিছুও বলেছেন এবং আরবি ভাষাতত্ত্ব ও কাব্য সম্পর্কীয় শিক্ষাকে, আন্দালুসী মতাদর্শের ন্যায় সমগ্র শাস্ত্রের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'কাব্য আরবের ঐতিহ্যভাণ্ডার; এ বিষয়টিই তার ও আরবি ভাষার অগ্রাধিকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় করে তোলে এবং ভাষার বিকৃতিও এর অন্যতম কারণ। তারপর শিক্ষার্থী গণিত শিখবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তার মূলনীতিগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এর পর সে কুরআন শিখতে যাবে এবং এরূপ একটি ভূমিকার ফলে তা তাঁর কাছে সহজ বলে বোধ হবে।' তারপর তিনি বলেন, 'আমাদের দেশবাসীরা কী উদাসীন! তারা জীবনের প্রারম্ভেই বালককে কুরআন শিক্ষা দেয়; সে তা পড়ে, কিন্তু বুঝে না এবং সে এমন একটি বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, যদপেক্ষা অন্যটি তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'এর পর সে ধর্মের মূলনীতি, ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতি, বিচার-বিতর্ক, হাদীস ও সে সম্পর্কীয় অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করবে।' এ সত্ত্বেও তিনি দুটি শাস্ত্রকে

www.amarboi.org

একত্র করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য কোনো যোগ্য শিক্ষক যদি এদুটির মিশ্রণকে বোধগম্যতা ও সহজসাধ্যতার সাথে শিক্ষা দিতে পারেন, তাহলে অসুবিধা নেই।

এটাই শিক্ষার ব্যাপারে কাজী আবু বকর (রহঃ)-এর অভিমত। আমার জীবনের শপথ, এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি মতাদর্শ। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম তাকে অনুমোদন করে না। কারণ প্রচলিত নিয়ম সর্বদাই অবস্থা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রচলন হল পুণ্য ও সুসারের দিকে প্রাধান্য দিয়ে কুরআন শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দান করা। তদুপরি এতে এমন একটি ভয়ও দূর হয় যে, বাল্যকালের চাপল্য ও বাধাবিপত্তি যদি হঠাৎ করে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে, তা হলেও সে অন্তত কুরআন পাঠ থেকে বঞ্চিত হবে না। কারণ শিক্ষার্থী যতক্ষণ পারিবারিক আবেষ্টনীতে থাকে, ততক্ষণ সে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন বয়ঃসীমা পার হয়ে যায় ও শাসনের বাধ্যবাধকতা থেকে কতকাংশে মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক সময় যৌবনধর্ম তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং অন্যায্যতার তীরভূমিতে সে অনর্থক ঘুরে বেড়ায়। এজন্যই তারা পারিবারিক বেষ্টনী ও শাসনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ থাকা কালেই কুরআন শিক্ষাকে এতটা মূল্য দিয়ে থাকেন; যাতে এ বিষয়টি থেকে যেন সে শূন্য না হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যদি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন স্থায়ী হবার বিশ্বাস থাকে এবং শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতাও তার থাকে, তাহলে কাজী আবু বকর যে মতাদর্শের কথা বলেছেন, পূর্ব-পশ্চিমে গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই;'[৩৫৮] পবিত্র তিনি।

৩৫৮. কোরান; ১৩, ৪১।

www.amarboi.org

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[শিক্ষার্থীদের কঠোরতা তাদের জন্য ক্ষতিকর]

এর বর্ণনা এই যে, শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। বিশেষ করে শৈশবে এরূপ শাস্তির আধিক্য যোগ্যতা অর্জনে অকল্যাণ ডেকে আনে। শিক্ষার্থী, দাসদাসী অথবা চাকর-নফরদের মধ্যে যারা অন্যায্য ও বেশি শাসনের অধীনে থাকে, তাদেরকে অলস, মিথ্যাচারী ও দুষ্কর্মকারী বানিয়ে দেয়। শাসনের কড়াকড়ির ভয়ে তারা মনের যথার্থ ভাব প্রকাশ না করে অন্যবিধ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং এ কারণেই তারা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে এটাই তাদের অভ্যাস ও চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষত্বের সব তাৎপর্য তার মূল্য হারিয়ে বসে। বস্তুত তার জন্যই এ সমাজজীবন ও সভ্যতা এবং তা আর কিছুই নয়; বরং নিজের ও নিজের আবাসভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সহায়তাবিধান। অথচ এর ফলে তারা অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বিষয় গৌরব ও সৎ চরিত্র অর্জনে উদ্যমহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ জীবনের উদ্দেশ্য সংকুচিত হয়ে মানুষত্বের হ্রাস ঘটে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় তারা সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়।

সে সব জাতি অন্যায় শাসন ও অবিচারের মধ্যে আবদ্ধ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। পাঠক, এ বিষয়টি আপনি তাদের মধ্যে বিবেচনা করতে পারেন, যাদের শাসনভার অন্যের হাতে এবং যাদের যোগ্যতা নিজেদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা করতে অপারগ। আপনি তাদের মধ্যে অনুরূপ বিষয় সুপ্রচলিত দেখতে পাবেন। আপনি ইহুদিদের কথা চিন্তা করুন না; এর ফলে তাদের মধ্যে কী দুশ্চরিত্রেরই না জন্ম হয়েছে এবং এর জন্যই সর্বদিকে সর্বত্র তাদেরকে বহিষ্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পরিচিত পরিভাষায় অনুরূপ পরিণতির অর্থ হল দুষ্কর্ম ও প্রতারণা এবং তার কারণ আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষক ও জনকের উচিত তাদের ছাত্র ও পুত্রকে সদাচার শিক্ষা দেওয়ার বেলায় অন্যায় শাস্তিপ্রদান না করা। মুহম্মদ ইবনে আবু যায়েদ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'বালকদেরকে সচ্চরিত্র শিক্ষাদানকারী যদি শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে তার পক্ষে তিনটি বেত্রাঘাতের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।' হযরত উমর (রাঃ)-এর বক্তব্যে আছে, যাকে ধর্মীয় বিধান সচ্চরিত্র শিক্ষা দিতে পারে না, তাকে আল্লাহ্ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেন না। 'এ বক্তব্যে তিনি একদিকে সচ্চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রদত্ত অসম্মান থেকে

www.amarboi.org

জীবাত্মার মুক্তি কামনা করেছেন এবং অন্যদিকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা যে ধর্মীয় বিধান দিতে সক্ষম তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ একমাত্র ধর্মই মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী।

সম্রাট হারুনুর রশীদ তাঁর পুত্রের শিক্ষকদের প্রতি যা বলেছিলেন, তদপেক্ষা উত্তম শিক্ষা পদ্ধতি আর হয় না। খালফ আল্ আহমর[৩৫৯] বলেছেন, 'রশীদ তাঁর পুত্র মুহম্মদ আমীনের শিক্ষার ব্যাপারে আমাকে বলে পাঠালেন, হে আহমর! আমীরুল মোমেনীন আপনার কাছে তাঁর আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের ফসল গচ্ছিত রেখেছেন। আপনি তাকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করুন এবং তাকে আপনার অনুগত করে নিন। যে উদ্দেশ্যে আমীরুল মোমেনীন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনি তার সহায়ক হন। আপনি তাকে কুরআন শিক্ষা দিন; ইতিহাস, কাব্য বর্ণনা ও হাদীস পাঠে সহায়তা করুন। তাকে যথাস্থানে বক্তব্য উপস্থিত করতে এবং যথানিয়মে তা আরম্ভ করতে শিক্ষা দান করুন। যথাসময় ছাড়া তাকে হাস্য সংবরণ করতে বলুন। বনি হাসেমের গুরুজন তার কাছে উপস্থিত হলে তাদেরকে সম্মান করতে শিক্ষা দান করুন। সেনাপতিগণ তার বৈঠকে এলে তাদেরকে সম্মানসূচক আসন প্রদান করতে তাকে পরামর্শ দিন। এমন কোনো সময় যেন অতিবাহিত না হয়, যে সময়ে আপনি অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে বিরক্ত না করে উপকারী কোনো না কোনো বিষয় শিক্ষা না দেন। কারণ বিরক্তির ফলে আপনি তার মেধাকে বিকৃত করে ফেলবেন। তাকে বেশি মাত্রায় অবসর ভোগ করতে দেবেন না; তাহলে সে তাকে আরামদায়ক মনে করে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আপনার পক্ষে যতদূর সম্ভব সস্নেহ ও কোমল ব্যবহারের দ্বারা তাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করুন। যদি সে এতে সম্মত না হয়, তাহলে অবশ্যই কঠোরতা ও কর্কশতার সাথে ব্যবহার করবেন।' শেষ।

৩৫৯. মৃত্যুকাল ৭৯৬-৮০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল।

www.amarboi.org

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্ঞানের অন্বেষণে দেশভ্রমণ ও জ্ঞানীদের দর্শন লাভ শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিধায়ক]

এর কারণ এই যে, মানুষ সাধারণভাবে তাদের জ্ঞান ও চরিত্র তাদের আচরিত মতাদর্শ ও অনুসৃত গুণাবলি থেকেই গ্রহণ করে থাকে। এ গ্রহণ কখনও জ্ঞান শিক্ষা ও বক্তৃতা থেকে আবার কখনও সাহচর্যের ফলে দীক্ষা ও অনুকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অবশ্য এ সাহচর্য ও দীক্ষার ফলে অর্জিত যোগ্যতা বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী প্রভাবশীল হয়। সেজন্যই বেশি শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য যোগ্যতা অর্জনে বেশি দৃঢ়তা আনয়ন করে।

তদুপরি শিক্ষাব্যবস্থায় পরিভাষার আধিক্যও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়; এমন কি তাদের অনেকেই ভাবতে থাকে যে, এগুলোও বুঝি শাস্ত্রেরই অংশ। তাদের এ ধারণা দূর হবার একমাত্র পথ হল এ সম্পর্কীয় বিচিত্র মতাদর্শের শিক্ষকদের সংস্পর্শে আগমন। এর ফলে জ্ঞানীদের দর্শন লাভ ও বিভিন্ন শিক্ষকের শিক্ষাদান তাকে এসব পরিভাষার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে এবং এ সম্পর্কে তাঁদের বিচিত্র মতাদর্শ দর্শনে সে তাদেরকে শাস্ত্রজ্ঞান থেকে পৃথক করতে সমর্থ হবে। সে বুঝতে পারবে যে, পরিভাষা শিক্ষাদানের বৈচিত্র্য ও লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর দরুন যোগ্যতা অর্জনে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভে তার শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে। সে তার জ্ঞানকে সংশোধন করতে এবং তাকে অন্যান্য আবিলতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এ সঙ্গে সাহচর্য, দীক্ষা এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন ও বিচিত্র শিক্ষকের সহায়তা লাভ তাকে যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্য করে তুলবে। অবশ্য এ সমস্তই তার পক্ষেই লভ্য, আল্লাহ্ যাকে জ্ঞানার্জন ও সৎপথ প্রাপ্তির জন্য সহজ শক্তি অর্পণ করেছেন। সুতরাং জ্ঞানী ও মহাপুরুষের সাহচর্য থেকে উপকার ও গুণাবলি লাভ করতে হলে এবং সর্বোপরি জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেশভ্রমণ একান্তই অত্যাবশ্যকীয়। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন।'[৩৬০]

---

৩৬০. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[মানবসমাজে জ্ঞানীরাই রাজনীতি ও তার বিচিত্র মতাদর্শ থেকে বেশি দূরে অবস্থান করেন]

এর কারণ এই যে, জ্ঞানীগণ মননশীল দৃষ্টি ও তাৎপর্যাদির গভীর অনুসন্ধিৎসায় অভ্যস্ত তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করে স্মৃতিতে তাদের সার সংকলন করেন। ফলে সব বিষয় একটি সার্বিক নিয়মে পর্যবসিত হয় এবং তা দিয়ে সাধারণভাবে যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এটা বিশেষভাবে কোনো বস্তু সত্তা, ব্যক্তি, পুরুষ, জাতি বা শ্রেণীর ওপর বর্তায় না। এভাবে তাঁরা অনুরূপ সার্বিক ধারণা গ্রহণ করার পর বহির্জগতের ওপর তাদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেন। তাঁরা সব বিষয়কে তাদের সমতুল্য ও সমশ্রেণীর বিষয়াদির সাথেও অনুমান করে থাকেন; কেননা ফেকাহ্শাস্ত্রের অনুরূপ অনুমানের সাথে তাঁরাও পূর্বাহ্ণেই পরিচিত। সুতরাং তাদের সর্বপ্রকার মনন ও সিদ্ধান্ত স্মৃতিতেই আবদ্ধ থাকে এবং তার সাথে বহির্জগতের সামঞ্জস্য বিধানের কাজ একমাত্র অনুরূপ বিচার-বিবেচনার পরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিংবা অনেক সময় তা সামগ্রিকভাবেই সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিষয়াদি থেকেই তা বহির্জগতের শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। যেমন ধর্মীয় বিধানসমূহ; তারা কুরআন-হাদীস থেকে সংগৃহীত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়। তারপর বহির্জগতে তাদের সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়। এটা বুদ্ধি শাসিত বিষয়াদির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সেখানে তাদের বিশুদ্ধি নির্ধারণের জন্য বহির্জগতের ওপরই সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করতে হয়।

এভাবে জ্ঞানীগণ তাঁদের যাবতীয় বিষয়ে স্মৃতি সঞ্চিত ধ্যান-ধারণা ও মননশীল যুক্তি-প্রমাণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন; তাঁরা এর বাইরে অন্যরূপ পরিচয় লাভের অবকাশ পান না। অথচ রাজনীতি সর্বদাই তার চর্চাকারীকে বহির্জগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে বাধ্য করে এবং সেখানে যে অবস্থা দেখা দেয়, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে বলে। এসব বিষয় সর্বদাই অস্পষ্ট থাকে এবং সম্ভবত সেখানে এমন উপাদানও জড়িয়ে থাকে, যদ্দরুন উক্ত অবস্থাকে অন্য কোনো অবস্থার সাথে তুলনা করা বা মিলিয়ে দেখা যায় না। এ কারণেই সার্বিক ধারণার সাথে তার সামঞ্জস্য বিধান বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বস্তুত জনসমাজের কোনো অবস্থাতে অন্য অবস্থার সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ তারা এক বিষয়ে তুল্য হলেও একাধিক অন্য বিষয়ে ভিন্নরূপের অধিকারী হতে পারে।

www.amarboi.org

জ্ঞানীগণ তাঁদের সার্বিক ধারণা ও এক বিষয়কে অনুমান করার যে অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, তার ফলে তাঁরা যখন রাজনীতিতে দৃষ্টি দেন, তখন তাকেও তাঁরা তাঁদের সেই মননশীলতা ও যুক্তি-প্রমাণের কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে চান; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়েন ও অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাথে মানব সমাজের বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অবস্থাও মিলিয়ে নেওয়া যায়; কারণ তাঁরাও এ শাস্ত্রবিদদের ন্যায় তাঁদের মেধাশক্তির চমৎকারিত্বে গভীর তাৎপর্য, অনুমান ও অনুকরণের পন্থা অনুসরণ করে থাকেন এবং পরিণামে ভ্রান্তিতে পড়েন।

তাঁদের তুলনায় সাধারণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও মধ্যম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে বেশি সাফল্যের মুখ দেখতে পান। কারণ তাঁদের মননশীলতার অভাব ও গভীর তাৎপর্য অনুধাবনের অনভ্যাসই তাঁদেরকে প্রতিটি বস্তুকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি অবস্থা ও ব্যক্তিকে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করে। তাঁরা এসব ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনুমান বা সার্বিক ধারণার দ্বারা কাজ চালাতে যান না এবং তাঁদের মননশীলতায় অধিকাংশ স্থানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সীমা অতিক্রম করেন না বা তাকে স্মৃতিসর্বস্ব করে তোলেন না। যেমন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীতে সন্তরণকারী তীরভূমির নৈকট্য ত্যাগ করতে চায় না। কবি বলেছিলেন,—

সন্তরণ করতে গিয়ে আতিশয্য প্রদর্শন করো না;
কারণ নিরাপত্তা তীরভূমিতেই বিদ্যমান।

এর ফলে এ সাধারণ ব্যক্তিগণ তাঁদের রাজনীতি সম্পর্কীয় চিন্তায় নিরাপদ ও জনসমাজের সমস্যা সমাধানে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের এ দৃষ্টিকোণই তাঁদেরকে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং তাঁদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। 'প্রত্যেক জ্ঞানীর চেয়ে তিনি বেশি জ্ঞানী।'[৩৬১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টিও প্রকাশ পায় যে, যুক্তিবিদ্যা ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ নয়; কারণ তাতে অধিকতরভাবে ধারণার ওপর নির্ভর করা হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে তা দূরে অবস্থান করে। কেননা তা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার দ্বিতীয় স্তরের মননশীলতা। সম্ভবত তাতেও সেসব উপাদান বিদ্যমান, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধার সৃষ্টি করে এবং বিশ্বাস্য পর্যায়ে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য বুদ্ধিগ্রাহ্যতার প্রথম স্তরের অবস্থা অন্য প্রকার। কারণ তার সারসংগ্রহ বাস্তবের নিকটবর্তী হওয়ায় অনুরূপ অসুবিধা দেখা দেয় না। তা যতই কল্পনা নির্ভর হোক, ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ের আকৃতি তাতে সংরক্ষিত থাকায় তার বিন্যাসগত সত্যতা সম্পর্কে আভাস দেয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়তার আধার।

---

৩৬১. কোরান; ১২, ৭৬।

www.amarboi.org

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[ইসলামী শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব]

একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ইসলামী দুনিয়ায় শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব। আরবদের মধ্যে শাস্ত্রবিদদের সংখ্যা, কি শাস্ত্রীয় বিষয়গুলোতে, কি মননশীল বিষয়গুলোতে খুবই নগণ্য ও বিরল। তাঁদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন, যাদের বংশ পরিচয় আরবি হলেও ভাগ্য, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষাদান সবই অনারবদের দ্বারা ব্যবস্থিত। অথচ জাতীয়তার ধারা আরবি এবং ধর্মপ্রবর্তক স্বয়ং আরবি।

এর কারণ এই যে, এ জাতি, তার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো প্রকার শাস্ত্র ও শিল্পজ্ঞানের অধিকারী ছিল না। কারণ তখনও তাদের মধ্যে বেদুইন জীবনের অবস্থা ও সারল্য বিদ্যমান ছিল। একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সংবলিত শাস্ত্রীয় বিধানের জ্ঞান তারা রাখতেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই স্মৃতির সাহায্যে এগুলো বর্ণনা করতেন। তারা ধর্মপ্রবর্তক ও তাঁর সহচরদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার ফলে কুরআন ও হাদীসে এসব বিধানের উৎসের সাথে পরিচিত ছিলেন। সমগ্র জাতিই তখন পর্যন্ত বেদুইন; তারা শিক্ষাদানের বিষয় এবং গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ধারা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের উপর কোনো চাপ এখনও সৃষ্টি হয় নি এবং অনুরূপ বিষয়াদির প্রয়োজন তখনও দেখা দেয় নি।

এ অবস্থায় সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সময় কেটে গেছে এবং তাঁরা অনুরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের বাহক হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যকার এ বর্ণনাকারীদেরকে তখন 'কারী' বা পাঠক বলা হত অর্থাৎ তারাই কুরআন পাঠ করতেন এবং এদিক থেকে তারা নিরক্ষর ছিলেন না। কারণ নিরক্ষরতা তখন সাহাবীদের সাধারণ গুণ; কেননা তারা সকলেই বেদুইন। সুতরাং কুরআন পাঠকদেরকে 'কারী' বলার মধ্যে এ অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত বিদ্যমান। বস্তুত তারা তখন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের পাঠকারী। কারণ এ কুরআন ও হাদীস ছাড়া তারা ধর্মীয় বিধান জানতে সক্ষম হন নি এবং হাদীস অধিকাংশ স্থানে কোরানের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা মাত্র। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি দুটি বিষয় রেখে গেলাম; যতক্ষণ এ দুটিকে ধরে রাখবে, বিপথগামী হবে না। এদের একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সুন্নত অর্থাৎ হাদীস।'

অতঃপর সম্রাট হারুনর রশীদ তার পরবর্তী সময় থেকে যখন স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত বর্ণনার ধারা প্রারম্ভ থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়ল, তখন বিনষ্টির ভয়ে কুরআনের

www.amarboi.org

ভাষ্য সংরক্ষণ ও হাদীসের বর্ণনায় বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এর পর বর্ণনার সূত্র জ্ঞান ও বর্ণনাকারীদের যোগ্যতা বিচার করে সূত্রাদির শুদ্ধাশুদ্ধি জানার আবশ্যকতা বোধ হল। এর পর কুরআন ও হাদীস থেকে বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা বেড়ে গেল। এ সঙ্গে ভাষাও বিকৃত হয়ে উঠল; সুতরাং ব্যাকরণের নিয়মাবলি প্রবর্তনের প্রয়োজন এসে উপস্থিত হল। এভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রাদির সবই বিচার-বিবেচনা, সমাধান, আবিষ্কার, যুক্তি-প্রমাণ দান ও অনুমান অনুভবের যোগ্যতায় পর্যবসিত হল। ফলে এগুলো সহায়ক কিছু শাস্ত্রজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে আরবি ভাষার নিয়মাবলি, বিবেচনা ও অনুমানের নিয়মাবলি এবং ইমামী ধ্যান-ধারণাকে শুদ্ধ রাখার নিয়মাবলি হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ অভিনব মতবাদ ও ধর্মদ্রোহিতা তখন ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। এভাবে এসব শাস্ত্র এমন কিছু যোগ্যতার অধীন হয়ে পড়ল, যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা প্রয়োজন। ফলে এসব বিষয় সমগ্র শিল্পকর্মের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হতে লাগল।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, শিল্পকলা নাগরিক জীবনের উপজীব্য এবং আরব বেদুইনগণ তা থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। এ কারণেই শাস্ত্রাদিও নাগরিক জীবনের ফসল হয়ে দাঁড়ায় এবং আরবরা তার চর্চা ও আদান-প্রদান থেকে দূরেই রয়ে গেল। বর্তমানকালে এ নাগরিক জীবনের অধিকারীদের সবই অনারব অথবা তাদের সমতুল্য আশ্রিত পোষ্য ও বিভিন্ন নগরীর অধিবাসী। পরিচয় তাদের যাই হোক না কেন বর্তমানকালে তারা বিভিন্ন শিল্পকর্মে ও পেশায় নাগরিক জীবনের বিচিত্র অবস্থায় অনারবদের অনুসারী। কারণ তারা সেই পারস্য সাম্রাজ্যের কাল থেকে স্থায়ী নাগরিকত্বের অধিকারী বিধায় এসব বিষয়ে বেশি দক্ষ। এ কারণেই আরবি ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সিবুয়াই, তাঁর পরে ফারেসি এবং তাঁদের পরে যুজ্জাজ[৩৬২]; তারা সকলেই বংশধারার দিক থেকে অনারব। কেবলমাত্র আরবি ভাষার পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও আরবদের সাথে মেলামেশায় তা অর্জন করেছেন এবং তার জন্য নিয়মাবলি আবিষ্কার করে পরবর্তী মানব সমাজের জন্য একটি শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ, যারা মুসলমানদের জন্য তা সংরক্ষণ করেছেন, তাদের অধিকাংশ অনারব অথবা অনারব ভাষা ও জীবন পরিবেশে লালিত-পালিত; কেননা এ শাস্ত্রের সমৃদ্ধি ইরাকের অবদান। জানা যায় যে, অসুলে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণের সকলেই অনারব ছিলেন; অনুরূপ এলমে কালামেরও এবং এরূপ কুরআন ভাষ্যকারদের অধিকাংশ। বস্তুত শাস্ত্রাদির সংরক্ষণ ও সংকলনে অনারবরাই অগ্রসর হয়ে এসেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাণীর সত্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'জ্ঞান যদি আকাশের সীমাতেও ঝুলন্ত থাকে, তা হলেও পারস্যবাসীদের একটি দল তার নাগাল পাবে।'

যেসব আরব এ নাগরির জীবন ও তার সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং এর সংস্পর্শে এসে তাদের বেদুইন রীতি-নীতি ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছেন তারাও রাজ্য

৩৬২. আবু ইসহাক ইব্রাহিম আন্‌সারী; মৃত্যু ৩১১ (৯২৩ খ্রি.) হিঃ (৮)।

www.amarboi.org

শাসন ও নেতৃত্বের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আমরা আব্বাসী সাম্রাজ্যেই দেখতে পাই, সেখানে এমন অনেক বিষয় ছিল, যা তাদেরকে শাস্ত্রাদির চর্চা ও অনুসন্ধান থেকে রাজ্য শাসনের দিকেই বেশি আকৃষ্ট করেছে। তখন তারা সাম্রাজ্যের অধিকারী ও তার রক্ষক এবং তার শাসনকার্যে ব্যাপৃত। এ সঙ্গে তাদের মধ্যে শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগের প্রতি ঘৃণার ভাবও জন্ম লাভ করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানও তখন শিল্পকর্মের ন্যায় পেশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত নেতৃবৃন্দ সর্বদাই শিল্পকর্ম ও পরিশ্রমাদির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। এমন কি যা অনুরূপ কার্যাদিতে নিয়োজিত করে, তাও তারা ভালো চোখে দেখেন না। এর ফল হয়েছে এই যে, এসব বিষয় অনারব এবং আরব ও অনারবের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের কবলেই ঠেলে দেয়া হয়েছে। নেতৃবৃন্দ সর্বদাই এসব বিষয় তাদের দ্বারাই চর্চিত হোক, এ অভিমত পোষণ করেছেন। যেমন এটা তাদেরই ধর্ম এবং তাদেরই জ্ঞান-বিজ্ঞান। এর ফলে নেতৃবৃন্দ কখনই নিজেদেরকে এসব বিষয়ের অধিকারী না হওয়ার জন্য তুচ্ছ মনে করেন নি। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার সব কিছুই আরবদের অধিকারচ্যুত হয়ে অনারবদের দখলে চলে গেছে। এমন কি ধর্মীয় শাস্ত্রাদির সঙ্গেও এ নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক বিরল হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁদের কর্মধারাই এ বিরলত্বকে টেনে এনেছে। পরিণামে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছেন। কারণ তারা দেখতে পেয়েছেন যে, এসব জ্ঞানীরা এমন বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত, যার সাথে নেতৃবৃন্দের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাদের রাজ্য শাসন ও রাজনীতিতে এসব বিষয় থেকে কোনো প্রকার সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার উপায় নেই। আমরা ইতিপূর্বে ধর্মীয় পদমর্যাদার আলোচনায় এ সম্পর্কে বলেছি। বস্তুত এটাই সেই কারণ, যদ্দরুন ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অথবা সাধারণ বিষয় চর্চায় অনারবদের প্রাধান্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি।

অবশ্য দর্শনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, তার চর্চা শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদের পৃথক শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার পরই মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে এবং শাস্ত্রচর্চাও ততদিনে শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাও অনারবদের জন্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবং আরবরা তার চর্চাও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা থেকে দূরে সরে রয়েছে। ফলে আরবি ভাষাভাষী অনারবরাই তার দায়িত্ব বহন করেছে এবং সব শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এটি সত্য হয়েছে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

ইসলামী জগতে যতদিন অনারবদের মধ্যে তাদের অঞ্চলগুলোতে ইরাক, খোরাসান ও মাওরায়ান্নাহারের নগর জীবন সমৃদ্ধ ছিল, ততদিন এ অবস্থাই বিরাজ করেছে। তারপর যখন উক্ত অঞ্চলগুলোর আলো নিভে গেছে এবং নগর জীবনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও শিল্পচর্চার যে ঐশী নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তা অন্তর্হিত হয়েছে, তখন অনারবদের মধ্য থেকেও সামগ্রিকভাবে জ্ঞানচর্চার অভ্যাস লোপ পেয়েছে ও তারাও বেদুইন জীবনের মধ্যে আবৃত হয়ে পড়েছে। জ্ঞানচর্চা সমৃদ্ধ নগরজীবনের সাথেই আবার বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমানকালে মিশর অপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল আর কোথাও নেই; তাই জগজ্জননী, ইসলামের সৌধ এবং জ্ঞান ও শিল্পের উৎসভূমি। মাওরায়ান্নাহারে নগর

www.amarboi.org

জীবনের এখনও কিছুটা বাকি আছে; তা সেখানকার সাম্রাজ্যের কল্যাণেই এখনও টিকে রয়েছে এবং সেই তুলনায় তাদের মধ্যেও যে জ্ঞান ও শিল্পকলার একটা অংশ অবশিষ্ট আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাদের মধ্যকার জ্ঞানীদের কিছু রচনা আমাদের এ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। তা পাঠ করেই আমরা এরূপ ধারণা পোষণ করছি। এর রচয়িতা সাদউদ্দিন তাফতাজানী। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে ইমাম ইবনে খতিব ও নাসিরউদ্দিন তুসীর পরে আমরা এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, যা আলোচনা হিসেবে চরম কোনো পর্যায়ের কীর্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন ও চিন্তা করে দেখুন; তাহলে আপনি জগতের বিচিত্র অবস্থার অদ্ভুত অনেক কিছু দেখতে পাবেন। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।'[৩৬৩] তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই জন্য রাজ্য ও তাঁরই জন্য প্রশংসা এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম নির্ভর। তিনি সব প্রশংসার অধিকারী।

৩৬৩. কোরান; ৩, ৪৭।

www.amarboi.org

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[কোনো অনারব যখন তার ভাষায় বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন তার পক্ষে আরবি ভাষাভাষীদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়]

এর রহস্য এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত আলোচনা একমাত্র স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ তাৎপর্যাদির মধ্যেই ঘটে থাকে। এটি ধর্মীয় শাস্ত্রাদি হোক বা মননশীল শাস্ত্রাদি হোক, অবস্থা একই। ধর্মীয়শাস্ত্রাদির অধিকাংশ আলোচনাই শব্দনির্ভর। আবার এ শব্দাবলির উপাদান কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাদি এবং তাদের ভাব প্রকাশক ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। এদের সবই কল্পনা নির্ভর। এমনিভাবে মননশীল শাস্ত্রাদির অবস্থানও স্মৃতির মধ্যে। ভাষা অন্তরস্থিত এসব তাৎপর্যকে প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষাদান ও তর্ক-বিতর্কে কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষা এ ভাবকে পরস্পরের কাছে উপস্থিত করে এবং সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শাস্ত্রাদির এ আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করতে হয়।

শব্দ ও ভাষা অন্তরস্থিত এ ভাবের ওপর যেমন আবরণ ও যবনিকা স্বরূপ, তেমনই তাৎপর্যাদির জন্য বন্ধন ও সীলমোহর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাদের অন্তর্গত অর্থাদি উদ্ধার করতে হলে শব্দাবলি ও অর্থের ওপর তাদের ভাষাগত নির্দেশ অনুধাবন করা আবশ্যক এবং অনুসন্ধিৎসুকে অবশ্যই এ সম্পর্কে উত্তম যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তা না হলে তাকে স্মৃতিনির্ভর আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা থেকেও বেশি বাধা এসে তার সামনে উপস্থিত হবে। যখন তার যোগ্যতা এসব অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে দৃঢ় হয় এবং শব্দাবলি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থ স্মৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়; যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে; তখন বোধ ও অর্থের মধ্যকার এ যবনিকা সম্পূর্ণ দূর হয় অথবা শিথিল হয়ে আসে। তখন সংশ্লিষ্ট আলোচনার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধির কাজটিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই সমুদয় বিষয়টি তখনই সত্য হয়, যখন শিক্ষা-দীক্ষারূপে এবং বর্ণনা ও ভাষণের মাধ্যমে হয়।

কিন্তু যদি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন, পুস্তকের বাধ্যবাধকতা এবং শাস্ত্রাদির সমস্যার সংকলন গ্রন্থের লিপি-রেখাগুলো অনুধাবনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে গ্রন্থে ব্যবহৃত লিপি ও তার রেখাবিন্যাস এবং কল্পনায় কথিত শব্দাদির মধ্যে আরও একটি যবনিকা এসে উপস্থিত হয়। কারণ লিপির রেখা কথিত শব্দাবলির উপর বিশেষ নির্দেশ বহন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ নির্দেশ অবগত হওয়া যায় না, ততক্ষণ বর্ণনার তাৎপর্য উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না এবং অসম্পূর্ণ যোগ্যতার দ্বারা তা জানতে গেলে

www.amarboi.org

পরিচয়ও সেই পরিমাণে অসম্পূর্ণ হয়। এর ফলে পাঠক ও শিক্ষার্থীর সামনে আরও একটি আবরণের সৃষ্টি হয়, যা যোগ্যতার জন্য উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জন ও তার মধ্যে প্রথম আবরণটি অপেক্ষা ঘনীভূত হয়ে ঝুলতে থাকে। সুতরাং যখন তার অর্জিত শব্দ নির্দেশ ও লিপি নির্দেশ সম্পর্কীয় যোগ্যতা দৃঢ় হয়, তখন তার ও উদ্দিষ্ট তাৎপর্যাদির মধ্যকার সব আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলোচনার অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যে-কোনো ভাষায় শব্দাবলি ও লিপির অন্তর্গত তাৎপর্যগুলোর এটাই সাধারণ অবস্থা। এজন্যই অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে বেশি পারদর্শী হয়ে থাকে।

অতঃপর ইসলামী জগতে রাজশক্তি যখন বিস্তৃতি লাভ করল, বহু জাতি এসে তার বশ্যতা স্বীকার করল এবং যারা একদিন নিরক্ষরতার ধারা ও ঐতিহ্য বহন করতেন, সেই পূর্বসূরিদের নবুয়ত ও গ্রন্থনির্ভর শাস্ত্রাদির যুগ অন্তর্হিত হল; তখন রাজশক্তি, পরাক্রম ও বিজিত জাতির সংস্রব তাদের মধ্যে নাগরিকত্ব ও সভ্যতার আবির্ভাব ঘটাল। এক সময়ে যে ধর্মীয় শাস্ত্রাদি শ্রুতিনির্ভর ছিল, তাকেই তারা প্রয়োজনে শিল্পকর্মে পরিণত করলেন। তাদের মধ্যেও যোগ্যতা দেখা দিল এবং সংকলন ও রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তারা অন্যান্য জাতির শাস্ত্রাদিকেও আয়ত্তে আনবার জন্য অনুবাদের মাধ্যমে তাদের শাস্ত্রভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তাদেরকে তাদের চিন্তার আধারে স্থাপন করলেন। তারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অনারব ভাষার কবল থেকে মুক্ত করে তাদের নিজের ভাষায় যেমন আনলেন, তেমনি তাদেরকে পূর্বসূরিদের উপলব্ধির পরিধি থেকে বিস্তৃততর পরিধিতে বিন্যস্ত করলেন। ফলে অনারব ভাষায় এদের মূল গ্রন্থগুলো সম্পূর্ণ বিস্তৃত বিষয়, পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হিসেবে পরিগণিত হল।

এভাবে সমুদয় জ্ঞানসম্ভারই আরবি ভাষায় সঞ্চিত হয়ে উঠল এবং তাদের সংকলন আরবি লিপির রেখায় পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং উপরিউক্ত জ্ঞানাদির চর্চাকারীদের জন্য অন্যান্য ভাষার চেয়ে এ আরবি ভাষার শব্দাবলি ও লিপির নির্দেশ জানা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ল। কারণ অন্য ভাষা তখন বিলুপ্তির পথে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কোনো অবকাশই তখন ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, ভাষা যেমন জিহ্বায় উদ্ভূত একটি যোগ্যতা, তেমনি লিপিকৌশলও হস্তজাত একটি যোগ্যতা। সুতরাং যে জিহ্বা অনারব ভাষার যোগ্যতায় অগ্রগামী হয়, তার পক্ষে আরবি ভাষায় সমান দক্ষতা দেখানো কখনই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে এটাও বলেছি যে, যদি কারও পক্ষে একটি শিল্পকর্মে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তাহলে খুব কমক্ষেত্রেই তার পক্ষে অন্যতর বিষয়ে উত্তম যোগ্যতা প্রদর্শন সম্ভব হয়ে থাকে, এটা একান্তই বাস্তব। সুতরাং শিক্ষার্থী যদি আরবি ভাষা এবং তার শব্দাবলির নির্দেশ ও লিপির প্রকাশভঙ্গি বুঝতে অক্ষম হয় তা হলে তার কাছে তদন্তর্গত তাৎপর্যগুলোও দুর্বোধ্য হয়ে পড়বে; যেমন ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। অবশ্য যদি তার আরবি ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করার সময় অনারব ভাষার যোগ্যতা দৃঢ় না হয়ে থাকে, তা হলেও হতে পারে। যেমন অনারবদের অল্পবয়স্ক সন্তান-সন্ততিরা, যারা অনারব ভাষায় যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই আরবদের মধ্যে লালিত-পালিত

www.amarboi.org

হবার সুযোগ লাভ করেছে। সুতরাং তাদের কাছে আরবি ভাষাই তখন প্রথম ভাষা এবং এর ফলে তাদের আরবি ভাষার তাৎপর্যাদি অনুধাবন করতে কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় না।

অনুরূপ অসুবিধা দেখা দেয় তাদের জন্যও, যারা আরবিলিপি শেখার আগে অনারব লিপিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এজন্য আমরা অধিকাংশ অনারব শাস্ত্রবিদগণকে দেখতে পাই, তারা তাদের অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের বৈঠকে গ্রন্থাদি থেকে ভাষ্যব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে উচ্চস্বরে পাঠ করার প্রতি জোর দেন। তারা এর দ্বারা তাদের মধ্যকার সেসব আবরণ ছিন্ন করার শ্রম থেকে কতকাংশে তাদেরকে অবকাশ দেন এবং সহজে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। বর্ণনায় ও লিপিজ্ঞানে যার যোগ্যতা রয়েছে, তার পক্ষে তার যোগ্যতার সম্পূর্ণতার জন্যই অনুরূপ আচরণের প্রয়োজন হয় না। কারণ তার জন্য তখন লিপি থেকে শব্দাবলি ও শব্দাবলি থেকে অর্থসমূহের হৃদয়ঙ্গম করা সুদৃঢ় সহজাত প্রবৃত্তির মতই হয়ে দাঁড়ায় এবং তার বোধ ও তাৎপর্যাদির মধ্যকার যবনিকা উত্তোলিত হয়।

অবশ্য অনেক সময় একাগ্র শিক্ষা, ভাষার অনুশীলনী ও লিপির অভ্যাস চর্চাকারীকে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে; যেমন আমরা বহু অনারব শাস্ত্রবিদের মধ্যে দেখতে পাই; যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। অন্যদিকে অনুরূপ দক্ষ ব্যক্তিগণকেও তাদের সমপর্যায়ের আরবি জ্ঞানীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, আরবীয়দের যোগ্যতা বেশি উচ্চমান ও দক্ষতাসম্পন্ন। কারণ অনারব জ্ঞানীদের মধ্যে অনারব ভাষাজ্ঞানের অগ্রগামিতার ফলে যে ত্রুটি বিদ্যমান, তা অনিবার্যভাবেই তাদেরকে পশ্চাদপদ করে রাখে।

আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্য অর্থাৎ ইসলামী জগতে শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব, এর দ্বারা এ মন্তব্যে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। কারণ এখানে আমরা অনারব বলতে অনারব বংশোদ্ভূত বোঝাতে চেয়েছি এবং তাদের মধ্যে নাগরিকত্বের একটি দীর্ঘাচরিত বোধ থাকায়; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, তা-ই শিল্পকৌশল ও যোগ্যতার উদ্ভাবক; তারা শাস্ত্রাদিতে পারঙ্গম হয়ে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু ভাষার অনারবত্ব এ শ্রেণীর বিষয় নয় এবং আমাদের মন্তব্যে আমরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

এক্ষেত্রে এ আপত্তিও উত্থাপন করা যায় না যে, গ্রিকরাও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। কারণ তারা তা তাদের প্রথম অর্জিত ভাষাতেই করেছে এবং তার জন্য যে লিপি তারা ব্যবহার করেছে, তাও তাদের মধ্যে সুপরিচিত। অথচ ইসলামী জগতে অনারব শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম অর্জিত ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় জ্ঞান আহরণ করে এবং এমন এক লিপির দ্বারস্থ হয়, যা তাদের যোগ্যতার কাছে অপরিচিত। এজন্য তা তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি। এ বিষয়টি সর্বশ্রেণীর অনারব তথা পারস্যবাসী, রোমীয়, তুর্কি, ফিরিঙ্গী এবং অনারব ভাষাভাষী অন্য সব জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত 'এ বিষয়ে ইঙ্গিতজ্ঞদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।'[৩৬৪]

---

৩৬৪. কোরান; ১৫, ৭৫।

www.amarboi.org

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[আরবি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এর মূল বিভাগ চারটি : অভিধান, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্য। ধর্মীয় শাস্ত্রবিদদের জন্য এদের জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যকীয়। কারণ ধর্মীয় বিধানের সবই কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এসব উৎস আরবি ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে। যেসব সাহাবী ও তাবেয়ী এগুলো বর্ণনা করেছেন, তারাও আরবি ভাষাভাষী এবং এ সম্পর্কীয় যাবতীয় সমস্যার সমাধানও তাদের ভাষায় বিদ্যমান। সুতরাং যিনি ধর্মীয় শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই এ সংশ্লিষ্ট আরবি ভাষার শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

এসব শাস্ত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের অন্তর্গত শক্তির পর্যায়ক্রম অনুসারে যে তারতম্য বহন করে, তার জন্যই তাদের গুরুত্বের তারতম্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনায় একের পর এক প্রতিটি শাস্ত্রের এ প্রকার গুরুত্ব বর্ণিত হবে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারব যে, তাদের মধ্যে ব্যাকরণই সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তার দ্বারাই উদ্দিষ্ট বর্ণনার মৌল উপাদানগুলো নির্দেশিত হয়ে প্রকাশ পায় এবং তার কল্যাণেই কর্তা ও কর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সুতরাং ব্যাকরণ না হলে বর্ণনার মৌল উপাদানই অজানা থাকত।

অবশ্য যথার্থভাবে দেখতে গেলে অভিধানই সকলের অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু অসুবিধা এখানে যে, তাতে আহৃত শব্দাবলির গঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকে এবং এর বিপরীতে ব্যাকরণের বিভক্তি এদের সাথে যুক্ত হয়ে অন্বয়, অন্বিত ও অন্বয়ী নির্দেশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এদের পরিবর্তন ঘটায় ও এদের পূর্বরূপের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই অভিধান অপেক্ষা ব্যাকরণের গুরুত্ব সমধিক; কেননা সে সম্পর্কে সামগ্রিক বোধগম্যতার ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ। কিন্তু অভিধানের অবস্থা তদ্রূপ নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই সর্বসহায়তার আধার।

ব্যাকরণশাস্ত্র

জেনে রাখুন, প্রচলিত ধারণা অনুসারে ভাষা হল বক্তার মনোভাবের বর্ণনা এবং এ বর্ণনা মনোভাব প্রকাশের ইচ্ছা থেকে জিহ্বার ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত হয়। সুতরাং এটি সম্পন্ন হবার জন্য ক্রিয়াশীল অঙ্গের মধ্যে অর্থাৎ জিহ্বার একটি স্থায়ী যোগ্যতার জন্ম হওয়া

www.amarboi.org

প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের পরিভাষা অনুসারে জিহ্বার এরূপ সক্রিয়তার বর্ণনা বিদ্যমান।

মনোভাব প্রকাশের জন্য আরবদের অর্জিত জিহ্বার এ যোগ্যতাকে সর্বোত্তম ও অতিশয় প্রাঞ্জল বলে গণ্য করা হত। কেননা তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলি তাদের নির্দিষ্ট অর্থের চেয়ে বেশি তাৎপর্য বহনের ক্ষমতা রাখত। যেমন আরবি ভাষায় ব্যবহৃত স্বরচিহ্নগুলো কর্তা, কর্ম ও সম্বন্ধকারকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে; যেমন তাতে ব্যবহৃত বর্ণাদি ক্রিয়াপদকে তার স্বরূপের মধ্যে রেখে অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াই সকর্মক করে তোলে। একমাত্র আরবি ভাষাতেই এ ব্যবস্থাটি বিদ্যমান। কিন্তু আরবি ছাড়া অন্য সব ভাষায় প্রতিটি অবস্থা ও অর্থের জন্য তার নির্দেশকারী বিশেষ শব্দের প্রয়োজন হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আরবি ভাষায় যে বর্ণনা আমরা ব্যবহার করি, অনারব ভাষায় তা দীর্ঘতর হয়ে থাকে। এটাই সম্ভবত হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই বাণীর মর্মার্থ, যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমাকে সুসংবদ্ধ বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে এবং আমার জন্য আলোচনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।' সুতরাং আরবদের ভাষায় বর্ণমালা, স্বরচিহ্ন ও শব্দের গঠন প্রক্রিয়ায় মনোভাব প্রকাশের এমন একটি সহজসাধ্যতা বর্তমান, যা তারা কোনো প্রকার শিল্পকৌশল ছাড়াই ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। বস্তুত তা তাদের ভাষার সেই যোগ্যতা, যা তাদের পূর্ববর্তীজনের কাছ থেকে পরবর্তীজন শিখে থাকে; যেমন আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আমাদের ভাষা শিক্ষা করে।

অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে আরবরা হেজাজ ত্যাগ করে অন্যান্য জাতি ও সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করল এবং অনারবদের সাথে মিশে গেল। ফলে অনারবদের মধ্যে যারা আরবি ভাষাভাষী হয়ে উঠল, তাদের উচ্চারণ বৈচিত্র্য শুনে আরবদের এ ভাষাগত যোগ্যতায় পরিবর্তন দেখা দিল। বস্তুত শ্রবণশক্তিই ভাষাগত যোগ্যতার নিয়ামক। সুতরাং শ্রবণশক্তি যখন বিকৃত উচ্চারণ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় ভাষাগত যোগ্যতার মধ্যেও বিকৃতি দেখা দেয়। ফলে জ্ঞানীরা ভাষার এরূপ পরিবর্তন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তারা ভাষার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং অনুরূপভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে কুরআন-হাদীসের অর্থ বোঝাও দুষ্কর হয়ে ওঠার আশঙ্কা করলেন। এর জন্য তারা ভাষার প্রচলিত ধারা থেকে এ যোগ্যতাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কতগুলো নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করলেন। এগুলো সার্বিক ধারণা ও ব্যবহার-বিধির সমতুল্য এবং এগুলো দ্বারা সর্বপ্রকার বক্তব্যকে বিবেচনা করে তুলনীয়কে তুলনীয়ের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। যেমন কর্তা 'উকার' বিশিষ্ট হবে, কর্ম 'আকার' বিশিষ্ট হবে এবং উদ্দেশ্য 'উকার' বিশিষ্ট হবে। এর পর তারা এসব পদের স্বরচিহ্নের পরিবর্তনের ফলে তাদের অর্থ নির্দেশের বৈচিত্র্যকে লক্ষ করলেন এবং তার পরিভাষাগত নাম রাখলেন 'ইরাব' ও যা দিয়ে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, তার নাম রাখলেন 'আমেল'। এরূপ অন্যান্য বিষয়। এভাবে সমুদয় বিষয়টি সম্পর্কে তারা বিশেষ পরিভাষার সৃষ্টি করলেন এবং সব কিছু গ্রন্থে আবদ্ধ করে তাকে তাদের জন্য একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তুললেন। এরূপে শাস্ত্র গড়ে উঠল, তারা তার নাম রাখলেন 'এলমে নুহূ'।

www.amarboi.org

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি হলেন বনি কেনানার আবুল আসোয়াদ আদ্দৌলী। বলা হয়, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর নির্দেশে এ কার্য সম্পাদন করেন[৩৬৫]; কেননা তিনি এ ভাষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন লক্ষ করে তাকে সংরক্ষণের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে গ্রন্থকার অতিক্রান্ত প্রচলিত নিয়মাবলি একত্র বিন্যাস করতে তৎপর হন। তাঁর পরে অনেকেই এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এভাবে রচনার ধারা সম্রাট হারুনুর রশীদের শাসন আমলে খলিল ইবনে আহমদ আল ফরাহিদীর[৩৬৬] কাছে এসে উপনীত হয়। এ সময়ে আরবদের মধ্যে ভাষাগত এ যোগ্যতার অভাব দেখা দেওয়ায় মানুষ এ বিষয়ের পূর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। ফরাহিদী এ ব্যাকরণ শিল্পের সংস্কার সাধন করে তার অধ্যায়গুলোর পূর্ণতা দান করেন। তাঁর কাছ থেকে এ সিবুয়াই[৩৬৭] গ্রহণ করেন এবং এর শাখা-প্রশাখার পূর্ণতা দান ও এর সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রাচুর্য বিধান করেন। এসব কিছু মিলিয়েই তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়, যা পরবর্তীকালে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারী প্রত্যেকের জন্যই আদর্শ হিসেবে বিরাজ করেছে। তারপর এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন আবু আলী আল ফারেসি[৩৬৮] ও আবুল কাসেম আল যুজ্জাজ[৩৬৯]। তাঁরাও এসব গ্রন্থে পূর্বোল্লেখিত আদর্শ গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর এ শিল্পকর্মে আলোচনা দীর্ঘতর হয়েছে এবং কুফা ও বসরার শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এ দুটিই আরবি ভাষাভাষীদের প্রাচীন শহর। ফলে তাঁদের মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের বহর বেড়েছে এবং উক্ত বিষয় শিক্ষাদানের পথ পৃথক হয়ে গেছে। তাঁদের অনুসৃত নিয়মাবলির বিভিন্নতার জন্য কোরানের বহু আয়াতের স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা বেড়ে গেছে এবং পরিণামে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী শাস্ত্রবিদরা সংক্ষেপণের মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং এসব দীর্ঘ আলোচনার সমুদয় সার সংগ্রহ করে তাঁরা অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। যেমন ইবনে মালেক[৩৭০] তাঁর 'তাসহিল' নামক গ্রন্থে এবং অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থে অন্যরা করেছেন। অথবা তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য কেবলমাত্র প্রাথমিক বিষয়গুলোর সার সংগ্রহ করেছেন; যেমন যমখশরী তাঁর 'মুফাস্সাল' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে হাজেব তাঁর 'মুকাদ্দমা' নামক গ্রন্থে এ রীতি অনুসরণ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা অনুরূপ প্রচেষ্টাকে পদ্যের মধ্যেও ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ইবনে মালেকের 'কুবরা' ও 'মুগরা' নামক 'রেজাজ' পদ্যদ্বয়ে এবং ইবনে মুতীর[৩৭১] 'আলফিয়া' নামক 'রেজাজ' পদ্যে এর স্বাক্ষর বিদ্যমান। এভাবে বলতে গেলে এ বিষয়ে রচনার পরিমাণ সংখ্যাও আয়ত্তের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিও

৩৬৫. হযরত আলীর এ নির্দেশের ব্যাপারটি ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই।
৩৬৬. খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী।
৩৬৭. মৃত্যু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে।
৩৬৮. হাসাম ইবনে আহমদ; ২৮৮-৩৭৭ (৯০১-৯৮৭ খ্রি:) হি:।
৩৬৯. আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক; মৃত্যু ৩৭৭ (৯৪৯ খ্রি:) হি:।
৩৭০. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ; মৃত্যু ৬৭২ (১২৭৪ খ্রি:) হি:।
৩৭১. ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল মুতি আজ জোয়াই; মৃত্যু ৬২৮ (১২৩১ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। ফলে পূর্বসূরিদের শিক্ষাধারা উত্তরসূরিদের শিক্ষাধারা থেকে বিভিন্ন এবং এক্ষেত্রে কুফী, বসরী, বাগদাদী ও আন্দালুসী সকলের ধারাই বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে সর্বপ্রকার শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে যে নির্জীবতা আমরা লক্ষ করেছি, তার ফলে এ শিল্পকর্মটিও গতায়ু হতে বসেছে। এ সময়ে মাগরিবে আমাদের কাছে মিশর থেকে এ বিষয়ক একটি সংকলন এসে পৌঁছেছে, যার সাথে সেখানকার জ্ঞানীদের অন্যতম জামালউদ্দিন ইবনে হিশামের নাম যুক্ত আছে।[৩৭২] তিনি এতে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আকারে স্বরচিহ্নাদির বিষয়টির পূর্ণতাব্যঞ্জক আলোচনা উপস্থিত করেছেন। তিনি বর্ণমালা, শব্দাবলি ও বাক্যাদির উপর কথা বলেছেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায়ে স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কিত যেসব পৌনঃপুনিক আলোচনা ছিল, তা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-মুগনী ফিল ইরাব'। তিনি এতে কোরানের স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছেন এবং তাদেরকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে নিয়মানুযায়ী সুসজ্জিত করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করে আমরা এক গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। যথার্থই এটি তাঁর সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মে সমুন্নত দক্ষতা ও পরিপূর্ণ গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। মনে হয়, তিনি এ গ্রন্থে 'মোসেলের' বৈয়াকরণদের পন্থা অনুসরণ করেছেন। মোসেলীরা এ বিষয়ে ইবনে জিন্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে পূর্বোক্ত গ্রন্থকার এমন অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, তা তাঁর যোগ্যতার শক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট অবগতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করে থাকেন'।[৩৭৩]

অভিধানশাস্ত্র

এ শাস্ত্রে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। এর উদ্ভব সম্পর্কীয় বর্ণনা এই যে, যখন ব্যাকরণবিদদের দ্বারা অভিহিত ভাষায় 'ইরাব' তথা স্বরচিহ্নাদির বিকৃতির মাধ্যমে আরবি ভাষার যোগ্যতা বিকৃতির অধীন হতে লাগল, তখনই তার সংরক্ষণের জন্য নিয়মাবলি আবিষ্কৃত হল; যেমন ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু তারপরও অনারবদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার ফলে বিকৃতির পরিমাণ বেড়েই চলল; এমন কি তা শব্দাবলির অর্থকেও বিকৃত করে তুলতে লাগল। ফলে আরবি ভাষার বহু বাকধারাকে ভাষাভাষীদের কাছে নির্ধারিত স্থান থেকে ভিন্নস্থানে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিল। এরূপ হবার মূলে আরবি ভাষাভাষী অনারবদের দ্বারা প্রচলিত অপটু বাকরীতিই দায়ী; কেননা তা প্রাঞ্জল আরবীয় রীতির বিরোধী। এর ফলে গ্রন্থ ও সংকলন রচনার মাধ্যমে শব্দাবলির অর্থ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল; যাতে কুরআন ও হাদীসের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিকৃতির ফলে দুর্বোধ্যতার আশঙ্কা মূর্তিমান হয়ে না ওঠে। এ উদ্দেশ্যে বহু ভাষাবিদজ্ঞানী উদ্যোগী হন এবং উক্ত বিষয়ে সংকলনাদি রচনা করতে লাগলেন।

---

৩৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ; ৭০৮-৭৬১ (১৩০৯-১৩৬০ খ্রি:) হি:।
৩৭৩. কোরান; ৩৫, ১।

www.amarboi.org

এ বিষয়ে সর্বাগ্রে রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন খলিল ইবনে আহমদ আল-ফরাহিদী। তিনি 'কিতাবুল আইন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ বিন্যস্ত সর্বপ্রকার প্রকৃতি, তথা দ্বিবর্ণী, ত্রিবর্ণী, চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দাবলিকে একত্রে গ্রথিত করেন। এ পঞ্চবর্ণীই আরবি ভাষায় বর্ণবিন্যাসের শেষ পর্যায়। গ্রন্থকার এ একত্রীকরণকে সুসংবদ্ধ ধারাবৈচিত্র্যে সম্পন্ন করেছেন।

এর বর্ণনা এই যে, দ্বিবর্ণী শব্দাবলির সবই এক থেকে সাতাশ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে বের হয়ে আসে। এ সংখ্যা সমগ্র বর্ণমালার চেয়ে এক কম। কারণ তাদের একটি বর্ণ এ সাতাশ বর্ণের প্রতিটির সাথে ধরা হয়। ফলে সাতাশটি দ্বিবর্ণী শব্দের উৎপত্তি ঘটে। তারপর তাদের দ্বিতীয়টি অনুরূপভাবে ছাব্বিশটি বর্ণের সাথে ধরা হয়। এভাবে তৃতীয়টি ও চতুর্থটি। এরপর সাতাশ সংখ্যাটিকে আটাশ সংখ্যকের সাথে ধরলে একটি শব্দের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং তাদের সবগুলো সংখ্যার দিক থেকে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে এক থেকে সাতাশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এভাবে সমস্তই একত্র হয়; যেমন গণিতবিদদের কাছে এর জন্য সুপরিচিত প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তা এই যে, প্রথম ও শেষ সংখ্যা একত্রে যোগ করে সমষ্টিকে অর্ধাংশের দ্বারা গুণ করতে হয় এবং তার ফলকে দ্বিবর্ণী শব্দের বৈপরীত্যের জন্য দ্বিগুণিত করতে হয়। কারণ বর্ণমালার বিন্যাসের ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাৎকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এভাবে যা বের হয়ে আসবে, তাই দ্বিবর্ণী শব্দের সমষ্টি।

এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা বিন্যাসে যে সমষ্টি দেখা দেয়, তাতে দ্বিবর্ণী শব্দসংখ্যা গুণ করলে ত্রিবর্ণী শব্দগুলো বের হয়ে আসে। কারণ প্রতিটি দ্বিবর্ণী শব্দের সাথে এক বর্ণ বৃদ্ধি করলেই ত্রিবর্ণী হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দ্বিবর্ণী শব্দগুলো একক বর্ণের আকারে অবশিষ্ট প্রতিটি বর্ণের সাথে যুক্ত হয় এবং এ অবশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা দ্বিবর্ণীর পরে মাত্র ছাব্বিশটি। সুতরাং এগুলো এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যার বিন্যাসে একত্র হয় এবং তার সাথে দ্বিবর্ণী শব্দসমষ্টিকে গুণ করা হয়। এভাবে যে সংখ্যা বের হয়ে আসে, তাকে ছয়ের দ্বারা গুণ করা হয় এবং এটাই ত্রিবর্ণী শব্দসমষ্টির বৈপরীত্যের মান। এর ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বিন্যস্ত সমুদয় শব্দসমষ্টি বের হয়ে আসে। চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দ সম্পর্কেও এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। এভাবেই গ্রন্থকার সমুদয় শব্দবিন্যাসকে একত্র করেছেন এবং পরিচিত ধারা অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমে গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ বিন্যস্ত করেছেন।

তিনি এতে বর্ণাদির উচ্চারণস্থল অনুসারে শব্দবিন্যাসের ওপর নির্ভর করেছেন এবং এদিকে লক্ষ রেখেই কণ্ঠ্যবর্ণের দ্বারা তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন; তারপর যথাক্রমে পরপর মূর্ধণ্য বর্ণ, দন্তমূলীয় বর্ণ ও ঔষ্ঠ্য বর্ণ স্থান পেয়েছে এবং অর্ধব্যঞ্জন তথা স্বরবর্ণগুলোকে সর্বশেষে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কণ্ঠ্যবর্ণাদির মধ্যেও 'আইন' বর্ণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন; কেননা তাই এ শ্রেণীর দূরতম উচ্চার্য বর্ণ। এজন্যই তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'কিতাবুল আইন'। কারণ পূর্বসূরিদের মধ্যে তাঁদের সংকলনাদির অনুরূপ নামকরণের প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা গ্রন্থের প্রথম শব্দ ও পদ যাই থাকুক না কেন, তার দ্বারাই নামকরণ করতেন।

www.amarboi.org

এরপর গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের পরিচয় প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দাবলির মধ্যেই অপ্রচলিত শব্দের সংখ্যা অনেক; কেননা এগুলো দুরুচ্চার্য হওয়ায় আরবি ভাষাভাষীরা খুব অল্পই ব্যবহার করত। এর সাথে দ্বিবর্ণী শব্দাবলিও যুক্ত হয়েছে; বস্তুত এগুলো প্রচলনের দিক থেকে স্বল্পতার অধিকারী। ত্রিবর্ণী শব্দাবলিই সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের প্রচলনের আধিক্যের জন্য গঠনও বেশি। গ্রন্থকার খলিল এ সমুদয়কেই দায়িত্ব সহকারে তাঁর কিতাবুল আইনে একত্র করেছেন এবং অতি উত্তম সম্পূর্ণতার সাথে তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

আন্দালুসের হিশাম আল মুয়াইয়েদ এর জন্য আবু বকর আল যুবায়দী[৩৭৪] চতুর্থ শতাব্দীতে এ কিতাবুল আইন, তার বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতাসহ সংক্ষেপ করেন এবং তার সমুদয় প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ ও অধিকাংশ দৃষ্টান্তমূলক শব্দাদি পরিহার করেন। কণ্ঠস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর এ সংক্ষেপণ খুবই উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

পূর্বাঞ্চলীয় জ্ঞানীদের মধ্যে আল জওহরী[৩৭৫] 'কিতাবুস্‌সিহাহ' রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির শব্দাবলি সুপরিচিত বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। তিনি এতে 'হামজা' (আলিফ) দিয়ে আরম্ভ করেছেন এবং শব্দাদির শেষ বর্ণ অনুসারে শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। কারণ মানুষ এ শেষ বর্ণের ভিত্তিতেই শব্দাদি অনুসন্ধানে বেশি ব্রতী হয়। এজন্য তিনি এ ভিত্তিতে অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রথম বর্ণের ভিত্তিতে ও শব্দাবলিকে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করেছেন এবং পরিচ্ছেদ আকারে শেষ বর্ণাদি পর্যন্ত শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। তিনি খলিলের ন্যায় সমগ্র শব্দসম্ভারকে একত্র করেছেন।

অতএব এ বিষয়ে আন্দালুসবাসীদের মধ্যে দানিয়ার ইবনে সাইয়েদা[৩৭৬] আলী ইবনে মুজাহিদের শাসনকালে 'কিতাবুল মুহকাম' রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে অনুরূপ সামগ্রিকতার পরিচয় রেখেছেন এবং কিতাবুল আইনের বিষয়বিন্যাস অনুসরণ করেছেন। তিনি তাতে শব্দ প্রকরণ ও ধাতুরূপের ব্যবহার তুলে ধরেছেন; ফলে গ্রন্থটি একটি উৎকৃষ্ট সংকলনে পরিণত হয়েছে। তিউনিসের হেফসী সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের অন্যতম আল মুস্তানসিরের সভাসদ মুহম্মদ ইবনে আবুল হুসাইন[৩৭৭] এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস পরিবর্তন করে কিতাবুল সিহাহ-এর ন্যায় শব্দের শেষ বর্ণানুযায়ী বিন্যাস ও শিরোনাম ব্যবহার অনুসরণ করেন। ফলে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এক উদরের যমজ ও এক ঔরসের দুই সন্তানরূপে পরিগণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ভাষাবিদদের মধ্যে 'কেরা'র[৩৭৮] 'কিতাবুল মুনজিদ', ইবনে দুরাইদের 'কিতাবুল জমহরা'[৩৭৯] এবং ইবনে আম্বারীর 'কিতাবুয্ যাহের'[৩৮০] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৩৭৪. মুহম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৩৭৯ (৯৮৯ খ্রি:) হি:।
৩৭৫. ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ; মৃত্যু খ্রি: একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।
৩৭৬. আলী ইবনে ইসমাইল; ৩৯৮-৪৫৮ (১০০৭-১০৬৬ খ্রি:) হি: (?)।
৩৭৭. মৃত্যু ৬৭১ (১২৭৩ খ্রি:) হি:।
৩৭৮. কুরা; আলী ইবনে হুসাইন; খ্রি: দশম শতাব্দী।
৩৭৯. মুহাম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৩২১ (৯৩৩ খ্রি:) হি:।
৩৮০. মুহম্মদ ইবনে কাশেম; ২৭১-৩২৮ (৮৮৫-৯৪০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

আমাদের জানা মতে, এগুলোই অভিধানশাস্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় রচনা। এছাড়াও কিছুসংখ্যক বিশেষ ধরনের শব্দকোষ বিদ্যমান, যাতে একক অধ্যায় অথবা সম্পূর্ণ অধ্যায়সমূহের বিষয় সন্নিবেশের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলোতে শব্দাবলির গাণিতিক সংখ্যা বিন্যাসের ব্যাপারটি গৌণ এবং পাঠক, আপনি অবশ্য লক্ষ করেছেন যে, পূর্বোক্তগুলোতে এ বিন্যাসের বিষয়টি ছিল মুখ্য।

এ শব্দকোষ সম্পর্কীয় অন্য একটি রচনা যমখশরীর রূপক শব্দাবলি সংগ্রহ। তিনি তার নামকরণ করেছেন 'আসাসুল বালাগত'। তিনি তাতে আরবদের দ্বারা ব্যবহৃত সর্বপ্রকার রূপক শব্দ এবং তাদের রূপকগত তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। উপকারিতার দিক থেকে এ গ্রন্থটি অতিশয় উন্নতমানের।

অতঃপর আরবরা যেহেতু কিছুসংখ্যক শব্দকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে তার বিশেষ রূপের জন্য বিশিষ্ট অন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করত, সেজন্য এসব শব্দ প্রচলন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে পৃথক হয়ে দেখা দিত। এর ফলে মানুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত জটিলতার জন্য ভাষা সম্পর্কীয় বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। যেমন তারা সাধারণভাবে যেসব বস্তুতে শুভ্রতা বিদ্যমান, সে সবের জন্য 'আবিয়ায' শব্দের প্রচলন করেছিল। এর পর তারা বিশেষভাবে অশ্বের মধ্যকার শুভ্রতার জন্য 'আশহায', মানুষের জন্য 'আযহার' এবং ছাগলের জন্য 'আমলাহ' শব্দ ব্যবহার করেছে; এমন কি এসব বিষয়ে 'আবিয়ায' শব্দ ব্যবহার অনিয়মিত ও আরবি ভাষা-নীতি থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হয়েছে।

অনুরূপ বিষয় অনুসরণ করে সালাবী[৩৮১] একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি অনন্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে তার নাম রেখেছেন 'ফেকহুল লুগাত'। এ গ্রন্থটি যে-কোনো অভিধানচর্চাকারীর জন্য আরবি ভাষারীতি থেকে বিচ্যুত হবার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার একটি উত্তম অবলম্বন। বস্তুত এক্ষেত্রে বাক্‌বিন্যাসের জন্য শুধু শব্দের প্রাথমিক প্রচলনের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং এ প্রসঙ্গে আরবদের ব্যবহারের বাস্তব প্রমাণও উপস্থিত থাকা দরকার। এ বিষয়টি গদ্যে ও পদ্যে ব্যবহারের জন্য সাহিত্যসেবীদেরই অত্যধিক প্রয়োজনীয়; যাতে তাদের একক শব্দ ব্যবহার ও মিশ্র শব্দগঠনে আরবি প্রয়োগ রীতি থেকে বিচ্যুতি মারাত্মক হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ অনুরূপ কিছু স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কীয় অনিয়ম অপেক্ষাও দূষণীয় ও গর্হিত।

অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে উত্তরসূরিদের অনেকেই যৌগিক শব্দাবলি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যতদূর সম্ভব সামগ্রিকতার সাথে বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন। যদিও এসব প্রচেষ্টাকে চরম পর্যায়ের বলা যায় না, তবুও মোটের উপর অধিকাংশ শব্দ সম্পদই এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচলিত শব্দাবলির সংগ্রহ, যেগুলো আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সহজসাধ্য, তাদের সংখ্যা বর্তমানকালে প্রচুর। যেমন ইবনে সাকিতের[৩৮২] 'আল আলফায', 'সালাব'-এর[৩৮৩] 'আল ফসীহ' এবং অন্যান্যদের অনুরূপ রচনা এদের অনেকগুলো শব্দ সংগ্রহের

---

৩৮১. আবদুল মালেক ইবনে মুহম্মদ; ৩৭০-৪২৯/৩০ (৯৬২-১০৩৭/৩৯ খ্রি:) হি:।
৩৮২. ইয়াকুব ইবনে ইসহাক, মৃত্যু ২৪৩ (৮৫৭ খ্রি:) হি:।
৩৮৩. আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া; ২০০-২৯১ (৮১৬-৯০৪ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

দিক থেকে সংক্ষিপ্ততর। কারণ সংগ্রহকারী শিক্ষার্থীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে এরূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। 'আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং সর্বোত্তম জ্ঞাতা'।[৩৮৪] তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

জেনে রাখুন, যে শ্রুতির দ্বারা অভিধানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, তা একমাত্র আরবদের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। তারা যেভাবে যে অর্থের জন্য এ শব্দাবলি ব্যবহার করেছে, তাই এ শ্রুতির ভিত্তি। এ কথা বলার উপায় নেই যে, তারা এদের প্রচলন ঘটিয়েছে; কারণ ভাষা সম্পর্কে এরূপ ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব এবং তাদের মধ্যে কারও সম্পর্কে অনুরূপ কিছু জানা যায়নি। অনুরূপভাবে অনুমানের দ্বারাও ভাষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না; যতক্ষণ জানতে না পারি যে, তারা এভাবেই ব্যবহার করেছে, ততক্ষণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন সাধারণ মাদকদ্রব্যের দিক থেকে বিবেচনা করে 'আঙ্গুরের রস'-কে অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ এরূপ বিবেচনা করার পদ্ধতি অনুমানের মধ্যেই পড়ে এবং তা একমাত্র ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই গৃহীত হয়ে থাকে। অথচ ভাষার ক্ষেত্রে আমরা এমন ধরনের কোনো কিছু পাই না; তবে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির মধ্যে অনুরূপ কিছু হতে পারে এবং তাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাত্র। এটিই নেতৃস্থানীয় ভাষাবিদদের অভিমত।

যদিও এ ব্যাপারে কাজী,[৩৮৫] ইবনে সুরাইহ[৩৮৬] ও অন্যান্য জ্ঞানীরা অনুমান ব্যবহারের মত পোষণ করেন; কিন্তু এর নেতিবাচক মতটিই সর্বাগ্রগণ্য। এক্ষেত্রে এরূপ ধারণা পোষণ করার কোনো কারণ নেই যে, শব্দাবলির সংজ্ঞা নির্ধারণের মাধ্যমেই অভিধানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে; কারণ এ সংজ্ঞার ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। একটি অপরিচিত শব্দের অস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট পরিচিত অর্থেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এজন্য অভিধানশাস্ত্রের কাজ হল 'এই শব্দের এই অর্থ'—এটিই প্রতিষ্ঠা করা এবং এদুটির মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অলঙ্কারশাস্ত্র[৩৮৭]

আরবি ভাষাতত্ত্ব ও অভিধানশাস্ত্রের আবির্ভাবের পরই ইসলামী জগতে এ শাস্ত্রটির উদ্ভব ঘটেছে। এটাও ভাষাতত্ত্বেরই অন্তর্গত; কেননা এটাও শব্দাবলি, তাদের তাৎপর্য এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার ঘটে, তার বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত। এর বর্ণনা এই যে, কথক তার বক্তব্যের দ্বারা শ্রোতার মনে যেসব বিষয় সঞ্চারিত করতে চায়, তা হল : হয় একক শব্দাবলির ধারণা সৃষ্টি, যা অন্বয়ী, অন্বিত ও পরস্পর সঞ্চারি এবং এসব একক বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয়ের তাৎপর্য নির্দেশ অথবা অন্বিত পদাদি থেকে অন্বয়ীর ও কালাদির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি এবং শব্দ গঠন ও কারক তথা স্বরচিহ্নাদির পরিবর্তনের

৩৮৪. কোরান; ১৫, ৮৬।
৩৮৫. বাকিল্লানী; ভূমিকায় ৮৩ নং টীকা দ্র:।
৩৮৬. ইবনে সুরাইজ (?) সম্ভবত আহমদ ইবনে উমর; ২৪৮-৩০৬ (৮৬৩-৯১৮ খ্রি:) হি:।
৩৮৭. মূলে আছে 'এলমুল বয়ান'; আলোচনায় এর অর্থ রচনাশৈলী করেছি; কিন্তু এস্থলে সামগ্রিক অর্থে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' করতে হয়েছে।

www.amarboi.org

মাধ্যমে তাদের তাৎপর্য নির্দেশ। এ শব্দ ও বাক্যের সমুদয় ব্যাপারটিই ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এর বাইরে ঘটনাবলির সহায়ক বিষয়, কথক ও কর্তার অবস্থা এবং ক্রিয়া সংঘটনের কারণ নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে অবশিষ্ট থাকে। কারণ এসব বিষয় নির্দেশ না করলে মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং বক্তা যখন এগুলো যথাযথ নির্দেশ করতে পারে, তখন সে বক্তব্যকে প্রকাশের সম্পূর্ণতা অর্জন করে। আর যদি তার বক্তব্যে অনুরূপ কোনো বিষয় না থাকে, তা হলে উক্ত বক্তব্য আরবি বাকরীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তাদের বক্তব্যের পরিধি ব্যাপক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের ভাষার বিশিষ্ট বাগধারা বিদ্যমান; প্রাঞ্জলতা ও স্বরচিহ্নাদির পরিপূর্ণতা সহ-ই এগুলো প্রচলিত।

পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন, তাদের এ বক্তব্য 'যায়েদ আমার কাছে এসেছে' কীভাবে তাদের এ বক্তব্য 'এসেছে আমার কাছে যায়েদ' থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কারণ এ উভয় বাক্যে প্রথমে আগত শব্দটিই বক্তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি বলেছে, 'এসেছে আমার কাছে যায়েদ', সে অন্বিত ব্যক্তি অপেক্ষা 'আগমন'-কেই গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং যে ব্যক্তি বলেছে, 'যায়েদ আমার কাছে এসেছে', সে অন্বয়ী ক্রিয়া 'আগমন' অপেক্ষা ব্যক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এভাবে একটি বাক্যের সমুদয় অংশকেই তাদের অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম ও পদাশ্রিত নির্দেশকের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। অনুরূপভাবে বাক্যের উপর অন্বয়ের গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারটিও ঘটে থাকে। যেমন তাদের বক্তব্য—'যায়েদ দণ্ডায়মান' এবং 'অবশ্যই যায়েদই দণ্ডায়মান[৩৮৮] : এদের প্রত্যেকটিই অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে পৃথক; যদিও স্বরচিহ্নাদির ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সমতা রয়েছে। প্রথমটিতে গুরুত্ব আরোপের কোনো পদ নেই। বস্তুত এটি সেই শ্রোতার জন্য, যে ইতিপূর্বে কিছুই জানত না; দ্বিতীয়টিতে 'অবশ্যই' পদের দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি এমন এক শ্রোতার জন্য, যে জ্ঞাত; অথচ স্বীকার করতে ইতস্তত করছে। তৃতীয়টিতে গুরুত্ব আরোপ বৃদ্ধি করে এমন এক শ্রোতাকে বলা হয়েছে, যে সত্যকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে। বস্তুত এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন। অনুরূপভাবে আপনি যদি বলেন, 'আমার কাছে ব্যক্তিটি এসেছে'; পুনরায় এ একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন, 'আমার কাছে ব্যক্তি এসেছে'[৩৮৯]; তা হলে এ প্রকার অনির্দেশের দ্বারা তার প্রতি আপনার সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছাকেই বোঝাবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি এমনি এক ব্যক্তি, অন্য কাউকেও যার স্থলাভিষিক্ত করা যায় না।

অতঃপর অন্বিত বাক্য কখনও নির্দেশসূচক হয়; তার একটি বাস্তব তাৎপর্য থাকে, যার সাথে প্রথমেই সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। আবার কখনও আজ্ঞাসূচক হয়; যার কোনো বাস্তব তাৎপর্য নেই। যেমন অনুজ্ঞা ও তার বিভিন্ন প্রকার। এর পর কখনও দুটি বাক্যের মধ্যকার সংযোজক অব্যয় পরিত্যাগ করা হয়; যদি দ্বিতীয়টিকে সে অনুযায়ী স্বরচিহ্নাদি ব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকে। এর ফলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রশংসা,

৩৮৮. মূলে আছে—'যায়েদুন্ কায়েমুন্'; যায়েদুন্ লা কায়েমন্ এবং ইন্না যায়েনান লা কায়েমুন্।
৩৮৯. 'যা আনি আর্ রাজুলু' এবং যাআনি-রাজুলুন্।

www.amarboi.org

গুরুত্ব অথবা পরিবর্ত আকারে সংযোজকবিহীন বাক্যে রূপান্তরিত হয়। অথবা দ্বিতীয়টিকে স্বরচিহ্নাদি প্রয়োগের কোনো সুযোগ না থাকলে সংযোজক অব্যয়ই নির্ধারিত হয়ে থাকে। আবার কখনও প্রসঙ্গ অনুসারে বক্তব্য দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করতে হয় এবং বক্তা সেই অনুপাতে তার বক্তব্য উপস্থিত করেন। আবার কখনও দেখা যায়, একক শব্দ ব্যবহার করে তার বাচ্যার্থ গ্রহণ করা হয় না। বরং তার রূঢ়ার্থ নির্দেশ করা হয়। যেমন আপনি বলেন, 'যায়েদ সিংহ'; এতে আপনি বাচ্যার্থক সিংহত্ব বোঝাতে চান না, বরং তার রূঢ়ার্থক বীরত্বই আপনার উদ্দিষ্ট। তাকেই আপনি যায়েদের সাথে অন্বিত করেন। এরূপ অর্থগ্রহণকে 'উপমা' বলা হয়।

কখনও আপনি একটি বাক্যাংশ ব্যবহার করে তার রূঢ়ার্থ বোঝাতে চান; যেমন আপনি বলেন, 'যায়েদ প্রচুর ডেগের ছাইয়ের অধিকারী।' আপনি এর দ্বারা এর রূঢ়ার্থক তাৎপর্য অর্থাৎ দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার কথাই বুঝিয়ে থাকেন। কেননা ছাইয়ের প্রাচুর্য এ দুটি বিষয় থেকেই জন্মে এবং পরিমাণে তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের সমুদয় ব্যাপারটিই শব্দার্থে অতিরিক্ত তাৎপর্য নির্দেশক। বস্তুত এগুলো এমন কিছু বাস্তব দৃশ্য ও অবস্থার পরিচায়ক, যা বোঝাবার জন্য শব্দাবলির মধ্যে প্রসঙ্গ অনুসারে কিছু দৃশ্য ও অবস্থা নির্ধারিত করা হয়েছে।

সুতরাং 'অলঙ্কার' নামাঙ্কিত এ শাস্ত্র অনুরূপ দৃশ্য, অবস্থা ও প্রসঙ্গ বোঝাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে এবং তার আলোচ্য বিষয় তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম প্রকার শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ দৃশ্য ও অবস্থাদি তাদের সর্বপ্রকার প্রসঙ্গসহ আলোচনা করে এবং একে বলা হয় 'এলমুল বালাগত' বা বাকবৈদগ্ধ্য শাস্ত্র। দ্বিতীয় প্রকার রূঢ়ি শব্দ ও তার রূঢ়ার্থক তাৎপর্য, যাকে উপমা ও রূপক বলা হয়, তাই আলোচনা করে এবং এর নাম রাখা হয় 'এলমুল বয়ান' বা রচনাশৈলী শাস্ত্র। এ দুই প্রকারের সাথে অন্য একটি প্রকারও এসে যুক্ত হয়; তার উদ্দেশ্য হল অলঙ্করণের দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি। অনুরূপ অলঙ্করণ সমবিভক্ত 'ছন্দোবদ্ধ গদ্য' (সাজ), শব্দের সমতুল্যতাজনিত 'অনুপ্রাস' (তাজনিস), খণ্ডিত বাক্যগুচ্ছের মধ্যকার 'ছন্দস্পন্দ' (তারসি), শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট গূঢ়ার্থ প্রকাশক 'ব্যঞ্জনা' (তওরিয়া), বিরোধের মধ্যে তুলনায় সামঞ্জস্যের প্রতীতি 'নিদর্শনা' (তিবাক) এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা সাধিত হয়। তাঁরা একে 'এলমুল বদি' বা অলঙ্কারশাস্ত্র নামে অভিহিত করেন।

অবশ্য আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা এ তিন প্রকারের সমুদয়কেই 'এলমুল বয়ান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত এ দ্বিতীয় প্রকারের নাম; কারণ পূর্বসূরিরা এ ব্যাপারেই সর্বপ্রথম আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। পরে এর সাথে একের পর এক অন্যান্য বিষয় এসে যুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে জাফর ইবনে ইয়াহিয়া,[৩৯০] আল জাহেয[৩৯১] কুদামা[৩৯২] ও সমতুল্য অন্যান্যরা সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধীরে

৩৯০. সম্ভবত যায়ামেকী।
৩৯১. এ অধ্যায়ের ১৭২ নং টীকা দ্র:।
৩৯২. কুদামা ইবনে জাফর; খ্রি: নবম শতাব্দী।

www.amarboi.org

ধীরে এ শাস্ত্রের বিষয়াদি পূর্ণতা লাভ করেছিল। পরে সাক্কাফী[৩৯৩] এসে এর সার সংগ্রহ, এর সমস্যাদি পরিমার্জনা এবং এর অধ্যায়গুলো অব্যবহিত পূর্বে আমাদের বর্ণিত ধারা অনুসারে সুবিন্যস্ত করেন এবং ব্যাকরণ, শব্দ-প্রকরণ ও রচনাশৈলীর উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মেফতাহ' রচনা করেন। তিনি এ শাস্ত্রটিকে তাঁর গ্রন্থের কতকাংশে স্থান দিয়েছেন। পরবর্তীগণ তাঁর গ্রন্থ থেকেই এ বিষয় গ্রহণ করেছেন এবং তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই বর্তমানকালে প্রচলিত রয়েছে। সাক্কাফী স্বয়ং এর সংক্ষেপ করে তাঁর 'আত্তিবিয়ান' নামক গ্রন্থ, ইবনে মালেক[৩৯৪] 'আল মিসবাহ' নামক গ্রন্থ এবং জালাল উদ্দিন কাযবিনী[৩৯৫] 'আল ইজাহ' ও 'আত্তালখিস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ শেষোক্ত গ্রন্থটি পরিসরের দিক থেকে 'আল ইজাহ' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিধায় পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে এর চাহিদা সমধিক এবং অন্যগুলো অপেক্ষা এর ব্যাখ্যা পুস্তক বেশি ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সামগ্রিকভাবে পূর্বাঞ্চলবাসীরা এ শাস্ত্রে পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বশি দক্ষতার অধিকারী। এর কারণ, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, এই যে, বিষয়টি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে পরিপূর্ণতা বিধায়ক এবং এরূপ পরিপূর্ণতা বিধায়ক শিল্পকর্ম একমাত্র সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেই পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় বেশি জনবসতির অধিকারী; এ কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। অথবা আমরা বলব, অনারবদের জন্যই এরূপ ঘটেছে এবং পূর্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। যেমন যমখশরীকৃত কোরানের ভাষ্য; তার সমুদয় আলোচনাই এ শাস্ত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; বরং বলা যায়, এটিই তার উপজীব্য। মাগরিববাসীরা এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা থেকে মাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। তারা একেই কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় সমুদয় শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা এর জন্য বিচিত্র নাম, বিভিন্ন অধ্যায় এবং নানাবিধ শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করেছে। তাদের ধারণা এই যে, তারা একে আরবি ভাষাতত্ত্বের সামগ্রিকতায় বিধৃত করেছেন; কিন্তু সত্য বলতে কি, একমাত্র শব্দগত সৌন্দর্য সৃষ্টির লালসাই তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করেছে। বস্তুত অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে একান্তই সহজ এবং বাকবৈদগ্ধ ও রচনাশৈলীর অন্তর্গত মননশীলতার সূক্ষ্মতা ও তাৎপর্যের দুরূহতা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়েছে বলেই তারা এ দুটিকে পরিত্যাগ করেছে।

আফ্রিকিয়াবাসীদের মধ্যে যিনি এ অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর নাম ইবনে রশিক[৩৯৬]। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল উমদা'। আফ্রিকিয়া ও আন্দালুসের অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

জেনে রাখুন, এ শাস্ত্রের ফলশ্রুতি একমাত্র কোরানের অননুকরণীয় বাকশৈলী অনুধাবনের জন্যই; কেননা তার অননুকরণীয়তা যাবতীয় অবস্থার চাহিদা অনুসারে

৩৯৩. ৩৫৩ নং টীকা দ্র:।
৩৯৪. ৩৭০ নং টীকা দ্র:।
৩৯৫. মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান; ৬৬৬-৭৩৯ (১২৬৭-১৩৩৮ খ্রি:) হি:।
৩৯৬. ভূমিকার ৮নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

শাব্দিক ও আর্থিক তাৎপর্য নির্দেশে সমর্থ হয়েছে। এজন্য তা পূর্ণতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তদুপরি তার বক্তব্য উপস্থাপনে বিশেষ শব্দের ব্যবহার পরিমার্জনা, উত্তম গঠন ও বিন্যাসে পূর্ণতা লাভ করেছে। বস্তুত এটাই কোরানের অনুকরণীয়তা, যা উপলব্ধি করতে মেধাশক্তি অপারগ হয়ে ওঠে। একমাত্র যার আরবি ভাষার সংস্পর্শ লাভ ঘটেছে এবং তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তার পক্ষেই স্বীয় রসগ্রহিতার অনুপাতে এ অননুকরণীয়তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এ কারণেই যেসব আরব কুরআন প্রচারকের কাছ থেকে তা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁদের স্থান ছিল অতি উন্নত। কারণ তাঁরাই ছিলেন বাণীর দিকপাল ও বর্ণনার সম্রাট। তাঁদের মধ্যেই রসগ্রাহিতার পূর্ণতা ও বিশুদ্ধি ছিল সমধিক। এ শাস্ত্রের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকার কথা ছিল কুরআন ভাষ্যকারদের; অথচ পূর্বসূরিদের অধিকাংশ ভাষ্যেই এ বিষয়ে উদাসীনতা বিদ্যমান। এর পর জারুল্লাহ্ যমখশরী আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর বিখ্যাত তফসীর রচনা করলেন। তিনি কোরানের সেই সমস্ত আয়াত অনুসন্ধান করে এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিষ্ঠা দিলেন, যা দিয়ে তার অননুকরণীয়তার কতকাংশ প্রকাশ পেতে পারে। এর ফলে তিনি সব তফসীরের উপর স্বীয় রচনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। আহা, তিনি যদি কোরানের এ বাকবৈদগ্ধ চয়ন করে অভিনব মতামতের প্রতিষ্ঠা না করতেন! এ কারণেই আহলে সুন্নতের অধিকাংশ লোকই এ গ্রন্থের বাকবৈদগ্ধ্যগত পুঁজি সত্ত্বেও তা পাঠ করতে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আহলে সুন্নতের ধ্যান-ধারণায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এ শাস্ত্রেও তার কিছু পরিমাণে যোগ্যতা বিদ্যমান; অন্তত যিনি গ্রন্থকারের আলোচনার যোগ্য উত্তর দানে সমর্থ অথবা যিনি অভিনব মতামতের স্বরূপ বুঝতে পেরে তা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম; উক্ত গ্রন্থ পাঠে তার বিশ্বাসের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এ গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে এজন্য নির্ধারিত হয় যাতে পাঠক অভিনব ও কাল্পনিক মতামত থেকে নিজেকে রক্ষা করে কোরানের অননুকরণীয়তা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারে। 'আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ দেখিয়ে থাকেন।'[৩৯৭]

সাহিত্যশাস্ত্র

এ শাস্ত্রের নিজস্ব এমন কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার উপর বহিরাগতের প্রভাব প্রতিষ্ঠা অথবা তার নিরসনের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। বস্তুত এর ফলাফলই ভাষাবিদদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এর স্বরূপ হল, আরবি ভাষাভাষীদের রীতি ও ধারা অনুসরণ করে গদ্যে ও পদ্যে দক্ষতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা আরবি ভাষার এমন সব বিষয় একত্র করেন, যা দিয়ে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। যেমন— উচ্চ শ্রেণীর কাব্য, প্রাঞ্জল ও সুসমন্বিত ছন্দোবদ্ধ গদ্য এবং এগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ছড়ানো অভিধান ও ব্যাকরণের বিভিন্ন সমস্যা। যে-কোনো উদ্যোগী পাঠক এগুলোর মধ্য থেকে আরবি ভাষারীতির নিয়মাবলি জেনে নিতে পারে। এর সাথে আরবের প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলিও বিবৃত হয় এবং এর দ্বারা তাদের

৩৯৭. কোরান, ৫, ৬০ অনুরূপ।

www.amarboi.org

কাব্যান্তর্গত এ সম্পর্কীয় বর্ণনা বুঝে নেওয়া সহজ হয়। অনুরূপভাবে তাঁরা বংশধারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং সাধারণ ইতিহাসও সংগ্রহ করেন। এ সব কিছুরই উদ্দেশ্য হল যাতে অনুসন্ধানকারীর কাছে আরবি ভাষা সম্পদ, তার রীতিনীতি ও বাকবৈদগ্ধ্যের কোনো দিকই লুক্কায়িত না থাকে। কারণ এতদসম্পর্কীয় যোগ্যতা একমাত্র এসব বিষয়ের যথাযথ সংরক্ষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটি বোঝার জন্য যা কিছু দরকার, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

অতঃপর ভাষাবিদরা যখন এ শাস্ত্রটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যান; তখন তারা বলেন, সাহিত্য হল আরবি কাব্য ও তার ইতিহাস সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষাতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত জ্ঞান আহরণ করা। ধর্মশাস্ত্র বলতে তাঁরা কুরআন ও হাদীসকেই বুঝিয়েছেন। কারণ আরবি সাহিত্য জগতে এ দুটি বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রবেশাধিকার খুবই কম। অবশ্য উত্তরসূরিগণ এক্ষেত্রে অলঙ্কারশাস্ত্রের শৈল্পিক উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং তারা কাব্যে ব্যঞ্জনা ও তাদের সরল গদ্যে বিচিত্র বিষয়ের উপমা ব্যবহার করেছেন। এর ফলে এ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষা জেনে নিতে হয়; যাতে এ সম্পর্কে তার বোধশক্তি স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষাদানের বৈঠকে আমরা আমাদের উস্তাদের কাছে শুনেছি, এ শাস্ত্রের মূলনীতি ও স্তম্ভ হল চারটি সংকলন গ্রন্থ। এগুলো হল ইবনে কুতাইবা রচিত 'আদাবুল কাতেব',[৩৯৮] মুবার্রাদ রচিত 'কিতাবুল কামেল,[৩৯৯] জাহেয রচিত 'কিতাবুল বয়ান ও ত্তিবিয়্যন'[৪০০] এবং আবু আলী আল কালী আল বাগদাদী রচিত 'কিতাবুন্ নাওয়াদের'।[৪০১] এগুলো ছাড়া অন্য সবই এদের অনুগামী ও বিস্তারিত তৎপরতা মাত্র। এ বিষয়ে আধুনিকদের বহু রচনা বিদ্যমান।

প্রাথমিক যুগে সঙ্গীত এ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কারণ তা কবিতারই অনুসারী বিষয় এবং সঙ্গীত বলতে তার উপর আরোপিত সুরকেই বোঝায়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট পদমর্যাদার লেখক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আরবি কাব্যের রীতি-নীতির সাথে পরিচিত হবার বাসনায় সঙ্গীতের চর্চা করতেন। তখন এর চর্চাকে ব্যক্তিচরিত্রের বিশ্বস্ততা ও সুচারুতার ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে গণ্য করা হত না।[৪০২] কাজী আবুল ফেরাজ ইস্পাহানীর[৪০৩] ন্যায় স্বনামধন্য জ্ঞানী এ বিষয়ে তাঁর 'আল আগানী' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি আরবদের ইতিহাস, কাব্য, বংশধারা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাম্রাজ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ বর্ণনার ভিত্তি হিসেবে সম্রাট রশীদের জন্য গায়কদের রচিত একশটি সুরকে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা একান্তই ব্যাপক ও সম্পূর্ণ। আমার জীবনের

---

৩৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম; ২৯৩-২৭০/৭৬ (৮২৮-৮৮৪/৮৯ খ্রি:) হি:।

৩৯৯. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ; ২১০-২৮৫ (৮২৫-৮৯৮ খ্রি:) হি:।

৪০০. এ অধ্যায় দ্র:।

৪০১. ইসমাইল ইবনে কাসেম; ২৮০-৩৫৬ (৮৯৩-৯৬৭ খ্রি:) হি:।

৪০২. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে—'মদিনা ও অন্যত্র বসবাসকারী প্রাচীন মুসলিম মণীষীগণ এ বিষয়ে সকলের জন্য আদর্শ স্থানীয়।'—এ বাক্যটি বিদ্যমান।

৪০৩. আলী ইবনে হুসাইন; ২৮৪-৩৫৬ (৮৯৮-৯৬৭ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

শপথ, এ গ্রন্থ আরবদের ঐতিহ্যভাণ্ডার এবং তাদের কাব্য, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে সৌন্দর্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের এক মহৎ সংকলন। আমাদের জানা মতে এ গ্রন্থের সমতুল্য বিষয়ানুসারী অন্য কোনো গ্রন্থ নেই। এ মহান গ্রন্থ সেই সমৃদ্ধি বহন করছে, যা একজন সাহিত্যসেবীর কামনার ধন। অথচ তার কাছে উপনীত হবার যোগ্যতা কোথায়!

পাঠক, আমরা ইতিপূর্বে ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছি, আসুন, এক্ষণে আমরা তাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। আল্লাহই যথার্থতার পথ প্রদর্শনকারী।

www.amarboi.org

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[ভাষা একটি শিল্পগত যোগ্যতা]

জেনে রাখুন, ভাষার সমুদয় ব্যাপারটিই এমন একটি যোগ্যতা, যা শিল্পকর্মের সাথে তুলনীয়। বস্তুত তা মনোভাব প্রকাশের জন্য জিহ্বার দ্বারা অর্জিত এক বিশেষ যোগ্যতা। এ কারণেই এ যোগ্যতার সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য প্রকাশভঙ্গিতেও ভালো-মন্দের পার্থক্য হয়ে থাকে। এর বহিঃপ্রকাশ যতটা না শব্দাবলির ক্ষেত্রে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বাকবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ শব্দাবলিকে সুবিন্যস্ত করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা যখন অর্জিত হয়, যখন তা উদ্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশের যোগ্য হয়ে ওঠে এবং যখন তা রচনার পারম্পর্য রক্ষা করে প্রসঙ্গের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়ে দাঁড়ায়, তখন বলতে গেলে বক্তা শ্রোতার মনে ভাব সঞ্চারের চরম সীমায় উপনীত হয়ে থাকে। একেই বাকবৈদগ্ধ্য বলা হয়।

এ যোগ্যতা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক আবর্তন ছাড়া অর্জিত হয় না। কারণ ক্রিয়া প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠিত হলে তার স্বরূপের মধ্যে একটি গুণের আবির্ভাব ঘটে এবং এরূপ বারংবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা অনুরূপভাবে পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি পেয়েই তা যোগ্যতা অর্থাৎ স্থায়ী গুণে পরিণত হয়।

এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে আরবদের মধ্যে আরবি ভাষার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল, তখন যে-কোনো আরবি ভাষাভাষী তার গোত্রের বক্তব্য শুনে, তাদের ভাষণের রীতি-নীতি অনুধাবন করে এবং উদ্দিষ্ট ভাব প্রকাশে তাদের ভঙ্গি অনুসরণ করে সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে পারত। যেমন একটি শিশু একক শব্দাবলির নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারকে প্রথম শুনে শিক্ষা করে এবং পরে তাদের বিন্যাসধারাও শুনে শিক্ষা করে নেয়। তারপর অনবরত তার এ শ্রুতি নবীনতর হতে থাকে—প্রতিটি বক্তার কাছ থেকে সে ভাষার ব্যবহারকে বারংবার শুনতে থাকে এবং পরিণামে তার এ অবস্থা যোগ্যতা ও স্থায়ী গুণে রূপান্তরিত হয়ে সেই ভাষাভাষীদেরই একজন হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবেই ভাষা ও বাকভঙ্গি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সংক্রমিত হয় এবং এভাবেই তা অনারব ও শিশুরা শিক্ষা করে। এটাই সাধারণ লোকের সেই বক্তব্যের অর্থ, যাতে তারা বলে থাকে, আরবি ভাষা আরবদের স্বাভাবিক গুণ অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রাথমিক যোগ্যতা থেকেই তা আহরণ করেছে; অন্যদের কাছ থেকে নয়। তারপর অনারবদের সংস্পর্শে এসে মুজার তথা প্রাচীন আরবদের এ যোগ্যতা বিকৃত হয়ে গেছে।

www.amarboi.org

অনুরূপ বিকৃতির কারণ এই যে, কোনো এক পুরুষের নবজাতক মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন কিছু ভঙ্গি শুনতে পেল, যা আরবদের ভঙ্গি থেকে বিভিন্ন। স্বভাবতই সে অনুরূপ ভঙ্গিতে তার নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করবে এবং অনারবদের সাথে মিশ্রণের আধিক্য এর অনিবার্যতা ফুটিয়ে তুলবে। এ সঙ্গে সে আরবদের ভঙ্গিও শুনতে থাকবে; ফলে এ বিষয়টি তার কাছে মিশ্রিত হয়ে পড়বে এবং সে এ থেকে কিছু ও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর ফলে তার যোগ্যতা একদিন নতুন রূপ লাভ করবে এবং তা পূর্বের যোগ্যতা থেকে নিকৃষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। আরবি ভাষার বিকৃতির এটাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এ কারণেই কোরায়েশ গোত্রের ভাষা আরবের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কারণ তারা চতুর্দিক থেকে অনাবর সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করত। এর পর কোরায়েশদের পাশে যারা ছিল, সেই সকিফ, হুযাইল, খুজাআ, বনি কেননা, গতফান, বনি আসাদ, বনি তমিম প্রভৃতি গোত্রের ভাষা। কিন্তু যারা কোরায়েশদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করত, যেমন রবিয়া, লখাম, জুযাম, গস্‌সান, ইয়াদ, কুযাআ এবং পারসিক, রোমীয় ও হাবশী জাতিগুলো প্রতিবেশী ইয়ামেনের আরবরা, তাদের সকলের ভাষাই অনারব সাহচর্যের দরুন অসম্পূর্ণ যোগ্যতায় পরিণত হয়েছিল। আরবি ভাষাশিল্পীরা এক্ষেত্রে কোরায়েশদের কাছ থেকে অন্যান্য গোত্রের অবস্থানের দূরত্ব বিচার করেই সংশ্লিষ্ট গোত্রের ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির প্রমাণ উপস্থিত করতেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ এবং তিনি সহায়তার আধার।

www.amarboi.org

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্তমান আরবি একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং মুজার ও হিমিয়ারের ভাষা থেকে এটা ভিন্ন]

এর বর্ণনা এই যে, আমরা আরবি ভাষাকে মনোভাব প্রকাশে ও উদ্দিষ্ট নির্দেশে মুজারী বাকরীতিরই অনুসারী দেখতে পাই। একমাত্র কর্ম থেকে কর্তাকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত স্বরচিহ্নাদিই তা থেকে লোপ পেয়েছে। ফলে তারা এর পরিবর্তে অগ্র-পশ্চাৎকরণ এবং উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশক চিহ্নাদি ব্যবহার করেছে। অবশ্য রচনাশৈলী ও বাক্‌বৈদগ্ধ্য মুজারী বাকরীতিতেই বেশি ও সুস্পষ্ট। কারণ তাতে শব্দাবলি স্বয়ং নির্ধারিত তাৎপর্যের নির্দেশবাহী। উক্ত তাৎপর্য নির্দেশের জন্য যা অবশিষ্ট থাকে, তা হল প্রসঙ্গের প্রয়োজন এবং একেই 'প্রসঙ্গের সম্প্রসারণ' বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি তাৎপর্যের সাথে অনুরূপ প্রসঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থান অত্যাবশ্যকীয়; সুতরাং মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব প্রসঙ্গের বিবেচনা করা দরকার; কেননা তারাই মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। সব ভাষাতেই এসব প্রসঙ্গজ্ঞাপক শব্দাবলি প্রচলনের মাধ্যমেই বিশিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু আরবি ভাষায় এগুলো নির্দেশ করার জন্য একমাত্র শব্দাবলির বিন্যাস ও অন্বয় সৃষ্ট অবস্থাবলি তথা অগ্র, পশ্চাৎ, উহ্য ও কারক চিহ্নাদি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কখনও অব্যয় শ্রেণীর বর্ণাদির দ্বারাও তা নির্দেশিত হয়। এজন্যই এমন প্রসঙ্গ নির্দেশের তারতম্য কারণ আরবি ভাষায় বক্তব্যের পর্যায়গত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অথচ এমন বৈশিষ্ট্যের জন্য আরবি ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ সংক্ষিপ্ততর এবং শব্দাবলি ও বর্ণনার পরিধি অন্যান্য সব ভাষা থেকে স্বল্প হয়।

এটাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাণীর তাৎপর্য; তিনি বলেছেন, 'আমাকে সুসংবদ্ধ বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে এবং আমার বক্তব্যকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হয়েছে।' পাঠক, এ বিষয়টি ইসা ইবনে উমর[৪০৪] থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা দিয়ে বিবেচনা করুন। তাঁকে ব্যাকরণবিদদের কেউ বলেছিলেন, আমরা আরবদের বক্তব্যে পুনরুক্তি দেখতে পাই; তারা বলে, যায়েদ দণ্ডায়মান, অবশ্য যায়েদ দণ্ডায়মান ও অবশ্যই যায়েদ দণ্ডায়মান; অথচ এগুলোর অর্থ একই। এর উত্তরে তিনি তাকে বলেছিলেন, এদের অর্থ বিভিন্ন। প্রথমটি, সেই ব্যক্তির জন্য, যে যায়েদের দণ্ডায়মান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নয়; দ্বিতীয়টি, যে তা অবগত হয়েও স্বীকার করতে ইতস্তত করছে এবং তৃতীয়টি, যে

৪০৪. মৃত্যুকাল ১৪৯ (৭৬৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

ব্যক্তি অবগত হয়েও অস্বীকার করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। সুতরাং অবস্থার বিভিন্নতায় তাদের অর্থ নির্দেশও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরূপ বাকবৈদগ্ধ্য ও রচনাশৈলী আরবরা ক্রমাগত বহন করে এসেছে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এটাই তাদের মতাদর্শ। পাঠক, আপনি এ ব্যাপারে সেসব ব্যাকরণবিদের অসার মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যারা কারক চিহ্নাদি সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাদের উপলব্ধি একান্তই ত্রুটিপূর্ণ। এজন্যই তারা ধারণা করে যে, আরবি ভাষার বাকবৈদগ্ধ্য বর্তমানকালে আর নেই এবং বলতে গেলে আরবি ভাষা বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের অনুরূপ মন্তব্যের উৎস হল পদাদির শেষের কারক চিহ্নের বিকৃতি এবং এগুলোর অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই তারা ভাষার নিয়ম-কানুন গড়ে তোলে। বস্তুত তাদের এ প্রকার মন্তব্য বিশেষ পক্ষপাতদুষ্ট স্বভাবেরই ফল এবং এর সাথে তাদের সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তিও এসে মিশ্রিত হয়েছে। অন্যথায় আমরা এই বর্তমানকালেও দেখতে পাই, প্রচুর আরবি শব্দ তাদের সেই প্রাথমিক তাৎপর্যাদিতেই বিধৃত হয়ে আছে এবং মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও সে অনুযায়ী বর্ণনায় পৃথক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির যোগ্যতা এখনও তাদের বক্তব্যে বিদ্যমান। ভাষার বাকরীতি ও গদ্য-পদ্যের বিষয় বৈচিত্র্যও তাদের ভাষণ বর্ণনায় রয়েছে। তাদের বৈঠকে, আসরে এখনও ওজস্বী বাগ্মী ও তাদের বাকরীতিতে এখনও হৃদয় সংবেদী কবি বিদ্যমান এবং তাদের বিশুদ্ধ রসগ্রাহিতা ও সুষ্ঠু হৃদয়বৃত্তি এখনও তাদের সাক্ষ্য বহন করছে। তাদের সংকলিত ভাষা সম্ভার থেকে একমাত্র পদাদির অন্তঃস্থিত কারক চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছুই লোপ পায় নি। বস্তুত মুজারী ভাষা যে একক ধারা ও পরিচিত গঠন প্রক্রিয়ায় অবস্থিত ছিল, তাতে এ স্বরচিহ্নাদিই ছিল একান্ত অনুসরণীয় এবং তাতে ভাষার নিয়মাবলিরও অন্তর্গত। একমাত্র অনারবদের সাথে সংমিশ্রণে এ মুজারী বৈশিষ্ট্য বিকৃত হবার পরই সে সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আরবরা ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও মাগরিবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার পরই বুঝতে পেরেছে যে, তাদের ভাষাগত এ যোগ্যতা পূর্বরূপে আর অবস্থিত নেই; বরং তা যেন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অথচ এক সময়ে এ ভাষাতেই কোরাণ অবতীর্ণ হয়েছে ও হাদীসের বাণী সম্প্রচারিত হয়েছে এবং এ দুটি বিষয়ই ধর্ম ও জাতির ভিত্তি। সুতরাং আরবি ভাষার অনুরূপ পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিলে হয়ত কুরআন-হাদীসের ভাষায় বিস্মৃতি আসবে এবং তাদের অবতরণ ও সম্প্রচারকালীন ভাষার পরিচিতির অভাবে তাদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে দুরূহতা দেখা দিবে। এ কারণেই উক্ত ভাষারূপের নিয়মাবলি সংকলন, তাদের তুলনীয় বিন্যাসধারা স্থাপন এবং তার মধ্য থেকে বাকরীতির আবিষ্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এভাবে তা একটি সুবিন্যস্ত শাস্ত্র তথা, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, প্রস্তাবনা ও সমস্যা সংবলিত হয়ে উঠল এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদরা তার নাম রাখলেন 'নুহূ' বা আরবি ভাষাশিল্প। তাদের প্রচেষ্টায় সমস্ত বিষয়টি সুসংবদ্ধ শিল্প, লেখ্যশাস্ত্র এবং আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস হৃদয়ঙ্গমের সমুন্নত সোপানে পরিণত হল।

www.amarboi.org

সম্ভবত আমরা যদি বর্তমান আরবি ভাষা নিয়ে উদ্যোগী হই এবং তার নিয়মাবলি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করি, তাহলে তাতে তার বিকৃত কারক চিহ্নাদির পরিবর্তে এমন অনেক বিষয়ের সাক্ষাৎ পাব ও এমন অনেক অবস্থা দেখা যাবে, যা ভাষার বিশেষ রীতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সম্ভবত সেগুলো ভাষার অন্তে সেভাবে থাকবে না, যেভাবে মুজারী ভাষায় বর্তমান ছিল। বস্তুত ভাষা ও তার যোগ্যতা কোনটাই হঠাৎ সৃষ্টি হয় না।

হিমিয়ারী ভাষার সাথে মুজারী ভাষার সম্পর্কও অনুরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মুজারী পর্যায়ে হিমিয়ারী ভাষার অনেক প্রচলন ও শব্দ গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে শ্রুতিবাহিত এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান যা দিয়ে এ মন্তব্যের প্রমাণ মিলে এবং যারা নিজেদের বোধের ত্রুটির জন্য মনে করে যে, তারা উভয়ে একই ভাষা, উপরিউক্ত প্রমাণ তাদের ধারণাকেও নস্যাৎ করে দেয়। তারা অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই মুজারী ভাষার গঠন ও রীতিনীতিতে হিমিয়ারী ভাষার ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চান। যেমন অনেকে ধারণা করেন যে, হিমিয়ারী ভাষার 'কায়ল (নেতা) শব্দটি 'কওল' (উক্তি) শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন এবং অনুরূপ অন্য আরও অনেক বিষয়। কিন্তু এর কোনোটিই যথার্থ নয়। বস্তুত হিমিয়ারী ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ধারা, শব্দ গঠন ও কারক চিহ্নাদিতে মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন যেমন এরূপ আমরা আরবি ভাষা ও মুজারী ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখতে পাই। অবশ্য মুজারী ভাষা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কারণ ধর্মীয় শাস্ত্রাদির জন্যই; যেমন ইতিপূর্বে আমরা তৎসম্পর্কে বলেছি। এ কারণেই উক্ত ভাষার নিয়ম-কানুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা আরবি ভাষা সম্পর্কে অনুরূপ কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করে না এবং তার কোনো কারণও বিদ্যমান নেই।

বর্তমানকালের আরবি ভাষাভাষীরা যে-কোনো দিকেই বসবাস করুক না কেন, তাদের ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য 'ক্বাফ' বর্ণটি উচ্চারণের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তারা একে শহরবাসীদের ন্যায় ক্বাফ বর্ণের উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণ করে না; যেমন আরবি ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার উচ্চারণস্থল জিহ্বার প্রান্ত ও মূর্ধার উর্ধ্বভাগ। তারা একে 'কাফের' উচ্চারণস্থল থেকেও উচ্চারণ করে না; যদিও তার উচ্চারণস্থল ক্বাফের উচ্চারণস্থল থেকে নিম্নস্তরে এবং মূর্ধার উর্ধ্বভাগের সন্নিহিত। বরং তারা একে 'ক্বাফ' ও 'কাফ' বর্ণদ্বয়ের জন্য নির্ধারিত উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ থেকে উচ্চারণ করে থাকে। এ বৈশিষ্ট্য পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থানরত সব গোত্রের মধ্যেই বিদ্যমান; এমন কি সব জাতি ও গোত্রের মধ্যে এটাই তাদের এমন একটি চিহ্ন, যাতে অন্য কারও অংশীদারিত্ব নেই। এর ফলে যারা আরবীয় হতে চায় এবং কোন গোত্রের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ও তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তারা এ বিশিষ্ট উচ্চারণ অভ্যাস করে। তাদের মতে বিশুদ্ধ আরব, আরবিয়ত্বে অনুপ্রবেশকারী ও শহুরে জীবনের অধিকারীদের মধ্যে এ ক্বাফ বর্ণের উচ্চারণ দ্বারা পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব। এতদ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, এটাই মুজারী ভাষা, কারণ এ অবশিষ্ট গোত্রাবলির অধিকাংশ ও তাদের নেতৃবৃন্দ পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র সুলাইম ইবনে মনসুর থেকে এবং বনি আমের ইবনে যাআযাআ ইবনে মাবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াজেন ইবনে মনসুর থেকে মনসুর ইবনে ইকরামা ইবনে

www.amarboi.org

হাফসা ইবনে কয়েস ইবনে আয়লান-এর সন্তান-সন্ততি। তারা বর্তমানকালে জনবসতির অধিকাংশ জুড়ে অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি প্রতাপের সাথে বিরাজ করছে। তারা মুজারের বংশাবলি এবং তাদের সাথে অবস্থানরত অন্যান্য গোত্র বনি কাহলানের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত তারাই এ 'ক্বাফ' বর্ণের উচ্চারণে অন্য সবার আদর্শস্বরূপ।

ভাষার বৈশিষ্ট্য এ গোত্রগুলোর কোনো অভিনব সৃষ্টি নয়; বরং এটা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং বংশপরম্পরায় আগত বিশেষত্ব মাত্র। এর ফলে প্রকাশ পায় যে, এটাই নবী (সঃ)-এর ভাষা। শিয়া ফেকাহ্শাস্ত্রবিদরা এরূপ দাবি উত্থাপন করেছেন এবং তারা ধারণা পোষণ করেন যে, সূরা ফাতেহা পাঠকালে যারা 'এহ্দেনাস্ সিরাতাল্ মুস্তাকিমা'য় ক্বাফ বর্ণটিকে উপরিউক্ত গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী উচ্চারণ করবে না, সে ভাষাকে বিকৃত করবে ও তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

জানি না, উচ্চারণের এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি কোথা থেকে এল? কারণ শহরবাসীরাও তা নতুন করে সৃষ্টি করেনি। তারাও তা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং বিজয়াভিযানের পরবর্তীকালে শহরে আগমনকারী তাদের পূর্বপুরুষরা মুজারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে গোত্রগুলোও এ ব্যতিক্রম নতুন করে সৃষ্টি করেনি। শুধু পার্থক্য এই যে, গোত্রের অধিবাসীরা শহরবাসীদের চেয়ে বেশি মাত্রায় অনারব সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করছে। এ বিষয়টিই তাদের মধ্যে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয় এবং বোঝায় যে, এটাই তাদের পূর্বপুরুষের ভাষা। তদুপরি এ কারণেই পূর্ব-পশ্চিমের সব গোত্র এ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। বস্তুত এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে বিশুদ্ধ আরবকে অনুপ্রবিষ্ট ও শহরবাসী থেকে পৃথক করা যায়।

এ বিষয়টি একান্ত সুস্পষ্ট যে, 'ক্বাফ' বর্ণটির যে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সমগ্র আরব-বেদুইন গোত্রগুলো জড়িত, তা পূর্ববর্তী ভাষাভাষীদের কাছে ক্বাফের যথার্থ উচ্চারণস্থল থেকেই উচ্চারিত হত। বস্তুত ক্বাফের এ উচ্চারণস্থলটি প্রশস্ত; তার আরম্ভ মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগ এবং তার শেষ ক্বাফের উচ্চারণস্থল সন্নিহিত। তাকে মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগ থেকে শহরবাসীরা এবং কাফ বর্ণের সন্নিহিতস্থল থেকে এই বেদুইন গোত্রগুলো উচ্চারণ করে থাকে। এ বক্তব্যের দ্বারা শিয়া ফেকাহশাস্ত্রবিদরা সূরা ফাতেহায় উক্ত বর্ণের বিশেষ উচ্চারণ ত্যাগ করায় নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন, তাও প্রতিরোধ করা যায়। কারণ শহরবাসী সব ফেকাহশাস্ত্রবিদই এ বিধানের বিরোধী। অথচ তাঁদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যায় না যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করেছেন; বরং তার কারণ আমরা পূর্বে যা বলেছি তাই।

অবশ্য আমরা এ কথা বলব যে, এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও উত্তম তাই, যার সাথে বেদুইন গোত্রগুলো জড়িত। কারণ তারা তা ধারাবাহিক সূত্রে লাভ করেছে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি এবং এ বিষয়টি এ সাক্ষ্যই দেয় যে, তা তাদের পূর্বসূরি গোত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। তাই নবী (সঃ)-এর ভাষারীতি। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে তাদের এ আচরণ ও প্রমাণ উপস্থিত করে যে, তারা উভয় বর্ণের উচ্চারণস্থল নিকটবর্তী হওয়ায় উভয়কে যুক্ত করে ফেলেছে। যদি তা শহরবাসীদের উচ্চারণের ন্যায় মূর্ধার ভিত্তি থেকে হত, তা হলে কখনও তা কাফ বর্ণের উচ্চারণস্থানের নিকটবর্তী হত না এবং যুক্তও হত না।

www.amarboi.org

অতঃপর আরবি ভাষাবিদরা যে এ ক্বাফ বর্ণটিকে কাফ বর্ণের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন; যেমন বর্তমানে আরব বেদুইন গোত্রগুলো উক্ত উচ্চারণের সাথে জড়িত রয়েছে এবং তাকে ক্বাফ ও কাফ বর্ণদ্বয়ের মাঝখানে স্থাপন করেছেন, যেন তা একটি স্বতন্ত্র বর্ণ; বস্তুত এসব বিষয়ই অসম্ভব বলে মনে হয়। সুস্পষ্ট যা, তা এই যে, তা ক্বাফের উচ্চারণস্থানের শেষ ভাগ থেকে উচ্চারিত। কারণ তার উচ্চারণস্থানে প্রশস্ততা বিদ্যমান; যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে বলেছি।

এর পর তাঁরা ক্বাফের এ উচ্চারণকে অনারবসুলভ ও দূষণীয় বলে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন তা তাঁদের কাছে পূর্ববর্তী গোত্রগুলোর ভাষা বলে গৃহীত হয়নি। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা এ উচ্চারণের পূর্বাপর সংযোগের কথা উল্লেখ করেছি। বস্তুত এটা তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এটা তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টিই সাক্ষ্য দেয় যে, তা তাদের পূর্বসূরি গোত্রাদির এবং নবী (সঃ)-এর ভাষারীতি; যেমন ইতিপূর্বে এ সম্পর্কীয় সব কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

কখনও কোনো ধারণাকারী এ ধারণাও পোষণ করেন যে; শহরবাসীরা যে ক্বাফের উচ্চারণের সাথে জড়িত, তা আদৌ সেই ক্বাফ নয়; বরং তা অনারবদের সাথে মেলামেশার ফলেই তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারা তার সেই উচ্চারণকে গ্রহণ করেছে; কাজেই তা আরবি ভাষার অন্তর্গত নয়। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হল; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তা এই যে, তা এক প্রশস্ত উচ্চারণস্থল থেকে নির্গত একই বর্ণের দুটি রূপ মাত্র। পাঠক, হৃদয়ঙ্গম করুন। আল্লাহ্ সুস্পষ্ট পথ-প্রদর্শক।

www.amarboi.org

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক ও শহরবাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং মুজারী ভাষা থেকে এটা ভিন্ন]

পাঠক, জেনে রাখুন, শহরাঞ্চল ও নাগরিকদের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা প্রাচীন মুজারী ভাষা নয়; এমনকি এসব আরব গোত্রগুলোর ভাষাও নয়; বরং তা মুজারী ভাষা ও আমাদের সময়কালীন আরব গোত্রগুলোর ভাষা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং এ গোত্রগুলোর ভাষা অপেক্ষা মুজারী ভাষা থেকে তা দূরবর্তী।

অবশ্য তা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, এ বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট; আরবি ব্যাকরণবিদদের নিয়মাবলি থেকে তার অপপ্রয়োগগত বিচ্যুতিই এর সাক্ষ্য বহন করছে। অথচ এ সত্ত্বেও তা বিভিন্ন শহরের পরিভাষা অনুসারে বৈচিত্র্যের অধিকারী। এদিক থেকেই পূর্বাঞ্চলবাসীদের ভাষা অনেকাংশে পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের ভাষা থেকে বিভিন্ন এবং অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীদের ভাষার সাথে এর অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা বিদ্যমান। কিন্তু প্রতিটি বাকরীতিই তার সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের মনোভাব প্রকাশ ও বক্তব্যের উদ্দেশ্য সাধনে পারঙ্গম। এটিই বাকরীতি ও ভাষার যথার্থ তাৎপর্য। কারক চিহ্নাদির অবলুপ্তি এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না; যেমন বর্তমানকালের আরবি ভাষা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

তবে তা যে আরব গোত্রগুলোর ভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা থেকে বেশি দূরবর্তী; এর কারণ এই যে, এ দূরত্ব অনারব ভাষারীতির সাথে মিশ্রণের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং যারা এরূপ অনারবত্বের মধ্যে অধিক মিশে গেছে, তাদের ভাষাও সেই তুলনায় মূল ভাষারূপ থেকে বেশি দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। কারণ ভাষাগত যোগ্যতা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে; এ কথা পূর্বেই আমরা বলেছি। বস্তুত এ প্রসঙ্গে ভাষাগত এ যোগ্যতা মূল ভাষাভাষী আরবদের যোগ্যতার সাথে অনারবদের অনুরূপ যোগ্যতার মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত। কাজেই সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা যে পরিমাণে অনারব বাকরীতি শুনেছে এবং যে হারে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে, সেই অনুপাতে প্রাচীন যোগ্যতা থেকে দূরে সরে গেছে।

পাঠক, এ বিষয়টি আফ্রিকিয়া, মাগরিব, আন্দালুস ও পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোর মধ্যে বিবেচনা করুন। এদিক থেকে আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে অনারব বারবারদের সাথেই বেশি মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ এতদঞ্চলে তাদের জনসংখ্যাই বেশি; কোনো শহর বা গোত্র এ আধিক্য থেকে মুক্ত বলা যায় না। সুতরাং সেখানে আরবি ভাষার উপর অনারবত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং একটি মিশ্রিত ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে

www.amarboi.org

বর্ণনা করেছি, অনারবত্ব সেখানে প্রাধান্য বিস্তারকারী এবং সেই তুলনায় তা পূর্ববর্তী ভাষা থেকে বেশি দূরবর্তী।

এভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরাও আরব বিজয়ের পরে পারসিক তুর্কি জাতিগুলোর সাথে মিশ্রণের ফলে তাদের মধ্যকার শ্রমিক, চাষী ও কয়েদীদের ভাষার সাথে বিজয়ীদের ভাষার আদান-প্রদান ঘটল। তারা বিজিত জাতির লোকদেরকে চাকর, বাঁদী, ধাই ও দুগ্ধদাত্রী হিসেবে নিয়োগ করার ফলে তাদের প্রভাবে ভাষারূপে বিকৃতি ঘটে ভিন্ন ভাষার জন্ম হল। অনুরূপ আন্দালুসবাসীরাও অনারব জাল্লাকী ও ফিরিঙ্গীদের সাথে মিশে ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বস্তুত এসব অঞ্চলে প্রতিটি শহরবাসীই একটি ভিন্ন ভাষার অধিকারী এবং তা মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন। তদুপরি তাদের পরস্পরের ভাষাও অনুরূপভাবে বিভিন্ন; যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। ফলত সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিটি দৃঢ়তাই তাদেরকে ভাষাগত বিচিত্র যোগ্যতারূপে উপস্থিত করেছে। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন।'[৪০৫]

৪০৫. কোরান; ৩, ৪৭; ৫, ১৭; ২৪, ৪৫।

www.amarboi.org

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[মুজারী ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা]

জেনে রাখুন যে, মুজারী ভাষার যোগ্যতা বর্তমানকালে বিলীয়মান নিশ্চিহ্নপ্রায়। বর্তমান গোত্রগুলোর সমগ্র ভাষারূপই কুরআন অবতরণের সময়কালীন মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন। বস্তুত বর্তমান ভাষা অনারবত্বের সংমিশ্রণে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষারূপ পরিগ্রহ করেছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য যেহেতু ভাষাবিশেষ একটি যোগ্যতা, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তা শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। সর্বপ্রকার যোগ্যতারই এই অবস্থা।

কাজেই যে ব্যক্তি এ যোগ্যতা লাভের ইচ্ছা পোষণ করে ও তা অর্জন করতে চায় তার জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হল সে কুরআন-হাদীসের ধারা অনুসারী আরবি ভাষাভাষীদের প্রাচীন বক্তব্য, পূর্বসূরিদের আলোচনা এবং বিশিষ্ট বাগ্মীদের বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ ও কবিদের কাব্য অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে। তার সাথে আরবিয়ত্ব প্রাপ্ত অনারবদের সর্ববিষয়ে প্রদত্ত অবদানকেও অনুসরণ করবে। এভাবে বেশি মাত্রায় তাদের গদ্য-পদ্য অধ্যয়ন করায় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যে সেই ব্যক্তি যেন সেই প্রাচীন আরবীয় পরিবেশেই পরিবর্ধিত হচ্ছে এবং মনোভাব প্রকাশের ধারা যেন তাদের কাছ থেকেই শিখছে। তারপর সে তাদের বর্ণনার ধারা অনুসরণ করে নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টায় নিয়োজিত হবে এবং এ প্রসঙ্গে তাদের বাকবিন্যাস, তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত বাকভঙ্গি ও শব্দ চয়নের ধারা অনুসরণ করবে। এভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহারের ফলে তার মধ্যে সেই ভাষাগত যোগ্যতার সৃষ্টি হবে এবং তাদের আধিক্যের মাধ্যমে এ যোগ্যতায় দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

এর সাথে যোগ্যতা অর্জনকারীকে প্রবৃত্তির সুস্থতা, আরবদের বাসনা-কামনা সম্পর্কে সৃষ্ট উপলব্ধি, তাদের বাকবিন্যাস প্রণালীর ধারণা এবং বক্তব্য উপস্থাপনে প্রসঙ্গের প্রয়োজন ও তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুত রস আস্বাদনের শক্তিই তার এ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বহন করে এবং তা এ যোগ্যতা ও সুস্থ প্রবৃত্তির সম্মিলনে উদ্ভূত হয়; যেমন পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে। ফলত অর্জনকারীর সংগ্রহশক্তি ও তার ব্যবহারের আধিক্যের মাধ্যমেই গদ্যে-পদ্যে তার বক্তব্য শিল্পোত্তীর্ণ গুণে ভূষিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ, তাকেই বলা যাবে যে সে মুজারী ভাষা অর্জন করেছে। সে ঐ ভাষার বাকবৈদগ্ধ সম্পর্কে বিচারক ও সমালোচক। বস্তুত উক্ত ভাষার শিক্ষার ধারা এরূপই হওয়া উচিত। আল্লাহ তাঁর দয়ায় ও কৃপায় যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখিয়ে থাকেন।

www.amarboi.org

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[ভাষার এই যোগ্যতা ও আরবি ভাষাতত্ত্ব এক নয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষোক্তটির প্রয়োজন সামান্য]

এর কারণ এই যে, আরবি ভাষাতত্ত্ব বলতে ভাষাগত যোগ্যতার নিয়মাবলি ও বিশেষ অনুমান জ্ঞানকেই বোঝায়। তা অবস্থার জ্ঞান; স্বয়ং অবস্থা নয়। সুতরাং তা স্বয়ং যোগ্যতা নয়।

এটা সেই ব্যক্তির শিল্পজ্ঞানের মতো, যে-কোনো একটি শিল্পকে কেবলমাত্র শাস্ত্রের দিক থেকে জেনেছে, কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে দৃঢ়তা অর্জন করেনি। যেমন সীবন শাস্ত্রে দক্ষ কোনো ব্যক্তি যে তার ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জন করেনি, সে উক্ত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারে, সীবন শিল্প হল সুইয়ের মার্গে সুতা পরানো; তারপর সুইটিকে কাপড়ের দুটি প্রান্ত এক করে তাতে প্রবেশ করানো এবং এমনভাবে অপর পাশে তাকে বের করা, যাতে পুনরায় ফিরিয়ে তাকে আরম্ভের স্থানে আনা যায়। এরপর তাকে আবার প্রথম ছিদ্রের সম্মুখ ভাগে পূর্ববর্তী দুটি ছিদ্রের মধ্যবর্তী ফাঁকের অনুরূপ ফাঁক রেখে বের করতে হবে এবং এভাবে ক্রিয়াটির শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে অনুসরণ করে যেতে হবে। উপরিউক্ত ব্যক্তি অনুরূপভাবে জোড়, ফোঁড় ও কাটা-সেলাইয়ের স্বরূপসহ সমুদয় সীবন শিল্প ও তার প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করতে পারে; কিন্তু তাকে যদি হাতেকলমে এসব কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়, তাহলে তার কোনোটিই সুসম্পন্ন করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে সূত্রধরের শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, তা হল করাতটিকে কাঠখণ্ডের মাথায় স্থাপন করে তার একপাশ ধরে রাখা এবং তার অন্যপাশে সম্মুখভাগে অন্যজন ধরবে। এভাবে উভয়ে উভয়ের দিক থেকে করাতটিকে আগ-পিছ করতে থাকবে। এর ফলে কাঠখণ্ডের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী করাতের তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট প্রান্তটি তাকে ফাঁড়তে আরম্ভ করবে এবং এক সময়ে তার প্রান্তে এসে পৌঁছবে। কিন্তু এ ব্যক্তিকে যদি এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন বা তার কিছু অংশ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়, তাহলে সে তাতে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হবে না।

ভাষার কারক চিহ্নাদির নিয়মাবলির জ্ঞানও এরূপ তার যথার্থ যোগ্যতার সাথে বিভিন্ন। কারণ কারক চিহ্নাদির নিয়মাবলির জ্ঞান হল প্রক্রিয়ার অবস্থাগত জ্ঞান; তা স্বয়ং প্রক্রিয়া নয়। অনুরূপভাবে, পাঠক, আপনি বহু বিচক্ষণ ব্যাকরণবিদ ও আরবি ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, যারা যথার্থই এসব রীতিনীতির জ্ঞান

www.amarboi.org

আয়ত্তে এনেছেন; কিন্তু তাঁদেরকে যদি ভাই বা বন্ধুর কাছে দুই ছত্র লিখতে অথবা কোনো অত্যাচারের বা মনোভাব প্রকাশের জন্য কিছু বর্ণনা করতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা শুদ্ধকে ভুল করে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসেন এবং উপরিউক্ত বিষয়াদির জন্য যথার্থ বাকবিন্যাস ও আরবি ভাষারীতি অনুযায়ী মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অপারগ হন। পাঠক, অনুরূপভাবে আপনি এমন অনেককে দেখনে, যারা এ ভাষাগত যোগ্যতা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা কী সাবলীলভাবেই না গদ্য ও পদ্য রচনা করতে পারেন! অথচ তারা কর্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধের কারক চিহ্নাদি এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য রীতিনীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না।

এ থেকেই জানা যায় যে, ভাষাগত যোগ্যতা ভাষাতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং বলতে গেলে তা এ শেষোক্তটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অবশ্য কখনও কারক চিহ্নাদির বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও এ যোগ্যতার ব্যাপারে পারদর্শী হিসেবে দেখতে পাই; কিন্তু এটি একান্তই বিরল ও আকস্মিক। অধিকাংশ সময় অনুরূপ ব্যতিক্রম সিবুয়াইয়ের গ্রন্থ অধ্যয়নকারীদের মধ্যে দেখা যায়। কারণ সিবুয়াই শুধু কারক চিহ্নাদির বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তাঁর গ্রন্থকে আরবদের প্রবাদ-প্রবচন, তাদের কাব্যের উদ্ধৃতি ও তাদের বর্ণনা রীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছেন। এর ফলে উক্ত গ্রন্থটিতে এ যোগ্যতা শিক্ষাদানের উপযোগী অনেক কিছু সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং পাঠক, আপনি তার অধ্যয়নকারী ও জ্ঞানার্থীকে দেখতে পাবেন, তারা আরবদের বাকরীতির একটি বিশেষ অংশ অর্জন করেছে এবং তাদের সংরক্ষিত বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গের প্রয়াজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে তারা ভাষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে তৎপর হয়েছে এবং নিজেদের মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে।

সিবুয়াইয়ের গ্রন্থ অধ্যয়নকারী এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে যারা এ যোগ্যতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে উদাসীন, তারা তা থেকে আরবি ভাষাতত্ত্বই শিক্ষা করে; যোগ্যতা অর্জনের কোনো সুযোগই তাদের ঘটে না। অনুরূপ উদ্ধৃতি ও সংগ্রহ পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের গ্রন্থাবলি, যাতে শুধু ব্যাকরণ সম্পর্কীয় রীতিনীতির আলোচনা রয়েছে, আরবদের কাব্য ও ভাষাসম্পদের কোনো উদ্ধৃতি নেই; সেই সব গ্রন্থের অধ্যয়নকারীরা এ যোগ্যতা সম্পর্কে অতি অল্পই জানতে বা তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এ কারণেই, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা মনে করে, তারা আরবি ভাষাশিল্প সম্পর্কে বিশেষ মর্যাদা লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা এ বিষয়ে অন্য সব অপেক্ষা অনেক দূরে অবস্থান করছে।

আন্দালুসের আরবি শিল্পীরা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষাদানকারীরা এক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনে এবং অপরকে যোগ্যতার শিক্ষাদানে বেশি বাস্তব পন্থার অনুসারী। কারণ তারা তাদের শিক্ষাগ্রহণের বৈঠকে আরবের ভাষাসম্পদ ও তার প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত ব্যবহার এবং বহুবিধ বাকবিন্যাস সম্পর্কীয় বিষয় উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষাগ্রহণের মধ্যপথে যোগ্যতার অনেক নিদর্শনের সাথে পরিচিত হয়; সুতরাং তার প্রকৃতি তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে প্রস্তুত হয় এবং যোগ্যতার অর্জন ও গ্রহণের উযোগী হয়ে ওঠে।

www.amarboi.org

কিন্তু তারা ছাড়া মাগরিব ও আফ্রিকিয়াবাসী অন্যান্যরা আরবি ভাষাতত্ত্বকে একটি শাস্ত্র হিসেবে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছে এবং আরবদের ভাষাসম্পদে ব্যবহৃত বাকবিন্যাস ধারাকে উপলব্ধি করার প্রত্যক্ষ পথ পরিহার করে চলছে। অবশ্য তারা অনেক সময় কোনো দৃষ্টান্তকে কারক চিহ্নাদির জন্য ব্যবহার করে এবং কোনো বিশেষ রীতিকে প্রধান্য দেবার জন্য তার প্রমাণও গ্রহণ করে; কিন্তু সবই মেধাশক্তির চাহিদা অনুসারেই হয়; ভাষার নিজস্ব সম্পদ ও বিন্যাস অনুধাবনের জন্য নয়। এর ফলে আরবি ভাষাশিল্পও যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রের অনুরূপ মননশীল নীতিসর্বস্ব একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনের পথ ও দৃষ্টান্ত থেকে বহুদূরে সরে গেছে। এর এ বৈশিষ্ট্য এর অনুসারী শহর ও বিভিন্ন দিকবাসী ভাষাবিদদেরকে যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে দিয়েছে; বস্তুত তাদেরকে দেখে মনে হয়, তারা বুঝে আরবদের ভাষাসম্পদ সম্পর্কে মোটেও অবহিত নয়। তাদের এরূপ অবস্থার একমাত্র কারণ তারা ভাষার দৃষ্টান্ত, তার বাকবিন্যাস ধারা, তার রীতিনীতির ভালমন্দ বিচার এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর জন্য এসব অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা পরিত্যাগ করেছে। বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর তার চেয়ে উত্তম সহায় আর নেই। নিয়মাবলি প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো শাস্ত্রসম্পর্কীয় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম মাত্র; অথচ তারা এগুলোকে তাদের যোগ্য স্থান থেকে বিচ্যুত করে তাদেরকেই শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছে এবং পরিণামে ফললাভ বঞ্চিত হচ্ছে।

আমরা এ পরিচ্ছেদে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে যা কিছু বর্ণনা করেছি, তার নির্গলিতার্থ হল এই যে, আরবি ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আরবদের ভাষাসম্পদকে বেশি আয়ত্তে আনতে হবে; যাতে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তিতে তাদের বাকবিন্যাস ধারার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় এবং সে তাতেই বিধৃত হয়ে গড়ে ওঠে। এর ফলে তার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে যে, সে যেন তাদের মধ্যেই লালন-পালন হচ্ছে এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে। এভাবে তার এমন একটি স্বতন্ত্র ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হবে, যা দিয়ে সে তাদের ধারা অনুসারে নিজের মনোভাব প্রকাশের শক্তিলাভ করতে পারবে। আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয় নির্ধারিত করে থাকেন এবং আল্লাহ্ই অদৃশ্য সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।

www.amarboi.org

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[বাকশৈলীবিদ্‌দের পরিভাষায় 'আস্বাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিরূপণ এবং সাধারণত আরবীয়ত্ব অর্জনকারী অনারবদের তা থেকে রক্ষা হওয়ার কারণ বর্ণনা]

জেনে রাখুন, আস্বাদ শব্দটিকে বাকশৈলী সম্পর্কীয় বিচিত্র বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে থাকেন এবং এর অর্থ ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় বাকবৈদগ্ধ্যের যোগ্যতা অর্জন। বাকবৈদগ্ধ্যের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে যে, এ বাকবিন্যাসের সর্বপ্রকার প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য সাধনের বৈশিষ্ট্যসহ ভাষার অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে প্রকাশ লাভ করা। সুতরাং আরবি ভাষাভাষী বাকবৈদগ্ধ্যের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদাই এক্ষেত্রে সেসব গঠন প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেন, যা আরবদের বাকরীতি ও ভাষণ বৈচিত্র্যের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং তিনি তার বক্তব্যকে সর্বপ্রযত্নে এ ধারায় বিধৃত করেন। সুতরাং আরবদের বাকসম্পদের মিশ্রণে যখন তার প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হয়, তখনই বলতে পারা যায় যে, উক্ত ধারায় বাকসংগঠনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ফলে তিনি অতি সহজে বাকবিন্যাসে সমর্থ হন এবং তার এ প্রচেষ্টা বলতে গেলে আরবীয় বাকবৈদগ্ধ্যের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে না। তিনি যদি অনুরূপ পথ ছাড়া অন্য পথে বাকবিন্যাসকে প্রকাশিত হতে শোনেন, তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারেন এবং অতি সামান্য চিন্তা বা কোনরূপ চিন্তা না করেই তার শ্রবণশক্তির মাধ্যমে সে সম্পর্কে অবহিত হন। বস্তুত এক্ষেত্রে তিনি তাকেই যথার্থ বলে জানেন, যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে তিনি সে সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কারণ যোগ্যতা যখন একবার যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই এমন বহু উদাসীন প্রকৃতির লোক, যারা যোগ্যতার এ বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখে না, তারা ধারণা পোষণ করে যে, আরবদের জন্য ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক কারক চিহ্নাদি ও বাকবৈদগ্ধ্য প্রদর্শন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তারাই বলে আরবরা স্বভাবতই বিশুদ্ধ কথোপকথন করে; অথচ বিষয়টি আদৌ তা নয়। বরং তা বাকসংগঠনের সেই ভাষাগত যোগ্যতা, যা সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হলে এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতি বলে প্রতীয়মান হয়।

এ যোগ্যতা, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে একমাত্র আরবদের বাণীর সাহচর্য, বারংবার শ্রবণে তার প্রতিধ্বনি এবং তার বাকবিন্যাসের ধারা উপলব্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে

www.amarboi.org

থাকে। আরবি ভাষাশিল্পীরা সে সম্পর্কে যেসব শাস্ত্রীয় নিয়মাবলি আবিষ্কার করেছেন, তাদের পরিচয় লাভের মাধ্যমে উক্ত যোগ্যতা অর্জিত হয় না। কারণ নিয়মাবলি শুধু সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে পারে; কিন্তু বাস্তব ভিত্তিতে প্রসঙ্গানুরূপ তার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে না। এর বর্ণনা ইতিপূর্বে গেছে।

সুতরাং যখন এ বিষয়টি পরিস্ফুটিত হল, তখন বলতে হয়, বাকবৈদগ্ধ্যের যোগ্যতা হল এমন একটি শক্তি, যা তার অধিকারীকে আরবদের ভাষার বাকসংগঠন ও বাকবিন্যাসের অনুরূপ উৎকৃষ্ট ও উত্তম বাণী সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বরং এ যোগ্যতার অধিকারী যদি এই নির্দিষ্ট পথ ও বিশেষ বিন্যাস ধারাকে অতিক্রম করে কিছু করতে চান, তাহলে তিনি কিছুতেই উক্ত যোগ্যতা প্রকাশে সমর্থ হবেন না এবং ভাষাও তার এই ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টায় সহযোগী হবে না। কেননা তিনি তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি এবং তার দৃঢ়মূল যোগ্যতা তাকে উক্ত পথের পথিক থেকে অনুপ্রাণিত করেনি। সুতরাং যখনই তার সামনে এমন বাণী উপস্থিত হবে, যা আরবদের বাকরীতি ও বাকবৈদগ্ধ্যের সংগঠন ধারা অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বুঝতে পারবেন যে, এটা আরবদের সেই বাণী সম্পদের অন্তর্গত নয়, যার সাহচর্যে তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অবশ্য তিনি তার এ ধারণা ব্যাকরণবিদ ও বাকশৈলীবিদদের ন্যায় যুক্তি-প্রমাণসহকারে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। কারণ এ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারটি অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত নিয়মাবলির জ্ঞান থেকে অর্জিত হয়ে থাকে এবং পূর্বোক্ত ধারণার বিষয়টি একটি বিমূর্ত আবেগ, যা আরবদের বাণীর সাহচর্য থেকে লব্ধ হয়ে থাকে; এমন কি তার অর্জনকারী তাদেরই একজন হয়ে যায়।

এর উদাহরণ এই যে, আমরা যদি এমন একটি শিশুর অস্তিত্ব কল্পনা করি, যে আরব গোত্র ও পরিবেশে জন্মেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে তা হলে সে অবশ্যই তাদের ভাষা শিক্ষা করবে এবং তার কারক-চিহ্নাদি ও বাকবৈদগ্ধ্যকেও আয়ত্তে আনবে; এমন কি এ বিষয়ে চরম সাফল্য লাভ করবে। অথচ সে এ শাস্ত্রীয় নিয়মাবলির বিন্দু-বিসর্গ না-ও জানতে পারে; বরং তার এমন যোগ্যতা একমাত্র ভাষা ও তার উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং একইভাবে যে উক্ত গোত্র ও পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করছে, সেও তাদের বাণী, কাব্য ও বাগ্মীতা কণ্ঠস্থ করে এবং তাদের ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ও তাদের একজন হয়ে যেতে পারে। যেন সে সেসব গোত্র-পরিবেশ ও তাদের ভাষার সাহচর্যেই জন্মেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে। অথচ নিয়মাবলির জ্ঞান তাকে অনুরূপ যোগ্যতা অর্জনে কোনো প্রকার সাহায্যই করতে পারে না।

এই যে যোগ্যতা, যখন তা সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে, তখনই তাকে বোঝাবার জন্য বাকশিল্পবিশারদদের পরিভাষা অনুসারে 'আস্বাদ' শব্দটির রূপক গ্রহণ করা হয়। প্রচলন অনুসারে আস্বাদ বলতে খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ যোগ্যতার আধার হল জিহ্বা এবং তার দ্বারাই বাণী উচ্চারিত হয়; যেমন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে এ জিহ্বাই ব্যবহার করা হয়; সেজন্য এ আস্বাদ শব্দটিকেই রূপক

www.amarboi.org

হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তদুপরি ভাষাগত এ গুণটি জিহ্বার একটি আবেগজনিত অবস্থা, যেমন খাদ্যবস্তু তার জন্য বাস্তব অনুভূতি; সেই কারণেও একে আস্বাদ বলা হয়।

পাঠক, যদি এ বিষয়টি আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, যেসব অনারব জাতি আরবি ভাষা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে এবং উক্ত ভাষা গ্রহণ করতে ও উক্ত ভাষাভাষীদের সাথে মিশ্রণের ফলে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে; যেমন—পূর্বাঞ্চলে পারসিক, রোমীয় ও তুর্কি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বারবারগণ; তাদের কারও পক্ষে এ আস্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ তারা ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ত্রুটির অধীন; ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি। কেননা তাদের এমন ভিন্ন ভাষা গ্রহণের পর্যায় জীবনকালের একটি অংশ অতিবাহিত হওয়া এবং তাদের নিজ ভাষার যোগ্যতা তাদের জিহ্বায় এসে যাওয়ার পর দেখা দিয়েছে। তারা শহরাঞ্চলে প্রবেশ করে তত্রস্থ অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শব্দ গঠন ও বাকবিন্যাসকে প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছে। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শহরবাসীদের মধ্যে এ যোগ্যতা তখন বিলীয়মান এবং তারা তা থেকে ক্রমশ দূরে সরে এসেছে। তখন তারা মনোভাব প্রকাশে যে যোগ্যতা ব্যবহার করছে, তা এ আলোচনার উদ্দিষ্ট যোগ্যতা নয়; বরং তা ভিন্ন প্রকৃতির অন্য এক যোগ্যতা। এভাবে যারা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ এ যোগ্যতার বিচিত্র নিয়মাবলির সাথে পরিচিত হয়, তারা তার রীতিনীতিই শিক্ষা করে; যোগ্যতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না; যেমন পাঠক আপনি বুঝতে পেরেছেন। বস্তুত উদ্দিষ্ট যোগ্যতা একমাত্র আরবদের বাণীর সাহচর্য, তার অভ্যাস ও বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

পাঠক, এ প্রসঙ্গে যদি আপনার সামনে সিবুয়াই, ফারেসি, যমখশরী ও তত্তুল্য অন্যান্য ভাষাতত্ত্ব বিশারদের অনারব হওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার শ্রুত কাহিনী বাধাস্বরূপ এসে উপস্থিত হয়, তাহলে আপনি জেনে রাখুন, এসব বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাদের কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন, তাঁরা একমাত্র বংশধারার দিক থেকেই অনারব ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্ম ও প্রতিপালন উদ্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী আরব পরিমণ্ডলেই হয়েছিল এবং তাঁরা তাদের কাছ থেকেই তার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলেই তারা বক্তব্য উপস্থাপনে এমন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হন, যার অতিরিক্ত আর কিছু নেই বললেই চলে। যেন তারা তাদের জন্মের প্রথম লগ্নে সেই আরব শিশুদেরই সমতুল্য, যারা তাদের গোত্র পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেখানে প্রতিপালিত হয়েছে এবং ভাষার সব রহস্য অনুধাবন করে তার অধিকারী হয়ে গেছে। সুতরাং ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তি বংশধারার দিক থেকে অনারব হলেও ভাষা ও বাণীর দিক থেকে অনারব নন। কারণ তারা যোগ্যতার অধিকারী জাতিকে তাদের সমৃদ্ধির যুগে এবং ভাষাকে তার যৌবনকালে পেয়েছেন। তখন তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতার নিদর্শন দূর হয়নি এবং শহরবাসীরাও তা হারিয়ে বসে নি। এর ফলে তারা তাদের বাণীর সাহচর্য লাভ করে তার অনুশীলনে লিপ্ত হয়ে যোগ্যতার চরমে পৌঁছেছিলেন।

অথচ বর্তমানকালে কোনো একজন অনারব যখন শহরবাসী আরবি ভাষাভাষীদের সাথে মিশ্রিত হয় তখন ভাষার ক্ষেত্রে এ উদ্দিষ্ট যোগ্যতার বিষয়টিকে একটি

www.amarboi.org

চিহ্নাবশেষহীন বস্তু হিসেবেই দেখতে পায়। মনোভাব প্রকাশের জন্য তারা ভাষাগত যে যোগ্যতা ব্যবহার করে তার সাথে আরবি ভাষার সেই যোগ্যতার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই। তদুপরি আমরা যদি এটা ধরে নেই যে, উক্ত ব্যক্তি আরবদের বাণী ও কাব্য দৃষ্টান্তের সাহচর্যে এল এবং তাদের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করল তবুও তার পক্ষে উক্ত যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, কোনো যোগ্যতা যদি একবার দৃঢ়মূল হয়ে বসে তাহলে সেখানে অন্য কোনো যোগ্যতার আবির্ভাব ত্রুটিপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। আর যদি আমরা এটা ধরে নেই যে, কোনো অনারব বংশোদ্ভূত ব্যক্তি অনারব ভাষার মিশ্রণ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং সে আলোচ্য যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ স্মৃতি ও অনুশীলনের সাহায্য গ্রহণ করেছে তা হলেও বলতে হবে যে, এ বিষয়ে তার সাফল্য অবধারিত নয়; বরং অনুরূপ সাফল্য একান্তই বিরল এবং আমাদের বর্ণনা থেকে পাঠক অবশ্যই তার কারণ বুঝে নিয়েছেন। অনেক সময় অনেক ব্যক্তি বাকশৈলীর এ নিয়মাবলি অধ্যয়ন করেই দাবি করে যে, তার জন্য এ প্রয়াসের মাধ্যমেই 'আস্বাদ' লাভ ঘটেছে; বস্তুত এরূপ দাবি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিকর বিষয় মাত্র। কারণ বাকশৈলীর নিয়মাবলি অধ্যয়নে উক্ত ব্যক্তিবর্গ শুধু সে-সম্পর্কীয় যোগ্যতাই অর্জন করতে পারে তাতে বর্ণনাশক্তির যোগ্যতা অর্জনে কোনো সাহায্যই আসবে না। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন'।[৪০৬]

---

৪০৬. কোরান; ২, ১৪২।

www.amarboi.org

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে শহুরবাসীরা শিক্ষার মধ্যদিয়ে এ ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম এবং যারা আরবি ভাষাপরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তাদের জন্য তা ততো কষ্টকর ও কঠিন]

এরূপ পরিস্থিতির কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীর উদ্দিষ্ট যোগ্যতার বিরোধী ভিন্নতর যোগ্যতার অগ্রাবির্ভাবকে ধরা যায়। এর ফলে সে অনারবত্ব মিশ্রিত শহুরীয় বাক-রীতির কবলে পড়ে। পরিণামে উক্ত বাকরীতি তাকে প্রথম যোগ্যতা থেকে নামিয়ে এক ভিন্নতর যোগ্যতায় স্থাপন করে এবং তাই বর্তমানকালে ভাষাগত নাগরিক যোগ্যতা। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, শিক্ষকগণ সর্বাগ্রে শৈশবকালীন শিক্ষায় এ ভাষার ওপরই জোর দিয়ে থাকেন। ব্যাকরণবিদদের ধারণা, ভাষার এমন অগ্রগামিতার কারণ তাদের ভাষাশিল্প; কিন্তু আসলে তা নয়। এ শিক্ষা একমাত্র সেই উদ্দিষ্ট যোগ্যতা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ রেখে আরবের বাণী ও বাকরীতির অনুশীলনেই সম্ভব হয়ে থাকে। অবশ্য ব্যাকরণশিল্প এরূপ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বাকরীতি বেশি অনারব পরিবেশের অধীন এবং বেশি মুজারী বাক্‌রীতি থেকে দূরে অবস্থিত, তা সেই পরিমাণেই তার শিক্ষার্থীকে মুজারী ভাষা ও তার যোগ্যতা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করবে। কারণ সেখানে দুটি বিরোধী বাকরীতির মধ্যকার প্রাধান্যের সম্ভাবনাই বেশি। পাঠক, শহরবাসীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আফ্রিকিয়া ও মাগরিববাসীরা যেহেতু অধিকতরভাবে অনারব পরিবেশের অধীন ও আদি বাকরীতি থেকে বেশি দূরে অবস্থান করত, সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমে এ ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও ছিল অপরিসীম। ইবনে রফিক[৪০৭] বর্ণনা করেছেন, কায়রোয়ানের কোনো এক লেখক তার সঙ্গীর কাছে নিচের এ প্রশ্নটি লিখেছিল :

'হে ভ্রাত ঃ এবং যার অনুপস্থিতে আমি নাস্তি জ্ঞান করি! আবু সাইদ আমাকে এ বক্তব্য জানিয়েছে যে, তুমি এরূপ স্মরণ করতে যে, তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে, যারা আসবে। আজ আমাদেরকে ব্যাহত করেছে, ফলে আমাদের বাইরে যাবার ব্যবস্থা করেনি। অবশ্য এ গৃহের অধিবাসী কুকাজের কুকুরগুলো তারা একে মিথ্যা বলে নস্যাৎ

---

৪০৭. ভূমিকা দ্র:।

www.amarboi.org

করেছে। তাতে এর একটি বর্ণও নেই। তোমার প্রতি আমার পত্র এবং আল্লাহ্ চান তো আমি তোমার প্রতি ব্যাকুল।'[৪০৮]

—বস্তুত মুজারী ভাষায় তাদের যোগ্যতার এটাই ছিল নমুনা এবং এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

অনুরূপভাবে তাদের কাব্যসম্ভারও ভাষাগত যোগ্যতাহীন নিম্ন পর্যায়ের হত এবং এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে। এ কারণেই আফ্রিকিয়ায় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে একমাত্র ইবনে রশিক[৪০৯] ও ইবনে শরফ[৪১০] ছাড়া অন্য কারও নাম উল্লেখযোগ্য নয়। বস্তুত কাব্যপ্রতিভায় অধিকাংশ কবিই ভাষাগত যোগ্যতার দিক থেকে নবাগত। তাদের বাকবৈদগ্ধ্য তদবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত ত্রুটির অভিমুখী হয়েই অগ্রসর হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে তাদের চেয়ে আন্দালুসবাসীদের দক্ষতা সমধিক। কারণ তারা গদ্য ও পদ্যের বিরাট সংগ্রহ থেকে এ যোগ্যতা অর্জনের প্রভূত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ইবনে হাইয়্যান[৪১১] নামী ঐতিহাসিক এ ভাষাশিল্পবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং তার সমৃদ্ধির পতাকাবাহী ছিলেন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়েও ইবনে আবদে রাব্বিহি,[৪১২] আল কস্তালী[৪১৩] ও তত্তুল্য অন্যান্য কবিরা ছিলেন। কারণ তাদের মধ্যে এ ভাষ্য ও সাহিত্যের সাগর উত্তাল হয়ে উঠল তা শত শত বর্ষব্যাপী তাদের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল এবং খ্রিস্টান আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে নির্বাসনের দুর্যোগ না আসা পর্যন্ত তাতে ভাঁটা পড়েনি। এ সময়ে তারা এসব বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে সরে আসে এবং জনবসতি হ্রাসপ্রাপ্তিতে সর্বপ্রকার শিল্পকর্মেই অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে ভাষাগত যোগ্যতাও তার তুঙ্গ অবস্থা থেকে নেমে এসে সর্ব নিম্নস্তরে উপনীত হয়।

তাদের মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়ে শেষ প্রতিনিধি ছিলেন সালেহ ইবনে শরীফ[৪১৪] ও মালেক ইবনে মুরাহাল।[৪১৫] তারা উভয়ে বনি আহমারের রাজত্বকালের প্রথমদিকে শেভিলার এ বিষয়ক গোষ্ঠীর উত্তরসূরি হিসেবে সিওটায় বর্তমান ছিলেন। আন্দালুস এরূপ যোগ্যতার অধিকারী তার হৃদয়খণ্ডগুলোকে নির্বাসনের মাধ্যমে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করেছিল; ফলে তারা শেভিলার তীরভূমি থেকে সিওটায় এবং পূর্ব আন্দালুস থেকে আফ্রিকিয়ায় এসেছিলেন। কিন্তু তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সব কিছু বিলীন হচ্ছিল এবং এ বিষয়ে শিক্ষার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কারণ সমুদ্রতীরবাসীরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছিল না এবং তা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা

---

৪০৮. বলাবাহুল্য ভাষার সেই নমুনা অনুবাদে উপস্থিত করা সম্ভব নয়।
৪০৯. ভূমিকা দ্র:।
৪১০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ নং টীকা দ্র:।
৪১১. ভূমিকা দ্র:।
৪১২. ভূমিকার ৫০ নং টীকা দ্র:।
৪১৩. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।
৪১৪. সালেহ ইবনে ইয়াজিদ; ৬০১-৬৮৪ (১২০৪-১২৮৬ খ্রি:) হি:।
৪১৫. মালেক ইবনে আবদুর রহমান; ৬০৪-৬৯৯ (১২০৭-১৩০০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বারবারী অনারবত্বের আধিপত্যের দরুন তাদের বাকরীতিতে বক্রতা বিদ্যমান ছিল এবং আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তা এ বিষয়ের পরিপন্থী।

অতঃপর এ ভাষাগত যোগ্যতা পুনরায় পূর্বের সেই সমৃদ্ধিসহ আন্দালুসে ফিরে আসে এবং ইবনে সিরীন,[৪১৬] ইবনে জাবের[৪১৭], ইবনে জিয়াব[৪১৮] ও তাঁদের পর্যায়ভুক্ত অন্যান্যরা খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের পরে ইব্রাহিম আস্‌সাহেলী আত্তুয়াইজন[৪১৯] ও তার পর্যায়ভুক্ত অন্যান্যরা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইবনে খাতিব আবির্ভূত হন,[৪২০] যিনি সম্প্রতি তাঁর শত্রুদের প্রচেষ্টায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর ভাষাগত যোগ্যতার অভাব পূরণ হবার নয় এবং তাঁর পরে তাঁর শিষ্যরা তাঁর অনুসরণ করছে।

সামগ্রিকভাবে আন্দালুসে এ ভাষাগত যোগ্যতার পরিচয় সমধিক এবং তার শিক্ষাদান পদ্ধতিও তুলনামূলকভাবে সহজ ও সাবলীল। বর্তমানকালেও তারা আমাদের সেই পূর্ববর্ণিত আরবি ভাষার বিষয়বৈচিত্র্য অনুসরণ ও সংরক্ষণ এবং সাহিত্যের চর্চা ও তা শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারা যত্নের সাথে রক্ষা করছে। কারণ অনারব ভাষার অধিকারী, যারা মিশ্রণের দ্বারা তাদের বাকরীতিকে বিকৃত করতে পারে, তারা সেখানে একান্তই নবাগত এবং সমুদ্রতীরের এ অঞ্চলের আন্দালুসী ও বারবার অধিবাসীদের মধ্যে অনারব ভাষার কোনো ভিত্তিই নেই। তারা এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং তাদের ভাষাই এ অঞ্চলের ভাষা। একমাত্র শহরগুলোতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তারা অনারবত্ব ও বারবারী ভাষার বাকধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এর ফলে তাদের পক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু আন্দালুসবাসীদের অবস্থা এর বিপরীত।

পাঠক এ বিষয়টি উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সময়কালীন পূর্বাঞ্চলবাসীদের অবস্থার সাথে বিবেচনা করুন। তৎকালে তাদের অবস্থাও ভাষাগত যোগ্যতা ও চমৎকারিত্বের ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীদের সমতুল্য ছিল। কারণ তৎকালে এ বিষয়ে তারা অনারবদের সাথে খুব সামান্যই মিশ্রণের কবলে পতিত হয়েছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে তখন এ যোগ্যতাটি সুদৃঢ় ছিল এবং তাদের সময়ে লেখক ও কবিদের খ্যাতি ছিল পরিপূর্ণ। কেননা তখন পূর্বাঞ্চল আরবরা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা পূর্ণ ছিল।

পাঠক, এ প্রসঙ্গে 'কিতাবুল আগানী' তাদের গদ্য-পদ্যের যে বিরাট সম্ভার উপস্থিত করেছে, তার প্রতি লক্ষ করুন। কারণ এ গ্রন্থটি যথার্থই আরবদের এবং তাদের ঐতিহ্য সম্ভার। এতে তাদের ভাষা, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আরবীয় জাতিত্ব, নবী (সঃ)-এর চরিত্র, খলিফা ও রাজন্যবর্গের কীর্তিমালা, কাব্য, সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আরবদের অবস্থা জানার জন্য এটার চেয়ে ব্যাপক বিষয় সম্বলিত অন্য আর কোনো গ্রন্থ নেই।

---

৪১৬. মুহম্মদ ইবনে আহমদ; ৬৭৪-৭৪৭ (১২৭৬-১৩৪৬ খ্রি:) হি:।
৪১৭. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী; ৬১৮-৭৮০ (১২৯৯-১৩৭৮ খ্রি:) হি:।
৪১৮. আলী ইবনে মুহম্মদ; ৬৭৩-৭৪৯ (১২৭৪-১৩৪৯ খ্রি:) হি:।
৪১৯. ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৭৪৭ (১৩৪৬ খ্রি:) হি:।
৪২০. তৃতীয় অধ্যায় দ্র:।

www.amarboi.org

বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতার এ বিষয়টি উক্ত দুটি সাম্রাজ্যের সময় সুদৃঢ়ভাবে বিরাজমান ছিল। এমন কি অনেক সময় এর বহিঃপ্রকাশ তাদের মধ্যে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মূর্খতার যুগেও তা দেখা যায়নি; যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এমনি অবস্থায় থেকে এক সময় আরবদের কর্তৃত্ব নষ্ট হল, তাদের ভাষা বিকৃত হল, তাদের বাণী লুপ্ত হল, তাদের বিষয় গৌরব ও সাম্রাজ্য সমাপ্ত হল এবং ক্ষমতা অনারবদের হাতে চলে গেল। তখন তাদের হাতেই রাজশক্তি এবং চতুর্দিকে তাদেরই আধিপত্য। দায়লমী ও সলজুকীদের সময়েই অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তারা শহরবাসীদের মধ্যে প্রবিষ্ট হল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের ভাষায় পৃথিবী পরিপূর্ণ করে তুলল। ভাষার ক্ষেত্রে অনারবত্ব শহরবাসী ও নাগরিকদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হল এবং পরিণামে তারা আরবি বাকরীতি থেকে দূরে সরে গেল। যোগ্যতার অভাবের ফলে শিক্ষার্থীরাও সেই যোগ্যতা অর্জনে বিচ্যুতির অধীন হতে লাগল। বস্তুত বর্তমানকালে তাদের গদ্য-পদ্যের এ স্বরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি; যদিও এ বিষয়ে তাদের সৃষ্টির সংখ্যা প্রচুর। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ও নির্বাচন করেন'।[৪২১] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়তার আধার। তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

৪২১. কোরান; ২৮, ৬৮।

www.amarboi.org

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্য বিষয়দ্বয়ে বাণীর দ্বিধাবিভক্তি]

জেনে রাখুন, আরবদের বাকরীতি ও বাণী দুটি ভাগে বিভক্ত। এর একটি ছন্দোবদ্ধ কাব্য; তা মাত্রাযুক্ত সমিল বাণীরূপ। সমিল অর্থে তার মাত্রাযুক্ত প্রতিটি পঙ্ক্তি একটি বর্ণের ধারায় মিলবে এবং একেই বলা হয় অন্ত্যানুপ্রাস। এর দ্বিতীয়টি হল গদ্য; তা মাত্রাবিহীন বাণীরূপ। এ দুটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই বাণী সম্পর্কীয় বিচিত্র বিষয় ও মতাদর্শের ধারক ও বাহক। বাক্যের মধ্যে স্তুতি, নিন্দা ও শোকগাথা। গদ্যের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ গদ্য, যা খণ্ড খণ্ড আকারে রচিত হয় এবং প্রতি দুটি বাক্যের মধ্যে একটি মিল অনুসরণ করা হয়; তাকেই ছন্দোবদ্ধতা বলে। গদ্যের অন্য একটি হল সরল গদ্য, যাতে বক্তব্যকে নির্বাধে বিস্তার করা হয়। কোনো প্রকার অংশে ভাগ না করে বরং কোন প্রকার অন্ত্যমিল ও অন্যবিধ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বক্তব্যকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এরূপ গদ্য ভাষণে, প্রার্থনায় এবং সাধারণ মানুষের উৎসাহ বর্ধন ও সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

কুরআন যদিও গদ্যে রচিত, তবুও তা উপরিউক্ত দুটি রূপের কোনটিতেই এককভাবে পড়ে না। তাকে সরল বাধাবন্ধনহীন গদ্যও বলা যায় না; আবার ছন্দোবদ্ধ গদ্যও বলা যায় না। বরং তাতে শ্লোকের বিভক্তি এমন এক স্থানে মূর্ত হয়, যেখানে আস্বাদ একটি বক্তব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং এর পরে বক্তব্য অন্য একটি শ্লোকে প্রত্যাবৃত্ত হতে থাকে। এরূপ প্রত্যাবর্তন বা দ্বিরুক্তি কোনো প্রকার বর্ণের ছন্দোবদ্ধতা ও অন্ত্যানুপ্রাসের আবশ্যকতা ছাড়া ঘটে থাকে। এটাই আল্লাহ্ মহানের বাণীর অর্থ; তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ সুন্দরতম অভিনব বাণী অবতীর্ণ করেছেন, যা গ্রন্থরূপে পরস্পরতুল্য দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট; যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তার সংস্পর্শে তাদের গাত্রচর্ম শিহরিত হয়ে ওঠে।'[৪২২] তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা শ্লোকগুলোকে বিভক্ত করে দিয়েছি।[৪২৩] কোরানের শ্লোকসমূহের শেষাংশকে 'বিভাজক' (ফাওয়াসেল) বলা হয় এজন্যই যে, এগুলো গদ্যের ছন্দোবদ্ধতা নয়। কারণ সেখানে অনুরূপ ছন্দোবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কি এগুলোতে অন্ত্যমিলের কিছু নেই। 'দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট' (মাছানী) নামটি সাধারণভাবে কোরানের সর্বপ্রকার শ্লোক সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয় এবং এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। বিশেষভাবে এর দ্বারা 'সূরা ফাতেহা' কুরআন

---

৪২২. কোরান, ৩৯, ২৩।

৪২৩. কোরান; ৬, ৯৭।

www.amarboi.org

জননীকে বুঝিয়ে থাকে এবং তার কারণ উক্ত সূরায় এর প্রাধান্য। যেমন প্রাধান্যের তারকা বলতে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' (সুরাইয়া)-কে বোঝায়। এজন্যই উক্ত সূরাকে 'দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট সপ্তশ্লোক' বলে অভিহিত করা হয়। পাঠক, এর সাথে কুরআন ভাষ্যকারদের দ্বারা উক্ত সূরার 'মাছানী' নামকরণের কারণ বর্ণনা মিলিয়ে লক্ষ করুন, দেখতে পাবেন, আমাদের বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্যই তা বহন করছে।

জেনে রাখুন, উপরিউক্ত প্রতিটি বিষয়েরই বিশেষ রীতি বিদ্যমান, যা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রকারদের কাছে সুপরিচিত এবং যা অন্য বিষয়ের উপযোগী নয় ও তাতে ব্যবহৃতও হয় না। যেমন 'নসিব' বা প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের সাথে বিশিষ্ট, স্তুতি ও প্রার্থনা ধর্মীয় ভাষণের সাথে বিশিষ্ট, প্রার্থনা সাধারণ অভিভাষণের সাথে বিশিষ্ট এবং অনুরূপ অন্যান্য রীতি।

উত্তরসূরিরা গদ্যের মধ্যে কাব্যের রীতি ও মাত্রা ব্যবহার করেছেন। তারা গদ্যে ছন্দোবদ্ধতার আতিশয্যে, অন্ত্যমিলের আবশ্যকতা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে প্রণয়োপাখ্যানের আভাস তুলে ধরেছেন। পাঠক, চিন্তা করে দেখলে দেখতে পাবেন, তা কাব্য ও তার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; একমাত্র 'মাত্রা' ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। রাজকীয় লেখকদের মধ্যকার উত্তরসূরিরা এ পথে এগিয়ে এসেছেন এবং রাজকীয় অভিভাষণে এরূপ গদ্যকে ব্যবহার করেছেন। তারা সমুদয় বিষয়বস্তুকে এ গদ্য রূপে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের প্রিয় একটি বিষয় হিসেবে এটাকে গড়ে তুলেছেন এবং তাতে সর্বপ্রকার রীতিনীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তারা সরল গদ্যরীতিকে পরিত্যাগ করেছেন ও ভুলে গিয়েছেন। বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে এ রীতি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানকালেও উদাসীন লেখকদের কাছে রাজকীয় অভিভাষণ লেখার জন্য এ গদ্যরীতিই ব্যবহৃত হচ্ছে, যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু বাকবৈদগ্ধ্যের দিক থেকে এটা সঠিক নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য হল প্রসঙ্গানুরূপ বক্তব্যের উপস্থাপন এবং বক্তা ও শ্রোতার অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। উপরিউক্ত রীতিতে তা সম্ভব নয়।

এভাবে পরবর্তীগণ সমিল গদ্যের যে ধারা প্রবর্তন করেছেন, তাতে তারা কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন; উক্ত রীতি থেকে রাজকীয় অভিভাষণাদিকে মুক্ত করা দরকার। কারণ কাব্যরীতিতে রসিকতা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে ভাঁড়ামি, প্রশংসায় আতিশয়োক্তি, প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ, উপমা ও অলঙ্কারাদির আতিশয্য প্রভৃতির স্থান আছে; কিন্তু ভাষণে এসব কিছুর তেমন প্রয়োজন নেই। তদুপরি অন্ত্যমিল প্রয়োগের বিষয়টিও আবশ্যকীয়ভাবে রসিকতা ও অলঙ্করণকে টেনে আনে। অথচ শাসক ও রাজন্যবর্গের মহিমা এবং তাঁদের পক্ষ থেকে সাধারণের প্রতি উচ্চারিত উদ্দীপনা ও সতর্কীকরণ এরূপ রীতির বিরোধী। এ কারণেই রাজকীয় অভিভাষণগুলোতে সর্বোত্তম হল সরল গদ্য, যে গদ্য বক্তব্যকে কোনো প্রকার ছন্দোবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সাবলীল করে তুলবে। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ ছন্দোবদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে; আবার তাও এমন হতে হবে যে, ভাষাগত যোগ্যতা যেন অনায়াস পটুত্বে তার যোগান দিয়ে বক্তব্যের বিস্তার সাধন করতে পারে। এরপর বক্তব্যকে প্রসঙ্গানুরূপ করার ক্ষেত্রে যেন তার যথার্থতা সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। কারণ প্রসঙ্গ বিচিত্রধর্মী

www.amarboi.org

এবং প্রতিটি প্রসঙ্গই তার নির্ধারিত রীতির সাথে বিশিষ্ট। এদিক থেকেই তাতে আতিশয্য, সংক্ষেপ, উহ্য, অভিব্যক্তি, বিশদ, ইঙ্গিত, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে যথাপ্রয়োজন প্রকাশ করতে হয়।

সুতরাং রাজকীয় অভিভাষণাদিকে কাব্যরীতির এ ভঙ্গিতে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করা দূষণীয়। ভাষার ওপর অনারবত্বের আধিপত্যই সমসাময়িক ভাষাবিদ্‌দেরকে অনুরূপ রীতি অনুসরণে উৎসাহিত করেছে। এ সঙ্গে তারা বক্তব্যকে প্রসঙ্গানুসারে সুসামঞ্জস্য করতেও অপারগ। এ কারণেই তারা সরল গদ্যের ব্যাপক বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও সাবলীল বিস্তারে বক্তব্য উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। মনোভাবকে প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে অক্ষমতা বিদ্যমান, তাকে আবৃত করার জন্যই তারা এরূপ ছন্দোবদ্ধ গদ্যরীতির প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেছেন। বস্তুত এর দ্বারা তারা অলঙ্করণ, ছন্দোবদ্ধতা ও বিচিত্র বাক্‌কুশলতায় তাদের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করে নিতে চায় এবং এছাড়া সব কিছুতেই তারা উদাসীন।

পূর্বাঞ্চলের লেখক ও কবিরাই এ রীতিটিকে সব বিষয়ে বেশি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানকালেও তারা এ ব্যাপারে আতিশয্য দেখিয়েছে। এমন কি এক্ষেত্রে তারা কারক-চিহ্নাদি ও শব্দ গঠনের নিয়মাবলির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে সমতুল্যতা অথবা সামঞ্জস্য রক্ষা করছে। যদি কোথাও বাক্যগুলোর মধ্যে এমন সমতুল্যতার অভাব ঘটে, তাহলে তার জন্য তারা বাক্‌রীতির ধারা পরিবর্তন করতে রাজি, তবুও সেই সমতুল্যতা আনতে হবে। যদি কারক-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করতে হয় ও বাক্‌বিন্যাসের ধারা বিকৃত করতে হয়; তবু তা করে হলেও রচনাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে তা সমতুল্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অব্যর্থ হয়ে দেখা দেয়। পাঠক, এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে তাকে বিবেচনা করে দেখুন; আশা করি, আমাদের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ্ তার অশেষ কৃপা ও দয়াগুণে যথার্থতার জন্য সহায়তাকারী এবং মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

www.amarboi.org

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়ে দক্ষতার সুযোগ খুব অল্পই ঘটে থাকে]

এর কারণ এই যে, আমরা যেমন ইতিপূর্বে ভাষাগত যোগ্যতার কথা বর্ণনা করেছি, ঠিক তেমনি যখন কোনো আধারে একটি যোগ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে বসে, তখন তার পশ্চাতে আগত অন্য কোনো যোগ্যতা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ মানব প্রকৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে এ যোগ্যতা গ্রহণ ও অর্জনের বিষয়টি সহজতর ও সাবলীল হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে যদি ভিন্ন কোনো যোগ্যতা অগ্রগামী হয়ে এ সুযোগ গ্রহণ করে, তাহলে তা পরবর্তী যোগ্যতা অর্জনের কাল দীর্ঘায়িত করে তার ত্বরিত গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে একটি বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং যোগ্যতার পূর্ণতা লাভে ত্রুটি দেখা দেয়।

এ বিষয়টি সাধারণভাবে সর্বপ্রকার শিল্পগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। যথাস্থানে আমরা অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ সহযোগেই এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছি। পাঠক, সেই যুক্তি-প্রমাণকে আপনি ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। কারণ এটাও ভাষাগত যোগ্যতা এবং তুলনামূলকভাবে শিল্পগত যোগ্যতারই অনুরূপ। লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তির যোগ্যতায় অনারবত্ব অগ্রগামী হয়, সে কীভাবে সর্বকালের জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটির অধীন হয়ে থাকে। এজন্যই দেখা যায়, যে অনারব ফারসি ভাষায় দক্ষ, সে আরবি ভাষার যোগ্যতা অর্জনে পশ্চাদ্‌পদ থাকে এবং তার শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত থাকলেও তার সেই ত্রুটি দূরীভূত হতে চায় না। এরূপ বারবার, রোমীয় ও ফিরিঙ্গীদের অবস্থা; তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যককেই আপনি আরবি ভাষাগত যোগ্যতায় পারদর্শী হতে দেখতে পারবেন। এর কারণও সেই একই অর্থাৎ তাদের ভাষাগত যোগ্যতায় ভিন্ন ভাষার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তা এমনভাবে হয়েছে যে উপরিউক্ত ভাষাভাষী কোনো শিক্ষার্থীকে যদি আরবি ভাষাভাষী পরিবেশে রেখে সে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি থেকেও শিক্ষা দেওয়া হয়, তবুও সে তার তাৎপর্য জ্ঞান ও আহরণের ক্ষেত্রে ত্রুটির কবলমুক্ত হতে সমর্থ হয় না। বস্তুত এটা ভাষার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইতিপূর্বে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, বাক্‌রীতি ও ভাষা শিল্পাদির সমতুল্য এবং পাঠক, আপনি এ আলোচনাও পাঠ করেছেন যে, শিল্পজ্ঞান ও তার যোগ্যতা কখনও একত্র ভীড় করে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তির একটি শিল্পে দক্ষতা অর্জিত হলে, অন্যটিতে সে কখনও দক্ষতা প্রদর্শন অথবা তার ওপর যথার্থ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের জানা সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন।[৪২৪]

---

৪২৪. কোরান; ৩৭, ৯৬।

www.amarboi.org

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[কাব্যশিল্প ও তার শিক্ষা পদ্ধতি]

এ বিষয়টি আরবি বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর অন্তর্গত। কাছে এটা কাব্য বলে অভিহিত এবং এটা সব ভাষাতেই বিদ্যমান। অবশ্য আমরা এক্ষণে আরবি কাব্য সম্পর্কেই কথা বলব। যদিও সব ভাষাকেই ভাষাভাষীদের মনোভাব প্রকাশের বাণীরূপ হিসেবে তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও প্রতিটি ভাষারই বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় এমন কিছু নিয়ম আছে, যা তারই সাথে বিশিষ্ট।

আরবি ভাষায় কাব্য তার প্রকাশধারায় অভিনব ও তার গঠনসৌকর্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। তা খণ্ড খণ্ড বাণীরূপের সমষ্টি, মাত্রার দিক থেকে তার প্রতিটি অংশ সমান এবং প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শেষ বর্ণের দিক থেকে সমিল ঐক্যবদ্ধ। এসব খণ্ডের মধ্যে প্রতিটি খণ্ড তাদের কাছে 'বয়ত' বা পঙ্‌ক্তি বলে আখ্যাত এবং পঙ্‌ক্তি শেষের যে বর্ণটির মিলের মধ্য দিয়ে এ পঙ্‌ক্তিগুলো একত্র গ্রথিত হয়, তাকে বলা হয় 'রবিয়া' বা অন্ত্যমিল ও 'কাফিয়া' বা অন্ত্যানুপ্রাস। এভাবে গ্রন্থণার শেষ পর্যন্ত বাণীরূপের সমষ্টিকে তারা 'কসিদা' বা দীর্ঘকবিতা ও 'কলেমা' বা বাণী বলে অভিহিত করে। এ কসিদার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই তার বাক্‌বিন্যাস ও ভাবপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে; যেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বক্তব্য এবং পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন একটি স্বতন্ত্র বাণীরূপ। সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ কসিদা থেকে পৃথক করে নিতেও যে কোনো প্রকার স্তুতি, প্রেম বা শোকের ভাব প্রকাশে তা পূর্ণতার দাবি করতে পারে। এজন্যই কবি এরূপ কাব্যপঙ্‌ক্তিকে ভাব প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য দানে তৎপর হন। তারপর তিনি অনুরূপ বক্তব্যসহ অন্য একটি কাব্যপঙ্‌ক্তির সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ও এক ভাব থেকে অন্য ভাবে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেন, যাতে প্রথম ভাব ও তার তাৎপর্যের সাথে দ্বিতীয় ভাবের সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং সমগ্র কসিদাটি বিশৃঙ্খল ভাববিন্যাস থেকে মুক্তি পায়। যেমন কবি প্রেমের স্মৃতিচারণ থেকে স্তুতি বর্ণনায় তার ধারার পরিবর্তন করেন। এমনিভাবে প্রান্তর ও পাহাড়ের গুণ কীর্তন করতে করতে বাহন, অশ্ব অথবা স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলির বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কখনও প্রিয়জনের প্রশংসা করতে গিয়ে তার গোত্র ও সৈন্যদলের গুণাবলি ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হন। আবার কখনো শোকগাথায় বেদনা ও হা-হুতাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে মৃতব্যক্তির দোষগুণও স্মরণ করতে পারেন। এমন অন্যান্য বিষয়।

কিন্তু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যাই হোক, সমগ্র কসিদাটির সংহতির জন্য একটি মাত্র মাত্রার অনুসরণ করা হয়; যেন কবিপ্রকৃতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে প্রায় সমতুল্য মাত্রার

www.amarboi.org

ব্যতিক্রম বহু লোকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে যা হোক, এসব মাত্রার জন্য যে শর্ত ও নিয়ম বিদ্যমান, তা ছন্দশাস্ত্রে আলোচিত হয়ে থাকে। অবশ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে যেসব মাত্রার বিন্যাস হওয়া সম্ভব, আরবরা সে সবই ব্যবহার করেনি; বরং এগুলো এমন কিছু বিশেষ মাত্রা, যাকে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদরা 'বাহর' বা ছন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা এসব ছন্দের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন পনের অর্থাৎ তারা স্বাভাবিক মাত্রায় এগুলোর বাইরে আরবদের রচিত কোনো পদ্য পান নি।

জেনে রাখুন, আরবদের বাণী সাধনায় কাব্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এজন্যই তারা তাকে তাদের জ্ঞান-গুণ ও ইতিহাসের রক্ষণাগার, তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার সাক্ষী এবং তাদের বহুবিধ বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-সাধনার উৎসরূপে স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যকার অন্যান্য যোগ্যতার ন্যায় এ কাব্যের যোগ্যতাও একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতার সবই তাদের এ বাণীরূপের কৌশল আয়ত্ত ও তার অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল অর্জন করা সম্ভবপর। এরূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল তাদের অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যায়।

বাণী সাধনার সাথে সম্পর্কিত সর্বপ্রকার বিষয়ের মধ্যে কাব্য বেশ আয়াসসাধ্য; বিশেষ করে পরবর্তীকালের যারা বাণীশিল্প হিসেবে তার যোগ্যতা অর্জনে প্রয়াসী তাদের জন্যই বটে। কারণ তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি এমন একটি বাণীরূপ, যা তার অন্তর্গত মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য সব কিছু থেকে পৃথকভাবে উপলব্ধ হবার যোগ্য। সুতরাং তার জন্য সংশ্লিষ্ট যোগ্যতায় এমন এক প্রকার সূক্ষ্ম বোধের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, যাতে কাব্যময় ভাব সাবলীলভাবে আরবদের কাব্যধারায় সুপরিচিত গঠনসৌকর্যে বিধৃত হতে পারে এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র রূপদানে সক্ষম হয়। তারপর অনুরূপভাবে আরও একটি কাব্য পঙ্‌ক্তির সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় আরও একটি। এভাবে মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয় বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করবে। এর পর সমগ্র কসিদাটির সংহতি বিধানের জন্য পঙ্‌ক্তিমালার মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের দিক থেকে সখ্যতা স্থাপন করতে হবে। এভাবে তার সৃজনধারার আয়াসসাধ্যতা ও বিষয়বিন্যাসের অভিনবত্ব তার রীতিনীতিতে দক্ষতা লাভের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে এবং বাণীকে তার গঠনসৌকর্যে বিধৃত করার ক্ষেত্রে মননশীলতা প্রাখর্য দাবি করেছে। এজন্যই সাধারণভাবে আরবীয় ভাষাগত যোগ্যতাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম বোধ ও দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে আরবদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রীতি ও তার ব্যবহার সুরভিত অবস্থায় মূর্ত হয়।

পাঠক, আসুন, আমরা এখানে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে গৃহীত এ 'উসলুব' বা রীতি শব্দটির তাৎপর্য বর্ণনা করি এবং তারা এর দ্বারা সাধারণভাবে কী বোঝাতে চান, তার যথার্থতা জেনে নিই। অতএব জেনে রাখুন যে, তারা এর দ্বারা এমন একটি তাঁতের কথা বোঝাতে চান যার মধ্যে বাক্‌বিন্যাসকে বয়ন করা হয় অথবা এমন একটি ছাঁচের কথা যাতে তাকে ঢালাই করা হয়। এর দ্বারা কোনো বক্তব্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশকে বোঝায় না; কারণ এ দায়িত্ব কারক-চিহ্নাদি পালন করে থাকে। এর দ্বারা কোনো

www.amarboi.org

বক্তব্যের বাক্‌বিন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মূল অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয় না; যেমনটি বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও বাক্‌শৈলীর বিচারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর দ্বারা আরবদের ব্যবহৃত মাত্রাজ্ঞানকেও বোঝানো হয় না, যা আমরা ছন্দশাস্ত্রে দেখতে পাই। বরং এসব শাস্ত্রই কাব্য-কৌশলের আওতা বহির্ভূত অবস্থায় বিরাজ করছে। বস্তুত এ উসলুব বলতে একমাত্র সেই সার্বিক বাক্‌বিন্যাস পরম্পরার এমন একটি হার্দিক রূপকে বোঝায়, যা যে-কোনো বিশেষ বাক্‌বিন্যাসকে মূর্ত করে তুলতে পারে। এ হার্দিক রূপটিকে মননশক্তি বাস্তব বাক্‌বিন্যাস ও তার বিশদ প্রক্রিয়া থেকে সারাংশ হিসেবে গ্রহণ করে কল্পনার মধ্যে তাঁত বা ছাঁচের আকারে স্থাপন করে। তারপর আরবদের কাছে কারক-চিহ্নাদি ও বাক্‌শৈলীর দিক থেকে বিশুদ্ধ বলে গৃহীত বাক্‌বিন্যাসকে চয়ন করে উপরিউক্ত তাঁত অথবা ছাঁচের মধ্যে যথানিয়মে বিন্যস্ত করে; যেমন একজন কারিগর তার ছাঁচে ও একজন তন্তুবায় তার তাঁতে করে থাকে। পরিণামে এ ছাঁচটি এমন এক বাক্‌বিন্যাসকে মূর্ত করে তোলে, যা বক্তব্যের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে এবং আরবি বাক্‌রীতি অনুপাতে যোগ্যতার একটি বিশুদ্ধ স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

বাণীসাধনার প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই এমন কিছু রীতি বা উসলুব বিদ্যমান, যা তার সাথে বিশিষ্ট এবং যা বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সুতরাং কাব্যে পরিত্যক্ত বস্তুর ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হলে তা সম্বোধনের আকারে উপস্থিত হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৫]

'হে উন্নতশীর্ষ পর্বতগাত্রে অবস্থিত মায়্যার আবাসস্থল।'

কখনো সঙ্গীদেরকে থামতে বলে জিজ্ঞেস করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৬]

'দাঁড়াও, সেই গৃহকে জিজ্ঞাসা কর, যার অধিবাসীরা অতর্কিতে সরে গেছে।'

কখনও সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বন্ধুদেরকে অশ্রুপাত করতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৭]

'দাঁড়াও, বন্ধু ও তার গৃহের স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করি।'

অথবা কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসু হতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৮]

'তুমি জিজ্ঞেস করনি? তাহলে ধ্বংসাবশেষই তোমাকে বলে দিত।'
যেমন ধ্বংসাবশেষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্রূপ করতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৯]
'গজলের পাশে অবস্থিত আবাসভূমিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর।'

৪২৫. 'নাবিগা যুবিয়ানী'।
৪২৬. অজ্ঞাত।
৪২৭. 'ইমরুল কায়েস'।
৪২৮. অজ্ঞাত।
৪২৯. ইমরুল কায়েস।

www.amarboi.org

অথবা তার জন্য বৃষ্টিপাতের প্রার্থনা করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩০]

'সুপ্রচুর বৃষ্টিপাতে তাদের ধ্বংসাবশেষ পরিতৃপ্ত হোক
এবং তাদের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রাচুর্য ফিরে আসুক।'

অথবা বিদ্যুতের কাছে তার জন্য বৃষ্টিপাত কামনা করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩১]

'হে বিদ্যুৎ! আরবাকের আবাসস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করছ;
মেঘমালাকে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাও, উটনীকে তাড়াবার মতো।'

অথবা শোকগাথায় বেদনা প্রকাশের জন্য কাঁদতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩২]

'এরূপ ঘটনাটি গুরুত্ব লাভ করুক ও বিষয়টি ঘৃণার্হ হোক;
যে চক্ষু অশ্রুপাত করে নি, তার কোন অজুহাত নেই।'

অথবা ঘটনার গুরুত্ব সম্পাদনের জন্য বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৩]

'তুমি কি দেখেছ, কীভাবে তারা কাষ্ঠখণ্ডে বাহিত হয়েছে!
তুমি কি দেখেছ, কীভাবে সমাবেশের আলো নিভে গেছে!'

অথবা তার তিরোধানে সব সৃষ্টি বেদনাহত বলে ধরা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৪]

'সমৃদ্ধ চারণভূমির কোনো রক্ষী নেই, রাখাল নেই
মৃত্যু নেই। দীর্ঘবর্শাধারী বলশালীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

অথবা তার জন্য শোক প্রকাশে অনিচ্ছুক জড় পদার্থের ভর্ৎসনা করা হয়। যেমন খারেজী মহিলাকবি বলেন,[৪৩৫]

'হে খাবুর বৃক্ষ! তুমি পত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত কেন?
তাহলে তুমি কি ইবনে তরিফের শোকে অবির্ভূত হওনি!

অথবা শত্রুস্থানীয়কে তার শক্তির দাপট থেকে মুক্তির সান্ত্বনা দেওয়া হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৬]

'হে রবিআ ইবনে নজার তোমার বর্শা ফেলে দাও,
অনবরত আক্রমণকারী তোমার শত্রু মৃত্যুর কবলে পতিত।'

বাণী সাধনার সব বিষয় ও মতাদর্শে এমন উদাহরণের প্রাচুর্য রয়েছে। এজন্য বাক্‌বিন্যাস কখনও বাক্যরূপে, কখনও অবাক্য অন্যরূপে; আবার সেই বাক্যও কখনও অনুজ্ঞাবোধক, কখনও বিধেয়জ্ঞাপক; কখনও উদ্দেশ্যের বার্তাবাহী, কখনও ক্রিয়ার অন্বয়ীরূপ, কখনও সুসমন্বিত, কখনও অসমন্বিত, কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও সুসংবদ্ধ;

৪৩০. আবু তাম্মাম।
৪৩১. পূর্বোক্ত।
৪৩২. পূর্বোক্ত।
৪৩৩. শরীফ আর্‌রাজী।
৪৩৪. অজ্ঞাত।
৪৩৫. ফারিয়া বিনতে তারিফ; তার ভ্রাতার শোকে।
৪৩৬. শরীফ আর্‌রাজী।

www.amarboi.org

আরবি বাণী-সাধনার ধারাবিন্যাস ও শব্দাবলির পরস্পর সম্বন্ধের অনুপাতেই এরা বিন্যস্ত হয়ে থাকে। পাঠক, আপনি আরবি কাব্যের এসব বিষয় অনুশীলনে কীভাবে একটি সার্বিক মননশীল ছাঁচের ধারণা লাভ করা যায়, তা এ বর্ণনা থেকে বুঝতে পারবেন। বস্তুত এসব নির্দিষ্ট বাক্‌বিন্যাস থেকে এমন একটি ছাঁচ গড়ে ওঠে, যা সমগ্রের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে একজন বচন-রচনাকারী একজন কারিগর অথবা বয়নকারীর সমতুল্য এবং তার মননের সমন্বিত রূপ বস্তু তৈরির ছাঁচ অথবা বয়ন করার তাঁতের ন্যায়। সুতরাং তা যদি তৈরির সময় ছাঁচের বাইরে চলে যায় অথবা বয়নের সময় তাঁতের মধ্যে না থাকে, তা হলেই নষ্ট হয়ে যায়।

পাঠক, এখানে আপনি কিছুতেই এ কথা বলতে পারবেন না যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্যের নিয়ম-কানুন জেনে নেওয়াটাই এজন্য যথেষ্ট। কারণ আমরা বলব, বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় নিয়মাবলি কতিপয় শাস্ত্রীয় ও অনুমানসিদ্ধ ধারা মাত্র, যা দিয়ে বাক্‌বিন্যাসকে অনুমানের ভিত্তিতে তার নির্দিষ্ট কাঠামোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা এমন একটি অনুমান, যা শাস্ত্রীয় হলেও সার্বিক ও শুদ্ধ; যেমন কারক-চিহ্নাদি সম্পর্কীয় অনুমানসিদ্ধ নিয়মাবলির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু আমরা এখানে যেসব উসলুবের কথা বর্ণনা করছি, তাতে অনুমানের কোনো স্থান নেই; তা একমাত্র আরবদের কাব্যগত বাক্‌বিন্যাস, যা তাদের বাক্‌রীতিতে প্রচলিত, তার অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্বভাবের মধ্যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যা ক্রমশ দৃঢ়তা লাভ করে এবং তার দ্বারা কাব্যের বিন্যাসধারায় আরবদের অনুরূপ ব্যবহার ও সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকে। যেমন আমরা সাধারণ বর্ণনায় ইতিপূর্বে বলেছি যে, আরবি ভাষাতত্ত্ব ও বাক্‌শৈলীর শাস্ত্রীয় নিয়মাবলির শিক্ষা এক্ষেত্রে কোনো সাহায্যই করে না। অন্যদিকে আরবের বাণী-সাধনায় যা কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম বলে অনুমানসিদ্ধ, আরবরা সে সবই ব্যবহার করেনি। বরং তাদের এ সম্পর্কীয় ব্যবহার এত বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে যে, একমাত্র তাদের বাণী কণ্ঠস্থকারীদের কাছে তার স্বরূপ পরিস্ফুট হতে পারে এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ রূপবৈচিত্র্যকে অনুমানসিদ্ধ নিয়মাবলির অধীনে বিবৃত করা সম্ভব। সুতরাং কেউ যদি আরবি কাব্য-সম্ভারে এ ধারায় দৃষ্টিপাত করে এবং সেই ছাঁচসদৃশ মানসিক রীতি নিয়ে তার সৌন্দর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে তাদের ব্যবহৃত বাক্‌বিন্যাসের মধ্যেই তা করতে হবে; অনুমানসিদ্ধ সম্ভাবনার মধ্যে নয়। এজন্যই আমাদের বক্তব্য এই যে, এমন মানসিক ছাঁচ প্রস্তুত করতে হলে আরবের কাব্য ও বাণীসম্ভার কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন।

বস্তুত তাদের বাণীতে বিবৃত এ মানসিক ছাঁচের উপাদান শুধু কাব্যেই নয়, গদ্যেও হয়ে থাকে। কারণ, আরবরা এ উভয় প্রক্রিয়াতেই তাদের বাণীর সাধনা করেছে এবং উভয়টিকে পৃথক আকারে রূপায়িত করেছে। এজন্য কাব্যে তারা সমমাত্রিক বাক্যখণ্ড, অবশ্য পালনীয় অন্ত্যমিল এবং প্রতিটি পঙ্‌ক্তিকে বক্তব্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গদ্যেও অনেক সময় সমমাত্রা ও সমতুল্যতার বিষয়টি এসেছে, কখনও ছন্দোবদ্ধ তার দ্বারা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়েছে, আবার কখনও সরল সাবলীল আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছে। আরবদের বাক্‌রীতিতে এদের প্রতিটিই অতিশয় সুপরিচিত। বস্তুত তাদের এ ব্যবহারই এমন এক ভিত্তি, যার ওপর রচনাকারী তার

www.amarboi.org

উদ্দিষ্ট রচনা গড়ে তোলে এবং একমাত্র তাদের বাণীসম্ভারের কণ্ঠস্থকারীই এ ভিত্তি জানতে সক্ষম। এভাবে বিচিত্র বিশদ বাণী-কাঠামো থেকে তার মানসমুকুরে এমন একটি সার্বিক সাধারণ ছাঁচ প্রতিবিম্বিত হয়, যার সাহায্যে সে তাদের অনুরূপ রচনাকার্যে পারদর্শী হয়ে ওঠে; যেমন কারিগর তার ছাঁচের দ্বারা এবং বয়নকারী তার তাঁতের দ্বারা অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ কারণেই এ রচনা বিষয়টি ব্যাকরণবিদ্ বাক্‌শৈলীবিশারদ ও ছান্দসিকের দৃষ্টি থেকে পৃথক একটি দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, উল্লেখিত শাস্ত্রসমূহের নিয়মাবলি এ রচনার শর্তস্বরূপ; তা এগুলোর সহায়তা ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। এসব নিয়ম-কানুন থেকে যে গুণাবলি সংগৃহীত হয়, তা বাণীরচনায় সেই দৃষ্টিকেই তীক্ষ্ণ করে মাত্র, যা ছাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এবং এ ছাঁচকেই শাস্ত্রবিদ্‌রা 'উসলুব' বা রীতি বলে অভিহিত করেন। এ রীতিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আরবীয় গদ্য-পদ্যের বাণীসম্ভার কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে।

পাঠক, উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা উসলুবের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবার পর, আসুন, আমরা কাব্যের সংজ্ঞা বা রূপরেখা তুলে ধরি, যা দিয়ে আমরা আমাদের এ উদ্দেশ্যের দুরূহতার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারব। কারণ আমরা এ বিষয়ে যতদূর দেখেছি, পূর্বসূরিদের মধ্যে কাউকেও এতে আত্মনিয়োগ করতে দেখি নি। এ প্রসঙ্গে ছন্দশাস্ত্রীরা তার মাত্রা ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাণীরূপ হওয়ার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা আমাদের মানসমুকুরে কাব্যের যে স্বরূপ বিদ্যমান, তার সংজ্ঞা বা রূপরেখা কোনোটাই হতে পারে না। তাদের সর্বপ্রকার কলাকৌশল কাব্যের ঐদিকটিই পরিস্ফুট করে তোলে, যা কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলোকেই পর্যায়ক্রমে স্বরান্ত ও হসন্তের সংখ্যায় একটি ঐক্যবদ্ধরূপে বিধৃত করে এবং ছন্দের দিক থেকে পঙ্‌ক্তিগুলোর গঠনসৌকর্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মাত্র। এটা শব্দাবলি ও তার তাৎপর্যাদি থেকে পৃথক একটি মাত্রাজ্ঞানের ধারণা মাত্র। সুতরাং এটা তাদের মতানুসারে একটা সংজ্ঞা হয়ত হতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে কাব্যকে তার কারক-চিহ্নাদি, বাক্‌বৈদগ্ধ্য, মাত্রা ও বিশেষ ছাঁচের ভিত্তিতে অখণ্ডরূপে দেখতে চাই। কাজেই তাদের সংজ্ঞায় আমাদের কাজ না চলাটা বিচিত্র কিছু নয়। এজন্যই এসব দিক থেকে তার এমন একটি বর্ণনা থাকা দরকার, যা তার যথার্থ স্বরূপকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করে তোলে।

আমরা বলব, কাব্য হল একটি বিদগ্ধ বাণীরূপ, যা অলঙ্কার ও বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা সমমাত্রা ও অন্ত্যমিলে খণ্ড খণ্ড রূপে বিন্যস্ত, যার প্রতিটি খণ্ড তার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের পূর্বাপর থেকে স্বতন্ত্র এবং যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত হয়ে উৎসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য তা 'একটি বিদগ্ধ বাণীরূপ' বস্তুত একটি গণ বা সার্বিক ধারণা মাত্র। 'যা অলঙ্কার ও বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রচিত' কথাটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা ভিন্ন বাণীরূপ থেকে তাকে পৃথক করে; কারণ অনুরূপ না হলে উক্ত বাণী সাধারণত কাব্য হয় না। আমাদের এ কথা—'যা সমমাত্রা ও অন্ত্যমিলে খণ্ড খণ্ড রূপে বিন্যস্ত'—তাও এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে বাণীর সেই গদ্যরূপ থেকে পৃথক করে, যা কারো কাছে কাব্য বলে অভিহিত হয় না। তারপর

www.amarboi.org

আমরা যে বলেছি, 'যার প্রতিটি খণ্ড তার উদ্দেশ্যও প্রকাশে পূর্বাপর থেকে স্বতন্ত্র', তা বলতে গেলে কাব্য স্বরূপের বর্ণনা; কেননা তার পঙ্‌ক্তিগুলো এভাবেই হয় এবং এক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছু থেকে তাকে পৃথক করতে হয় না। আমাদের বক্তব্য, 'যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত; তাও এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা কাব্যের অনুরূপ পরিচিতিতে বিধৃত নয়, এমন সব কিছু থেকে তাকে পৃথক করে; কেননা তা তখন আর কাব্য বলে গণ্য হয় না। বস্তুত এরূপ রচনা বাণীর পদ্যরূপ মাত্র। কারণ কাব্যের এমন কিছু রীতি বর্তমান, যা গদ্যের নেই এবং অনুরূপভাবে গদ্যেরও এমন কিছু রীতি রয়েছে, যা কাব্যের নেই। সুতরাং বাণীর যে-কোনো গদ্যরূপ যা সংশ্লিষ্ট বিশেষ রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কাব্য বলে অভিহিত হবে না।

এদিক থেকে বিবেচনা করেই আমাদের বহু উস্তাদ, যারা সাহিত্যশিল্পে পারদর্শী, তাঁদেরকে এ অভিমত প্রকাশ করতে দেখেছি যে, আলমুতানব্বী ও আল মুআরীর[৪৩৭] পদ্য রচনায় কাব্যের কোনো নামগন্ধ নেই; কেননা তাঁরা তাতে আরবীয় রীতি অনুসরণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, বাণীর কাব্যরূপ আরব ও আরব ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায়, তাদের জন্য কাব্য সংজ্ঞায় বর্ণিত আমাদের এই বক্তব্য, 'যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত', তা কাব্যকে অন্যান্য জাতির কাব্য থেকে পৃথক করবে। আর যারা মনে করেন যে, কাব্য আরব ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না, তাদের জন্য অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন নেই; তারা সেখানে বলবেন, 'যা বিশিষ্ট রীতিতে বিধৃত' মাত্র।

আমরা যেহেতু কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পেরেছি, সুতরাং আসুন, আমরা এখন তার রচনা-প্রক্রিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করি। আমরা বলব, জেনে রাখুন, কাব্য রচনা ও তার কলা-কৌশলের দক্ষতা অর্জনের জন্য কিছু শর্ত বিদ্যমান। এদের প্রথমটি হল অনুরূপ কাব্যের অর্থাৎ আরবদের কাব্য-সম্ভারের জ্ঞান আহরণ, যাতে তা দিয়ে প্রবৃত্তির মধ্যে এমন একটি যোগ্যতার সৃষ্টি হয়, যা তাঁতের ন্যায় বাণী বয়নে সাহায্য করতে সক্ষম এবং বাক্‌রীতির অন্তর্গত সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ ও প্রচুর দৃষ্টান্ত কণ্ঠস্থকরণে সুচয়নের দিক্ নির্দেশ করতে পারে। এরূপ সুচয়িত কণ্ঠস্থ সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ, যা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে, তা হল ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবিদের কাব্য। যেমন—ইবনে আবু রাবিয়া, কুছাইর, যুররুম্মা, জরির, আবু নাওয়াস, হাবীব, আল বুহতরী, আর্‌রাজী ও আবু ফেরাস।[৪৩৮] এর অধিকাংশই 'কিতাবুল আগানী'তে বিধৃত কাব্য; কেননা তা ইসলামী যুগের সব কবি এবং জাহেলী যুগের নির্বাচিত কবিদের কাব্যের এক ব্যাপক সংকলন। যে ব্যক্তি অনুরূপ সংগৃহীত জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হবে, তার কাব্যসাধনা অসম্পূর্ণ ও নীরস হতে বাধ্য এবং একমাত্র এরূপ সংগ্রহের প্রাচুর্যই তার কাব্যরূপকে উজ্জ্বল ও সজীব করে তুলতে পারে। সুতরাং যার সংগ্রহজ্ঞান

৪৩৭. আব্বাসীয় যুগের দুজন বিশিষ্ট কবি; জীবনকাল হিজরী চতুর্থ শতাব্দী।

৪৩৮. উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:। যে দৃষ্টিকোণ হতে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। আল মুতানব্বী ও আল মুআরী সম্পর্কে পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বক্তব্যই এ জন্য যথেষ্ট। বলাবাহুল্য এখানের মতামত ইবনে খলদুনের নিজস্ব নয়।

www.amarboi.org

স্বল্প কিংবা তার একান্ত অভাব, তাঁর সাধনায় কাব্য নেই; বস্তুত তার প্রচেষ্টা নিকৃষ্ট পদ্য সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। কাজেই যার জন্য উক্তরূপ সংগৃহীত জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তার জন্য কাব্যসাধনা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

অতঃপর এরূপ সংগৃহীত জ্ঞানের পূর্ণতা ও প্রকৃতিকে তাঁত বয়নের জন্য একাগ্র করার যোগ্যতা অর্জনের পর পদ্য রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ উদ্যোগের প্রাচুর্য যোগ্যতাকে দৃঢ় ও স্থায়ী করে তুলবে। অনেক সময় বলা হয়, কাব্য রচনার শর্ত হল সংগৃহীত জ্ঞানকে ভুলে যেতে হবে, যাতে তার বাহ্যিক শক্তির রেখাবিন্যাস বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা তা যোগ্যতার যথার্থ প্রয়োগের পথে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং রচনাকারী যখন তা ভুলে যাবে এবং তার প্রকৃতি তার বিমূর্তরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন তার মধ্যে উসলুব বা রীতি মূর্ত হয়ে উঠবে। যেন তাই তাঁতের আকারে সেই ভুলে যাওয়া শব্দাবলির স্থানে প্রয়োজনীয় অনুরূপ অন্য শব্দ এনে বয়নকার্যে নিরত হবে। তারপর এ উদ্যোগের জন্য নির্জনতা এবং ফুল ও জলের সমারোহে উৎকৃষ্ট পরিবেশের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে শ্রুতিসুখকর অন্য বিষয়েরও দরকার রয়েছে, যাতে আনন্দ সম্ভোগের মাধ্যমে তার কবিপ্রকৃতি একাগ্রতায় উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে।

এসবসহ কাব্য রচনার আরও একটি শর্ত হল, কবি অবসর ও সতেজ ভাবের মধ্যে অবস্থান করবে। বস্তুত এটা তাকে বেশি একাগ্র ও উদ্দীপ্ত করে প্রকৃতিকে তার মানসের অনুরূপ একটি রচনা তাঁতের আবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করবে। শাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন, কাব্য সাধনার উৎকৃষ্ট সময় হল প্রাতঃকাল; তখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত অবস্থা, পাকস্থলী শূন্য, মননশক্তি সতেজ এবং একটি অবসরের পরিবেশ বর্তমান। অনেক সময় তারা এটাও বলেন যে, প্রেম ও মাদকতা কাব্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইবনে রসিক তাঁর 'উমদা' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি এ শিল্পকৌশল বর্ণনা ও তার যথাযথ গুরুত্ব প্রদানে একক কৃতিত্বের অধিকারী। এ বিষয়ে তাঁর ন্যায় অন্য কেউ ইতিপূর্বে ও অতঃপরে সমতুল্য কিছু রচনা করেননি। তারা আরও বলেন, এসব সত্ত্বেও যদি কাব্যরচনা তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে অন্য সময়ের জন্য তা স্থগিত রাখতে হবে এবং কোনো প্রকারেই তার জন্য প্রকৃতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

কাব্যপঙ্‌ক্তির গঠন ও বয়নের প্রারম্ভেই একটি অন্ত্যমিল নির্দিষ্ট করতে হবে, যার ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বক্তব্যকে উক্ত মিল অনুসারে শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়। কারণ পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল সম্পর্কে অসতর্ক হলে রচয়িতার পক্ষে তাকে যথাস্থানে স্থাপিত করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অনেক সময় এটা আর আয়ত্তে আসতে চায় না এবং আয়াসসাধ্য হয়ে ওঠে। কোনো সময় যদি রচয়িতার কাছে কোনো উৎকৃষ্ট পঙ্‌ক্তি এসে যায়, অথচ তা প্রসঙ্গের সাথে মিলছে না এমন অবস্থা দেখা দেয়; তাহলে তাকে যোগ্য প্রসঙ্গের জন্য রেখে দিতে হবে। কারণ প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই অর্থের দিক থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং তার জন্য যোগ্য প্রসঙ্গ অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কিছু করার নেই এবং এ ব্যাপারে যথাসম্ভব করাই বাঞ্ছনীয়।

কাব্য রচনার পর রচয়িতার উচিত তাকে পরিমার্জনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুনরায় বিচার করা। যদি দেখা যায় যে, তা মানানুযায়ী উৎকর্ষ লাভ করেনি, তাহলে

www.amarboi.org

তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। বস্তুত মানুষ মাত্রেই তার কাব্য সম্পর্কে দুর্বলতা পোষণ করে; কারণ তা তার মননের অঙ্কুর ও তার প্রতিভার নিদর্শন। সুতরাং এর জন্য এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, যা বাক্‌বিন্যাসের দিক থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যাতে ভাষাগত প্রয়োজনীয়তার কোনো চিহ্ন নেই, তেমন বাক্‌রীতি পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা তা বাণীকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে নামিয়ে দেয়। নেতৃস্থানীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা নব্য কবিদেরকে এ প্রয়োজনীয়তার দিকটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ তাদের পক্ষে পূর্বোক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করে উত্তম আদর্শ অনুসরণে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। যথাসম্ভব জটিল বাক্‌বিন্যাসও পরিত্যাগ করা উচিত। একমাত্র সেসব শব্দই ব্যবহার করা চাই, যার উচ্চারণমাত্র তাৎপর্যাদি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে একই পঙ্‌ক্তির মধ্যে একাধিক অর্থের সংস্থানও অনেকাংশে বোধের কাছে দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাপেক্ষা সুচয়িত শব্দ তা-ই, যার অর্থের মধ্যে গভীরতা আছে এবং তা ব্যঞ্জনায় উক্ত পরিধিকেও অতিক্রম করে যায়। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থের আধিক্য বাহুল্য বিধায় মননশক্তিকে তা অযথা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং আমাদের পক্ষে তার বাক্‌বৈদগ্ধ্য উপলব্ধি করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কাব্যের শব্দাবলিকে অতিক্রম করে তাদের অর্থ যদি বাঙ্ময় হয়ে উঠতে না পারে, তা হলে কাব্য কখনও সাবলীল হয় না।

এজন্যই আমাদের উস্তাদগণ (রহঃ) পূর্ব-আন্দালুসের কবি আবু বকর ইবনে খাফাজার[৪৩৯] কাব্যকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতেন। কারণ তার কাব্য পঙ্‌ক্তির এক আধারেই বহু অর্থের ভীড় জমে উঠত। অনুরূপভাবে তাঁরা আল মুতানববী ও আল মুআরীর কাব্যকেও দূষণীয় বলে উল্লেখ করতেন। কারণ তাদের কাব্য আরবীয় রীতিতে গ্রথিত নয়; এ সম্পর্কে পূর্বেও বলা হয়েছে। ফলে তাদের কাব্য তার যথার্থ পর্যায় থেকে নিম্নে অবতরণ করে বাণীর পদ্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে রসানুভূতিই একমাত্র বিচারক।

কবির উচিত দূরন্বিত ও দুর্বোধ্য শব্দাবলির পরিহার করা ও অনুরূপভাবে এমন শব্দও তিনি ব্যবহার করবেন না, যা অত্যধিক ব্যবহারে অতিশয় সাধারণ হয়ে পড়েছে। কারণ এরূপ শব্দাবলি রচনাকে বাক্যবৈদগ্ধ্যের স্তর থেকে নামিয়ে দেয়। অতি সাধারণ ভাবের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য; তাতেও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অবনতি ঘটে। ফলে রচনা খুবই সাধারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অপরের মনে কোনো প্রকার সাড়া জাগায় না। যেমন সাধারণ লোকের কথা, আগুন গরম আর আকাশ আমাদের মাথার উপরে। কাজেই রচনা যেই পরিমাণে অপরের মনে সাড়া জাগাতেই ব্যর্থ হয়, সেই পরিমাণে বাক্‌বৈদগ্ধ্য থেকে দূরে সরে পড়ে। কারণ এ দুটি বিষয় রচনার দুইই বিপরীত মেরু। এজন্যই অধ্যাত্ম ও নবুয়ত সম্পর্কীয় বিষয়ে বাক্য সাধারণত উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি এবং একমাত্র দক্ষ কবিরাই এক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন। তবুও তাদের এ সাফল্যের পরিমাণ যেমন স্বল্প, তেমনি তা আয়াসসাধ্যও। কারণ এ সম্পর্কীয় সব বিষয়ই সাধারণের পরিচিত; ফলে কাব্যও সাধারণ হতে বাধ্য।

---

৪৩৯. ইব্রাহিম ইবনে আবুল ফতেহ; ৪৫১-৫৩৩ (১০৬০-১১৩৯ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

উল্লেখিত সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে কাব্য রচনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার; তবুও কবিকে অনুশীলন ও অভ্যাসের উপর জোর দিতে হবে। কারণ প্রতিভা দুগ্ধবতী স্তনের তুল্য; দোহনে তার দুগ্ধধারা বৃদ্ধি পায় এবং পরিত্যাগ করলে স্বল্প দুধ অথবা অনেক ক্ষেত্রে শুকিয়ে যায়। যাহোক, এ রচনা শিল্প ও তার শিক্ষাপদ্ধতি ইবনে রসিকের 'উমদা' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের পক্ষে যতটুক অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে, আমরা এখানে বর্ণনা করেছি। যিনি এ সম্পর্কে আরও বেশি অবগত হতে চান, তাঁর জন্য উক্ত গ্রন্থ পাঠ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এর ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট বলে মনে করি। আল্লাহ্ই যথার্থ সহায়ক।

মানুষ এ কাব্যশিল্পের বিষয়ে পদ্যাদিও রচনা করেছে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়াদির উল্লেখ বিদ্যমান। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর একটি পদ্য, মনে হয় ইবনে রসিকের রচনা :

আল্লাহ্ কাব্যশিল্পের উপর অভিসম্পাত করুন! আহা;
কত প্রকারের মূর্খই না আমরা তাতে দেখতে পেয়েছি!
তারা বিরল বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে; অথচ
পরিবর্তে শ্রোতাদের জন্য সহজ ও প্রাঞ্জলকে ত্যাগ করে।
অসম্ভবকে তারা মনে করে এক বিশুদ্ধ ভাবাবেগ এবং
অতি সাধারণ বাণীরূপকে ভাবে অতিশয় মূল্যবান।
যথার্থ বিষয় সম্পর্কে তারা একান্তই অজ্ঞ; অথচ তারা
এটিও বুঝতে পারে না যে, তারা মূর্খতা দেখাচ্ছে।
আমরা নই, বরং অন্যরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করে;
বস্তুত আমাদের কাছে তাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়।
কাব্য তো পদ্যের তুল্যই একটি সুসমঞ্জস বাণীরূপ; শুধু
গুণের দিক থেকেই তাদের বিষয় বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়।
তার একাংশ অপরাংশের সাথে আকারে তুলনীয় এবং
তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ সবই অনুরূপ সমতুল্যতায় সুগঠিত।
তাতে এমন তাৎপর্য বিধৃত, যা তোমার কামনার
অন্তর্গত হয়নি, অথচ তা-ই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।
বর্ণনার শেষ পর্যন্ত তা এমনভাবে সংস্থাপিত হয়েছে,
যেন দর্শকদের সামনে একটি সৌন্দর্য ফুটে উঠছে।
শব্দাবলি যেন তাতে মুখের অবয়বতুল্য এবং
অর্থ তাতে চক্ষুর তুল্যই সুবিন্যস্ত রয়েছে।
সেই চক্ষু মনের কামনাকেই উৎসারিত করছে এবং
আবৃত্তিকারকে তার সৌন্দর্য দিয়ে আবৃত করছে।
সুতরাং তুমি যখন তোমার কাব্যে স্বাধীন পুরুষের প্রশংসা কর,
তখন সেখানে এমন বক্তব্য আনবে, যা সবার কাম্য হয়।
তোমার প্রণয়াভাস হবে অতিশয় সাবলীল এবং
তোমার প্রশংসিতকে অতিশয় বাস্তব সত্য করে তুলবে।
যা কিছু শ্রুতিকটু তা অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে;
যদি অনুরূপ শব্দাবলি মাত্রার দিক থেকে সুসমঞ্জসও হয়।

www.amarboi.org

যখন তুমি কাকেও বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা কর, তখন
অবশ্যই কটুবাক্য প্রয়োগকারীদের পথ ত্যাগ করতে হবে।
এ উদ্দেশ্যে তোমার সরল বর্ণনা হবে ওষুধের মতো এবং
তোমার শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত রোগের নিবৃত্তি ঘটাবে।
যখন তুমি তোমার কাব্যে এমন কাহারও জন্য অশ্রুপাত কর,
যে অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যাত্রার আয়োজন করছে;
তখন অবশ্যই তুমি হা-হুতাশ পরিত্যাগ করবে এবং তোমার
উদ্গত অশ্রুধারাকে অবদমিত করার চেষ্টা করবে।
অতঃপর তুমি যদি তিরস্কার করতে চাও, তা হলে
প্রতিজ্ঞার সাথে ভর্ৎসনা ও কঠোরতার সাথে কোমলতা মিশাও।
এর ফলে তাকে তুমি এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করবে,
যেন সে ভীত ও নিঃশঙ্ক, শক্তিমান ও দুর্বল হয়ে থাকে।
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ হল যা কাব্য-সুষমা মণ্ডিত হয়,
যদিও তা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টভাবে উৎসারিত হোক না।
তার উচ্চারণমাত্র মানুষ অনুরূপ কিছু সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হবে
এবং সৃষ্টি করতে গিয়ে অক্ষমতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছবে।

এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য অনেকের বাণী; যেমন আন্নাশী বলেছেন,[৪৪০]

কাব্য তা-ই, যার বক্ষের বক্রতাতে তুমি সমতল করেছ
এবং পরিমার্জনার দ্বারা যার পৃষ্ঠের পরিধিকে আয়ত্তে এনেছ।
যার বিদীর্ণ রেখাগুলো তোমার অতিশয়োক্তিতে আবৃত হয়েছে
এবং তোমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে যার দৃষ্টির অন্ধত্ব ঘুচেছে।
যার কাছে ও দূরের মধ্যে তুমি সেঁতু বেঁধে দিয়েছ
এবং যার স্থির ও প্রবহমান জলরাশি সংযুক্ত করেছ।
যার বিষয় প্রসঙ্গ সৌন্দর্যের তুলনা কামনা করে,
তুমি যেই তুলনাকে সমতুল্য বিষয়ের দ্বারা পূর্ণ করেছ।
তুমি যখন কাব্যে কোন দানশীল সম্ভ্রান্তকে প্রশংসা করেছ,
তখন কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদয় ঋণ শোধ করেছে।
তুমি তাকে দিয়েছ যা মূল্যবান ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ
এবং মহত্ত্ব ও মহার্ঘতার দ্বারা তাকে বিশিষ্ট করেছ।
সুতরাং কাব্য তার বিচিত্র প্রবাহ ধারায় সাবলীল হবে
এবং তার বিভিন্ন বিষয় সম্মিলনে সহজ হয়ে উঠবে।
যখন তুমি কোন আবাসভূমি ও তার অধিবাসীদের জন্য কাঁদবে,
তখন সেই ব্যথিত জনের জন্য অবশ্যই অশ্রুপাত করবে।
তুমি যদি কোন সন্দেহকে রূপকে প্রকাশ করতে চাও,
তা হলে বিষয়টি প্রকাশ ও গোপনের মধ্যভাগে রাখবে।
এর ফলে শ্রোতা তার সন্দেহকে প্রশংসার সাথে এবং
তার ধারণাকে বিশ্বাসের সাথে মিশিয়ে ফেলবে।
যদি তুমি তোমার ভ্রাতার পদস্খলনের জন্য ভর্ৎসনা কর,
তা হলে তার কঠোরতাকে কোমলতার দ্বারা আবৃত করিও।
ফলে তুমি তাকে তার দুর্বলতাসহ বন্ধুত্বকামী দেখবে

৪৪০. আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৯৩ (৯০৬ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

এবং তার ব্যথা বেদনার মধ্যে আশ্বাসের স্পর্শ লাগবে।
যখন তুমি তোমার এমন কোন প্রিয়তমাকে আঘাত করতে চাও,
যে তার অন্যায্য ছলা-কলায় তোমার বিচ্ছেদ কামনা করেছে;
তা হলে তুমি বাণীর সূক্ষ্মতা ও কোমলতায় তাকে বাঁধবে
এবং তার সংগোপন ও তীর্যক প্রকাশে তাকে উদ্দীপ্ত করবে।
যখন তুমি তোমার কোন স্খলনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর,
তখন বাণীকে প্রকাশ ও অপ্রকাশে দোদুল্যমান করে তুলবে।
তা হলে তোমার ত্রুটিতে আহত ব্যক্তির কাছে তা নিজের
ভর্ৎসনা রূপেই দেখা দিবে এবং সে প্রতিজ্ঞার মুখাপেক্ষী হবে।

www.amarboi.org

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্যের কলা-কৌশল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থের মধ্যে নয়]

জেনে রাখুন, গদ্য ও পদ্যরূপে বাণীর শিল্পসাধনা শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রেই; অর্থের ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত নয়। ভাব এখানে শব্দের অনুসারী এবং শব্দই মূল ভিত্তি। সুতরাং যে শিল্পী তার ভাষাগত যোগ্যতাকে গদ্য ও পদ্যে রূপায়িত করেন, তিনি একমাত্র তার শব্দ রূপটিই তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে আরবের ভাষাসম্পদ থেকে সংগৃহীত শব্দাবলিই তাকে পথ দেখায়। কারণ তাদের বহুল ব্যবহার ও উচ্চারণে তার জিহ্বা অভ্যস্ত হয়েছে এবং পরিণামে মুজারী বাক্‌রীতিতে তার যোগ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। তিনি নিজের গোত্র পরিবেশের অনারবত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং এখন নিজেকে আরবীয় গোত্র পরিবেশে জাত একজন হিসেবে গণ্য করতে পারেন। তিনি উক্ত পরিবেশের শিশুর মতই ভাষায় দীক্ষা লাভ করেছেন এবং পরিণামে তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছে।

এর বর্ণনা এই যে, আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ভাষা উচ্চারণের একটি বিশেষ যোগ্যতা বৈ অন্য কিছু নয়; জিহ্বাকে বারংবার এ উচ্চারণের দ্বারা অভ্যস্ত করে তুললেই এরূপ যোগ্যতা অর্জন সুগম হয়। বস্তুত এ উচ্চারণ ও প্রকাশের সবটুকুই শব্দাবলি মাত্র এবং ভাব বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই অন্তরে লুকায়িত। তদুপরি এ ভাব সবার কাছেই বিদ্যমান এবং সবার চিন্তাধারাই তাকে ইচ্ছামত লালন করতে সক্ষম। সুতরাং এ ভাবরূপী আবেগকে বিন্যস্ত করতে কোন প্রকার শিল্প-কৌশলের দ্বারস্থ হতে হয় না; বরং উক্ত ভাবসম্পদকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাণীরচনার জন্যই শিল্পকলার প্রয়োজন দেখা দেয়; একথা পূর্বেও আমরা বলেছি।

প্রকৃতপক্ষে এ শব্দাবলি ভাবের ছাঁচতুল্য। যেমন সমুদ্রের জলে পরিপূর্ণ পাত্রাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে; তাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ঝিনুক, স্ফটিক ও মৃত্তিকার পাত্র হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরস্থ জল এক। এ জলপূর্ণ পাত্রগুলোর উৎকর্ষ-অপকর্ষ তাদের সত্তাগত বৈচিত্র্যের দ্বারাই সাধিত হয়; তাদের অন্তর্গত জলের দ্বারা নয়। অনুরূপ ভাষাও তার বাক্‌বিন্যাস স্তরের তারতম্যে উৎকর্ষ ও বাক্‌বৈদগ্ধের দিক থেকে ব্যবহারিকভাবে বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়; অথচ ভাব তার স্বরূপে একই অবস্থায় বিদ্যমান। একমাত্র ভাষাগত যোগ্যতা অনুসারে বাক্‌বিন্যাস ও বাক্‌রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই যখন তার মনোভাব প্রকাশ করতে তৎপর হয়, তখন কিছুতেই সুষ্ঠুতা প্রদর্শন করতে পারে না। তার তুলনা সেই পঙ্গুর সাথে করা যায়, যার উত্থান শক্তি নেই বলেই সে চাইলেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। 'আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে পারতে না।'[৪৪১]

---

৪৪১. কোরান; ২, ১৫১।

www.amarboi.org

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[অতিরিক্ত কণ্ঠস্থ শক্তির দ্বারা এ যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং কণ্ঠস্থ বিষয়ের উৎকর্ষের উপর তার উৎকর্ষতা নির্ভরশীল]

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, যে ব্যক্তি আরবি ভাষায় যোগ্যতা অর্জন করতে চায়, তাকে অবশ্যই অতিরিক্ত মুখস্থ শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং তার এরূপ মুখস্থ বিষয়ের উৎকর্ষ, স্বরূপগত পর্যায় ও আধিক্য-স্বল্পতার পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থকারীর অর্জিত যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হবে। সুতরাং যার কণ্ঠস্থ বিষয় আরবীয় মুসলিম কবি—হাবিব, ইতাবী, ইবনে মুতাজ, ইবনে হানী ও শরিফ আররাজীর কাব্য অথবা ইবনে মুকাফ্‌ফা, সহল ইবনে হারুন,[৪৪২] ইবনে যিয়াত, আলবাদী ও আস্‌সাবীর[৪৪৩] পুস্তিকাবলি থেকে সংগৃহীত হবে, তার এ সম্পর্কীয় যোগ্যতা সর্বোৎকৃষ্ট ও বাক্‌বৈদগ্ধের দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে গণ্য হবে। এ তুলনায় যে ব্যাপ্তি পরবর্তীকালের কবিদের, যেমন ইবনে সহল ও ইবনে নবিহ্‌র[৪৪৪] কাব্য অথবা আল বিসানী ও ইমাদ ইস্পাহানীর[৪৪৫] সরল গদ্য কণ্ঠস্থ করবে পূর্বসূরিদের তুলনায় তাঁদের মর্যাদা নিম্নতর হওয়ায় তার যোগ্যতাও নিম্নপর্যায়ের হবে। যে-কোন বিচক্ষণ সমালোচকের কাছেই রসানুভূতির দিক থেকে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হতে পারে।

বস্তুত কণ্ঠস্থ ও বিষয়াদির উৎকর্ষের ওপর পরবর্তীকালীন ব্যবহারের উৎকর্ষ নির্ভরশীল হয় এবং এ দুটির উৎকর্ষই যোগ্যতার উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করে। সুতরাং কণ্ঠস্থ বিষয়াদি যদি পর্যায়ের দিক থেকে উচ্চতর হয়, তা হলে তা থেকে অর্জিত যোগ্যতাও উচ্চস্তরের হবে। কেননা প্রবৃত্তি তার গৃহীত তাঁত দ্বারাই বয়ন করে এবং যোগ্যতার শক্তি তার খাদ্য অনুপাতেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বিষয়ক বর্ণনা এই যে, জীবাত্মা যদিও তার সহজাত প্রবৃত্তিতে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তবুও তার উপলব্ধিগত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানুষের মধ্যে তা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। আর এ বৈশিষ্ট্যের মূলে বহির্জগৎ থেকে উপলব্ধিজাত জ্ঞান, তজ্জনিত যোগ্যতা ও সত্তাগত বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল থাকে। এদের ফলে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং তার শক্তি সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করে।

---

৪৪২. এ অধ্যায়ের ৪৩৮ নং টীকা দ্র:।

৪৪৩. যথাক্রমে মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, বদিজ্জামান হামদানী ও ইব্রাহিম ইবনে খলিল; ৩১৩-৩৮৪ (৯২৫-৯৯৪ খ্রি:) হি:।

৪৪৪. ইব্রাহিম ইবনে সহল ইসরাইলী; মৃত্যু ৬৫৮ (১২৬০ খ্রি:) হি: ও আলী ইবনে মুহাম্মদ; মৃত্যু ৬১৯ (১২২২ খ্রি:) হি:।

৪৪৫. তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪৪ ও ১৪৫ নং টীকা দ্র:।

www.amarboi.org

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জীবাত্মার এ যোগ্যতা লাভের বিষয়টি একান্তই ধীর প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। সুতরাং কবিত্বের যোগ্যতা কাব্য কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমে, রচনার যোগ্যতা ছন্দোবদ্ধ ও সরল গদ্য মুখস্থ করার মাধ্যমে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন, উপলব্ধি, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ফেকাহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন, তার সমস্যাবলির বিচার তার শাখা-প্রশাখার জ্ঞান ও মূল থেকে শাখার ব্যুৎপত্তির জ্ঞানলাভ করতে হয়। আধ্যাত্মিক সূফীতত্ত্ব সম্পর্কে যোগ্যতার জন্য উপাসনা, নামজপ, লোক সংসর্গ থেকে দূরে সরে নির্জনবাসের মধ্যে বহিরেন্দ্রিয়ের বিলুপ্তি সাধন এবং এর মাধ্যমে অন্তরেন্দ্রিয় ও আত্মিক শক্তির যোগ্যতার জাগরণ ঘটাতে হয়। পরিণামে সেই যোগ্যতাই ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিভূষিত হয়ে থাকে। এরূপ অন্যান্য সব বিষয়।

বস্তুত এদের প্রত্যেকটির মধ্যে জীবাত্মার জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দিয়ে তা মণ্ডিত হয় এবং তার মধ্যে উদ্ভূত যোগ্যতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুসারে তার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের বাক্‌বৈদগ্ধ্য অর্জনের জন্য তার সমতুল্য উচ্চপর্যায়ের বাক্‌বিন্যাসের কণ্ঠস্থকরণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ কারণেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ ও অন্যান্য শাস্ত্রবিশারদ সবাই এ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে অক্ষমতার অধিকারী। এর একমাত্র কারণ তাদের কণ্ঠস্থ বিষয়াদি এবং তা এমন সমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ, যা বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। কারণ এমন নিয়মাবলি ও শাস্ত্র সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এমন সঞ্চয় যখন বেশি মাত্রায় কোন মননশক্তিতে প্রবেশ করে এবং জীবাত্মা তার দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তখন তা থেকে উদ্ভূত যোগ্যতা একান্ত দুর্বল হতে বাধ্য। এর ফলে আরবীয় বাক্‌বিন্যাসের রীতিনীতি থেকে অনেক দূরে সরে যায়। আমরা ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্, ব্যাকরণবিশারদ, কালাম শাস্ত্রী, তার্কিক ও অন্যান্য গুণীজন, যারা আরবীয় বাক্‌ধারার বিশুদ্ধ ও সভ্রান্ত সঞ্চয়ের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি, তাদের কাব্য রচনাকে অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পতিত দেখতে পাই।

আমাদের এক সঙ্গী, মারিনী সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ রচনাবিদ 'আলামা' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল কাসেম ইবনে রেদোয়ান[৪৪৬] আমাদেরকে জানাতে গিয়ে বলেছেন, "আমি একদিন সম্রাট আবুল হাসানের লেখক, আমাদের সাথী আবুল আব্বাস ইবনে শোয়ায়েব,[৪৪৭] যিনি তখন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের শিরোমণি ছিলেন, তার কাছে আলোচনার জন্য ইবনে নহুবীর কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেছিলাম :

বুঝতে পারি নি, যখন ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম,
তাদের নতুন ও পুরাতনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা।

আমি কবির নাম বলিনি, কিন্তু তিনি শুনিবামাত্র বলে উঠলেন, এটি একজন ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদদের কাব্য। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কী করে বুঝলেন? তিনি

৪৪৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ।
৪৪৭. আহমদ ইবনে শোয়ায়েব; মৃত্যু ৭৫০ (১৩৪৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

বললেন, তার 'কোন পার্থক্য আছে কিনা'—এ উক্তির দ্বারা। কারণ এটি ফেকাহ্শাস্ত্রবিদদের বাগ্ধারা; আরবীয় বাক্রীতির অন্তর্গত নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্র জন্য আপনার পিতা উৎসর্গ হোন; ইনি ইবনে নহুবী![৪৪৮]

কিন্তু লেখক ও কবিদের অবস্থা অনুরূপ নয়। কারণ তারা তাদের সঞ্চয়ের মধ্যে আরবের বাক্বিন্যাস ও তাদের সরল গদ্যরীতির সমুদয় উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত চয়ন করেছে এবং এসব উৎকৃষ্ট বাক্রীতির সাথে নিজেদের পরিচয়কে গভীর করে তুলেছে।

একদিন আমি আমার সঙ্গী, আন্দালুসের বনি আহ্মার রাজন্যবর্গের মন্ত্রী আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে খতিব, যিনি তখন রচনা ও কাব্যশিল্পে সবার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবেন; তাঁর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বললাম, 'আমি কাব্য রচনা করতে উদ্যত হলেই কঠিন বাধার সম্মুখীন হই; অথচ এ ব্যাপারে আমার বিচক্ষণতা এবং বিশুদ্ধ বাক্বিন্যাসের সঞ্চয় কুরআন, হাদীস ও আরবের বাণীসম্ভার মিলিয়ে স্বল্প হলেও উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয়, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এর যথার্থ কারণ হচ্ছে আমার স্মৃতিতে পূর্ব সঞ্চিত শাস্ত্রীয় পদ্য ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত বিচিত্র রচনা। কেননা আমি কেরাত ও লিপিশাস্ত্র সম্পর্কে শাতেবীর[৪৪৯] দুটি কবিতা 'কুবরা' ও 'সুগরা' মুখস্থ করেছি এবং তাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি ফেকাহশাস্ত্র ও তার মূলনীতি সম্পর্কীয় ইবনে হাজেবের[৪৫০] দুটি গ্রন্থ, যুক্তিবিদ্যায় খোনজীর[৪৫১] 'জুমাল', 'আসতসহিল' গ্রন্থের কতকাংশ অধ্যয়ন করেছি এবং বিভিন্ন বৈঠকে শিক্ষাদানের বিচিত্র নিয়ম-কানুন শিখে নিয়েছি। এর ফলে আমার স্মৃতির সঞ্চয় এসব বিষয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কুরআন, হাদীস ও আরবের বাণী থেকে সুচয়নের মাধ্যমে আমি যে যোগ্যতার প্রত্যাশী হয়েছিলাম, তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সুতরাং আমার প্রতিভা সে সম্পর্কে চরম পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।' তিনি আমার এ বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, তুমি। একমাত্র তুমি ছাড়া কি এ কথা অন্য কেউ বলতে পারত!'

পাঠক, এ পরিচ্ছেদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা দিয়ে আরও একটি বিষয় আপনার সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং তা এই যে, ইসলামী যুগের আরবি কবিদের বাণী বাক্বৈদগ্ধ্য রসানুভূতির দিক থেকে জাহেলী যুগের কবিদের বাণীর চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থিত। এ অবস্থা তাদের গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আমরা হাস্সান ইবনে সাবেত, উমর ইবনে আবু রবিয়া, হুতাইয়া, জরির ফরসদক, নুসাইয়েব, গায়লান জুর্রুম্মা, আহওয়াজ, বাশ্শার প্রমুখ কবিদের[৪৫২] কাব্য এবং উমাইয়া সাম্রাজ্য ও আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার পূর্বসূরি আরবদের ভাষণ; রচনা ও রাজন্যবর্গের সাথে কথোপকথন ইত্যাদির মধ্যে বাণীর যে নিদর্শন লাভ করি, তা জাহেলী যুগের

৪৪৮. ইউসুফ ইবনে মুহম্মদ; ৪৩৩-৫১৩ (১০৪২-১১১৯ খ্রি:) হি:।

৪৪৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৮ নং টীকা দ্র:।

৪৫০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ নং টীকা দ্র:।

৪৫১. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৫৭ নং টীকা দ্র:।

৪৫২. এ দুটি স্থানে উল্লেখিত কবিদের পরিচয়ের জন্য একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

www.amarboi.org

নাবেগা, আন্তারা, ইবনে কুলসুম, যুহাইর, আলকামা ইবনে আবদা, তরফা ইবনে আবদ প্রমুখ কবিদের[৪৫৩] কাব্য ও তাদের সমকালীন গদ্যভাষণ ইত্যাদি থেকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে বহু উচ্চস্তরে দেখতে পাই। সুস্থ প্রবৃত্তি ও বিশুদ্ধ আস্বাদশক্তিই একমাত্র বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিচক্ষণ সমালোচকের কাছে এ মন্তব্যের সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারে।

এর কারণ এই যে, আরবদের মধ্যে যারা ইসলামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তারা কুরআন হাদীসের সেই উচ্চ পর্যায়ের বাণীরূপ শুনেছেন, যার সমতুল্য কোন কিছু রচনা করতে মানুষের শক্তি অক্ষম হয়েছে। তা তাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের আত্মশক্তিকে তার বাক্‌রীতিতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। এর ফলে তাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে তাদের যোগ্যতা পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের লোকদের চেয়ে সমুন্নতি লাভ করেছে। কারণ পূর্ববর্তীরা এ পর্যায়ের বাণীরূপ শোনেনি এবং তারা এর মধ্যে লালিতও হয়নি। সুতরাং এ কারণেই ইসলামী যুগের তাদের গদ্য ও পদ্য রচনা গঠনসৌকর্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকে পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশি সুন্দর ও শোভন হয়ে উঠেছে। এমন উচ্চ পর্যায়ের বাণীরূপ থেকে আদর্শ গ্রহণ করার ফলেই তাদের রচনা বেশি দৃঢ়ভিত্তিক ও ব্যাপকতর পরিমার্জিত রূপ লাভ করেছে। পাঠক, বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, আপনার রসানুভূতিই এর সাক্ষ্য বহন করবে; যদি আপনি বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় বিচক্ষণতা ও আস্বাদের অধিকারী হয়ে থাকেন।

আমাদের উস্তাদ শরীফ আবুল কাসেম[৪৫৪] যিনি আমাদের সময়ে গ্রানাডার কাজী ছিলেন, এ রচনাশিল্পে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এ বিষয়ে আশ্‌মালুবীনের[৪৫৫] শিষ্য কয়েকজন উস্তাদের কাছে সিওটায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ভাষা সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চরম সীমায় উপনীত হন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইসলামী যুগের আরবরা জাহেলী যুগের আরবদের চেয়ে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে বেশি উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত, এর কারণ কি? তাঁর রসানুভূতির গভীরতার জন্যই এ প্রশ্নের গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আমাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না। তারপর আমি তাঁকে বললাম, এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে তা আপনার সামনে পেশ করতে পারি। আমার ধারণা, এটাই এরূপ হওয়ার কারণ। এর পর তাঁর সামনে আমার উল্লেখিত বক্তব্য উপস্থিত করেছিলাম। শুনে তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন; পরে বললেন, হে বিচক্ষণ! এটি এমন একটি বক্তব্য, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

এ ঘটনার পর তিনি আমার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, শিক্ষার বৈঠকে আমার বক্তব্যকে তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং শাস্ত্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আমার পাণ্ডিত্যের কথা বলতেন। আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বাক্‌শৈলী শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৫৬]

---

৪৫৩. এদুটি স্থানে উল্লেখিত কবিদের পরিচয়ের জন্য একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

৪৫৪. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহম্মদ; ৬১৭-৭৬০ (১২৯৭-১৩৫ খ্রি:) হি:।

৪৫৫. উমর ইবনে মুহম্মদ; ৫৬২-৬৪৫ (১১৬৭-১২৪৫ খ্রি:) হি:।

৪৫৬. কোরান; ৫৫, ৩-৪।

www.amarboi.org

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[স্বাভাবিক ও অলঙ্কৃতবাণীরূপ ও অলঙ্করণের উৎকর্ষ-অপকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা]

জেনে রাখুন, যে বাণীকে প্রকাশ ও বর্ণনা বলা হয়, তার রহস্য ও শক্তি একমাত্র মনোভাব সঞ্চারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিন্তু অনুরূপ উদ্দেশ্যে যদি তা পরিচালিত না হয়, তাহলে তা সেই মৃতের সমতুল্য, যার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা নেই। বস্তুত বাণীর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাকেই বাক্‌বৈদগ্ধ্য বলা হয়, যার সংজ্ঞা বাক্‌শৈলীবিদদের কাছ থেকে পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন। তারা বলেন, তা প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে বাণীর সামঞ্জস্য বিধানের নামান্তর। এ সঙ্গে উক্ত প্রসঙ্গের সাথে শব্দাবলির বিন্যাসের সামঞ্জস্য সাধন করতে যেসব শর্ত ও নিয়মের প্রয়োজন, তার জ্ঞানও অর্জন করতে হয় এবং এ সব মিলিয়েই বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিষয়টি গড়ে ওঠে।

এভাবে বাণীকে প্রসঙ্গানুরূপ সুসমঞ্জস করার জন্য বাক্‌বিন্যাসের প্রয়োজনীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি আরবি ভাষা থেকে গ্রহণ করার পর রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিন্যাস তার প্রচলন অনুসারে এসব শর্ত ও নিয়ম দ্বারা দুটি অন্বয়ী পদের মধ্যে অন্বয়ের ব্যবস্থা করে থাকে এবং এটাই আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি। অনুরূপভাবে পদগুলো বিন্যাসের বাস্তবায়নে অগ্র-পশ্চাৎ, নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট-সুস্পষ্ট, শর্তযুক্ত-শর্তহীন প্রভৃতি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্বয়ের বের হতে আগত অন্যান্য নিয়মকে পরিস্ফুট করে তোলে। বক্তার মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এভাবে যেসব শর্ত ও নিয়ম প্রযোজ্য হয় তাই একটি বিষয়ের রীতিনীতি এবং শাস্ত্রবিদগণ তাকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে 'ভাবপ্রকাশ শাস্ত্র' নামে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই আরবি ভাষাতত্ত্বের রীতিনীতি এ ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়; কেননা তা অন্বয়ের দ্বারা যা প্রকাশ করে তা এর অন্বয় বহির্ভূত সুপ্ত অবস্থারই অংশ মাত্র। সুতরাং বিন্যাসের মধ্যে স্বরচিহ্নাদি ও ভাবপ্রকাশের রীতিনীতির অভাবজনিত কোন ত্রুটির ফলে যদি তা প্রসঙ্গকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তা প্রসঙ্গের চাহিদা অনুসারে বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানেও অপারগ হবে এবং সেই উদ্দেশ্যহীন বক্তব্যে পরিণত হবে যা প্রাণহীন বলে গণ্য।

অতঃপর এ প্রসঙ্গানুরূপ বাক্‌বিন্যাস ধারাকে বিচিত্র ভাবের মধ্যে সঞ্চারিত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা দেখা দেয়। কারণ বাক্‌বিন্যাস প্রচলন অনুসারেই একটি অর্থের বাহক হয়; একে উপলব্ধি করার পর মননশক্তি তার অনুষঙ্গী সম্ভাব্য, সম্ভাবিত ও সমতুল্য তাৎপর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা তখন উপমা অথবা লক্ষণার সাহায্যে পরোক্ষ অর্থ

www.amarboi.org

প্রকাশ করে থাকে। এ সম্পদটি যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। বাচ্যার্থ উপলব্ধির মধ্যে যেমন একটি আস্বাদ আছে, অনুরূপভাবে পরোক্ষ তাৎপর্য অনুসন্ধানেও মননশক্তি একটি আস্বাদ লাভ করে; বরং পূর্বের আস্বাদ অপেক্ষা এটি তীব্র হয়ে উপলুব্ধ হয়। কারণ এসব কিছুর মধ্যে প্রমাণ থেকে প্রামাণ্যকে আয়ত্ত করার একটি আনন্দ বিদ্যমান এবং পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন যে, এ আনন্দই রসানুভূতির কারণ।

অতঃপর এরূপ পরোক্ষ তাৎপর্য অনুসন্ধানের বিষয়টির জন্যও শর্ত ও নিয়ম বর্তমান এবং রীতিনীতির মতো এগুলোও বিষয়টিকে শাস্ত্রাকারে গড়ে তুলেছে। শাস্ত্রবিদগণ এর নাম দিয়েছেন 'বাক্‌শৈলী' শাস্ত্র। এটি প্রসঙ্গানুরূপ ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের সহোদরা তুল্য; কেননা এটিও ভাবার্থের বিন্যাস ও তার তাৎপর্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের রীতিনীতি প্রকাশের দিক থেকে বিন্যাসাদির স্বরূপের সাথে জড়িত রয়েছে এবং পাঠক, যেমন আপনি জানতে পেরেছেন শব্দ ও অর্থ উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পূরক। সুতরাং এ ভাবপ্রকাশ ও বাক্‌শৈলী উভয়েই বাক্‌বৈদগ্ধের অংশ এবং তাদের সমন্বয়ে ভাষার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। যদি কোথাও এ বাক্‌বৈদগ্ধের অভাব ঘটে, তাহলে বিদগ্ধজনের কাছে তা মূক প্রাণীদের শব্দাবলির সাথে তুলনীয় এবং তা আরবি ভাষার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ আরবি ভাষা তা-ই, যার প্রকাশ প্রসঙ্গানুরূপ হয়ে থাকে এবং এদিক থেকে বাক্‌বৈদগ্ধ্য আরবীয় বাণীর মূল ভিত্তি, তার সত্তা, তার আত্মশক্তি ও তার প্রকৃতি।

অতঃপর পাঠক, এটি জেনে রাখুন, শাস্ত্রবিদগণ যখন বলেন বক্তব্যটি স্বাভাবিক তখন তারা তার দ্বারা সেই বক্তব্যকে বুঝিয়ে থাকেন, যা মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যের দিক থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ তা বর্ণনা ও ভাষণ; কতিপয় ধ্বনির উচ্চারণ মাত্র তার উদ্দেশ্য নয়। বরং বক্তা তার মাধ্যমে শ্রোতাকে তার মনোগত ভাব সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত করতে চান এবং এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বস্ত হতে চান। এভাবে বক্তব্য বক্তার মনোগত ভাব প্রকাশের পর তার বাক্‌বিন্যাসে বিচিত্র ধরনের পরিমার্জনা ও অলঙ্করণ সংযোজিত হয়; যেন এসব বিষয়ের দ্বারা বক্তব্যকে বিশুদ্ধতায় উজ্জ্বল করে তোলা হয়। এরূপ অলঙ্করণের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে চাকচিক্য, বাক্‌বিন্যাসের মধ্যে মাত্রার সমতুল্যতা, বিচিত্র নিয়মে তার বিভাজন সৌকর্য, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বারা মুক্ত তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতীতি[৪৫৭]

---

৪৫৭. এখানে রোজেনথালের অনুবাদে অত্র পরিচ্ছেদের অংশবিশেষের একটি ভিন্ন পাঠ সন্নিবেশিত হয়েছে; আমরা সম্পূর্ণতার জন্য এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।

এবং অন্যান্য আলঙ্কারিক বিষয়াদি, যা শাস্ত্রবিদগণ আবিষ্কার ও নির্ধারিত করেছেন। তাঁরা এদের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি প্রবর্তন করেছেন এবং এগুলোকেই তাঁরা অলঙ্কারশাস্ত্র বলে অভিহিত করেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের আলঙ্কারিকগণ এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার স্বরূপ নির্ধারণে মতানৈক্য পোষণ করেন; যেমন তাদের মধ্যে এদের অনেকগুলোই শাস্ত্রীয় দিক হতে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত কিনা, সে সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান। পশ্চিমাঞ্চলীয়গণ এ সম্পর্কে নেতিবাচক মত পোষণ করেন। পূর্বাঞ্চলীয়দের ধারণা, এটি অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাণীর উৎসমূলের সাথে এর কোন সাযুজ্য

www.amarboi.org

নেই। বরং বাণী তার গঠনসৌকর্য প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার পরই এর ব্যবহার উক্ত বাণীরূপকে অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য, আভরণ মাধুর্য ও সৌন্দর্য দান করে থাকে। বস্তুত বাণী প্রসঙ্গে চাহিদা পূরণ করতে না পারলে এর আরবিয়ত্ব লাভই ঘটে না; এমতাবস্থায়—কোন প্রকার চাকচিক্যই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম নয়। তদুপরি অলঙ্কারশাস্ত্রের সমুদয় বিষয়ই আরবের ভাষা-সম্পদ বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমেই উদ্ভাবিত হয়েছে। এর কতকাংশ আরবদের বাকরীতি হতে শ্রুত এবং তাদের অস্তিত্ব পরীক্ষিত সত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আবার এর কতকাংশ ভাষা-সম্পদের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া বিবেচিত হয়েছে। আবার এর কতকাংশ ভাষা-সম্পদের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে। আরবি সাহিত্য সাধকদের বাণী হতেই অনুরূপ বিষয়াদি লাভ করা সম্ভব।

যখন তারা অলঙ্কৃত বাণীরূপের কথা বলেন, তখন এরূপ অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাণীর কথাই বুঝিয়ে থাকেন। শাস্ত্রবিদরা তাঁদের গ্রন্থে স্বাভাবিক বাণীরূপের ভাবপ্রকাশের কথাও তুল্য গুরুত্বে বর্ণনা করেন। ফলে দেখা যায়, এরা একে অপরের বিরোধী; এমন কি মনে হয়, অলঙ্কারশাস্ত্রই বুঝি অলঙ্কারশাস্ত্রের বিরোধী।

যেহেতু অলঙ্করণের এ বিষয়টি কোন সুস্পষ্ট আলোচ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং এটি তখন শাস্ত্র হিসেবেও গড়ে উঠেনি, সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা একে সাহিত্যশিল্পের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছেন এবং সেভাবেই তাদের গ্রন্থাদিতে বিন্যস্ত করেছেন। ইবনে রশিক তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল উমদা'তে এরূপ করেছেন। এ গ্রন্থে এ সম্পর্কীয় তাঁর বিষয় বিন্যাসের ধারা অভূতপূর্ব। এতে তিনি প্রথমে কাব্য রচনার নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পরে এর সাথে সঙ্গতি রেখে অলঙ্কারাদির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। আন্দালুসের আরও অনেক সাহিত্যশাস্ত্রীই এরূপ আলোচনা করেছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, এ অলঙ্কার ব্যবহারে যিনি সর্বপ্রথম তার কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি হলেন আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আউস আততায়ী। তিনি তার রচনাকে তা দিয়ে ভরে ফেলেছেন। তাঁর পরবর্তী লোকেরা এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কাব্য রচনার অলঙ্করণের এ প্রকার আতিশয্য ছিল না। এ কারণেই প্রাক্-ইসলামী ও ইসলামী আমলের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে কেউই তাদের কাব্যে অনুরূপ অলঙ্করণের প্রয়াস দেখাননি। অলঙ্কার তাদের কাব্যেও আছে, কিন্তু তা এসেছে একান্ত স্বতোঃস্ফূর্তভাবে এবং তাদের বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অনুষঙ্গী রূপে। স্বাভাবিক সুষ্ঠুতাই তাদের কাব্য-স্বাদ আস্বাদনের মানদণ্ড ছিল। এজন্যই তাদের অলঙ্কার ব্যবহারে কোন প্রকার আয়াসের চিহ্ন নেই; তাতে বাণীর যথার্থস্বরূপ ব্যাহত হয়নি এবং কোন প্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয়ও নিতে হয়নি। বরং তাদের স্বভাব ও অভ্যাস একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এর জন্ম দিয়েছে। ফলে অলঙ্কার সমৃদ্ধ হয়েও তাদের বাণীরূপ এর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা পরিহার করেনি।

প্রাক্-ইসলাম ও ইসলামী আমলের গদ্য রচয়িতারাও কোন প্রকার অলঙ্কার, মাত্রা, মিল ইত্যাদি ছাড়াই সহজ-সরল গদ্য রচনা করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইব্রাহিম ইবনে হিলাল আস্‌সাবীর আবির্ভাবে এর ব্যতিক্রম ঘটে। বানি বুয়া শাসকদের এ দরবারী লেখক কাব্যশিল্পে ব্যবহৃত অলঙ্করণের অনুকরণ একান্ত শাসনকার্যে ব্যবহৃত গদ্য রচনা ও ভাষণ বিবৃতিতেও অলঙ্করণের বাহুল্য ঘটান। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ছিল; কারণ তার উপরস্থ শাসকবৃন্দের কেউই আরবি ভাষাভাষী ছিলেন না। তদুপরি তার কাজকর্ম ছিল একান্ত সাধারণ মানুষ নিয়ে এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যিনি খলিফাদের ন্যায় রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের জন্য দাবি উত্থাপন করতে পারেন। ফলে আস্‌সাবী তার রচনায় এমন নিম্নস্তরের অলঙ্করণের সংযোগ সাধন করেছেন, যা সাধারণ রাজকীয় ফরমানাদিতে করা হয়ে থাকে, বিশেষভাব ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু তবুও তখন তিনি এ বিষয়ে সার্থকতা অর্জন করেন এবং তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার পার্শ্ববর্তী রচয়িতাদের রচনা আরও অধিকতর অলঙ্কার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে এক সময়ে যে সহজ সরল গদ্যে বাগ্মিতা প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত ছিল, মানুষের পক্ষে তা স্মরণ করাও অসম্ভব

www.amarboi.org

ইত্যাদি স্থান লাভ করে; যাতে শব্দাবলি ও তাদের অর্থের মধ্যে সমধর্মিতা পরিস্ফুট হয়। এর ফলে বক্তব্য এমন ঔজ্জ্বল্য, শ্রুতিমাধুর্য, আস্বাদ ও সৌন্দর্য লাভ করে, যার সবটুকুই ভাব প্রকাশের অতিরিক্ত।

এ শৈল্পিক উৎকর্ষ কোরানের অননুকরণীয় বাণীর বহুস্থানে বিদ্যমান। যেমন—'রাত্রির শপথ, যখন তা আবৃত করে এবং দিবসের শপথ, যখন তা প্রকাশিত হয়।' যেমন—'অবশ্য যে ব্যক্তি দান করেছে, বিরত রয়েছে এবং সুন্দরতমকে সত্য বলে জেনেছে।' এভাবে আয়াতের শেষ বিভাজন পর্যন্ত। অনুরূপ অন্যত্র, যেমন—'অবশ্য যে ব্যক্তি বিপথে গিয়েছে ও পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে'—আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরূপ, 'তারা ভাবছে যে, তারা কাজের মত কাজ করছে।' এমন উদাহরণ প্রচুর।[৪৫৮] বস্তুত এসবই বাক্‌বিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করার পরই অলঙ্কারমণ্ডিত হয়েছে। জাহেলী যুগের বক্তব্য উপস্থাপনেও অনুরূপ অলঙ্করণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেখানে এর বহিঃপ্রকাশ একান্তই স্বতোৎসারিত ও অনিচ্ছাকৃত। বলা হয় যে, যুহায়েরের[৪৫৯] কাব্যে অনুরূপ অলঙ্করণ বিদ্যমান।

হয়ে দাঁড়াল। রাজকীয় ফরমানাদিও সাধারণ ব্যক্তিগত যোগাযোগের অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল এবং আরবি ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্য সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হল। ভাল-মন্দ উভয়বিধ শব্দ একত্র মিশে একাকার হয়ে গেল এবং ভাষার স্বাভাবিক শক্তি এর বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে অপারগ হয়ে উঠল; কারণ তার প্রতি কাহারও লক্ষ ছিল না। বরং প্রত্যেকেই গদ্যে-পদ্যে ব্যবহারযোগ্য বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল এবং যত্রতত্র তাদের ব্যবহার করাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য করতে লাগল। অথচ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্‌রা অন্য বিষয় পরিত্যাগ করে শুধু এ অলঙ্কার প্রীতিকে সর্বদাই নিন্দনীয় মনে করেছেন।

আমি আমাদের উস্তাদদেরকে দেখেছি, তাঁরা অনুরূপভাবে যারা রচনায় অন্যায্য অলঙ্কার প্রীতির পরিচয় দিত, তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তাদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করতেন; আমাদের উস্তাদ আবুল বরাকাত আল বাল্লাফিকী যিনি ভাষার ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য ও সুস্থ আস্বাদ শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমার ইচ্ছা হয়, এভাবে যারা গদ্যে-পদ্যে বিচিত্র অলঙ্কার প্রয়োগের প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তারা যেন কঠিন শাস্তি পায় এবং জনসমক্ষে যেন তাদেরকে অসম্মান করা হয়। যাতে তাদের অনুসারীরা অনুরূপ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে আগ্রহী না হয়।' তিনি যথার্থই এ প্রকার অলঙ্কারপ্রীতির ফলে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অবলুপ্তি আশঙ্কা করে এ মন্তব্য করেছেন। আমাদের উস্তাদ শরীফ কাজী আবুল কাসেম আস্‌সিবতী, যিনি আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং তখন এর চর্চার নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি প্রায়শই বলতেন, 'বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার কোন কবি বা লেখকের রচনায় স্বতোস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু সে যদি এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বারংবার প্রয়োগ করে, তাহলে খুবই নিন্দনীয়। বস্তুত এসব অলঙ্কারের দ্বারা বাণীর চাকচিক্য বৃদ্ধি ও সৌকর্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এগুলোকে মুখমণ্ডলের তিলের সাথে তুলনা করা যায়; একটিতেই সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং বেশি হলে একান্ত কুৎসিত হয়ে দাঁড়ায়।

এসব গণ্যমান্য গুণীদের সমুদয় বক্তব্যের তাৎপর্য অলঙ্কার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যাতে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিলুপ্তি না ঘটে। তাঁদের বক্তব্য হতে এটিও বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক বাণীরূপ সর্বদা অলঙ্কৃত বাণীরূপ হতে শ্রেষ্ঠ। আমরা এখানে এর রহস্য ও যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আস্বদই একমাত্র বিচারক। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানী এবং তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দেন, যা তোমরা জান না।

৪৫৮. যথাক্রমে কোরান; ৯২, ১-২, ৯২, ৫; ৭৯, ৩৭; ১৮, ১০৪।

৪৫৯. সফল কবির পরিচয়ের জন্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

www.amarboi.org

ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে অবশ্য এর বহিঃপ্রকাশ একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও ইচ্ছাকৃত এবং তারা এক্ষেত্রে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা এ বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তারা হলেন হাবিব ইবনে আউস, আল বুহ্তরী এবং মুসলিম ইবনে ওলিদ। তারা সকলেই এমন অলঙ্করণে আসক্ত ছিলেন এবং তাতে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। বলা হয়, প্রথমে যারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, তারা হলেন বাশশার ইবনে বুর্দ ও ইবনে হেরমা। তারা উভয়ে শেষ কবি, যাদের কাব্যের দ্বারা আরবি বাক্রীতির প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। তারপর তাদেরকে অনুসরণ করে আমর ইবনে কুলসুম, আল ইতাবী, মুনসুর আন্নুমায়রী, মুসলিম ইবনে ওলিদ ও আবু নওয়াস এসেছেন এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছেন হাবিব ও আল বুহতরী। এর পর ইবনে আল মুতাজ আবির্ভূত হয়ে সর্বপ্রকার শৈল্পিক অলঙ্করণের সমাপ্তি টেনেছেন।[৪৬০]

আমরা এখানে শৈল্পিক অলঙ্করণ থেকে মুক্ত বাণীর স্বাভাবিকরূপের কিছু উদাহরণ তুলে ধরব। যেমন কাযেম ইবনে যারিহের উক্তি :

'আমি আবাসস্থল থেকে বের হয়ে এলাম এজন্য, যাতে
নির্জনে তোমার সাথে অন্তরের কথা ব্যক্ত করতে পারি।'

কুসাইয়েরের উক্তি :

'আমি 'আজ্জা'র জন্য আবেগে আন্দোলিত হচ্ছি, যখন
আমর ও তার মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
যেন আকাশের মেঘের ছায়া প্রত্যাশী কোন লোক,
যার শিরোপরে তা এসেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।'

পাঠক, শৈল্পিক অলঙ্করণমুক্ত এ স্বাভাবিক বাণীরূপের বন্ধনগত দৃঢ়তা ও বিন্যাসগত পরিমার্জনার কথা চিন্তা করুন। যদি এর এই ভিত্তির উপর অলঙ্করণযুক্ত হত, তাহলে বেশি সুন্দর হয়ে উঠত।

অলঙ্কৃত বাণীরূপের উদাহরণ বাশ্শার ও হাবিব এবং তাদের পর্যায়ভুক্ত কবিদের সময় থেকে প্রচুর পরিমাণে লভ্য : তারপর ইবনে আল মুতাজ এসে তাকে এমন পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার আদর্শ অনুসরণ করেই পরবর্তী কবিরা অগ্রসর হয়েছেন এবং তাদের তাঁতেই নিজেদের বাণী বয়ন করেছেন।

শাস্ত্রবিদ্দের কাছে এ শিল্পের প্রকার বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং এ বৈচিত্র্যের নামকরণে তাদের পরিভাষাও বিভিন্ন। তাদের মধ্যে অনেকেই একে বাক্বৈদগ্ধ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন; কেননা এটি ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। বরং এর দ্বারা বাণীর সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অবশ্য পূর্বসূরি অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্গণ একে বাকবৈদগ্ধ্যের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এজন্যই তারা একে সাহিত্যের বিষয়াদির মধ্যে বর্ণনা করেন, যার নির্দিষ্ট কোন আলোচ্য নেই। এটাই 'উমদা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত ইবনে রশিকের মত এবং আন্দালুসের সাহিত্যিকগণও এ মত পোষণ করেন।

৪৬০. সফল কবির পরিচয়ের জন্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

www.amarboi.org

শাস্ত্রবিদ্‌গণ এ শিল্পকৌশল ব্যাবহারের জন্য শর্তাদি আরোপ করেছেন। তার মধ্যে উক্ত অলঙ্করণ প্রক্রিয়া কোন প্রকার আয়াস ও কষ্ট-কল্পনা ছাড়া সংঘটিত হবে। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত হলে তাতে আপত্তির কিছু থাকে না। কারণ বক্তব্য অনুরূপ কষ্ট-কল্পনা থেকে মুক্ত হলে তাতে আতিশয্যের দোষ ঘটে না। কেননা এমন আতিশয্যও তার জন্য কষ্ট স্বীকার বাণীর বাক্‌বিন্যাসগত মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেই উদাসীনতার সৃষ্টি করে। ফলে তা মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের পর্যায় থেকে সম্পূর্ণ নেমে যায়। তখন বাণীরূপের মধ্যে এ অলঙ্করণ সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বর্তমানকালে সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে এরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাক্‌বৈদগ্ধ্যের রসবোদ্ধা ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে তাদের কষ্ট-কল্পনাকে বিদ্রূপ করে থাকেন এবং এছাড়া অন্য বিষয়ে তাদের অক্ষমতার নিদর্শন হিসেবেই একে গণ্য করেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের উস্তাদ আবুল বরকাত আল বালফিকী, যিনি বাক্‌রীতি সম্পর্কে বিচক্ষণ ও রসগ্রহিতায় পারদর্শী হিসেবে সুপরিচিত, তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমার মনের একান্ত বাসনা, যারা গদ্যে-পদ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকরণ ব্যবহারে নিবিষ্টচিত্ত, তারা যদি চরম শাস্তির সম্মুখীন হত এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা হত যে, তারা যেন তাদের শিষ্যদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, 'যাতে তারা এ শিল্প-কৌশল অনুসরণ করে কষ্ট-কল্পনার মাধ্যমে বাকবৈদগ্ধ্যের কথা ভুলে না যায়।'

শাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে এ সম্পর্কীয় শর্তাদির মধ্যে অন্য একটি হল যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ ব্যবহার। একটি দীর্ঘ কবিতার দুই বা তিনটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতেই তার কাব্যের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাবে এবং তদতিরিক্ত আতিশয্য প্রদর্শন ত্রুটি মাত্র! ইবনে রশিক ও অন্যান্যদের এটাই মত। আমাদের উস্তাদ আবুল কাসেম শরীফ আস্‌সবতী, যিনি সমসাময়িককালে আন্দালুসের আরবি বাক্‌রীতির একজন দক্ষ বোদ্ধা ছিলেন, প্রায়ই বলতেন, "কোন কবি বা লেখকের এ অলঙ্কারশাস্ত্রাদির প্রতি আসক্তি জন্মালে, তার মধ্যে এদের ব্যবহারের আতিশয্য দেখা দিবেই। কারণ এর দ্বারা বাক্‌বিন্যাস পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যবিশিষ্ট হয়। বস্তুত এ অলঙ্করণকে মুখমণ্ডলের তিলের সাথে তুলনা করা যায়; একটি বা দুটিই তার জন্য শোভা, বেশি হলে কদর্যতার পরিচায়ক।"

ইসলামী ও জাহেলী আমলের কাব্যের ধারা অনুসরণ করেই গদ্য রচনা আবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিকে গদ্য খুবই প্রাঞ্জল ছিল; তার বাক্য ও বিন্যাসাদির মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য সমতুল্যতা এবং কোন প্রকার ছন্দোবদ্ধতা ও শৈল্পিক কৃত্রিমতা ব্যতিরেকেই পর্বাদির বিভাজনের একটা সমধর্মিতা বিদ্যমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বনি বুয়ার লেখক ইব্রাহিম ইবনে হেলাল আস্‌সাবী আবির্ভূত হলেন এবং শিল্প-কৌশল ও অন্ত্যমিল, ব্যবহার করে তাতে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করলেন। কিন্তু এরূপ গদ্যে সুলতানদের ভাষণাদি রচনা করায় তার কৃত্রিমতার জন্য মানুষ নিন্দা করতে লাগল। তাঁর এরূপ রচনার জন্য উৎসাহবোধের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ ছিলেন অনারব এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টির জন্য মূল কারণ খেলাফতের প্রভাব থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। তারপর উত্তরসূরিদের গদ্য রচনায় এ শিল্প-কৌশলেরই বিস্তৃতি

www.amarboi.org

ঘটল, প্রাঞ্জলতার যুগ সকলেই বিস্মৃত হল এবং প্রশাসনিক নির্দেশাদি ও ভ্রাতৃসুলভ যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য রইল না; আরবি রচনা সাধারণ স্তরে নেমে গেল। ভাল-মন্দ মিশে একাকার হয়ে উঠল।

পাঠক, এসবই আপনাকে এ নির্দেশই প্রদান করবে যে, আয়াসসাধ্য ও কষ্ট-কল্পিত অলঙ্কৃত বাণীতে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের উপাদানের স্বল্পতা থাকায় তা কখনই স্বাভাবিক বাণীরূপের সমতুল্যতা অর্জন করতে পারে না। বস্তুত রসানুভূতিই এর একমাত্র বিচারক। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জ্ঞাত ছিলে না।'[৪৬১]

---

৪৬১. কোরান; ২, ২৩৯।

www.amarboi.org

ঊনষষ্টি পরিচ্ছেদ

[পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা কাব্যচর্চার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন]

জেনে রাখুন, কাব্য ছিল আরবদের ঐতিহ্য ভাণ্ডার; তাতেই তাদের শাস্ত্র, ইতিহাস ও বিচক্ষণতা সংগৃহীত হত এবং আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ কাব্যের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন। উকাজের মেলায় তারা এর জন্য উপস্থিত হতেন এবং প্রত্যেকেই তার উৎকৃষ্ট সম্পদ বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সামনে পেশ করতেন। এমন কি আরবরা তাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ তাদের হজ্জব্রত পালনের স্থান, তাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহিমের উপাসনাগৃহ পবিত্র কাবার স্তম্ভাদিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামত। যেমন—ইমরুল কায়েস ইবনে হুজুর, নাবিগাতু যুবিয়ানী, ফুহাইর ইবনে আবু সলমা, আন্তারা ইবনে শাদ্দাদ, তরফা ইবনে আবদ, আলকামা ইবনে আবদা, আল আশা এবং 'ঝুলন্ত সপ্ত কবিতা'র অন্যান্য কবিরা করেছেন। বস্তুত এভাবে কবিতা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি তাদের পক্ষেই সম্ভব হত, যারা গোত্র, গোত্রপ্রীতি ও মুজার জনসমাজে প্রয়োজনীয় প্রভাবসহ কাব্য সম্পদের অধিকারী ছিল। এ কারণেই এসব কবিতার নাম 'ঝুলন্ত কবিতা' হয়ে দাঁড়ায়।[৪৬২]

অতঃপর ইসলামের প্রথমদিকে আরবরা এমন প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। কারণ তখন তারা ধর্মীয় ব্যাপার, নবুয়ত ও ওহী নিয়ে ব্যস্ত এবং কোরানের বাক্‌বিন্যাস ও বাক্‌রীতিও তাদেরকে তখন অভিভূত করে রেখেছে। ফলে তারা কিছুকাল নির্বাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করেছে এবং তাদের গদ্য-পদ্য সম্পর্কীয় অনুসন্ধিৎসা থেকে বিরত রয়েছে। কিন্তু এরপর তাদের এমন অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে জাতি উক্ত বিস্ময়ের সাথে সুপরিচিত হয়ে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কাব্যের নিষেধাজ্ঞা ও তার বিরোধিতা করে কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং কবিতা শুনে তার প্রতিদান দিয়েছেন।[৪৬৩] ফলে আরব আবার তাদের কাব্যচর্চায় ফিরে এসেছে। এ সময়ে কোরায়শ গোত্রের নেতৃস্থানীয় উমর ইবনে আবু রবিয়া কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে উন্নত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় তার কবিতা ইবনে আব্বাসকে শোনাতেন এবং তিনিও তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

এরপর বিখ্যাত রাজন্যবর্গ ও বিরাট সাম্রাজ্য এসে উপস্থিত হল। আরবরাও তাঁদের প্রশংসা কীর্তন করে তাদের কাব্য নিয়ে দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। সম্রাটরাও

৪৬২. টীকা নং ৪৬০-এর অনুরূপ।

৪৬৩. কবি কাব ইবনে যুহায়ের-এর ঘটনা এর প্রমাণ বহন করে।

www.amarboi.org

কবিদের কাব্যের উৎকর্ষ অনুসারে তাদের গোত্রগত মর্যাদা বিচার করে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা এমন কাব্য উপঢৌকনের জন্য লালায়িত থাকতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা ও বাক্‌রীতির গৌরব অনুসন্ধান করতেন। আরবরাও তাদের সন্তান-সন্ততিকে এসব কাব্য কণ্ঠস্থ করতে উৎসাহ দিত। উমাইয়া সাম্রাজ্য ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়ে এ পরিস্থিতিই বিরাজমান ছিল পাঠক, এ প্রসঙ্গে আপনি সম্রাট হারুনুর রশীদ ও আসমাই-র মধ্যে কবি ও কাব্য সম্পর্কীয় কথোপকথনের যে উদ্ধৃতি 'ইকদ' গ্রন্থ প্রণেতা তার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তার প্রতি লক্ষ করুন।[৪৬৪] দেখবেন এ বিষয়ে রশীদের জ্ঞানের গভীরতা কত বেশি এবং কাব্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের পরিধি কত ব্যাপক! এ সঙ্গে তিনি বাণীরূপের উৎকর্ষ বিচারে এবং তাদের কণ্ঠস্থ করার প্রাচুর্যে কী পরিমাণ দক্ষতা রাখতেন!

তাঁদের পরে এমন একদল লোক এল, যাদের ভাষা আরবি ছিল না এবং তাদের অনারবত্বের জন্যই তারা আরবি বাক্‌রীতিতে ত্রুটি বহন করত। তারা শিল্পের প্রয়োজনেই এ ভাষা শিক্ষা করত এবং এর দ্বারা কাব্য রচনা করে এমন ব্যক্তিদের প্রশংসা করত, যারা মূলতই অনারব; অন্তত আরবি ভাষার সাথে যাদের গভীর কোন পরিচয় নেই। কবিরাও তাদের কাছে একমাত্র পারিতোষিক ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করত না। যেমন হাবিব, আল বুহতরী, আল মুতানব্বী, ইবনে হানী এবং তার পরবর্তী অন্যান্য কবিরা করে এসেছেন। সুতরাং এর ফলে কাব্যরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল অলীক স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা এবং আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুসারে পূর্বসূরিদের মধ্যে এ কাব্যচর্চায় যে উপকারিতা ছিল, তা বিলুপ্ত হল। এ কারণেই পরবর্তীকালের পদমর্যাদার অধিকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কাব্যচর্চাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটল যে, কাব্যচর্চা নেতৃত্বের জন্য ত্রুটি এবং বিরাট পদমর্যাদার জন্য নিন্দনীয় বিষয় বলে গণ্য হতে লাগল। 'আল্লাহ দিনরাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।'[৪৬৫]

---

৪৬৪. ভূমিকা দ্র:।

৪৬৫. কোরান; ২৪, ৪৪।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[বর্তমানকালের নাগরিক ও বেদুইন আরবি কাব্য]

জেনে রাখুন, কবিতা শুধু আরবি ভাষাতেই বিশিষ্ট নয়; বরং আরবি অনারব সব ভাষাতেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। পারস্য ভাষায় যেমন কবিরা কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি গ্রিক ভাষাতেও। এরিস্টটল তাঁর যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থে গ্রিক কবিদের মধ্যে হোমারের কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন। হিমিয়ারদের মধ্যেও প্রাচীন কবিরা ছিলেন।

অতঃপর যখন মুজারী বাক্‌রীতি ও তাদের ভাষায় বিকৃতি দেখা দিল এবং তার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য অনুমানসিদ্ধ ধারা ও কারক-চিহ্নাদির নিয়ম সংকলন করা হল, তখন উক্ত ভাষা অনারব বাক্‌রীতির সাথে মিশ্রণের তারতম্যানুসারে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করল। এর ফলে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট ভাষারূপ জন্ম নিল, যা কারক-চিহ্নাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এবং শাব্দিক তাৎপর্য ও শব্দ গঠনে আংশিকভাবে পূর্বসূরি মুজারী ভাষা থেকে পৃথক। অনুরূপভাবে শহরবাসী নাগরিকদের মধ্যেও এমন একটি ভাষার উদ্ভব ঘটল, যা কারক-চিহ্নাদি, অধিকাংশ প্রচলন ও পদ প্রকরণে মুজারী ভাষারূপ থেকে স্বতন্ত্র এবং বর্তমানকালের আরব গোত্রগুলোর ভাষার সাথেও এর মিল নেই। বস্তুত এ ভাষারূপ বিভিন্ন স্থানের প্রচলনের ধারা অনুসরণ করে বিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের সাধারণ ও নাগরিক রূপের কোন সামঞ্জস্য নেই এবং এ উভয় রূপের সাথে আন্দালুসবাদীদের সাধারণ নাগরিক রূপে বিভিন্নতা বিদ্যমান।

অতঃপর যেহেতু কাব্য স্বভাবতই প্রত্যেক বাক্‌রীতিতে বিদ্যমান এবং যেহেতু হসন্ত ও স্বরান্ত শব্দাবলির সংখ্যা অনুপাতে ও তার বিপরীত ধারায় মাত্রাজ্ঞানের সমতা মানুষের প্রবৃত্তিতে উপস্থিত, সেজন্য একটি বিশেষ ভাষারূপ অর্থাৎ মুজারী ভাষার অনুপস্থিতিতে তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হতে পারে না; যদিও জগৎবাসী সকলেই অবগত যে, এ মুজারী বাক্‌রীতির অধিকারীরাই কাব্য রচনায় দক্ষ ও উক্ত বিষয়ে দিক্‌পাল ছিলেন। বরং অনারবত্বের প্রভাবাধীন প্রতিটি আরব গোত্র ও শহরবাসী নাগরিক জনসমাজ তাদের বাক্‌বিন্যাসের ধারা অনুসারে কাব্যচর্চা ও তার যথাযথ উপস্থাপনে মনোনিবেশ করেছে। এক্ষেত্রে আরব বেদুইন এ গোত্রবাসীরা, যারা তাদের পূর্বসূরি মুজার গোত্রের ভাষারীতি থেকে অনারব পরিবেশে স্খলিত হয়ে পড়েছে, তারা এই বর্তমানকালেও তাদের পূর্বসূরি বিশুদ্ধ আরবদের ন্যায় কাব্যকে তার সর্বপ্রকার ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। তারা কবিতার সব ধারা ও উদ্দেশ্য, তথা—প্রেমানুভূতি, স্তুতি, শোক ও নিন্দার উপস্থাপনার মাধ্যমে তাকে দীর্ঘায়িত করতে উদ্যোগী এবং তার পরিসরের মধ্যে বিষয়

www.amarboi.org

থেকে বিষয়ান্তরে গমনের জন্য উদ্গ্রীব। অনেক সময় তারা বক্তব্যের প্রথম দিকেই তাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতার আরম্ভ কবির নামোচ্চারণের মাধ্যমে ঘটে। এর পর তারা প্রিয়তমার স্মৃতিচারণে আত্মনিয়োগ করে।

মাগরিবের শহরবাসী আরবরা এ জাতীয় দীর্ঘ কবিতা (কসিদা)-কে 'আসমাই কাব্য' বলে অভিহিত করেন। আরবি কাব্যের বর্ণনাকারী বিখ্যাত 'আসমাই'র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলবাসী আরবরা এরূপ কবিতাকে 'বদবী' (বেদুইন), 'হাওরানী' ও 'কায়সী' বলে ডাকেন। অনেক সময় তারা এতে একটি সরল সুরও সংযোজন করেন। অবশ্য এ সুর সঙ্গীতের কলাকৌশলের অনুরূপ নয়। তারপর তারা উপরিউক্ত সুরের মাধ্যমে সঙ্গীতের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করেন এবং এরূপ সঙ্গীতকেও 'হাওরানী' বলে ডাকা হয়,। বস্তুত ইরাক ও সিরিয়ার প্রান্তবর্তী একটি অঞ্চলের নাম এ 'হাওরান' এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত তা আরব-বেদুইনদের অবতরণস্থল ও আবাসভূমি হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে।

তাদের মধ্যে আরও একটি বিষয়ের খুবই প্রচলন রয়েছে; তারা কাব্য রচনায় চারটি পঙ্‌ক্তির ব্যবহার করেন। তাদের শেষেরটি অন্ত্যমিলের দিক থেকে প্রথম তিনটি থেকে ভিন্ন হয় এবং অন্ত্যমিলের প্রতি চতুর্থ পঙ্‌ক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপনকে অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। এভাবে দীর্ঘ কবিতার শেষ পর্যন্ত এ ধারা অনুসৃত হয়ে থাকে। এটি পরবর্তীকালের আরব-অনারবের মিশ্রণজাত কবিদের উদ্ভাবিত চার পঙ্‌ক্তি ও পাঁচ পঙ্‌ক্তির কাব্য রচনার সাথে তুলনীয়। এসব আরব গোত্র অনুরূপ কাব্য রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে দক্ষ ও পরবর্তীকালীন অদক্ষ সব শ্রেণীর কবিই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানকালে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত বহু লোক, বিশেষ করে ভাষাবিদ্‌রা তাদের এমন বিষয়াদিকে শোনা মাত্রই অস্বীকার করে বসেন এবং সব কবিতা আবৃত্তিকালে তারা একে কবিতা বলে মানতে চায় না। তাদের ধারণা এই যে, এসব কবিতায় ভাষার বিশুদ্ধতা ও কারক-চিহ্ন না থাকায় রসানুভূতির যথার্থ উপাদানের অভাব ঘটেছে। বস্তুত তাদের এমন ধারণা, একমাত্র ঐসব গোত্রের ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে অনবগতিরই ফল। যদি তাদের মধ্যে এ বেদুইন ভাষার যোগ্যতা থাকত, তাহলে তাদের প্রবৃত্তি ও আস্বাদশক্তি অবশ্যই উক্ত ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সাক্ষ্য দিত! কিন্তু এসত্ত্বেও যদি তাদের রসানুভূতি তার গঠন প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বাধা বিপত্তি মুক্ত না হয়, তাহলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। তবেই এ কথা সত্য যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে কারক-চিহ্নাদির কোন ভূমিকা নেই। বস্তুত বাক্‌বৈদগ্ধ্য বলতে মনোভাব ও তদন্তর্গত প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানকে বোঝায়। এক্ষেত্রে 'উকার' কর্তাকে ও 'আকার' কর্মকে নির্দেশ করুক কিংবা এর বিপরীত কিছু হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ বক্তব্যের নিদর্শনাদিই তার জন্য যথেষ্ট; যেমন এ গোত্রগুলোর ভাষায় বিদ্যমান। কেননা যে-কোন ভাষাভাষীর কাছে প্রচলিত ধারাই তাদের বক্তব্য নির্দেশ করে। সুতরাং অনুরূপ ভাষাগত যোগ্যতা যদি সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত হয়, তাহলেই তার নির্দেশ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ

www.amarboi.org

থাকে না এবং এরূপ বাক্ নির্দেশ যদি মনোভাব ও প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে বাক্‌বৈদগ্ধ্যেও কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদ্‌দের নিয়মকানুন খুব একটা লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। বস্তুত এসব গোত্রের কাব্য রচনায় কাব্যের রীতি ও বিষয় উভয়ই বিদ্যমান; কেবলমাত্র তাদের শব্দাবলির শেষের কারক-চিহ্নাদিরই অভাব রয়েছে। কারণ তাদের অধিকাংশ শব্দই হসন্তযুক্ত। এজন্যই তাদের বক্তব্যের নিদর্শন থেকেই কর্তা ও কর্ম এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে; কারক-চিহ্নাদির প্রয়োজন হয় না।

তাদের কাব্যের অনুরূপ উদাহরণের মধ্যে আশ্ শরীফ ইবনে হাশেমের বাচনিক যে কবিতাটি বিদ্যমান, তা নিম্নরূপ। এতে কবি আল জযিয়া বিনতে সিরহানের জন্য অশ্রুপাত করে তার গোত্রের সাথে তার মাগরিব অঞ্চলে প্রস্থানের কথা বর্ণনা করছেন।[৪৬৬]

যুদ্ধজয়ী বীর শরীফ ইবনে হাশেম বলছে—যেহেতু
তার উৎপীড়িত হৃদয় তার বেদনার আর্তনাদকারী।
সে দ্রুত সেই কথাই বলতে চায়, কীভাবে তার অন্তর
একটি তরুণ বেদুইনকে কেন্দ্র করে ব্যথা-বেদনায় মুহ্যমান।
সে বলছে, কীভাবে তার অন্তরাত্মা বিদায় বেলার ভোরে
আর্তনাদ করেছিল! আল্লাহ্ তার সংবাদবাহককে ধ্বংস করুন!
যেন মনে হয়, তার হৃদয়কে কেউ তীক্ষ্ণ ভারতীয় ছুরিকার দ্বারা
দ্বিখণ্ডিত করেছি এবং স্মৃতিশক্তিকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছে।
যেন ধৌতকারীর হাতে পতিত ভেড়ার করুণ আর্তনাদ
যে তার বন্ধন রজ্জুকে মৃত্যুফাঁসরূপে দৃঢ় সংবদ্ধ করেছে।
যেন তাকে দুইভাঁজ করেছে যে, মাথা ও লেজের অংশ
একত্রে কণ্টকবিদ্ধ এবং অবশিষ্টাংশ নির্মমতায় আকর্ষিত।
দুই চক্ষের অশ্রুধারা বিগলিত, যেন তাদের অবস্থা
জলতোলা চক্রের অবিরল ঘূর্ণায়মানতার সাথে তুলনীয়।
উহা তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ফোটায় অনবরত বর্ধনশীল;
যেন আকাশের মেঘমালা থেকে পতিত বৃষ্টির ধারা।
তা 'সাফার নিম্নবর্তী সমতলে ঝর্ণাধারায় প্রবাহিত
এবং দ্রুততায় তা বিদ্যুচ্চমককেও হার মানাচ্ছে।
আমর এ গীত, যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ডেকে আনবে,
বাগদাদের সব মানুষ, এমন কি নিঃস্বকেও উত্তেজিত করছে।
যাত্রার জন্য আহ্বানকারী উচ্চ কণ্ঠে বলল, প্রস্তুত হও;
মহাজনরা খাতকের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল।
হে দিয়েব ইবনে গানেম! কাফেলার গতিরুদ্ধ কর;
তার নেতা মাযী ইবনে মুকার্রিবের শক্তিকে প্রতিহত কর।
হাসান ইবনে সিরহান তাদেরকে বলল, পশ্চিমে যাও;
পশুপালকে তাড়না কর, আমি তাদের পশ্চাদ্‌রক্ষী;
তারা যাত্রা করল ও তার হাতে অবনমিত বর্শার ফলা

৪৬৬. এ কবিতাটির অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হতে পারিনি। কারণ এতে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বিদ্যমান।

www.amarboi.org

এবং আল্লাহ্‌র কসম, তারা আক্রমণ করতে সাহস পেল না।
আবেসের যিয়ান—দানশীল আমাকে ত্যাগ করেছে;
সে কখনও হিমিয়ারের জাঁকজমক ও নেতৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল না।
সে আমাকে ছেড়েছে, যাকে বন্ধু ও সাথী বলে ভাবতাম
এবং আমার কাছে এমন কোন ঢাল নেই, যা চতুর্দিকে ঘুরাতে পারি।
বেলাল ইবনে হাশেম ফিরে এসে তাদেরকে বলল,
আঞ্চলিক উষ্ণতায় যদি পিপাসার্ত হও শুভ হবে না।
বাগদাদের দ্বার ও তার ভূমিতে প্রবেশ আমার জন্য নিষিদ্ধ;
আমার বাহন তাতে প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনে একান্তই বিমুখ!
ইবনে হাশেমের অঞ্চল থেকে আমার অন্তরাত্মা বিবাগী;
তার রৌদ্র তাপ; নয়তো তার দুঃসহ তাপে মৃত্যু নিকটবর্তী।
অনবরত কুমারী অগ্নি তাতে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণকারিণী;
আশ্রয় তাতে জুরজানে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর ন্যায়।

তাদের অনুরূপ কাব্যের আরও একটি উদাহরণ জানাতী আমীর আবু সুদা আল ইয়াকরিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শোকগাথা। আফ্রিকিয়া ও যাব অঞ্চলে এ আমীর যথেষ্ট দুর্যোগ বহন করে এনেছিল। এ কারণেই তার জন্য শোকের ভাণ করা হয়েছে।

গোত্রের যুবতীগণ বলছে, হায়, সুদা! এবং হাওদাবাহী
উটের কাফেলা সম্মত অবস্থায় তাদের আর্তনাদকে ব্যক্ত করছে।
হে জানাতী খলিফার কবর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারী!
আমার কাছ থেকে তার বিবরণ গ্রহণ কর; বোকামি করিও না।
তুমি তাকে 'রান' নদীর উচ্চভূমিতে দেখতে পাবে, সেখানে
একটি খ্রিস্টান গীর্জা অবস্থিত এবং তার গঠনসৌকর্য সমুন্নত।
আমি তাকে দেখেছি, যেখানে নিম্নভূমি বালুর পাহাড়ে পর্যবসিত
এবং তার পূর্বদিকে নদী এবং নলবন তার চিহ্ন নির্দেশক।
আহা, আমার অন্তর সেই জানাতী খলিফার জন্য কীভাবে মুহ্যমান;
তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশধারার এক সম্ভ্রান্ত সুসন্তান!
তিনি বীরবর দিয়েব ইবনে গোনেমের দ্বারা নিহত হয়েছেন
এবং তার আহত স্থানগুলো থেকে উন্মুক্ত মশকের ন্যায় রক্ত ঝরেছে।
ওহে জায়েযা! সেই জানাতী খলিফা এখন মৃত্যুর কবলে পতিত;
তুমি যাত্রা করিও না, যতক্ষণ না যাত্রার সময় এসে উপস্থিত হয়।
হায় দুর্ভাগ্য! আমরা তোমাকে ত্রিশ বার বিদায় করেছি
এবং একই দিনে ষোল বার; কী অকিঞ্চিৎকর এ বিদায়!

আরও একটি উদাহরণ শরীফ ইবনে হাশেমের বাচনিক নিম্নরূপ। এতে কবি ও মাযী ইবনে মুকার্রিবের মধ্যকার একটি কোন্দলের বিবরণ বিদ্যমান।

পরাক্রমশালী মাযী আমাকে বলতে আরম্ভ করল,
হে শোকর! আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।
হে শোকর! আবার দেখ, আমাদের মধ্যে সম্প্রতি অবশিষ্ট নেই;[৪৬৭]

৪৬৭. এখানে রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নরূপ:
'হে শোকর! নজদে ফিরে এস এবং ভর্ৎসনা করিও না।
যে ব্যক্তি নিজের ভূমি আবাদ করে, সেই বেঁচে থাকে।'—দুটি পংক্তি বিদ্যমান।

www.amarboi.org

তোমাকে সেই আরব গোত্রের সাথে দেখছি, যারা পরিচ্ছদধারী।
আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ভাগ্যের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি;
যেমন রন্ধনপাত্রের খাদ্য আলোড়নের সম্মুখীন হয়।
হে শোকর! ইয়াজিদকে তার ভর্ৎসনা আবার ফিরিয়ে দাও,
যাতে উত্তপ্ত হয় এবং এলাকার জীবন পুনরায় ফিরে আসে।
যদি তোমাদের ভূমিতে কন্টকগুল্ম অত্যধিক উৎপাত হয়;
তাহলে আমরা, আরবরা বেশি উর্বর ভূমি কোথায় পাব!

আরও একটি কবিতায় তাদের মাগরিবে আগম ও জানাতীদের উপর তাদের আধিপত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শরীফ ইবনে হাশেমের সাথে আমি কী সুজনকেই না হারিয়েছি।
আমার পূর্বে আর কোন ব্যক্তি কি অনুরূপ কোন সুজন হারিয়েছে?
সে এবং আমি আমাদের গৃহস্থিত গৌরবের মধ্যে অবস্থিত ছিলাম;
কোন্দলে সে আমাকে এমনভাবে হারিয়েছে, যার কথা ভুলতে পারিনি।
তা এমনভাবে এসেছে; যেন আমি পান করেছি সেই মাদকতা,
যা তীব্র মদে বিদ্যমান এবং কোন পানকারীই অভিভূত না হয়ে পারে না।
অথবা আমার তুলনা সেই বৃদ্ধার ন্যায়, যে অন্তর্জালায় মৃত্যু কবলিত,
বিদেশে বিপাকে—তার গোত্র থেকে নির্দয়ভাবে বিতাড়িত;
তার সামনে দুঃসময় স্বয়ং মূর্তিমান, তাকে গ্রাস করতে উদ্যত,
সে এমন বেদুইন গোত্রে অবস্থানরত, যারা অতিথির প্রতি উদাসীন।
এমনিভাবে আমিও আমার উপর আপাতত ভর্ৎসনার অন্তর্দাহে
এমন এক হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ তুলে ধরতেছি, যে মর্মান্তিক ভারাক্রান্ত।
আমি আমার গোত্রকে যা করতে আদেশ দিয়েছি প্রাতঃকালে;
তারা দৃঢ়বদ্ধ এবং সকলেই আসবাবপত্রের বোঝা বেঁধে ফেলেছে।
আমরা আমাদের বিপাকের মধ্যে সাত দিন আবদ্ধ অবস্থায় নিস্পন্দ
এবং বেদুইনরাও তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলো পুঁততে অবসর পায়নি।
আমরা অনবরত পাহাড়ি ঘাঁটির পরস্পরমুখী অবস্থানে নিরত
এবং আমাদের উপরে অবিরত তীর ও বর্শার বৃষ্টিপাত হচ্ছিল।[৪৬৮]

রিয়াহ্-এর একটি শাখাগোত্রের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম 'যাওয়াবিদা'র সুলতান ইবনে মুজাফর ইবনে এহিয়ার কবিতার উদাহরণ। ইনি আফ্রিকিয়ার আল মোহেদ রাজন্যবর্গের প্রথম আমীর আবু যাকারিয়া ইবনে আবু হেফসের শাসন আমলে মেহেদিয়ার কারাগারে বন্দী থাকাকালে এ কবিতা রচনা করেন।

কবি বলছে, যখন ভোরের আলোকরশ্মি তার ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে;
আমার চোখের পাতার পরে তন্দ্রার ছায়াপাত নিষিদ্ধ হয়েছে।
হায়, এ ব্যথা-বেদনায় নিপীড়িত হৃদয়ের সাহায্যকারী কোথায়!
আর এ প্রণয়পাগল আত্মার এ পুরাতন ব্যাধিই-বা দূর করবে কে!
সে ভালবাসে এক হেজাজী, আরবি, বেদুইন কুমারীকে;
একান্ত কোমল প্রাণী, অথচ সে কখনও ধরা দেয় না।
হায়, সে প্রান্তরের জন্য উদগ্রীব, কখনও গ্রামের অভিমুখিনী নয়;

৪৬৮. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

www.amarboi.org

তার দৃষ্টি সেই বালুময় মরুতে, যেখানে তাঁবুই আবাসস্থল।
বৃষ্টিমুখর দিন ও প্রতিটি শীতজর্জর কাল সে সেখানে সাগ্রহে কাটায়;
সে তাতেই সমর্পিতা এবং এ মরু জীবনেই তার প্রীতি ন্যাস্ত।
বৃষ্টির ফলে সবুজ তৃণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে তার বিচরণস্থল;
উন্মুক্ত প্রান্তরের আলস্য মন্থরতায় তার দেহের শ্রী বৃদ্ধি।[৪৬৯]
সেখানে যতদূর দেখা যায় চক্ষুকে তৃপ্তিদানকারী বিষয়ের সমারোহ;
কারণ সেই ভূমির উপর প্রবহমান মেঘমালা প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছে।
আহা কতই না সে অশ্রুত প্রবাহ আর কীভাবেই না আসে তার বুকে
ধাবমান ঝর্ণার কাকলি— তারা একে অন্যের পরিপূর্ণতা দানকারী।
সেই প্রান্তর যেন সজ্জায় সুশোভিতা নব পরিণীতা সুকুমারী;
তার উপরে শোভা পাচ্ছে প্রস্ফুটিত লতাগুল্মের এক বেষ্টনী।
উহা এটি প্রান্তর, সমতল, ব্যাপক, বিস্তৃত, দূরাধিগম্য;
এমন এক চারণভূমি, যেখানে পশুপালের সাথে উটপাখি বিচরণ করে।
সেই প্রান্তরে উটনীর দুধই একমাত্র পানীয়, যা অপরাহ্নে দুহিত হয়
এবং ভেড়ার মাংসই তার সারাক্ষণের একমাত্র খাদ্য বস্তু।
তাতে দ্বারদেশের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সেই রণাঙ্গনের,
যার ভয়াবহতা যুবকের চুলের বর্ণও ধূসর করে তোলে।
আল্লাহ্ এ বৃক্ষাদিশোভিত প্রান্তরকে বৃষ্টির জলে ধৌত করুন,
অনবরত; যাতে তার অন্তর্গত প্রাচীন অস্থিগুলো সজীব হয়ে ওঠে।
এসব কিছুর সমতুল্য আমার ভালবাসাই তার জন্যে যথেষ্ট; হায়,
আমি যদি এ বালুকা প্রান্তরে অতিবাহিত দিনগুলো উদ্ধার করতে পারতাম।
আর সেই রাতগুলো, যখন যৌবনের ধনুর্বাণ আমার করায়ত্ত ছিল;
যখন আমি শর যোজনা করতাম, তার একটিও ব্যর্থ হত না।
আমার অশ্বতরী সর্বদা আমার জিনপোষের নিচে কম্পমান;
আহা সেই যৌবনরূপী জিনপোষ, তার লাগাম ছিল আমার হাতে।
কত না তন্বী তরুণী আমাকে জাগ্রত রেখেছে এবং আমি
মুগ্ধ বিস্ময়ে পৃথিবীর সেরা লাস্যদীপ্তি অবলোকন করেছি।
কত না অন্যতর পীনোন্নত কোমল দেহবল্লরী রমণী,
তাদের আয়ত চোখের ভুরু কৃষ্ণ এবং উল্কির চিহ্ন উজ্জ্বল।
আমার আবেগ তাদের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছে;
এত ঘনিষ্ঠ যে, তারা সেই মিলনকে ভুলতে পারেনি।
সেই আবেগের আগুন অনবরত বুকের মধ্যে জ্বলছে;
এমনভাবে জ্বলছে যে, পানিতে তার তীব্রতা হ্রাস সম্ভব নয়।
হায়, কে তুমি আমাকে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলে;
অথচ এমন এক গৃহে আমার জীবন বিনষ্ট হচ্ছে, যার অন্ধকার আমাকে
অন্ধ করেছে।
আমিও দেখেছি, সূর্যও সামান্য সময়ের জন্য গ্রহণের অধীন হয়;
মেঘমালাও তাকে আবৃত করে, আবার সরে যায়;
সৌভাগ্যের পতাকা ও নিশান আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে
আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং তা বায়ুতে আন্দোলিত হয়ে আসছে।
আমিও দেখছি যুদ্ধের জন্য ব্যাগ্র বীর যোদ্ধাদের দেহাবয়ব;

৪৬৯. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

www.amarboi.org

আমার বর্শা আমার স্কন্ধে স্থাপিত এবং আমি তাদের অগ্রগামী।
'শামিসে'র উপরিভাগে 'এতাকুনৌকে'র সমতল বালুকাভূমি;
আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আমি তার পাহাড়ী অঞ্চলকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসী।
সেই বালুকার প্রান্তে 'জাফরিয়া'য় আমাদের ঘাঁটি থাকবে
এবং সেখানে যতদিন আমার অন্তর চাইবে, আমি অবস্থান করব।
সেখানে আমরা উদার হৃদয় হেলাল ইবনে আমেরের সাক্ষাৎ পাব।
এবং তার শুভেচ্ছা আমার অন্তরের সব দুঃখ ব্যথা দূর করবে।
পূর্ব পশ্চিমে তাদের বীরত্বের দৃষ্টান্তই সকলে ব্যবহার করে থাকে।
এবং তারা কোন জাতিকে আক্রমণ করলে তার পরাজয় ত্বরান্বিত হয়।
তাদের উপর এবং তাদের আশ্রয়ে লালিত সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক
দীর্ঘকাল ধরে—যতদিন 'খানা'র কবুতরগুলো কূজন করে ফিরবে।
অতএত এটি থাকুক এবং যা গিয়েছে তার জন্য দুঃখবোধ করারও
প্রয়োজন নেই;
কারণ এ পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার স্থায়িত্ব অবধারিত হয়েছে।

পরবর্তী কবিদের কাব্যের উদাহরণ। তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে হামজা ইবনে উমরের কবিতা। ইনি 'কাব' গোত্রের নেতা ও আবু লায়লের বংশধর। মুহাল্লালের বংশধরের সাথে তাদের যুদ্ধের বিষয়ে ইনি সমালোচনা করছেন এবং প্রতিপক্ষের কবি শিবলি ইবনে সিকিয়ানা ইবনে মুহাল্লালের কাব্যের উত্তর দিচ্ছেন। এতে প্রতিপক্ষের তুলনায় স্বজাতির গৌরব প্রকাশ পেয়েছে।

কবি বলছে এবং সে এখন এক দুর্ভাগা, যে বিদগ্ধ সমালোচকের
গালাগালির দুর্গন্ধ শুঁকছে ও তার তীব্রতার সম্মুখীন হচ্ছে।
পয়ঃ প্রণালী প্রবাহিত হলে যে দুর্গন্ধ বের হয়, ঠিক সেরূপ;
অথচ এর জন্যই অতি উত্তম অন্ত্যমিল ও বিষয়াদি নির্বাচিত হয়েছে।
বিস্ময়কর, সুনির্বাচিত সব আবৃত্তির উপকরণ, যাতে
হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ প্রজ্বলনের অভিমুখী হয়ে উঠেছে।
যে-কোন সমালোচকের জন্য তার স্তবকগুলো ছেঁকে তোলা
এবং তার পন্থা ও আমার পন্থা বিদগ্ধের কাছে অত্যন্ত দৃঢ়সংবদ্ধ।
আমার এসবের স্মৃতিচারণ, হে শ্রোতৃমণ্ডলী, একটি প্রত্যাঘাত
শিবলির সমস্ত আঘাতের এবং এটাই তার জন্য উত্তর।
হে শিবলী! গর্ভিনী কোন উষ্ট্রীর অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণ,
বেদনা লাঘবকারীদের ফুৎকারে যে বের হয়ে এসেছে।
তুমি অহঙ্কার কর, এতে তোমার ত্রুটি নেই; অথচ তুমি নিঃস্বত্ব নও।
যদি সাধারণের তুমি এমন কথা বলেছ, যা তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে।
মতিন ইবনে হামজার মাতার ব্যাপারে তোমার ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি;
যে ব্যক্তি তাদের সম্ভ্রমের রক্ষক এবং তাদের সমৃদ্ধির সংগঠক।
তুমি কি জান না, এ সেই ব্যক্তি, যে পুনর্গঠিত করেছে
বনি ইয়াহিয়ার বাসনপত্রের রাং ধাতু বিগলিত হবার পর।
বিদীর্ণকারী নেতৃত্বের সে এক, হে শিবলি, অগ্নিগোলক;
তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছ, যে জাহান্নামের আগুনে শরীর তপ্ত করে।
সে অগ্নি নিভেও যায়, সে তাকে আবার উসকে তোলে;

www.amarboi.org

প্রয়োজনে পুনরায় নিভায় বিপুল বিক্রমে আবার জ্বালাবার জন্য।
দুর্বার নির্বাপিত হবার পর তা পুনরায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে
এবং ফেজের মৃত্যুগৃহের দিকে তাতে অনুসরণ করে এসেছে।[৪৭০]
তার বীরত্বের দৃষ্টান্ত নেতৃবৃন্দের কাছে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।
এবং তাদের গাত্রচর্ম বার্ধক্যের অনুরূপ ঝুলে পড়েছে।
সেই ত একমাত্র ব্যক্তি যার চাহিদা আছে; সেজন্যই সরে থাকে
বনি কাবের পুরুষরা, যারা তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

এ কবিতারই ভর্ৎসনার অন্য একটি অংশ;

হে বালক। তুমি কি দম্ভোক্তি করতে চাও, তাহলে আমি এতে অগ্রণী
কেননা আমার আছে স্তুতির মহাবান্ধন এবং তার ব্যাপক দৃঢ়তা।
হ্যাঁ, আমার সেই মর্যাদা, যা দিয়ে আমি প্রতিটি দলকে বিমুখ করি;
আর সেই তরবারী, যার আঘাত থেকে শত্রু সর্বদা পলায়ন করে।
পাত্রীরা যদি আমাদের কাছে সম্পদের প্রাচুর্য প্রার্থনা করে।
তাহলে আমরা বর্শার ফলকে তাদেরকে লুণ্ঠিত দ্রব্য এনে দেই।
তাদের যৌতুক হিসেবে তারপর আসে ক্ষীণকটি চপল অশ্ব
নীলাভ তার গাত্রবর্ণ এবং বিষাক্ত সাপের জিহ্বা অপেক্ষা দ্রুতগামী।
হে জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণ! আমরা অপমানে কখনও সন্তুষ্ট নই; কেননা
আমাদের বাহনগুলো সর্বদাই বন্দীদেরকে বহন করে আনে।
সকলেই জানে যে, মৃত্যু অচিরেই তাদেরকে গ্রাস করবে এবং
সন্দেহ নেই, এ পৃথিবী অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল।

অন্যত্র হাওদায় ভ্রমণকারীদের প্রশংসায়—

আমরা মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে গেলাম, শত্রুর ভয় আমাদের ছিল না;
এমন সীমাহীন প্রান্তর, যেখানে আশঙ্কা সর্বদাই বিরাজমান।
শিবলিকে বলে দাও যে, সেখানে চক্ষু পরিচিত দৃশ্যই অবলোকন করে;
বন্যপাভী তারই অনুরক্ত হয়ে ওঠে, যে তাকে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম।
তুমি দেখতে পাবে তার অধিবাসীরা প্রাতঃকালেই তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে;
এমন প্রতিটি দুগ্ধবতীপূর্ণ হাওদা, যার দ্বার কখনও রুদ্ধ করা হয় না;
তাতে প্রতিদিন নিহত হয়, এমন লোকের চিহ্নাদি দেখতে পাওয়া যায়
এবং একান্ত উচ্ছৃঙ্খল কামুকের পক্ষেও তাদেরকে চুম্বন করা সম্ভব নয়।

তাদের কবিতায় বিচক্ষণ প্রবচনের দৃষ্টান্ত—

অসম্ভবের অনুসন্ধান তোমার জন্য নির্বুদ্ধিতার নামান্তর এবং
যে তোমাকে নিরাশ করে, তাকে নিরাশ করা একান্তই যথার্থ।
যদি দেখ কোন জাতি তোমার সামনে তাদের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে;
বাহনের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আল্লাহ্ তোমার জন্য অন্য দ্বার খুলে দিবেন।

শিবলির রচনার উদাহরণ; তাতে তিনি 'কাব' গোত্রকে 'বুরজম'-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

বুরজমের সন্তান-সন্ততি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের বিরুদ্ধে
সমস্ত পৃথিবী বিপ্লব-বিদ্রোহের অভিযোগ করে ফিরছে।

---

৪৭০. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

www.amarboi.org

নিম্নের কবিতাটি খালেদের রচনা। ইনি আল মোহেদ নেতা আবু মুহম্মদ ইবনে তাফরাজিনের সাথে তার গোত্রের সখ্যতার জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করছেন। উক্ত নেতা তিউনিসে সুলতান আবু ইসহাক ইবনে সুলতান আবু ইয়াহিয়ার দ্বাররক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং এ ঘটনা আমাদের নিকটবর্তী সময়েই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উদার হৃদয় বীর যুবক খালেদ সম্পূর্ণ অবগতির সাথে বলছে,
যেমন একজন যথার্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে এবং যা বলে সত্যই বলে।
একজন সাধুসন্তের মত বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য এবং তাতে
কোন প্রকার দ্বিধা নেই ও আহত ব্যক্তির সমালোচনারও কিছু নেই।
আমি একটি বিচক্ষণ ধারণাকে বহন করছি, কোন প্রকার উদ্দেশ্য
সাধনের জন্য নয়; এমন কি তাতে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনাও
তিরোহিত।
তা গুপ্তভাণ্ডারের মত আমার অন্তরেই ছিল; আহা, কী উত্তম-ই না ছিল।
কিন্তু যে-কোন চিন্তার ভাণ্ডারই হোক না কেন, তা এক সময়ে প্রকাশ পায়।
আমি যখন তার প্রকাশের জন্য মুখ খুলে দিয়েছি এবং এমন বিষয়াদি
বলছি,
যা আমাদের গোত্রের আত্মীয়-স্বজনেরা এক সময়ে বাস্তবায়িত করেছে।
বনি কাব আমাদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী
এবং তারা আমাদের জ্ঞাতি ভাই-ভগ্নি যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে।
এ দেশ বিজিত হওয়ার পর আমরা তাদের অনেকের প্রতি যথার্থই
বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছি এবং সৎপ্রতিবেশী করে নিয়েছি।
তাদের অনেককে তাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছি,
এবং তারা সকলেই জানে যে, আমি যা বলছি, তা সত্য।
তাদের অনেকেই আমাদের নানাবিধ আধিপত্যের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত
হয়েছিল অধীরভাবে; অথচ হৃদয়ের মধ্যে ছিল আমাদের লিখিত অঙ্গীকার।
তাদের অনেকেই আহত অবস্থায় এসেছে, আমাদের উদার হৃদয় তাদের
ক্ষত আরোগ্য করেছে এবং অভ্যাগতকে দিয়েছে দর্শনীয় উপঢৌকন।
তাদের অনেকেই আমাদের প্রতি বিদ্বেষসহকারে দৃষ্টিপাত করেছে।
আমরা তাদের দুর্ব্যবহারে আমাদের মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা জন্মেছিল, তাও শেষ
হয়েছে বহুবার এবং অনেক বারই তা ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।
তাদের অনেকেই কোন এক যোগ্য ব্যক্তির কর্মচারীদের সম্পর্কে অভিযোগ
তুলেছিল যে, তারা দরবারে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের দ্বার রুদ্ধ করেছে।
আমরা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে রক্ষা করেছি, তাদের প্রবেশ অবারিত হয়েছে
এবং 'বালেকী' ও 'দিয়াবের' পোষ্যের মতের বিরুদ্ধেই তা ঘটেছে।
আমরা সর্বদাই দুর্যোগ এড়িয়ে তাদের উন্নতি কামনা করেছি;
আমরা তাদেরকে দুষ্কর্মের মধ্যে জড়াতে কোন অন্তরালের প্রশ্রয় দেই নি।
আমরা আমাদের স্বদেশ 'তরশিশে'র সামগ্রিক আধিপত্য লাভ করেছি।
তখনই, যখন তার জন্য আমাদের দ্রুতগামী অশ্ব ও স্বীয় শির ন্যস্ত করেছি।
আমরা তেমন সম্পদেই আধিপত্য পেয়েছি, যা আয়ত্তের বাইরে ছিল;
এমন একজন শাসকের অধীনে, যিনি অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত
ছিলেন।

www.amarboi.org

আমাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের নেতৃত্বসুলভ প্রতিরোধেই এটি সম্ভব হয়েছে;
বনি কাব; যাদের মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতা সমভাবে বিদ্যমান।
আমরা তাদেরকে প্রতিটি সংঘবদ্ধ শত্রুতা থেকে রক্ষা করেছি এবং
সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতায় আমরা তাদের সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছি।
ফলে তাদের মধ্যে যারা একটি ছাগলছানারও সামর্থ্য রাখত না,
তারাও সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হয়ে প্রাচুর্য লাভ করেছে।
তারা মূল্যবান দাসদাসীদের স্কন্ধে আরোহণ করে বেড়াচ্ছে এবং
বিচিত্র ধরনের রেশমি পোশাক পরিধান করে তারা ঘুরছে।
তারা বহুবিধ পশুসম্পদ এমন অবলীলায় ক্রয় করে নিচ্ছে,
যা দুর্মূল্যের জন্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে।
তারা বিচিত্র ধরনের এমন সব প্রয়োজনীয় পশু অর্জন করেছে,
যা একমাত্র দীর্ঘ সময়ের অবকাশেই একত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।
ফলে তারা প্রাচীনকালের বারমেকীদের সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে
কিংবা দিয়েবের শাসন-আমলে বিখ্যাত হেলালের সমমর্যাদাবান।
বস্তুত তারা সর্বপ্রকার বিপদে আমাদের বর্মস্বরূপ ছিল,
যতদিন না শত্রুর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বিস্তার করল।
তারা অন্ধকারের আড়ালে গৃহত্যাগ করল; কিন্তু ভয় করল না
ভর্ৎসনা—অথচ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহ কখনও ভর্ৎসনার অধীন নয়।
তারা স্বগোত্রকে পশুচর্মের আচ্ছাদনে আবৃত করে রাখল;
অথচ তারা যদি বুঝত, তাহলে নিজেরাও কুৎসিত কাপড় পড়ত।
অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে সংকীর্ণমনাও আছে, যে সংবাদ আয়ত্ত করতে পারেনি
এবং তার বুদ্ধি যদি বিনষ্ট না হয়ে থাকে, তবে আমার বুদ্ধিমত্তাই ত্রুটিপূর্ণ বলতে হবে।
সে আমাদের সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যা আমাদের মধ্যে নেই;
অথচ সে আশা করে যে, তার ক্ষমার বিচিত্র পথ বের হয়ে আসুক!
সে নিজে ভ্রান্ত এবং তার সাথে অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণায় যারা জড়িত, সকলেই
এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যারা অসৎ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই দোষী।
অহো, সেই বীর যুবক আবু মুহম্মদের মৃত্যুতে আমার সান্ত্বনা লাভের উপায় কী!
যে হাজার হাজার মুদ্রা কোন প্রকার গণনা ছাড়াই দান করে দিত।
তার তিরোধানে তার সেই সব কর্মচারী ব্যথিত হয়েছে, যারা তার
আগমনকে সজীবতার নিদর্শনবাহী মেঘমালার আগমন তুল্য মনে করত।
তারা সেই মেঘের ছায়ায় যেসব রাজপথের অনুসন্ধান করেছিল;
এখন তাদের সেই আশার সব কিছুই মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে।
সে যখন দান করত, তখন বুঝতে পারত কতটুকু দিলে যোগ্য হবে;
এমনকি সে যখন অল্প দান করত, তাও যোগ্যতানুসারে সঠিক হত।
আমরা তার ব্যাপারে আর কী সান্ত্বনার আশা পোষণ করতে পারি;
যখন সে নিজেই ধ্বংসের শরাঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে।
'তারতিশ' তার প্রশস্ত ভূ-পরিবেশসহ কেমন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে
এবং তার উপর ছিন্নভিন্ন মেঘমালাসহ সূর্যাস্ত এসে দেখা দিয়েছে।

www.amarboi.org

অচিরেই তার স্মৃতি এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে যাচ্ছে;
এখানে শুধু তার পানপাত্র, আসবাবপত্র ও সৌধাবলিই দৃশ্যমান থাকবে।[৪৭১]
আয়তলোচনা সুন্দরীগণ তাদের তন্বী দেহবল্লরী নিয়ে
ক্রমশ আবরণ আর আচ্ছাদনের অন্তরালে সরে যাচ্ছে।
তারা ভ্রূভঙ্গি করলে সেও করত এবং তাদের লাস্যে সে-ও হেসে উঠত;
সবই ছিল 'কানুন' আর 'রবাবে'র সমধুর সুর লহরীর দ্বারা মুখরিত।
তারা তাকে বিভ্রান্ত করেছে, কারণ সে তার নিশ্চয়তা বিরহিত ছিল;
অথচ এ সত্ত্বে সে কখনও চিরকালের যুবকের মত আচরণ করেছে।
সে তাদের সাহচর্যেই আনন্দিত জীবনযাপন করেছে; তার আদেশ মান্য হয়েছে
এবং তার উত্তম খাদ্য ও উত্তম পানীয়ের কোন অভাব হয়নি।
কিন্তু ইবনে তাফরাজিনের জন্য সেই অতীত আর ফিরে আসবে না;
বরং সেই প্রেমপ্রীতির পরিবর্তে সে নিরেট মৃত্যুর সুধা পান করেছে।
যদিও তার বুদ্ধিমত্তা ছিল অপরিমেয় ও বিচক্ষণতা ছিল অতুলনীয়,
তবুও সবকিছু সহ-ই সে গহণ গভীর সাগরের তলদেশে ডুবে গিয়েছে।
অভূতপূর্ব কোন কিছুর জন্য উদ্যোগী কর্মীপুরুষের প্রয়োজন।
তেমন মহান পরুষ, যাদের সাহচর্যে মানুষ সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে।
যাদের সংস্পর্শে আমাদের বাজারের পণ্য আবার তেজী হয়ে দাঁড়াবে
এবং সন্নিবদ্ধ বর্শার ফলাগুলো আবার রক্তে লাল বর্ণ ধারণ করবে।
ফলে আমাদের আধিপত্যের উপর হস্তক্ষেপে ইচ্ছুক যুবকরা অনুতপ্ত
হয়ে ফিরবে এবং তারা কখনই তার উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে না।
ওহে রুটি ভক্ষণকারী! যারা তার ব্যঞ্জনকে সুসমঞ্জস করতে চায়
তারা মহাভুল করেছে—বিষের সাথে সুখাদ্য মিশ্রিত করে ফেলেছে।

আলী ইবনে উমর ইবনে ইব্রাহিমের কবিতার একটি উদাহরণ। ইনি বর্তমানকালে 'যুগাবা' গোত্রের শাখা বনি আমেরের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। এ কবিতায় ইনি সংশ্লিষ্ট গোত্রের নেতৃত্বলাভে প্রয়াসী তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণকে ভর্ৎসনা করেছেন।

কারুকার্যমণ্ডিত মোতির ন্যায় কোন শিল্পীর হাতে,
যখন রেশমি সুতার তা সুবিন্যস্ত হতে থাকে।
আমি প্রকাশ করছি অতীত ঘটনাবলির কার্যকারণ,
যখন বিচ্ছেদ তার সাফল্যের জন্য হাওদাবাহী উটের সারি হয়েছিল।
এর ফলে একটি গোত্র দুটি শাখা গোত্রে পরিণত হল এবং বিক্ষিপ্ত
হল তার লাঠি; তার জন্য কোন নির্দেশকারীর সাক্ষাতও আমরা পাইনি।
কিন্তু আমার হৃদয় সেই বিচ্ছেদের বিশেষ দিনটিতে তাদের জন্য
সুতীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাতে অনুক্ষণ জর্জরিত হয়েছে।
কিংবা তার মধ্য থেকে সেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে, যা কর্মকারের
হাতের বাঁকা হাতুড়ি-নেহাই সৃষ্টি করে থাকে।
কিংবা সেই হৃদয় এমন এক সূত্রধরের হাতে পতিত হয়েছে,
যে বোকার মতো করাতের আঘাতে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করছে।
যখন আমি বললাম, চল, আমরা বিচ্ছেদের দুর্ভাগ্য সহ্য করি, তখন
কেউ আমাকে প্রদক্ষিণ করে উচ্চস্বরে বিদায়ের কথা ঘোষণা করল।

---

৪৭১. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

www.amarboi.org

হে আবাসভূমি, যা গতকালও জনবসতিতে পরিপূর্ণ ছিল;
গোত্রের মানুষ ও তাদের সঙ্গী-সাথী এবং দাসদাসীরাও ছিল।
তারা খেলার জন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে বাহনাদি ছুটাত এবং
রাতের অন্ধকারে তাদের অনেকের জাগরণ ও অনেকের নিদ্রায় কাটত।
পশুপাল, তাদের একত্র হওয়ার সময় দর্শকদের চক্ষু বিস্ফারিত হত;
যখন তারা সমতলভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ঘরে ফিরত।
অসংখ্য কাক, সেখানকার বৃক্ষের ডালে বসে কা কা করে ডাকত এবং
উন্মুক্ত পশুপালের সাথে বন্য গাভী ও উটপাখি এসে জুটত।
আজ সেখানে পেচকের ক্লান্ত স্বর ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না;
তারাই পরিত্যক্ত তাঁবুর স্থানগুলো ও পাহাড়ি টিলায় ঘুরে বেড়ায়।
আমরা সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম;
অথচ আমাদের দৃষ্টি সংকুচিত এবং অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল।
কিন্তু তার কাছ থেকে আমার হৃদয় এক উদাস অনুভূতি ছাড়া কিছুই পায়নি
এবং বিচিত্র কার্যকারণে আমার অসুস্থতাই বাড়ছিল; যদিও জানি তা কল্পনা মাত্র।
এরপর তুমি মনসুর আবু আলীর কাছে শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও;
বস্তুত তার জন্য শুভেচ্ছার পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন যোগ্যতার।
বল তাকে, হে আবুল ওয়াফা! তোমাদের দুর্মতির কারণ কী!
তোমরা যে গভীর সাগরের তলদেশেই অন্ধকারে প্রবেশ করছে।
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সেই সাগর, লাঠির দ্বারা তার গভীরতা মাপা যায় না;
তা সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চল সমভাবে প্লাবিত করে দেয়।
কোন প্রকার অনুমানের দ্বারাই তুমি তাতে পথের দিশা খুঁজে পাবে না;
জোয়ারে স্ফীত সাগর কি সাঁতরিয়ে পার হওয়া যায়!
তারা তাতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে তোমাদের ধ্বংস কামনা করছে;
কতকগুলো বুদ্ধিহীন দুশ্চরিত্র মানুষ মাত্র।
হায়, দুর্ভাগ্য। তারা পথভ্রষ্টতার স্কন্ধে আরোহণ করেছে, অস্থির চঞ্চল
এবং তাদের এ পার্থিব ঐশ্বর্যেরও কোন স্থিরতা নেই।
তাদের এ দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা, তুমি দেখবে তাদের ধারণারই অনুরূপ;
যেন প্রান্তরের মরীচিকার প্রলোভন, যার কোন অন্ত নেই।
বর্শার ফলায় তারা উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে চায়;
অথচ তা এমন এক স্থান, যার যোগ্যতা তাদের নেই।
মহান নবী, পবিত্র গৃহ ও তার উন্নত শীর্ষ স্তম্ভগুলোর শপথ,
যুগে যুগে প্রতি বছর যার চতুর্দিকে দর্শনার্থী এসে ভীড় জমায়;
যদি আমার জীবনকাল বিস্তৃত হয়, তাহলে এমন রাত আসবে;
যে সময় অতিশয় তিক্ত স্বাদের মদ আস্বাদন করতে বাধ্য হবে।
সেই রাতকে বাস্তবায়িত করতে প্রান্তরীয় জীবন একাগ্র হয়ে উঠবে
এবং প্রতিটি সংকীর্ণ পথ মুখরিত করে তরবারী ঝংকৃত হবে।
প্রতিটি অশ্ব, যা বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি, ধাবিত হবে এবং
তার পৃষ্ঠদেশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন যুবককে বহন করবে।
প্রতিটি ধূসর বর্ণের অশ্ব, তার দন্তপাটি উন্মীলিত করে
লাগামের প্রান্তকে মাড়াতে থাকে—ধাবিত হবে।

www.amarboi.org

এ বন্ধ্যা ভূমি কিছু কালের জন্য আমাদের সংস্পর্শে গর্ভিণী হবে।
অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ি পথ দিয়ে আমাদেরকে প্রসব করবে।
বীর যোদ্ধাবৃন্দ, সুঠামদেহী উষ্ট্রদল ও অগণিত বর্শাফলক
এবং শত্রুর অবস্থান বিচলিত করে প্রধাবিত হতে থাকবে।
তুমি কি আমাকে হিংসা কর; অথচ আমিই তাদেরকে পরিচালিত করব
আমার তীক্ষ্ণধার বর্শাই যুদ্ধের পতাকারূপে ব্যবহৃত হবে।
আমরা মিলনোন্মুখ দন্তপাটির ন্যায় আক্রমণে তোমাদেরকে উৎপাটিত
করব এবং তোমাদের পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করতে তোমরা বাধ্য হবে।
কখন সেই দুর্ভিক্ষের দিন, হে আমীর আবু আলী?
যে দিন এমন শিকারীদের সাক্ষাৎ ঘটবে, যারা মাংসের অপেক্ষা করে আছে।
অনুরূপ আবু হাম্মুও অতি সহজেই একটি দুর্বল অশ্ব ক্রয় করেছে
এবং উন্নতমানের উত্তম অশ্বগুলোকে অবলীলাক্রমে যেতে দিয়েছে।
এমন ব্যক্তিবর্গকে ত্যাগ করেছে, যাদের প্রতিবেশী নিরাপদ ছিল
এবং যারা শত্রুর ভয়ে কখনও দুর্বল হয়ে পড়েনি।
তারা বিপদের দিনে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি;
অথচ তারা এখন চিরদিনের জন্য তার নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন।
কত না পূর্বরক্তের প্রতিশোধকামী বেদুইনদের প্রতি ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করেছে;
এ সমতল প্রান্তর ও পাহাড়ি অঞ্চলের মাঝখানে।
কোন সেই যুবক, যে আমাদের এ দিনে সমতল প্রান্তর অতিক্রম করবে
এবং আমাদের এ ভূমিতে হাওদাবাহী কাফেলার ডুরি হাতে নিবে?
অথচ এক সময় তারা এ ভূমির জন্য প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করে
এনেছে; তারা ছিল প্রশংসার দোসর ও বিপদে বর্মস্বরূপ।
যখন রাজন্যবর্গ তাকে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়ন করতে এসেছে,
তখন তার প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে ও তাতে ন্যস্ত রয়েছে।
এক বিচক্ষণ জিহ্বা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ শান্তি কামনা করছে,
যতদিন ঘুঘু সুরলহরী তুলবে এবং কবুতর কান্নায় বিগলিত হবে।

হাওরানের প্রান্তবর্তী আরব 'নিমর'দের কবিতার উদাহরণ। এটি তত্রস্থ এক মহিলা কবির রচনা। তার স্বামী নিহত হলে তাদের বন্ধুস্থানীয় গোত্র 'কায়সে'র কাছে স্বামীর রক্তের মূল্য আদায়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ এ কবিতাটি তিনি রচনা করেন।

গোত্রের এক বীরাঙ্গনা উম্মে সালমা বলছে, এমন এক
প্রিয়জনের কথা তার জন্য যারা শোক প্রকাশ করেনি আল্লাহ্ তাদেরকে
ভীত করুন।
সে সমস্ত রাত জাগরণে কাটায়, দুই চোখে তন্দ্রায় ঘোর আসে না;
তার পার্শ্ব পরিবর্তনের মধ্যে দুর্ভাগ্যের বেদনাই প্রশ্বসিত হয়ে ওঠে।
এটি তারই ফলশ্রুতি, যা তার গৃহে ও পরিবারে সংঘটিত হয়েছে
এবং এক মুহূর্তের ব্যবধানে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।
হে কায়েস! তোমাদের সকলেই শিহাবুদ্দিনকে হারিয়েছ এবং
তার রক্তমূল্য আদায় করতেও তোমরা নিরুদ্বেগ, যা তোমাদের চুক্তি ছিল।
আমি বললাম, যখন তারা আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পত্র দিল;
উদ্দেশ্য তা দিয়ে তারা আমার অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করবে—

www.amarboi.org

'কী লজ্জা। তারা তাদের বাবরী ও দাড়িতে চিরুণী ব্যবহারে নিরত,
অথচ গৌরদেহী তন্বী তরুণীদের সৌন্দর্য সংরক্ষণে তারা উদাসীন।'[৪৭২]

আন্দালুসের 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা

আন্দালুসবাসীদের মধ্যে যখন কাব্যচর্চা বৃদ্ধি পেল, তখন তার আঙ্গিক ও বিষয় বৈচিত্র্যেও পরিমার্জনা এসে উপস্থিত হল এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি চরম সীমায় উপনীত হল। উত্তরসূরিগণ এ বিষয়ে এমন এক আঙ্গিকের আবিষ্কার করলেন, যাকে তারা 'মুয়াশ্যিহা' বলে অভিহিত করেন। তারা কবিতাকে স্তবকে স্তবকে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ করে বিন্যস্ত করলেন। এতে যেমন স্তবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তেমনি বিভিন্ন ছন্দের বৈচিত্র্যও ব্যবহার করা হল। তারা এরূপ একটি গুচ্ছকে 'বয়েত' বলে আখ্যায়িত করেন এবং এমন গুচ্ছের অন্তর্গত পঙ্ক্তিগুলোতে পর্যায়ক্রমে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের মাত্রা ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করেন। একটি কবিতা এমন সাতটি গুচ্ছ বা স্তবকের অতিরিক্ত হয়

---

৪৭২. রোজেনথালের অনুবাদে এর পর আরও একটি কাব্যাংশ বিদ্যমান; সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি। মিশরের যুজাম বেদুইনদের একটি গোত্রে 'হলুবা'র জনৈক কবির একটি রচনা :

এভাবে 'রুদিয়ানী বলেছে এবং রুদিয়ানী সত্যই বলে থাকে;
তার কবিতা সুরচিত সুবিন্যস্ত ও একান্তই মৌলিক।
কে তুমি একটি উটনীর উপর চড়ে আসছ—
সেই উটনী, যা প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সুডৌল দেহের অধিকারিণী;
সে এমন এক যুবককে বহন করে; যে শ্রম ছাড়া নিদ্রায় কাতর হয় না;
সেই মহা বিচক্ষণ গুণবানের শপথ! একমাত্র সেই বুঝতে পারে এর স্বরূপ।
তুমি যদি 'হলুয়া' নামীয় সেই গোত্র থেকে এসে থাক,
যারা যুদ্ধের ময়দানে সর্বদাই চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করে
এবং বনি মনজুরের আমার স্বগোত্রীয়দের কাছ থেকে—যাদের সান্নিধ্য স্থায়ী।
তারা মানবজাতির প্রতিনিধি, দুর্বলের আশ্রয় ও দুর্ধর্ষ।
আমি বনি রাদ্দাকের কাছ থেকে আমার সমুদয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি;
আমার প্রভু যেন তাদেরকে সর্বপ্রকার পতন হতে রক্ষা করেন।
আমি তোমাকে বলেছি, কাফেলার সাথে বিভ্রান্তির সংবাদ এসেছে।
এক চরম অনৈক্য ও দ্বিধা বিভক্তির সেই সংবাদ।
আমি একা কী করে এ উৎপীড়ন সহ্য করি; অথচ তোমরা দলবদ্ধ
দীর্ঘ কেশরবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করে এসেছ।
আমি প্রার্থনা করি তোমাদের সকলের সুমতি হোক;
যদিও এর সংসাধনে তোমাদের জীবন ও সম্পদ ব্যয়িত হয়।
আমার পক্ষে সহায়ক উবায়েদ ইবনে মালীকের ন্যায় নেতা বিদ্যমান;
যিনি সম্ভ্রান্ত কুল-গৌরব ও নেতৃত্বের মর্যাদায় সমাসীন।
আমি তার মধ্যে এক প্রকৃত বন্ধু ও মুসলমানদের নেতাকে পেয়েছি;
অথচ আমার স্বগোত্রই আমাকে নানান বিপাকে ফেলেছে।

সেখানে এ ধরনের বহু কবিতা বিদ্যমান। এগুলো আরব বেদুইনের মধ্যে বহুল প্রচলিত। অনেকগুলো গোত্রই এমন কাব্য রচনার ব্যাপৃত। রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এমন কি সমসাময়িক 'রায়া', 'জুগবা' ও 'সুলাইন' গোত্রের নেতৃবৃন্দ এমন কবিতা রচনার আগ্রহী। অবশ্য এমন অনেকেই আছেন যারা এমন কাব্যচর্চাকে হেয় বলে মনে করেন; যেমন আমরা কাব্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে এর কারণ বর্ণনা করেছি।

www.amarboi.org

না। প্রতিটি স্তবকের পঙ্ক্তি সংখ্যাও বিষয় ও আঙ্গিকের প্রয়োজন অনুসারে সন্নিবেশিত হয় এবং আরবি 'কসিদা' বা দীর্ঘ কবিতার ন্যায় তাতেও তারা প্রণয়-স্মৃতি ও স্তুতির বিষয়বস্তু আলোচনা করেন।

আন্দালুসবাসীরা উক্ত প্রকার কবিতা রচনায় চরম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক এগুলোকে গ্রহণ করেছে। বিদ্বজ্জন ও সাধারণ নির্বিশেষে সকলেই এ কবিতায় সহজগ্রাহ্যতা ও সহজবোধ্যতার জন্য এর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। আন্দালুস উপদ্বীপে যিনি সর্বপ্রথম এ কবিতার প্রচলন ঘটান, তিনি হলেন মুকাদ্দম ইবনে মুআফির আল-কিবাররী। ইনি আমীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ আলী-মরোয়ানীর শাসন আমলের কবিদের অন্যতম। তাঁর কাছ থেকে 'কিতাবুল ইকদ' রচয়িতা আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ ইবনে আবদে রাব্বিহি এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখিত না হওয়ায় তাঁদের মুয়াশ্যিহা কবিতাগুলো বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়।

অতঃপর তাঁদের পরবর্তী পর্যায়ে যিনি এ কবিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তিনি হলেন আব্বাদা-আল-কাজ্জাজ।[৪৭৩] ইনি আল-মারিয়ার শাসক আল-মুতাসিম ইবনে সুমাদিহের আশ্রিত কবি ছিলেন। আলাম-আল বাতলিউসী[৪৭৪] বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু বকর ইবনে যুহায়রকে[৪৭৫] বলতে শুনেছেন—সব প্রকার মুয়াশ্যিহা রচনাকারী আব্বাদা আল-কাজ্জাজের কাছে ঋণী; তিনিই বলতে পেরেছেন—

পূর্ণিমা চন্দ্র—মধ্যাহ্ন সূর্য—পাহাড়ি কুঞ্জ—কস্তুরীগন্ধ;
আহা কী পূর্ণ—প্রসিত প্রোজ্জ্বল—পত্র শোভিত—মধুর আনন্দ!
নাহিক দ্বন্দ্ব—দর্শনার্থী—প্রীতি আসক্ত—লুপ্ত ছন্দ!!

তাদের ধারণা, ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে তৎকালীন মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে কেউই আব্বাদাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বরং তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের কবিরা অগ্রসর হয়েছে। তাদের মধ্যে ইবনে আরফা[৪৭৬] উল্লেখযোগ্য; ইনি টলেডোর শাসন আল মামুন ইবনে যুননূন-এর আশ্রিত কবিদের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাদের ধারণা, ইনি তার রচিত মুয়াশ্যিহার প্রারম্ভে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেছেন—

সারঙ্গী বাজছে—অপূর্ব সুস্বর—বইছে ঝর্ণা—পূর্ণ উদ্যান।

এবং এ কবিতার শেষে, যেখানে তিনি বলেছেন—

সাহসী হও, আত্মসমর্পণ করিও না; সম্ভবত তাহলেই তুমি মামুন।
ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে শত্রু সেনাদলকে

—ইয়াহিয়া ইবনে যুননূন।

---

৪৭৩. জীবনকাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী।
৪৭৪. আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে কাশেম; মৃত্যু ৬৪২—৪৬ (১২৪৪—৪৮ খ্রি:) হি:।
৪৭৫. মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালিক; মৃত্যু ৫৯৫/৯৬ (১১৯৯/১২০০ খ্রি:) হি:।
৪৭৬. ইবনে আরফাশা (?)।

www.amarboi.org

অতঃপর আবৃত বেদুইন মিনহাজাদের শাসন আমলে মুয়াশ্যিহা কবিতা রচনায় একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রচেষ্টায় অভিনবত্ব দেখা দেয়। উক্ত গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন আলআমা তালিতুলী।[৪৭৭] এরপর ইয়াহিয়া ইবনে বকীর[৪৭৮] নাম করা যায়। তালিতুলীর সুমার্জিত মুয়াশ্যিহার মধ্যে একটি এই—

কী করে আমি ধৈর্যধারণ করি; পথের নিদর্শন আকুল করে তোলে;
কাফেলা প্রান্তরের মধ্য ভাগে এবং সাধ্বী ও তন্বীদের সাহচর্য বিচ্যুত।

উস্তাদদের মধ্যে অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, আন্দালুসের অনুরূপ কবিতাপ্রিয় লোকেরা বলে থাকে—একবার একদল মুয়াশ্যিহা রচনাকারী কবি শেভিলায় একত্র হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের রচিত ও শিল্পগুণ সমন্বিত মুয়াশ্যিহা ছিল। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলআমা তালিতুলী এগিয়ে এলেন এবং তার বিখ্যাত মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন—

হাস্যে বিকশিত মোতি মুখচন্দ্রিমা পূর্ণজ্যোতি
সময় সঙ্কট অতি হৃদয় বিহ্বল মতি।

এটি শোনামাত্রই ইবনে বকী তাঁর মুয়াশ্যিহাটি পুড়িয়ে ফেললেন এবং অন্যান্য কবিরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। আলাম আল বাতলিউসী বর্ণনা করছেন যে, তিনি ইবনে যুহরকে বলতে শুনেছেন, আমি কখনও কোন মুয়াশ্যিহা রচয়িতাকে হিংসা করিনি; কেবলমাত্র ইবনে বকীকেই তার এ উক্তির জন্য হিংসা করেছি :

তুমি কি আহমদকে দেখ না, কী অতুলনীয় গৌরবে সে অধিষ্ঠিত;
মাগরিব তাকে এ সমুন্নতি দিয়েছে। হে পূর্বাঞ্চল, তার ন্যায় একজন দেখাও।

উক্ত দুই কবির সমসাময়িককালে মুয়াশ্যিহার স্বভাব-কবিদের মধ্যে আবু বকর আল-আবিয়ায এবং প্রখ্যাত সুরস্রষ্টা হাকিম আবুবকর ইবনে বাজাও[৪৭৯] তাদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সারাগোসার অধিপতি ইবনে তিফলুইত-এর দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর গায়িকাদের কেউ তাঁর রচিত সেই মুয়াশ্যিহাটি গেয়েছিল, যার প্রারম্ভ নিম্নরূপ—

বস্ত্রাঞ্চল যতদূরই বিস্তৃত হোক—
কৃতজ্ঞতার সাথে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাই যুক্ত হবে।

প্রশংসিত ইবনে তিফলুইত এটি শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং যখন কবি এটি এই বলে শেষ করলেন—

আল্লাহ্ বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করুন
মহান আমীর আবু বকরের জন্য।

তখন তাঁর কানে এটি প্রবেশ করা মাত্রই চিৎকার করে বলে উঠলেন, আহ্ কী আনন্দ! তিনি তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন এবং কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করে

৪৭৭. মৃত্যু ৫২০ (১১২৬ খ্রি:) হি:।
৪৭৮. মৃত্যু ৫৪০ (১১৪৫ খ্রি:) হি:।
৪৭৯. ষষ্ঠ অধ্যায় দ্র:।

www.amarboi.org

বললেন যে, ইবনে বাজা একমাত্র স্বর্ণের উপর দিয়ে তাঁর ঘরে ফিরবেন। কিন্তু হাকিম ইবনে বাজা এ শপথের অশুভ পরিণাম চিন্তা করে কৌশল অবলম্বন করলেন এবং তাঁর জুতার নিচে স্বর্ণ স্থাপিত করে তিনি পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরে গেলেন।

আবুল খাত্তাব ইবনে যহর[৪৮০] বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর ইবনে যুহরের দরবারে আবু বকর আল আবিয়ায নামক পূর্বোক্ত কবির কথা আলোচিত হচ্ছিল; উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন তার সম্পর্কে বিরূপ কী করে বিরূপতা দেখানো যায়, যিনি বলেছেন—

মদ্যপানে আমি স্বাদ পাই না — 'আকাহ্' ফুলের উদ্যানে বসেও—
যদি না কোন তন্বী কোমলাঙ্গী — আনত হয় প্রাতঃকালে;
অথবা অপরাহ্ন বেলায় — এবং বলতে থাকে,
সান্ধ্য পানের কী হল — আমার গণ্ডে চপেটাঘাত?
আহ্ উত্তরে বাতাস কেন — বইছে আনত করে
পরিপূর্ণ পল্লব শাখা — আমার উত্তরীয় আবৃত করতে?
এতে হৃদয় বিগলিত — গমনে আনে বিভ্রান্তি,
হায় কটাক্ষ, পাপ শুধু পাপ — হায় বিম্বোষ্ঠ, হায় দন্তপাঁতি!
মোচন করছে তৃষ্ণা — জর্জরিত এ প্রেমিকের
পারে না যে ভঙ্গ করতে — প্রেমের সেই অঙ্গীকার;
সর্বদাই যে প্রিয়জন — সর্বাবস্থায় কামনা করে
প্রিয়ার উষ্ণ সান্নিধ্যে, — অথচ সে দূরাধিগম্য!

তাঁদের পরে আল মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মুহম্মদ ইবনে আবুল ফজল ইবনে শরফ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল হাসান ইবনে দুয়াইরিদা[৪৮১] বলেছেন, আমি হাতেম ইবনে সায়িদ[৪৮২]কে এভাবে কবিতা আরম্ভ করতে দেখেছি:

সূর্য চন্দ্রের নৈকট্য প্রয়াসী — মদ্য ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

ইবনে হরদোসেরটির এরূপ :

হে মিলন ও আনন্দের রাত, — আল্লাহ্‌র কসম, ফিরে আয়।

ইবনে মওহিলেরটি এরূপ :

ঈদ আসে না সৌখিন সজ্জায় — আতর গোলাবের বাসে;
প্রিয়জনের সাথে মিলনের মধ্যেই — যথার্থ ঈদ আসে।

আবু ইসহাক আর্‌রুন্দিনী[৪৮৩] সম্পর্কে ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি আবুল হাসান সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, রুন্দিনী একদিন ইবনে যুহরের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তার বয়স হয়েছে এবং তিনি প্রান্তরবাসীদের পোশাক পরা ছিলেন। কারণ তখন তিনি 'ইস্তাব' দুর্গে বাস করতেন। ফলে ইবনে যুহর তাঁকে চিনতে পারলেন না।

৪৮০. ইনি সম্ভবত আবু বকর ইবনে দিয়াহ; মৃত্যু ৬৩৩ (১২৩৫ খ্রি:) হি: (?)।
৪৮১. আলমাস ইবনে দুয়াইরদা (?)।
৪৮২. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক।
৪৮৩. আদ্ দুয়াইনী (?)—রোজেনথাল।

www.amarboi.org

তিনি বৈঠকের শেষ প্রান্তে বসে রইলেন। আলোচনা চলবারকালে এক পর্যায়ে তিনি স্বরচিত একটি মুয়াশ্‌শিহা আবৃত্তি করলেন; তাতে ছিল :

আঁধার সুর্মা ঝুলছে ভোরের অক্ষিতারকায় ভোর বেলায়;
নদীর বাহুটি ঘিরে সবুজ সজ্জা জড়িত মাঠ মেলায়।

এটি শুনে ইবনে যুহর বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন, তুমি এটি বলছ? রুদিনী বললেন, বুঝে দেখুন। ইবনে যুহর বললেন, কে তুমি? রুদিনী তাঁর পরিচয় দিলেন। ইবনে যুহর বলে উঠলেন, উঠে দাঁড়ান; আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

ইবনে সায়িদ বলেছেন, এ কবিগোষ্ঠীর সকলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন আবু বকর ইবনে যুহর। তাঁর রচিত মুয়াশ্‌শিহা কবিতা পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র সুপরিচিত। ইবনে সায়িদ বলেন, আমি আবুল হাসান সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, ইবনে যুহরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার কথিত মুয়াশ্‌শিহাগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা অভিনব ও শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপনি কী উত্তর দিবেন? তিনি বললেন, আমি বলব—

এ আসক্ত ব্যক্তিটির কী হল—সে কেন তার নেশা থেকে সচেতন হচ্ছে না?
আর কেমন ধরনের সে নেশাগ্রস্ত—কোন প্রকার মদ্য পান নেই!
এ ব্যথিত লোকটি কিসের আশা করে—সে কি তার গৃহে যেতে চায়?
আবার কি ফিরে আসবে—নদী তীরের আমাদের দিনগুলো
এবং আমাদের রাতগুলো?—অথবা আমরা ভোগ করতে পারব
সুবাসিত মলয়ানিল—'দারিনের[৪৮৪] কস্তুরীর সুগন্ধ!
অথবা এমন কিছু হবে—এ উৎফুল্ল পরিবেশ থেকে
আমরা জীবন লাভ করতে পারব?—একটি উদ্যান ছায়াদানকারী
তার সুন্দর বৃক্ষরাজি—শাখা পল্লবে পরিপূর্ণ
এবং জলস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে
পতিত ফুলের কুঁড়িগুলোকে।

তাঁর পরবর্তীকালে ইবনে হাইউন প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত 'ফজলে' কবিতায় তাঁর উক্তি—

তার শরাঘাত সর্বদাই প্রচণ্ড—সে তা হাতেই নিক্ষেপ করুক কিংবা কটাক্ষ। তিনি তাঁর দীর্ঘ কবিতায় বলেন—

আমার সৃষ্টি লাবণ্যময়, আমার দক্ষতা শর চালনা;
সুতরাং আমি মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হই না
আমি আমার সম্পদ এ দুই চোখ দিয়ে যা করতে পারি,
আমার হাত শর নিক্ষেপ করেও তা করতে সমর্থ হয় না।

তাঁদের সমসাময়িককালে গ্রানাডার আল মুহর ইবনে ফরসও খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে সায়িদ বলেন, ইবনে যুহর তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি শুনবার পর—

৪৮৪. পারস্য উপন্যাসের তীরবর্তী একটি প্রাচীন বন্দরের নাম।

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র কসম! কী আনন্দ উৎফুল্ল ছিল সেই দিন—
'হেমসে'র নদীতে সেই স্রোতধারার উপর ভাসমান;
অতঃপর আমরা সেই খালের মুখে ফিরে এলাম
তখন আমরা বোতলের সুবাসিত ছিপিগুলো খুলছিলাম
সেই চিরকালের পরিষ্কৃত তরল পানীয়ের জন্য এবং
বিকালের উত্তরীয় অন্ধকার নিজ হাতে জড়াচ্ছিল।

তিনি বললেন, আমরা এমন একটি 'উত্তরীয়' কেন খুঁজে পেলাম না। একই শহরে উক্ত মুহরের সাথে মুতরিফ নামে এক কবি বাস করতেন। ইবনে সায়িদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন উক্ত মুহরের কাছে মুতরিফ এসে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালেন। মুতরিফ বললেন, দাঁড়াবার কী প্রয়োজন! ইবনে ফরস বললেন, আমি তাঁর জন্য না দাঁড়িয়ে কি থাকতে পারি; যিনি বলেছেন—

অন্তর ক্ষতবিক্ষত অব্যর্থ শরাঘাতে—বল, অভিভূত না হয়ে কি থাকতে পারি!

অতঃপর ইবনে হযমুন 'মরিসিয়া'তে খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে রায়েস বর্ণনা করেছেন, একদিন, ইয়াহিয়া আল খযরজী ইবনে হযমুনের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিজের রচিত একটি মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করে শুনালেন। উত্তরে ইবনে হযমুন বললেন, কোন মুয়াশ্যিহা রচনাকারী যতক্ষণ কষ্ট-কল্পনা থেকে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ তাকে কবি বলা যায় না। খযরজী বললেন, তার দৃষ্টান্ত কী? তিনি বললেন, আমার এ রচনার ন্যায়—

হে দূর প্রবাসী, তোমার সাথে মিলনের—কি কোন পথ আছে?
অথবা তোমার প্রেমে আক্রান্ত এ হৃদয়ের—কী কোন মুক্তি আছে?

আবুল হাসান সহল ইবনে মালেক গ্রানাডায় প্রসিদ্ধ হন। ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমার পিতা তাঁর কবিতায় চমৎকৃত হতেন;—

পূর্বাশার প্রভাতী প্রবাহ—সমগ্র দিগন্তে সমুদ্রে পরিণত;
ঘুঘুরা পরস্পর ক্রন্দনরত—

তারা কি নিমজ্জনের ভয়ে—পত্রে পল্লবে অশ্রুপাত করেছে?

তখন শেভিলায় আবুল হাসান ইবনে ফজল খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে সায়িদ তাঁর পিতার সূত্র থেকে বলেছেন তিনি সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছেন, হে ইবনে ফজল, মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে তুমি তোমার এ রচনার জন্য গর্ব করতে পার।

হায়, অপেক্ষা সেই সময়ের জন্য, যা চলে গিয়েছে,
চলে গিয়েছে সেই রাত; কামনা বিচ্ছিন্ন ও বিগত হয়েছে।
আমি অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে একাকী পড়ে আছি;
বিক্ষোভের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তাপে রাত পোহাচ্ছে।
আমি চিন্তায় সেই পরিত্যক্ত স্থানগুলোকে আলিঙ্গন করছি
এবং কল্পনায় বিচিত্র নিদর্শনকে চুম্বন করে ফিরছি।

ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি আবু বকর ইবনে আস্‌সাবুনীকে উস্তাদ আবুল হাসান দাব্বাজের[৪৮৫] সামনে বহুবার তাঁর মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করতে শুনেছি। কিন্তু উস্তাদ

৪৮৫. আলী ইবনে জায়েয; ৫৬৬—৬৪৬ (১১৭০—১২৪৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কখনও তার এ কাব্যাংশ ছাড়া অন্যত্র তাঁকে এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি চমৎকার!

বিচ্ছেদকামীর ভালবাসার শপথ-প্রতীক্ষার রাতি প্রভাত হয় না;
জমাটবাঁধা ভোর প্রবাহহীন—আমার রাতও মনে হয় আগামীকালহীন—
সত্য হে রাত তুমি চিরস্থায়ী
অথবা ঈগলের পাখা পিঞ্জরাবদ্ধ—আকাশের তারকা গতিবিহীন।

ইবনে সাবুনীর সুন্দর মুয়াশ্যিহাগুলোর মধ্যে এ উক্তি—

সেই প্রেমাসক্ত পীড়িত ব্যথিত ব্যক্তির অবস্থা কী!
হায়, চিকিৎসক তাকে আরোগ্যের পরিবর্তে রোগগ্রস্ত করেছে।
প্রিয়তম তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ—
ফলে ঘুমও প্রিয়কে ত্যাগ করে তার অনুসরণ করেছে—
ঘুম আমার চোখের পাতা থেকে দূরীভূত; কিন্তু আমি
কাঁদি, তা কেবল স্বপ্নে প্রিয়ার মুখচ্ছবি দর্শনের জন্যই, নিদ্রার জন্য নয়।
আমাকে প্রতারণা করেছে আজকের মিলন
তার সাথে তার ইচ্ছামত; আহা কী বিসদৃশ মিলন!
কিন্তু তার জন্য আমি তাকে ভর্ৎসনা করি না—আমাকে
সে বাস্তবে বা কল্পনায়, যেভাবেই ব্যাহত করুক না।

সমুদ্রতীরবাসীদের মধ্যে ইবনে খলফ আল জায়ায়েরী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত মুয়াশ্যিহায়—

ভোরের হাত নিক্ষেপ করেছে—জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ—ফুলের অগ্নিকটাহে।

এবং ইবনে খরয আল বাজাঈর একটি মুয়াশ্যিহার অংশ—

সুসময়ে দন্তপাটি—তোমাকে সংবর্ধিত করেছে মৃদুহাস্যে।

পরবর্তী ময়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে ইবনে সহলের মুয়াশ্যিহা সুন্দর। ইনি শেভিলা ও পরে সিওটায় কাব্যচর্চা করেন। তাঁর রচনার কিয়দংশ—

'হিমা'র হরিণী কি জানে সে কী আগুন জ্বেলেছে
প্রেমিকের মনে, যেখানে সে তার বাসা বেঁধেছে!
এখন তা আগুন আর আলোড়নে ভরা; যেমন
পূবালী বায়ু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে খেলা করে।

তাঁর ধারা অনুসরণ করে আমাদের সঙ্গী উজির আবু আবুদল্লাহ্ ইবনে আল খতিব মুয়াশ্যিহার বাক্‌বিন্যাস করেছেন। ইতি তাঁর সমসাময়িককালে আন্দালুস ও মাগরিবের কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

বৃষ্টি তার বর্ষণের দ্বারা তোমাকে সঞ্জীবিত করুক—হে আন্দালুসের মিলনকাল!
বস্তুত তোমার সাথে মিলন নিদ্রাকালীন দুঃস্বপ্ন অথবা ব্যস্ত মুহূর্তের দৃষ্টিপাত।

* * * * *

সময় যখন বিচিত্র আশায় আন্দোলিত করে—লেখনির ধারা বিন্যাসে তা আবর্তিত হয়,

www.amarboi.org

একের পর এক দুইয়ের পর দুই দলবদ্ধভাবে—যেমন নির্দিষ্ট সময়ের হজ্জ্বব্রতীদের অগ্রযাত্রা।
বৃষ্টি যেমন উদ্যানকে ঔজ্জ্বল্য দান করে—ফুলের কুঁড়িগুলো তখন হাসতে থাকে।
যেমন নুমান মাউস্‌সামা থেকে বর্ণনা করে—যেমন মালেক আনাস থেকে—
ফলে তা কারুকার্যময় সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়—যার কাছে মহামূল্য ভূষণও লজ্জা পায়।

* * * * *

সেই রাতগুলোতে ভালবাসার রহস্যলীলা—অন্ধকারে আবৃত হত, যদি না মুখে জ্যোতি থাকত;
তাতে পানপাত্ররূপী তারকাপাত ঘটেছে—সরলরেখায় সৌভাগ্যের পরিচয়ে—
এমন এক পরিস্থিতি, যাতে কোন ত্রুটিই ছিল না—শুধু তা চোখের পলকে বিগত হয়েছে।
যখন কিয়দ পরিমাণে তন্দ্রার আমেজ অথবা—যেমন ভোরের আলোর চকিত আভাস—
উল্কার ন্যায় হরণ করেছে অথবা কখনও—নার্গিসের অশ্রু আমাদের উপর পতিত হয়েছে।

* * * * *

দুশ্চিন্তামুক্ত কোন ব্যক্তির কী এমন প্রয়োজন—যাতে উদ্যানের শোভা তার চিত্তে স্থান পায়;
ফুলগুলো সে অবকাশের সুযোগ লাভ করে—তার প্রতারণার ভীতি থেকে নিরুদ্বেগে?
সুতরাং ঝর্ণার জল উপল খণ্ডের সাথে আলাপ করবে—এবং প্রিয় তার সখাসহ নিরালা হবে।
গোলাপকে তুমি দেখবে সৌন্দর্য দর্শনে বিকৃত মুখ—ক্রোধের লালিমায় নিজকে আবৃত করতে
'আস' গুল্মকে মনে হবে বুদ্ধিমান সতর্ক—ঘোড়ার মত কান উঁচিয়ে সে আড়ি পেতেছে।

* * * * *

হে 'ওয়াদিউল গাজা'র[৪৮৬] সমগোত্রীয় ভ্রাতৃবৃন্দ!—আমার হৃদয়ে তোমাদের জন্য স্থান আছে;
তোমাদের জন্য আমার আকুলতায় সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ—তা পূর্ব কি পশ্চিমের তাতে কিছু যায় আসে না।
অতীতের প্রীতিবন্ধন আবার ফিরিয়ে আন—তাহলে দাসকে ব্যাথামুক্ত করতে পারবে।
আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও প্রেমাসক্তকে সঞ্জীবিত কর—যার জীবন শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষীয়মান।

৪৮৬. সম্ভবত গ্রানাডার কোন নদী; তবে উত্তর আরবের একটি স্থানও উক্ত নামে পরিচিত।

www.amarboi.org

তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার হৃদয় বন্দী—তোমরা কি বন্দীকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা কর!

*　　　　　*　　　　　*

আমার হৃদয়ে তোমাদের জন্য একজন অতি ঘনিষ্ট—আশার বাক্যালাপে, অথচ সে বহু দূরে;

তার জন্য চন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদীয়মান—তাতে প্রেমাসক্তের দুর্ভাগ্য, অথচ সে ভাগ্যবান।

সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সবই সমান—তার প্রেমে, অঙ্গীকারে ও ভর্ৎসনায়।

তার দুই চোখে জাদু, তার দুই ঠোঁটে মধু—সে শ্বাসের মতই আত্মায় ভ্রমণরত;

লক্ষ্যে স্থাপিত শর আল্লাহ্‌র নামে নিক্ষেপিত—আর আমার হৃদয় হিংস্রতার শিকারে পরিণত।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

যদিও সে বিরূপ হয়, আশায় নিরাশ করে—তবুও প্রেমিকের হৃদয় আবেগে বিগলিত;

তবুও সে আত্মার পরম আত্মীয়—এবং প্রেমে প্রিয়তমের কোন অপরাধ নেই।

তার আদেশ শিরোধার্য—দৃষ্টান্তস্থল—সেই অস্থিপিঞ্জরের, যাকে বিদ্ধ করেছে এবং হৃদয়ের।

তার দৃষ্টিই তাদের বিচারক দৃঢ়তার সাথে—সেখানে প্রেমিকের দুর্বলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন;

উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিই তার দয়া—এবং প্রতিদানের ক্ষেত্রে পাপীও নিষ্পাপ সমতুল্য।

*　　　　　*　　　　　*

হৃদয়ের কী হল, যখনই মলয় প্রবাহিত হয়—সে নবীন আবেগের ঈদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সে দুশ্চিন্তা ডেকে আনে এবং বেদনা—অথচ এমনি জ্বালার জন্য সে নিয়ত উৎসুক।

'লওহে মাহফুজে' তার জন্য লিখিত ছিল—সেই বাণী—'আমার শাস্তি খুবই প্রচণ্ড'

আমার বক্ষপিঞ্জরে এক বহ্নিমান আবেগ—শুষ্ক খড়ের স্তূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি—

আমার জীবনরসের অতি অল্পই অবশিষ্ট—শেষ রাতের অন্ধকার ভোরের দীপ্তির ন্যায়।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

হে হৃদয়, ভাগ্যের সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ কর—এবং সময়কে প্রত্যাবর্তন ও অনুশোচনায় কাটাও।

অতীত দিনের চিন্তা পরিত্যাগ কর—সেই সন্তুষ্টি ও ভর্ৎসনার বিগত কাহিনী।

সমস্ত বাক্য সেই সদাতুষ্ট প্রভুতে অর্পণ কর—যিনি সূরা ফাতেহার সাহায্যে আভাস দিয়েছেন।

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি বিকাশে ও পরিণতিতে সম্ভ্রান্ত—যে সমষ্টিতে সিংহ সভায় পূর্ণচন্দ্র—
তার জন্য বিজয় অবতীর্ণ হবে, যেমন—পবিত্র আত্মার সাহায্যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য পূর্বাঞ্চলবাসীদের রচিত মুয়াশ্শিহাগুলোর মধ্যে কষ্ট-কল্পনার ছাপ স্পষ্ট। তাদের এমন রচনার মধ্যে ইবনে সানাউল মুলকের[৪৮৭] মুয়াশ্শিহাটি সুন্দর। তা পূব-পশ্চিমের সর্বত্র সুপরিচিতি লাভ করেছে। তার আরম্ভ নিম্নরূপ—

প্রিয়তম! তোমার মুখমণ্ডলের জ্যোতির যবনিকা উত্তোলন কর,
যাতে দাড়িম্বের কর্পূরে অবস্থিত কস্তুরী দৃশ্যমান হয়।
হে মেঘমালা! গিরিশৃঙ্গকে অলঙ্কারের আবরণে আবৃত কর এবং
তাকে সেই বলয় পরিধান করাও যা স্রোতস্বিনীর ন্যায় বঙ্কিম।

যখন আন্দালুসবাসীদের মধ্যে 'মুয়াশ্শিহা' রচনাধারা প্রতিষ্ঠিত হল এবং সাধারণের কাছে উক্ত রচনার প্রাঞ্জলতা, বাক্‌বিন্যাসের কারুকার্য সাদরে গৃহীত হল, তখন বিভিন্ন শহরের অধিবাসীরা তাদের ধারা অনুসরণ করে মুয়াশ্শিহ রচনায় মনোযোগ দিল। তারা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধারা অনুসরণ করলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাগরিক ভাষাকেই কারক-চিহ্নাদির বন্ধনমুক্ত করে ব্যবহার করতে লাগল। তারা নতুন করে আরও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করল এবং তার নাম রাখল 'জযল'। এ ধারায় কবিতা রচনার পর্যায়ক্রমিক বিকাশ বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে। তারা এক্ষেত্রে যেমন অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমনি অনারবত্ব মিশ্রিত তাদের ভাষায় তাতে বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও তার বিচরণক্ষেত্র প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে।

জযল শ্রেণীর কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন, তিনি হলেন আবু বকর ইবনে কযমান।[৪৮৮] যদিও তাঁর পূর্বে উক্ত কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তবুও তার পূর্বে তার মাধুর্য প্রকাশ পায়নি তার অর্থের গভীরতাও দেখা দেয়নি এবং তার বাক্‌চাতুর্য খ্যাতিলাভ করেনি। তিনি আবৃত বেদুইন মিনহাজাদের শাসন-আমলে ছিলেন এবং তাঁকে সাধারণভাবে জযল রচনাকারীদের নেতা বলা হয়। ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি তাঁর জযল কবিতা মাগরিবের শহরগুলো থেকে অধিকতরভাবে বাগদাদেই আলোচিত হতে দেখেছি। তিনি আরও বলেছেন, আমি আমাদের সময়ের রচনাকারী নেতৃস্থানীয় আবুল হাসান ইবনে জুহদর আল্ আশবেলিকে বলতে শুনেছি—জযল রচনাকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আর কারও ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটেনি, যেমনটি শিল্পকর্মের উস্তাদ ইবনে কযমানের জন্য ঘটেছে। একদা তিনি কতিপয় সহচরসহ একটি উদ্যানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি ছায়াকুঞ্জে তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। তাঁদের সামনে শ্বেতমর্মর নির্মিত একটি সিংহমূর্তি ছিল, যার মুখ থেকে বারিধারা নির্গত হয়ে সুবিন্যস্ত প্রস্তর চত্বরে পড়ছিল। তিনি বললেন,

৪৮৭. হযরতুল্লাহ ইবনে জাফর ৫৭৫—৬০৮ (১১৫০—১২১১ খ্রি:) হি:।
৪৮৮. মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালিক; মৃত্যু ৫৫৫ (১১৬০ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

নিকুঞ্জটি এমন এক চত্বরে সংস্থাপিত—যাকে অলিন্দ বলা হয়;
সেখানে সিংহ একটি অজগরকে গ্রাস করেছে—উরুর ন্যায় স্থূল
এবং এমনভাবে সে মুখ ব্যাদান করেছে—যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকারীর হাঁ।
তার মধ্য থেকে অজগর প্রস্তর চত্বরে নেমেছে—গর্জমান অবস্থায়।

ইবনে কযমান যদিও কার্ডোভার অধিবাসী ছিলেন, তবুও প্রায়শ তিনি শেভিলায় আসতেন এবং তার নদীর তীরে সময় কাটাতেন। একদিন এক শুভ সংযোগ ঘটল; জযল রচয়িতা একদল কবি একত্রে মিলিত হলেন। তারা নৌবিহারের জন্য নদীতে ভাসমান হলেন। তখন তাদের সাথে সেখানে ধনাঢ্য পরিবারের একটি সুন্দর বালক ছিল। তারা নৌকায় বসে মৎস্য শিকার করার ফাঁকে ফাঁকে তাৎক্ষণিক অবস্থার ওপর কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ইসা আল বালিদীই প্রথম আরম্ভ করলেন—

আমার হৃদয় মুক্তি চাইছে, অথচ যে হারিয়ে গিয়েছে;
কারণ প্রেম তাকে আবৃত করে ফেলেছে—কিঞ্চিমাত!
তুমিত দেখছ সে কেমন নিঃস্ব ও অস্থির হয়ে পড়েছে;
অনুরূপভাবে সে এক বৃহৎ ব্যথার ভারও বহন করছে।
সে সেই সুরমা-আঁকা আঁখির জন্য উন্মাদ আর তা অদৃশ্য
হয়েই তাকে বিপদে ফেলেছে—হায় সুরমারঞ্জিত আঁখি!

অতঃপর আবু আমর ইবনে যাহের আল্-আশবেলী বললেন—

নিমজ্জিত হয়েছে; আর প্রেম সাগরে যে ঝাঁপ দেয়, সে নিমজ্জিত হয়।
সেজন্যই তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ, কী দুর্ভাগ্য, কী জর্জরিত!
সে প্রেমের সাথে বিচিত্র লীলায় লীলায়িত হতে চেয়েছিল;
কিন্তু বহু লোকই এ প্রেমলীলায় আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

এরপর আবুল হাসান আল মুকরী আদ্দানী বললেন—

একটি প্রসন্ন দিন; তার সব কিছুই চমৎকার—
পানীয় ও মধুর সুখ আমার চারপাশে ভ্রমণরত।
'সফসফে'র শাখায় শাখায় পাখির কল-কাকলী
এবং আমার আধারে একটি মৎস্যের উপঢৌকন।

এরপর আবু বকর ইবনে মারতিন বললেন—

সত্যই তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি বারংবার ফিরে আসি
এ পবিত্র নদীতে বিহার করতে এবং শিকার করতে।
প্রকৃতপক্ষে এখানে শিকারের বস্তু এ মৎস্যকুল নয়;
বরং মানুষের সেই হৃদয়, যা বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ।

অতঃপর আবু বকর ইবনে কযমান বললেন—

যখন সে তার ক্ষুদ্র জাল নিক্ষেপের জন্য আস্তিন গুটায়,
তখন তুমি দেখতে পাও যে মৎস্য তার দিকে ধেয়ে আসছে;
কিন্তু মৎস্যের এবংবিধ আগমন জালে আবদ্ধ হবার জন্য নয়;
বরং তার সেই সুকোমল হস্তদ্বয়ে চুম্বন করার জন্য।

www.amarboi.org

তাদের সম-সাময়িককালে পূর্ব আন্দালুসে মুহলিফ আল আসোয়াদ[৪৮৯] খ্যাতি লাভ করেন। তার সুন্দর জযলগুলোর মধ্যে একটি—

আমি আসক্তির ভয় করতাম; অথচ আসক্ত হয়ে পড়েছি।
এ প্রেম আমাকে এক দুর্গম নিবাসে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।
এর ফলে তুমি সেই উজ্জ্বল শুভ্র গণ্ডদ্বয়কে দেখছ,
যা রঙীন শরাবের ন্যায় রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে।
হে রসায়ন শাস্ত্রের অনুসন্ধায়ী! আমার চোখেই তা আছে;
সেখানে দেখতে পাবে রৌপ্য কীভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়।

এরপর একটি ভিন্ন যুগের আবির্ভাব ঘটে; তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মুদগলিস।[৪৯০]
এ ধারায় তার চমৎকারিত্ব বহু বিস্তৃত। তার বিখ্যাত জযলের একটি অংশ—

বিচূর্ণ বৃষ্টির ধারা নামছে—সূর্যকিরণ আঘাত করে;
তুমি দেখতে পাবে একটি রুপালি—এবং অন্যটি সোনালি।
গাছপালা পান করে মাতাল হচ্ছে—শাখাগুলো নেচে উল্লাস করছে;
আমাদের মধ্যে তা আসতে ইচ্ছুক—কিন্তু লজ্জা পায় ও পলায়ন করে।

তাঁর জযলের আরও একটি সুন্দর অংশ—

সূর্যালোক উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তারকাকুল বিভ্রান্ত;
উঠ, চল আমরা আলস্যকে পরিহার করি।
সোরাহী থেকে কিঞ্চিৎ মিশ্রিত শরাব—
আমার কাছে মধু অপেক্ষাও মধুরতর।
কে তুমি আমাকে তোমার ধারণা অনুরূপ আচরণ না করার জন্য ভর্ৎসনা কর;
আল্লাহ্ তোমাকে তোমার বিশ্বাস মতো আচরণ করতে সহায়ক হোন।
সে বলে পানীয় পাপের জনয়িত্রী—
এবং বুদ্ধিকে সে বিকৃত করে ফেলে।
দেখছি হেজাজে যাওয়াই তোমার জন্য বেশি যুক্তিযুক্ত;
আমার সাথে বৃথা বাক্য ব্যয়ের জন্য কে তোমাকে টেনে এনেছে।
যাও তুমি মক্কায় হজ্জ ও মদিনায় যিয়ারত কর
এবং আমাকে আমার এ পানীয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে দাও।
যার শক্তি থাকতেও যা করার কোন অবকাশ নেই,
তার জন্য আকাঙ্ক্ষাই কর্মের চেয়ে মূল্যবান।

তাঁদের পরে শেভিলায় ইবনে জহদর আবির্ভূত হন। তিনি 'মিউরেকা' বিজয়ের[৪৯১] উপর এটি জযল রচনা করে অন্যান্য জযল রচয়িতার চেয়ে কৃতিত্ব দেখেন। উক্ত কবিতার আরম্ভটি নিম্নরূপ—

যারা সত্যকে হিংসা করে, তরবারী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবে;
বস্তুত সত্য-হিংসুকদের সাথে আমার কোন সংস্রব নেই।

---

৪৮৯. ইয়াখলাফ (?)—রোজেনথাল।
৪৯০. জীবনকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।
৪৯১. মিউরেকা—মালার্কা বিজয় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা।

www.amarboi.org

ইবনে যায়িদ বলেছেন, আমি তার সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তাঁর শিষ্য আলমাআমাআকেও দেখেছি। তার একটি বিখ্যাত জযলের আরম্ভ হচ্ছে—

হায়, আমি যদি আমার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ পেতাম
এবং তার কানে কানে এই একটি কথা বলতে পারতাম—
কেন সে হরিণীর গ্রীবা গ্রহণ করল
আর কেনই বা সে চকোরের মুখচ্ছবি চুরি করল!

অতঃপর তাঁদের পরবর্তীকালে সাহিত্যবিশারদ আবুল হাসান সহল ইবনে মালেক আবির্ভূত হলেন এবং তাঁদের পরে বর্তমান সময়ে আমাদের বন্ধুস্থানীয় আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে আমখতিব উজির এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামী জগতে গদ্য ও পদ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জযল কবিতাধারায় তাঁর সুন্দর সৃষ্টির অংশ বিশেষ—

মিশ্রিত কর পানপাত্র, পূর্ণ কর, বারংবার আমাকে দাও;
হায়, সম্পদ একমাত্র ধ্বংসের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে!

সুফীসাধকের ধারা অনুসরণ করে রচিত তাঁর একটি কবিতার অংশ। এক্ষেত্রে তিনি 'শশতরী'র ভাববিন্যাস ধারা অনুকরণ করেছেন।[৪৯২]

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে বহু বিচিত্র গজল তৈরি হয়েছে;
যারা গিয়েছে, তারা যেন ছিল না এবং যিনি ছিলেন তিনি আছেন।

এমন তাঁর আরও একটি সুন্দর কবিতার অংশ—

তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা, হে পুত্র, আমার জন্য পরম বেদনাদায়ক
এবং যখন আমি তোমার নৈকট্য লাভ করি, আমার নৌকা ভাসমান হয়।

উজির ইবনে খতিবের সময়ে 'ওয়াদিআশ'-এর অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে আবদুল আজিম খ্যাতি লাভ করেন। তিনিও নেতৃস্থানীয় জযল রচয়িতা ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত মুদগলিসের জযলের—'সূর্যালোক উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তারকাকুল বিভ্রান্ত' এ উক্তির ধারা অনুসরণ করে জযল রচনা করেছেন। তাঁর উক্তি—

পথভ্রষ্টতা অবারিত হয়েছে হে চতুর বন্ধুরা।
যখন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করেছে।
প্রতিদিনই একটি নবীন অমরতা আনয়ন কর;
তাদের মধ্যে কোন অসহনীয় মুহূর্তের প্রক্ষেপ ঘটাইও না।
চল 'জেনিল' নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের উদ্দেশ্যে যাই—
তার সবুজ গাছপালার সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে।
বাগদাদকে ত্যাগ কর এবং নীলের কথাও বলিও না;
আমার কাছে তারচেয়ে উক্ত অঞ্চলই সুন্দরতর।
এমন একটি স্থান, চল্লিশ মাইলের বিস্তৃতিও তার কাছে তুচ্ছ—
যখন তার চতুর্দিকে মাতাল বায়ু বইতে থাকে।
সেখানে তবুও ধূলিবালির কোন চিহ্ন দেখা যায় না;
এমন কি চোখে সুরমা হিসেবে ব্যবহারের পরিমাণও।

৪৯২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্; মৃত্যু ৬৬৮ (১২৬৮ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কেন তা ভিন্নতর হবে না, কেননা তাতে এমন কোন স্থান নেই
যেখানে মধুমক্ষিকা গুঞ্জরণ করে ফিরে না।

জযল কবিতা রচনার এ ধারা বর্তমানে আন্দালুসের সাধারণ কাব্যকৃতি রূপে পরিগণিত হয়েছে। এ ধারাতেই তারা কবিতা রচনা করে; এমন কি আরবি পনেরটি ছন্দই তারা এমন কবিতা রচনায় ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাদের ব্যবহৃত ভাষা একান্তই সাধারণ। এ সত্ত্বেও তারা এসব সৃষ্টিকে 'জযলী' কবিতা বলে অভিহিত করে। যেমন তাদেরই এক কবির বাণী—

এক যুগ, বহু বছর ধরে আমি তোমার চক্ষুকে ভালবেসেছি;
কিন্তু তোমার মধ্যে কোন মায়া, কোন কোমল হৃদয় নেই।
তুমি ত দেখছ, তোমার জন্য আমার হৃদয় কীভাবে
কামারের হস্তধৃত লাঙ্গলের ফাল হয়ে পড়েছে।
অশ্রু ঝরছে, আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে
এবং দক্ষিণে বামে অনবরত হাতুড়ির আঘাত পড়ছে।
আল্লাহ্ খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধে লুণ্ঠনের জন্যই সৃষ্টি করেছেন;
আর তুমি একাই প্রেমিকদের হৃদয় হরণ করে ফিরছ।

এ ধারার কবিতা রচনায় দক্ষতা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্যিক আবু আবদুল্লাহ্-আল্-লুশী[৪৯৩] খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর এমন একটি কবিতায় তিনি সুলতান ইবনুল আহমদের প্রশংসাকীর্তন করেছেন। কবিতাটি এই—

প্রভাত হয়েছে, উঠ হে বন্ধু, চল শরাব পান করি;
সঙ্গীতের দ্বারা উজ্জীবিত হবার পর চল আমরা হাসতে থাকি।
ভোরের ধাতুপিণ্ড রংয়ের লালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে
রাতের কষ্টিপাথরের উপর; চল পানপাত্র পূর্ণ করি।
তুমি ঐ পানীয়কে দেখতে পাবে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ—
রৌপ্য তুল্য; কিন্তু ভোরের লালিমা তাকে সোনালী করে তুলেছে।
তা মুদ্রার মতই মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত;
চক্ষের ঔজ্জ্বল্য তার ঔজ্জ্বল্য থেকেই শোভা গ্রহণ করে।
এই তো দিন, হে সহচর, যথার্থ জীবনধারণের জন্য;
ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবনযাপন তাতে, আল্লাহ্ কসম, কী মধুর!
রাত্রিও এরূপ চুম্বন ও আলিঙ্গনের জন্য—
মিলনের শয্যায় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করে।
সময় দাতা হয়ে উঠেছে, ইতিপূর্বে সে ছিল কৃপণ;
সুতরাং তার হাত থেকে কোন সৌভাগ্যই যেন স্খলিত হয়ে না পড়ে।
যেমন কেউ অতীতে তার তিক্ততা গলাধঃকরণ করেছে;
কিন্তু এখন তার শরাব পান ও তার সুখাদ্য গ্রহণ করছে।
সমাজরক্ষীরা বলেন, হে সাহিত্যিক! এ কী ব্যাপার—
তোমাকে প্রেম ও শরাবের মধ্যে এমন সৃষ্টিশীল দেখছি কেন!
আমার ভর্ৎসনাকারীরা এ সংবাদে আশ্চর্যবোধ করেন;
আমি বলি, হে বন্ধুরা! এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কী আছে!

৪৯৩. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৬৭৮—৭৫২ (১২৬০—৩৫১ খ্রি:) হি: (?)।

www.amarboi.org

একমাত্র কোমল হৃদয়ের অধিকারীরাই সৌন্দর্যকে ভালবাসে
অন্যথায় তারা আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করবে অথবা তাঁর আদেশের।
সৌন্দর্যের যথার্থ স্বরূপ কেবলমাত্র সাহিত্যসেবী কবিরই উপলুব্ধ;
এ জন্যই সে কুমারী সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিবাহিতাকে ত্যাগ করে।
অবশ্য পানপাত্র; তা নিষিদ্ধ। তবে তা নিষিদ্ধ
সেই ব্যক্তির জন্য, যে জানে না কীভাবে তা পান করতে হয়।
যে হাত হিসাবের সংখ্যা বিন্যাসে পারদর্শী হয়;
সে কখনও শব্দের সৌন্দর্যের আকর্ষণ করে আনতে পারে না।
বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও আবেগতাড়িত ব্যক্তিবর্গ—
এজন্য পাপ করলে তাদের পাপ ক্ষমার্হ বলে গণ্য হয়।
এক উৎফুল্ল হরিণী, যার সংস্পর্শে জ্বলন্ত অঙ্গার নির্বাপিত হয়;
অথচ আমার হৃদয় তেঁতুলের জ্বলন্ত অঙ্গারে লীলায়িত হয়ে ওঠে।
এমন এক মরু-হরিণী, যে সিংহের হৃদয়কেও বিচলিত করে
এবং তাকে দেখবার পূর্বেই কল্পনামাত্র পালিয়ে যায়।
অতঃপর সে তাদের কাছে আসে, মুচকি হেসে তাদেরকে হাসায়
এবং পূর্বের বিমর্ষভাবের পর তারা আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।
তার মুখচ্ছবি অঙ্গুরীয়ের ন্যায়; উজ্জ্বল দন্ত শোভিত—
জাতির বিচক্ষণ বক্তাও সেই মুখচুম্বনের জন্য ভাষণ দান করে।
আহা, কী মণিমাণিক্যের মালাই না তা, হে অবলোকনকারী।
বিন্যাসকারীর দ্বারা সুবিন্যস্ত; অথচ ছিদ্রযুক্ত নয়।
তার ভ্রূ-যুগল ঘনকৃষ্ণ, বলতে গেলে তুলনাহীন;
কেউ যদি তাকে কস্তুরীর সাথে তুলনা করতে চায়, নিন্দনীয় হবে।
তার চুলের গুচ্ছ কাকের পক্ষতুল্য কৃষ্ণ-অন্ধকার;
আমার বিচ্ছেদের রাত্রিও সেই কৃষ্ণতার দিক থেকে বিরল।
এমন একটি গৌরবর্ণ তনু, যা পীযূষকান্তির সাথে তুলনীয়;
রাখাল কখনও তার ছাগল থেকে এমন দুধ দোহন করে না।
তার রক্তিম স্তন্য যুগল, আমি ইতিপূর্বে দেখিনি,
এমন কোন প্রস্তর-গোলক অথবা ইস্পাত—এমনি সুদৃঢ়।
তার এ স্থূল বক্ষদেশের নিম্নভাগে একটি সূক্ষ্ম কটীতট;
এমন সূক্ষ্ম, কেউ খোঁজ করলে হারিয়ে যাবে।
তা বুঝি-বা আমার ধর্ম থেকেও সূক্ষ্ম, যেমন বলা হয়;
পরীক্ষা করে দেখ, আমি বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলছি না।
তোমার সংস্পর্শে এসে আমার কোন্ ধর্ম ও কোন্ বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে!
যে তোমাকে অনুসরণ করবে, সে এ দুটি থেকেই বিচ্যুত হবে।
সে প্রহরীর ন্যায় ভারী নিতম্বের বোঝা বহন করছে—
যখন সে প্রিয়জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তার জন্য অপেক্ষা করে।
সে যদি সহজে না আসে সর্বনাশ হয় অথবা এমন দুর্যোগ
চোখের পলকে দেখা দেয়, মানুষ এসে ভীড় জমায়।
যখন সে আসে, সাধারণ গৃহও প্রাসাদের ন্যায় মনে হয়
এবং সে ফিরে গেলে তাকে মনে হয় একটি অন্ধকার গুহা।
তোমার গুণপনা বুঝি-বা কোন আমীরের চরিত্র-লিপি,

www.amarboi.org

অথবা বালুকার ন্যায় অজস্র, কার সাধ্য গণনা করে!
যিনি শহরগুলোর স্তম্ভ, বিশুদ্ধ আরবিভাষী
যার বাক্‌বৈদগ্ধ্য মানুষকে আকর্ষণ করে আনে।
তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একক এবং কর্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্রেও;
এ সঙ্গে অভিনব কবিত্বশক্তি ও রচনার অধিকারী।
তিনি বক্ষের মাঝে বর্শার দ্বারা কী দারুণ আঘাত করেন;
তাঁর চারটি গুণের জন্য আকাশও তাকে হিংসা করে;
এমন কে আছে যে আমার হৃদয়ের ন্যায় তা গণনা করবে।
সূর্য তাঁর ঔজ্জ্বল্যের জন্য, চন্দ্র তাঁর ইচ্ছার জন্য,
মেঘমালা তাঁর দানের জন্য এবং তারকা তাঁর মর্যাদার জন্য।
তিনি দানশীলতার তুরগে আরোহণ করেন ও বল্গা ছেড়ে দেন;
ধনিক-সৈনিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁর এ অশ্বারোহণ।
তাঁর রাজকীয় পোশাকের সুবাসে প্রতিটি দিন সুবাসিত হয়
এবং উচ্চবংশীয় রমণীকুল সে সুগন্ধেই পরিপূর্ণ থাকে।
তাঁর সন্নিধানে যারা আসে, সবার উপরেই তাঁর সম্পদ বর্ষিত হয়;
দূত ও অভ্যাগত কেউই নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।
তিনি সত্যকে প্রকাশিত করেছেন, ইতিপূর্বে তা গুপ্ত ছিল;
অতঃপর মিথ্যার পক্ষেও আর গুপ্ত থাকা সম্ভব নয়।
তিনি সংগোপনে ধর্মভীরুতার স্তম্ভকে নির্মাণ করেছেন;
ইতিপূর্বে সময় তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।
সাক্ষাতের সময় তুমি তাঁকে সমীহ করবে, যেমন তুমি তাঁকে কামনা কর;
তাঁর মুখচ্ছবি কী গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ কী অমায়িক!
তিনি হাসিমুখে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধ তখন বিমর্ষভাব ধারণ করে;
তিনিই বিজয়ী,—পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তাকে জয় করতে পারে।
তিনিই যখন যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় তার তরবারী কোষযুক্ত করেন,
তখন তাঁর আঘাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকে না।
তাঁর নাম নবী মোস্তাফা (সঃ)-র নামতুল্য এবং আল্লাহ্
তাঁকে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন।
তুমি তাঁকে খলিফার ন্যায় দেখতে পাবে, বিশ্বাসীদের নেতা;
তিনি সৈন্যদল পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের শোভা বর্ধন করেন।
তাঁর নেতৃত্বের সামনে সকলের শির অবনত হয়ে আসে;
অথচ সকলেই তাঁর হস্তচুম্বন করার জন্য একান্তই উৎসুক।
তাঁর পরিবারে যুগের সব পূর্ণচন্দ্র একত্র হয়েছে;
তাঁর মর্যাদায় ক্রমবর্ধমান,—হ্রাসপ্রাপ্তি কোন লক্ষণ নেই।
তারা সমুন্নতি ও গৌরবে সব থেকে দূরে অবস্থিত এবং
লজ্জায় ও বিনয়ে তারা সবার একান্ত নিকটবর্তী।
আল্লাহ্ তাদেরকে আকাশমণ্ডলের আবর্তন পর্যন্ত স্থায়ী করুন;
যতদিন তাতে সূর্যোদয় ঘটবে ও তারকা দীপ্তি দিবে, ততদিন।
যতদিন এ কবিতা সুরের ছন্দে গীত হতে থাকবে—
হে হারেমের সূর্য! তোমার জ্যোতি অস্তমিত হবে না।

www.amarboi.org

অতঃপর মাগরিবের শহরবাসীরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয়ের আবির্ভাব ঘটাল; তা মুয়াশ্যিহার ন্যায় মিশ্রিত ছন্দ্রের কবিতা। তাতেই তারা তাদের নাগরিক ভাষা ব্যবহার করে তার নাম রাখল 'আরোজল বালাদ' (নগর-ছন্দ)। যে ব্যক্তি প্রথম এ রচনা-রীতির প্রবর্তন করেন, তিনি আন্দালুস থেকে ফেজে এসে বসবাস করছিলেন এবং তার নাম ছিল ইবনে উমাইর। তিনি ময়াশ্যিহার ধারায় এ কবিতা রচনা করলেন এবং তাতে খুব কমক্ষেত্রেই কারক-চিহ্নাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রারম্ভ নিম্নরূপ—

নদীর তীরে ভোরবেলা উদ্যানের বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট
ঘুঘুর ক্রন্দনধ্বনি আমাকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে।
ভোরের হাত তখন রাতের আঁধার কালিমা মোচন করেছিল
এবং 'আকাহ' ফুলের দাঁত বেয়ে শিশিরের ঝর্ণা ঝরছিল।
উদ্যানে তার ভোরের অতিথি; কুয়াশা তখন ছিন্নভিন্ন—
যেন কুমারীবালার বক্ষদেশে বিন্যস্ত মণিমানিক্যের মালা।
পানি তোলার চাকগুলো থেকে অশ্রুধারা গড়াচ্ছিল;
যেন ফলের চারিধার বেষ্টনকারী সাপের আনাগোনা।
পরস্পর জড়িত শাখাগুলো যেন পায়ের গোছায় পরিহিত খাড়ু;
এসবই সমগ্র উদ্যানকে ঘিরেছিল একটি চুড়ির ন্যায়।
শিশিরের হাত ফুলকলির ঘোমটা উন্মোচন করছিল।
এবং বায়ু তার কস্তুরী সুবাস বহন করে ফিরছিল।
শুভ্র আকাশ কস্তুরী কাজল মেঘমালায় আবৃত হচ্ছিল।
আর বায়ু তার আঁচল জড়িয়ে তাকে মুছছিল।
আমি দেখলাম একটি ঘুঘু পাতার মাঝখানে ক্ষুদ্র শাখায়
শিশিরের ফোঁটায় তার পাখা-পক্ষ্ম সমস্ত ভিজে গিয়েছে।
সে এক প্রবাসী আশ্রয়প্রার্থীর মত করুণা প্রার্থনা করছে;
নবীন পালক চাদরের ন্যায় তার সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে।
অবশ্য তার ঠোঁট লাল ও পায়ের রং-ও মেহেদী-রঙিন;
একটি সুবিন্যস্ত মণির মালায় তার কণ্ঠদেশ আবরিত।
সে শাখার ফাঁকে এক প্রণয়কাতর ব্যক্তির ন্যায় উপবিষ্ট;
একটি পাখা যেন তার তাকিয়া আর অন্যটি গায়ে জড়িয়েছে।
সে তার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা সম্পর্কেই অভিযোগ করছিল;
এজন্যই তার চক্ষু বক্ষস্থানে নিয়োজিত এবং কণ্ঠে আর্তনাদ।
আমি তাকে বললাম, হে ঘুঘু আমার চোখে নেই;
তোমাকেও দেখছি অনবরত কাঁদছ, অশ্রু বর্ষণ করছ।
সে আমাকে বলল, যতক্ষণ অশ্রু শুষ্ক না হয় আমি কাঁদব;
বাকি জীবন অশ্রুহীন কান্নায় চিৎকার করে ফিরব।
একটি শাবকের জন্য, যে উড়ে গিয়েছে আর ফিরে আসেনি;
আমি সেই নূহের কাল থেকে এ কান্না ও ব্যথার সাথে পরিচিত।
এ বুঝি অঙ্গীকার পূরণ আর এরূপই বুঝি বিশ্বস্ততার পরিচয়;
দেখ না আমার চোখের ভুরুগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।
কিন্তু তোমরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এক বছর ধরে কাঁদে,
বলবে, এ কান্না আর হাহাকার আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

www.amarboi.org

বললাম, ঘুঘু হে, তুমি যদি ব্যথার সাগরে এমন ডুবেই থাক,
তাহলে কি আমার জন্যও কান্নায় দীর্ঘশ্বাসে শোক প্রকাশ করতে পার না!
আমার হৃদয়ে যা আছে, যদি তোমার হৃদয়ে তা থাকত।
তাহলে তোমার পায়ের নিচে এ শাখার অবলম্বনও থাকত না।
কত বছর হল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য করছি;
ফলে এমন হয়েছে যে আজ আমাকে কোন চক্ষুই দর্শনীয় মনে করে না।
আমার দেহ শীর্ণতা ও রোগের উপসর্গাদির দ্বারা আবৃত হয়েছে;
বিশেষ করে দেহের শীর্ণতাই আমাকে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত রেখেছে।
হায়, আমার মৃত্যু যদি আসত, তাহলে আমি এখনই মরতাম;
বাস্তবিক যারা মরেছে, তারাই শান্তিতে ঘুমোতে পারছে।
সে আমাকে বলল, যদি আমি এ উদ্যানের পত্রপল্লবে ঘুমিয়ে পড়ি;
আমার ভয় হয়, আমার আত্মাটিও অন্তরে প্রবেশ করবে।
এজন্যই আমি অশ্রুকে রঙিন করেছি, যাতে এ শুভ্র বর্ণের উপর
তা আমার কণ্ঠে অঙ্গীকারের হাত হিসেবে পরকালে ঝুলতে থাকে।
অবশ্য আমার চক্ষুর দিকটি, সে সম্পর্কে সবাই জানে যে,
আমার দেহ ভস্মে পরিণত হলেও তা একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিদ্যমান।[৪৯৪]

ফেজবাসীরা তার এ রচনা খুব পছন্দ করল এবং আগ্রহের সাথে আবৃতি করতে লাগল। তারা এ ধারায় কবিতাও রচনা করতে লাগল এবং কারক-চিহ্নাদির ব্যাপারটিতে যেহেতু তারা অভ্যস্ত নয়, সে জন্যই তা পরিত্যাগ করল। এমন কবিতা পঠন-পাঠনের বিষয়টি তাদের মধ্যে বিস্তৃত হল এবং অনেকেই তার রচনায় দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হল। তারা তাকে নানা শাখায় বিভক্ত করে 'মযদোয়াজ', 'কাযী', 'মালাবা' ও 'গজল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করল। তাদের মধ্যকার জোড় তৈরি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে বিচিত্র সব অভিধার সৃষ্টি হল। 'মযদোয়াজে'র মধ্যে ইবনে সুজার রচনাটি উল্লেখযোগ্য। ইনি 'তাজা'র অধিবাসী মাগরিবের বিশিষ্ট কবিদের অন্যতম। কবিতাটি এই—

সম্পদ পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আত্মার শক্তি বিশেষ;
এটি অসুন্দর মুখমণ্ডলকেও সুন্দর করে তোলে।
দেখ, যার হাতে পয়সার প্রাচুর্য বিদ্যমান;
তার জন্যই কথা বলার শক্তি ও উচ্চ পদমর্যাদা।
যার প্রচুর সম্পদ আছে, সে ছোট হলেও বড়—
এবং যিনি জাতির গৌরব, দারিদ্র্যের জন্য তিনিও ছোট হয়ে যান।
এজন্যই আমার হৃদয় জ্বলে ওঠে, এজন্যই বিচলিত হয়;
যদি না ভাগ্যের পায়ে ফিরতে হত, তবে তা ফেটে যেত।
ফলে শরণাপন্ন হয়, এমন এক ব্যক্তি—যে তার জাতির নেতৃস্থানীয়,
এমন এক ব্যক্তির, যার কোন কৌলিন্য নেই, সমীহ করার কিছু নেই।
এমন বৈপরীত্বের জন্য ব্যথিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই;
এর দ্বারা বিছানার সাদা চাদরও রঙিন হয়ে ওঠে।

৪৯৪. রোজেনথালের অনুবাদে এর পরও দুটি ছত্র বিদ্যমান।

www.amarboi.org

হায়, লেজগুলো মস্তকের সম্মুখভাগে স্থাপিত হয়েছে
এবং নদী পানপাত্রবাহীর কাছে পানি প্রার্থনা করছে।
মানুষের দুর্বলতা এজন্যই দায়ী, না সময়ের বিকৃতি এরূপ ঘটিয়েছে;
কেউ জানে না কাকে এজন্য ভর্ৎসনায় ব্যতিব্যস্ত করতে হবে।
হায়, যদি এমন হত যে, অমুক অমুকের পিতা হয়ে গিয়েছে;
তাহলে তার জবাব কীভাবে দেওয়া হয়,
আমরা বহুদিন বেঁচেছি, আল্লাহ্‌র দয়া, ফলে স্বচক্ষে দেখলাম,
সুলতানদের আত্মাগুলো কুকুরের চামড়ায় আবৃত রয়েছে।
মহৎ প্রাণের অধিকারীরা দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন;
তাঁরা যেখানে থাকেন, মর্যাদা থাকে তা থেকে ভিন্ন স্থানে।
তাঁরা এরূপই চিন্তা করেন; অথচ মানুষ তাঁদেরকে ভাবে জ্ঞানবৃদ্ধ,
দেশের মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়দের ভিত্তিভূমি!

তাদের রচনাধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইবনে সুজার 'মযদোয়াজে'র কতকাংশ—

যে ব্যক্তি সময়ের লাবণ্যে হৃদয় বিকিয়েছে, তার বড় কষ্ট;
সাবধান হে ভাইজান! সৌন্দর্যকে তোমাকে নিয়ে খেলতে দিও না।
তাদের মধ্যে সব সৌষ্ঠবই অঙ্গীকার করেই ভঙ্গ করেছে;
এমন কমই আছে, যার উপর তুমি ও তোমার উপর সে ভরসা করতে পারে।
তারা প্রেমিকদের প্রতি অকৃপণ; কিন্তু অন্যত্র বাধাসৃষ্টিকারী।
তারা ইচ্ছা করে মানুষের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করতে অগ্রসর হয়।
তারা যদি এক মুহূর্তে মিলনের কথা বলে'ত অন্য মুহূর্তে বিচ্ছেদের কথায় যায়;
যদি অঙ্গীকার করে, তাহলে সর্বাবস্থায় তা ভঙ্গ করতে তৎপর হয়।
কী লাবণ্যময় ছিল সে, আমার অন্তর তার জন্য উন্মুক্ত;
আমার গণ্ডের চামড়া দিয়ে তার জন্য পাদুকা বানিয়ে দিয়েছি।
আমার হৃদয়ের মধ্য ভাগে তার জন্য শয্যা পেতেছি
এবং আমার হৃদয়কে বলেছি, তোমাতে সমাগতজনকে স্বাগত জানাও।
সেজন্য তোমার উপর যে নিপীড়ন আসবে, তা সহজভাবে গ্রহণ কর;
কারণ প্রেমের এ বিভীষিকা তোমাকে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।
তাকে আমার উপর শাসক নিযুক্ত করেছি এবং তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি।
আহা, তুমি যদি আমার অবস্থা দেখতে, যখন সে দেখে।
তা তখন জলাশয়ে ভাসমান একটি কাঠখণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়;
যা অনবরত ডুবছে, তবু কোরবানীর পশুর ন্যায় পিপাসার্ত।
তৎক্ষণাৎ তার অন্তরের ভাষা আমি বুঝতে পারি এবং
তার ইচ্ছা ব্যক্ত না করলেও আমার বোধগম্য হয়ে ওঠে।
আমি তার ইচ্ছামত সব কিছু আনতে চেষ্টা করি, যদিও তা হয়
বসন্তকালের আঙুর রস অথবা রাত্রিকালের পানীয়।
আমি বাজার থেকে সংগ্রহ করি, প্রয়োজনে ইস্পাহানে যাই;
যখনই সে বলে, আমার এর প্রয়োজন; তখনই বলি, তুমি এটি পাবে।
... এভাবে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

www.amarboi.org

এমন 'মযদোয়াজ' রচয়িতাদের মধ্যে তিলমিসানে আলী ইবনে আল-মুয়াজ্জেন খ্যাতি লাভ করেন। অদূর অতীতে 'মেকনাসা'র সীমান্তবর্তী অঞ্চল যারহুনে 'আল কাফিফ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তিও এ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন এবং তিনি এতে অভিনবত্ব দেখান। তার সুন্দরতম যে রচনাটি আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে, তা হল সুলতান আবুল হাসান ও বনি মারিনের আফ্রিকিয়ায় গমন এবং কায়রোয়ানে তাদের পরাজয় বরণ সম্পর্কীয় বর্ণনা।[৪৯৫] এ কবিতায় তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও অন্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার সাথেও পরিচিত করাচ্ছেন এবং এ সঙ্গে তাদের আফ্রিকিয়ায় অভিযান পরিচালনার জন্য নিন্দাও শুনাচ্ছেন। তার কবিতাটি এ ধারার একটি 'মালাবা' জাতীয় রচনা। তিনি তার প্রারম্ভেই এমন একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা কবতির প্রারম্ভ রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ও উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে অভিনবত্বের দাবিদার। পরিভাষায় অনুরূপ সূচনাকে 'বারাআতুল ইস্তেহলাল' বা উত্তম সূচনা বলে অভিহিত করা হয়।

পবিত্রতা তাঁরই, যিনি আমীরদের অন্তরের অধীশ্বর
এবং সবযুগে সবমুহূর্তে তাদের চুলের ঝুঁটি তাঁর হস্তধৃত।
আমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি, তিনি মহান বিজয় দান করেন
আর আমরা যদি তাঁর অবাধ্য হই, তাহলে সব অপমানে তিনি শাস্তি দেন।

এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি বিষয় পরিবর্তন করত মাগরিবের সেনাবাহিনী সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

যদি পার ছাগল হও, কখনও রাখাল হতে যেও না।
কারণ রাখাল তার রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।
তাঁর উপর দরুদ পাঠ কর, যিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন
ইসলাম এবং পরিপূর্ণ সমুন্নত এক জীবন সন্তোষের দিকে।
সত্যনিষ্ঠ খলিফাদের উপর এবং তার অনুগামীদের উপর।
তাঁদের পরে যাকে ভাল লাগে, স্মরণ কর ও সে সম্পর্কে কথা বল।
হে হজ্জব্রত পালনকারী দল, যারা মরুপ্রান্তর অতিক্রম করছে;
তোমরা বিভিন্ন অঞ্চলকে অধিবাসীদের একসাথে বর্ণনা করিও।
ফেজের সৈন্যবাহিনী অত্যুজ্জ্বল জাঁকজমকপূর্ণ—
বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুলতান তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে?
হে হজযাত্রীগণ, আল্লাহর নবীর কসম, যাঁর মাজার দর্শন করেছ
এবং সমৃদ্ধির আকর হেজাজের মরুপ্রান্তরে তোমরা অতিক্রম করেছ।
আমি এখন তোমাদেরকে মাগরিবের সৈন্যদল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি;
যা কৃষ্ণ আফ্রিকার মরুদেশে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে এবং
সেই শাসক সম্পর্কে, যিনি দান-ধ্যান তোমাদের পাথেয় সমৃদ্ধ করেছেন
ও হেজাজের মরুপ্রান্তরকে করে তুলেছেন প্রাচুর্যের অঞ্চল।
ভাটার টানের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন প্রাচীরের ন্যায় এবং
আশঙ্কা কাতরতার পরিবর্তে আঘাতকে তিনি পর্যুদস্ত করেছেন।
ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে ভূমিতলে বিধ্বস্ত 'সদোমে'র ন্যায়;

৪৯৫. উক্ত ঘটনা ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

www.amarboi.org

যেখানে এখন বিচরণশীল হরিণীদের প্রাচুর্য ঘটেছে।
হায়, যদি তিউনিসের পশ্চিমাঞ্চল
এবং মাগরিবের অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি সেকান্দরী প্রাচীর থাকত;
তার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সুগঠিত,—
তার এটি স্তর লোহার ও অন্য স্তরটি ব্রোঞ্জের নির্মিত হত—
তাহলেও পাখি আমাদেরকে সংবাদ এনে দিত
অথবা বাতাস তাদের একটি মাত্র সংবাদও বহন করে আনত।
কী জটিল সেই বিষয়গুলো আর কী যে মন্দ!
যদিও তা প্রতিদিন আম-দরবারে উচ্চারিত হোক না কেন।
তাদের সংস্পর্শে পাথরেও রক্ত দেখা দেয় ও তা ফেটে যায়;
পাহাড় ধ্বসে পড়ে এবং হরিণীরা ভীত সন্ত্রস্ত দৌড়াতে থাকে।
তোমার অনসন্ধায়ী বুদ্ধির কথা আমাকে বুঝিয়ে বল
এবং একাগ্রচিত্তে তুমি আমার জন্য চিন্তা কর;
এমন কি কোন কবুতর শিখেছে অথবা কোন নর্তক—
সুলতানের কাছ থেকে বিখ্যাত কিছু এবং তাকে চুম্বন করেছে সাতবার!
যথার্থ সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী গল্পকারের কাছে প্রকাশ পেয়েছে;
এমন কিছু নিদর্শন যা মিনারে দাঁড়িয়ে বলা যায়!
বরং তারা এমন এক জাতি উলঙ্গ বস্ত্রহীন;
একান্ত মূর্খ, তাদের বাসস্থান নেই— তার সম্ভাবনাও নেই।
তারা জানে না, তারা কীভাবে পরাজয়কে কল্পনা করতে পারে;
অথচ তারা কীভাবে 'কায়রোয়ান' শহরে প্রবেশ করল!
হে মালিক আবুল হাসান! আমরা দ্বারের কাছে পৌঁছেছি
কোন একটি বিষয়ে; চলুন, আমরা তিউনিসের দিকে অগ্রসর হই।
আপনার জন্য আমরাই যথেষ্ট; 'জারিদ' ও 'যাবে'র প্রয়োজন নেই।
আপনি এ কৃষ্ণ আফ্রিকিয়ার বেদুইনদেরকে দিয়ে কী করবেন?
আপনি কি উমর ইবনে আল খাত্তাবের কথা শুনতে পাননি?
যিনি 'ফারুক' নামে খ্যাত, যিনি বহু নগরীর বিজেতা ও প্রতারিত।
তিনি ইরাক, হেজাজ ও পারস্য সম্রাটের মুকুটের অধিকারী
এবং তিনি আফ্রিকিয়ার প্রবেশমুখের কিয়দংশ জয় করেছিলেন।
আমার জন্য বৃথা হোক, যদিও উচ্চারণ করতে খারাপ লাগে;
তবু তিনি বলেছেন, এখানে আমরা ভ্রাতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত হবে।'
এ 'ফারুক' সমস্ত মানব সমাজের 'মণি' স্বরূপ;
তিনিই এ আফ্রিকিয়া সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।
ফলে আফ্রিকিয়া উসমানের সময় পর্যন্ত স্থগিত ছিল এবং
শুদ্ধ মত এই যে ইবনে যুবায়ের তা জয় করেছেন।
তারাই দ্বারা তার লুণ্ঠিত সম্পদ রাজকোষে প্রবেশ করেছে;
উসমানের মৃত্যু হয়েছে এবং আমাদের উপর বায়ুর গতি ফিরে গিয়েছে।
মানুষ তিনটি নেতৃত্বের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল
এবং যারা নিশ্চুপ ছিল, তাদের হাতেই ছিল বাগডোর।
যখন পুণ্যাত্মা মুসলমানদের সময়েই এ অবস্থা হয়েছিল;
তখন আমরা এ আখেরী জামানায় আর কী করব!
নগরবাসীগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পুস্তিকায় এবং

www.amarboi.org

তাদের বুধ ও শনি গ্রহ সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক বিবরণে
এরূপ ধারণার সত্যতা প্রমাণে কবিতা উপস্থিত করেন
'সিক্ক', 'সাতিহ' ও ইবনে মেরানার।
তা এই যে, মারিনীরা যদি তিউনিসের প্রাচীরের উপর
নির্ভর করে, তাহলে মূলশুদ্ধ ধ্বসে পড়বে।
আমরা স্মরণ করতে পারি, যা উজিরদের প্রধান—
ইসা ইবনে আবুল হাসান—উন্নত মহান—বলেছেন।
তিনি আমাকে বলেছেন, দেখ, আমিই সেই, যে বুঝতে পারে;
কিন্তু যখন ভাগ্যের পালা আসে, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।
আমি তোমাকে বলতে পারি, মারিনীদেরকে কিসে এনেছে,
ফেজের রাজধানী থেকে এ 'দিয়াবের' বেদুইনদের দিকে!
আমাদের মালিক ইবনে ইয়াহিয়ার মৃত্যুতে লাভবান হতে ইচ্ছুক;
তিনি তিউনিসের সুলতান ও বহুদ্বারের অধিকারী।

অতঃপর কবি সুলতানের অভিযান ও সৈন্য পরিচালনার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং আফ্রিকিয়ার বেদুইনদের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ও শেষ পর্যন্ত এসেছে। এ বর্ণনায় কবি বিরল অভিনবত্বের সর্বপ্রকার নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

তিউনিসবাসীরাও তাদের নাগরিক ভাষায় 'মালাবা' কবিতা রচনার ধারাটি নতুনভাবে বিস্তৃত করেছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টির অধিকাংশই অতিশয় নিম্নমানের। এ বিশেষ কারণেই তাদের কোন কবিতার নিদর্শন আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।

পূর্বাঞ্চলে 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা

বাগদাদের সাধারণ মানুষও এক ধরনের কাব্যচর্চা করত; তাকে বলা হত 'মাওয়ালিয়া'। তার অধীনে বিচিত্র বিষয় বিদ্যমান; তাদের কতকগুলোকে তারা 'কৌমা' ও 'কান ও কান' বলে অভিহিত করে। তাদের মধ্যে এক পঙ্ক্তির কবিতাও আছে; দুই পঙ্ক্তির কবিতাও আছে। তাদের কাছে গৃহীত সব প্রকার বিভেদ সত্ত্বেও তারা তাদের প্রত্যেকটিকেই 'দো-বয়েত' বলে আখ্যায়িত করে। তাদের অধিকাংশ কবিতাই চারটি পঙ্ক্তিতে বিন্যস্ত।

মিশরের কায়রোর অধিবাসীরা এ বিষয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেছে এবং বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তারা তাদের স্থানীয় ভাষায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সর্বপ্রকার রীতিতে কবিতা রচনায় প্রাচুর্য এনেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত রচনাশৈলী দেখিয়েছে। আমি সফী আল হিল্লীর[৪৯৬] সংকলন গ্রন্থে দেখেছি; তার উক্তির মধ্যে একটি হল, "মাওয়ালিয়া 'বাসিত' ছন্দে রচিত এবং তার চারটি পঙ্ক্তি ও চরটি অন্ত্যমিল বিদ্যমান। তাকে 'সাউত' (সুর) ও 'বয়তান' (পয়ার) বলা হয়। তা 'ওয়াসিত'-এর অধিবাসীদের আবিষ্কার। 'কান ও কান' একই অন্ত্যমিলে রচিত হয়; তার অর্ধপঙ্ক্তিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মাত্রা থাকে। কবিতার প্রথম অর্ধপঙ্ক্তি তার দ্বিতীয় অর্ধপঙ্ক্তির চেয়ে দীর্ঘ হয় এবং তার অন্ত্যমিল 'হরফে ইল্লত' বা আলিফ, ওয়াও, ইয়া বর্ণযুক্ত হয়ে থাকে।

৪৯৬. আবদুল আজিজ ইবনে সারায়া আলী হিল্লী; ৬৭৭—৭৪৯ (১২৭৮—১৩৪৯ খ্রি:) হি:।

www.amarboi.org

কবিতার এমন সৃষ্টিকার্যের আবিষ্কার বাগদাদীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আমাদের জন্য 'কান ও কান'-এর একটি উদাহরণ—

ভুরুর ইশারায় আমরা যে, কথা বলেছি, তা স্বয়ং প্রকাশ;
মূকের মাতাই শুধু মূকের ভাষা বুঝতে পারে।

সফী আল হিল্লীর বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত। আমার স্মৃতিতে তাদের এক কবির যে উক্তিটি বিধৃত রয়েছে, তা অতীব সুন্দর!

এ আমার সজীব ক্ষতস্থান,—রক্ত ঝরছে
এবং আমার হত্যাকারী, হে ভাই—প্রান্তরে ক্রীড়ামগ্ন!
তারা বলল, তোমার রক্তের শোধ নিব,—বললাম, এটি আরও মন্দ।
আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ করুক—তা-ই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

তাদের অন্য একজনের—

রাত্রিবেলা তাঁবুর দরজায় শব্দ করলাম, বলল, শব্দকারী কে তুমি?
বললাম, বিপদাপন্ন একব্যক্তি, ডাকাতও নই, চোরও নই।
সে হাসল, তার দন্তপাতি থেকে আমার উপর বিদ্যুপাত হল;
আমি আমার অশ্রু সাগরে ডুবে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরলাম।

অন্য একজনের—

তার সাথে এমন সময় কেটেছে, যখন সে বিচ্ছেদের আশ্বাস দিতে পারত না;
আমি প্রণয়-জ্বালার অভিযোগ করলে সে বলল, তোমার জন্য আমার চোখ।
কিন্তু যখন অন্য এক সুন্দর যুবক তার চোখ কেড়ে নিল—তখন
আমি তাকে অঙ্গীকার স্মরণ করালে সে বলল, তা তোমার কাছে আমার ঋণ;

অন্য একজন 'হাশিশ' (ভাঙ)-এর বর্ণনায়—

এমন বিশুদ্ধ মাদকতাপূর্ণ, যার নেশা সর্বদাই লেগে থাকে;
সে আমাকে মদ্য, শুঁড়ী এবং পরিবেশনকারিণীর প্রয়োজন মিটিয়েছে।
সে এক প্রবীণা বেশ্যা, তার ছলাকলা আমার মধ্যে আগুন জ্বালায়;
আমি তা আমার আঁতে লুকিয়ে রাখি, কিন্তু আমার চোখ প্রকাশ করে দেয়।

অন্য একজনের—

কে তুমি ভালবাসার সন্তানদের সাথে মিলতে চাও, বাহ্!
বিচ্ছেদের জ্বালা কীভাবে অন্তরকে পোড়ায়, আহাহা-আহ্!
আমার অন্তরে লুকায়িত হুঁ হুঁ; আমার ধৈর্য কী, বাহ্!
আমার চোখে সব ধরা 'কাখ্'; শুধু তোমার অস্তিত্ব, দাহ্!

অন্য একজনের—

আমি তাকে বললাম, যখন বার্ধক্য আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে;
'আমাকে একটি ভালবাসার চুম্বন উপহার দাও, হে মা[illegible]!'

www.amarboi.org

সে বলল, অথচ সে ইতিমধ্যে আমার অন্তঃস্থলকে দাগে দাগে জর্জরিত করেছে;
'আমি বুঝি না, এ সাদা কার্পাস কী করে একটি জীবিত লোকের মুখ আবৃত করে!'

অন্য একজনের—

সে আমাকে দেখে হাসল; আমার অশ্রুমেঘ বিদ্যুচ্চমকের আগেই ঝরল।
সে ঘোমটা খুলল, পূর্ণিমা চাঁদ পূর্বাকাশে প্রকাশ পেল।
সে চুলের অন্ধকার ছড়াল, হৃদয় তার মধ্যে পথ হারিয়ে বসল।
সে তুলে নিল, ভোরের আভাসে আমরা পথ খুঁজে পেলাম।

অন্য একজনের—

হে কাফেলা চালক! উটগুলোকে যতদূর সম্ভব জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও
এবং ভোরের পূর্বেই আমার প্রিয়তমার আবাসে গিয়ে গতি থামাও।
গোত্রের মধ্যে চিৎকার করে বল, কেউ যদি পুণ্য লাভ করতে চাও,
তাহলে জাগ্রত হও এবং বিচ্ছেদের ফলে নিহত ব্যক্তির জানাজা পড়াও।

অন্য একজনের—

যে চোখ তোমার দেহে বিচরণ করত, আজ তা রাত্রিযাপন করে
তারকার দেহ বিচরণ করে এবং অনিদ্রাই তার খাদ্য।
বিচ্ছেদের শত তীর আমার দেহে অব্যর্থ—একটিও ব্যর্থ হয়নি;
হায় আমার সান্ত্বনা, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রচুর পুণ্য দিন, সে মরেছে।

অন্য একজনের—

আমি ভালবেসেছি তোমাদের সমৃদ্ধ অঞ্চলে, হে নিষ্ঠুর বিলাসীরা;
এমন এক হরিণীকে, যার চিন্তায় সিংহ-হৃদয়ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
এমন একটি শাখা, নত হলে কুমারীদের হৃদয়ও বিচলিত হয়
এবং যখন সে উত্থিত হয়, পূর্ণিমার চাঁদও তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

তারা যাকে 'দো-বয়েত' বলে অভিহিত করে, তার একটি উদাহরণ—

আমি যাকে ভালবাসি, সে স্রষ্টার কসম খেয়ে বলেছে,
সে তার মূর্তিকে ভোরের সাথে সাথে পাঠাবে।
হে আমার প্রণয়ের অগ্নি, তুমি জ্বলতে থাক;
সারা রাত, যাতে সে তার আলো দেখে পথ খুঁজে পায়।

জেনে রাখুন, এসব কাব্য-সামগ্রীতে বিধৃত বাক্‌বৈদগ্ধ্যের আস্বাদ লাভ করতে হলে যে-কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ভাষার সাথে পরিচিত হতে হবে এবং তার ব্যবহার ও কথোপকথনে ভাষাভাষীদের মধ্যে অধিকতরভাবে মেলামেশা করতে হবে। এর ফলে সেই ব্যক্তির মধ্যে সেই যোগ্যতা দেখা দিবে, যে যোগ্যতার কথা আমরা আরবি ভাষার ক্ষেত্রে বলেছি। এ যোগ্যতা না থাকার কারণেই আন্দালুসবাসীরা মাগরিবের অধিবাসীদের কবিতায় বিধৃত বাক্‌বৈদগ্ধ্যকে বুঝতে পারে না। মাগরিববাসীরাও অনুরূপভাবে আন্দালুসী ও পূর্বাঞ্চলবাসীদের বাক্‌বৈদগ্ধ্য বুঝতে সক্ষম হয় না। আবার

www.amarboi.org

পূর্বাঞ্চলবাসীদের পক্ষেও একইভাবে আন্দালুস ও মাগরিবের বাক্‌বৈদগ্ধ্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। কারণ তাদের নাগরিক ভাষা ও তার বিন্যাস পদ্ধতি বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং নিজ ভাষাভাষীদের কবিতার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারঙ্গম।

'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যে জ্ঞানীদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।'[৪৯৭]

---

৪৯৭. কোরান; ৩০, ২২।

www.amarboi.org

উপসংহার

আমরা প্রায় আমাদের উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম; এজন্যই আমরা এ প্রথম গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্যের রাশ এখানে টেনে ধরছি।

আলোচ্য বিষয় ছিল সভ্যতার স্বরূপ ও তাতে জ্ঞাত বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। আমরা তার সমস্যাবলি আমাদের ধারণা অনুসারে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত আকারে উপস্থিত করেছি। আশা করি, আমাদের পরে যিনি আসবেন, যাকে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ চিন্তা ও প্রগাঢ় জ্ঞানের দ্বারা সাহায্য করবেন, তিনি এ বিষয়ের সমস্যাবলির আরও গভীরে প্রবেশ করে আমাদের চেয়ে বেশি বিস্তারিতভাবে তা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। কোন বিষয়ের যিনি প্রবর্তন করেন, তার উপর তার সব সমস্যা অনুধাবনের দায়িত্ব বর্তায় না। বস্তুত তিনি জ্ঞানের এ শাখাটির আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেন, তার অধ্যায়-পরিচ্ছেদ বিভক্ত করেন এবং তাতে উপস্থাপনযোগ্য বক্তব্যের আভাস দান করেন। পরবর্তীগণ এসে আরও বহু সমস্যা তার সাথে যোগ করতে থাকেন এবং এভাবে ধীরে ধীরে একসময়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। 'আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না'।

গ্রন্থের রচয়িতা আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন—বলছে, আমি 'মুকাদ্দিমা' সংবলিত এ প্রথম গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস ও খসড়া রচনা কোন প্রকার পরিমার্জনা ও সংশোধন ছাড়াই সাত শত উনআশি (নভেম্বর, ১৩৭৭ খ্রি.) হিজরির মধ্যভাগে পাঁচ মাসে সমাপ্ত করি। তারপর আমি একে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করেছি এবং এর সাথে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সংযুক্ত করেছি। এ সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করেছি এবং আমার এ গ্রন্থ রচনার এটাই উদ্দেশ্য ছিল। 'জ্ঞান একমাত্র মহাপরাক্রমশালী বিচক্ষণ আল্লাহ্র কাছ থেকেই লাভ করা যায়।'

www.amarboi.org

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার
স্মারক ডাকটিকিট

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Arnold J. Toynbee
মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেছেন
"undoubtedly the greatest work of its kind
that has ever yet been created by
any mind in any time or place."

Bernard Lewis তার *The Arabs in History*
গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে
"the greatest historian of the Arabs
and perhaps the greatest
historical thinker of the Middle Ages"